সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

নির্বাচিত রচনাবলী

২
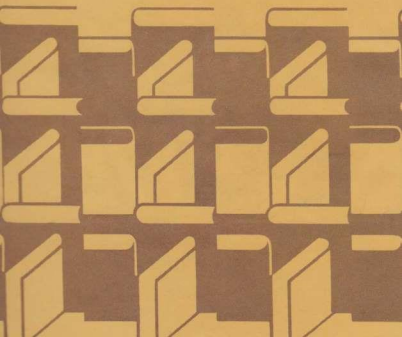
নির্বাচিত রচনাবলী

২

নির্বাচিত রচনাবলী

২য় খণ্ড

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)

অনুবাদঃ মাওলানা আকরাম ফারুক
মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা—চট্টগ্রাম—খুলনা

প্রকাশনায়ঃ
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোনঃ ২৫১৭৩১

আঃ প্রঃ ১৬৭

১ম প্রকাশঃ
রবিউস্‌সানি ১৪১২
কার্তিক ১৩৯৮
অক্টোবর ১৯৯১

বিনিময়ঃ ১৬০.০০ টাকা

মুদ্রণেঃ
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

تفہیمات -এর বাংলা অনুবাদ

NIRBACHITO RACHONABALI By Sayiid Abul A'la Maududi. Published by Adhunik Prokashani. 25, Shirishdas Lane Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25, Shirishdas Lane, Dhaka-1100.

Price: Taka 160.00 only.

আমাদের কথা

মাওলানা মওদূদী আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ। আজ প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সবাই তাঁর এ পরিচয় জানে। আধুনিক বিশ্বে ইসলামের পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বহুমুখী। তবে আমি বলবো, তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর লেখা। তাঁর চিন্তার ধারার লিখিত রূপ। তাঁর লিখিত কুরআনের তাফসীর তাফহীমুল কুরআন আজ বিশ্বজুড়ে লক্ষ কোটি যুবক যুবতীর দৈনন্দিনকার পাঠ্য বই। বস্তুত, তাঁর সমস্ত লেখাই জ্ঞানের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহর ফাল্গুধারা। তাঁর লেখা পড়ে বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ যুবকের ঘুম উঠে গেছে।

তাঁর এক অনবদ্য গ্রন্থের নাম 'তাফহীমাত'। এর অর্থ, বুঝিয়ে দেয়া বা বুঝে নেয়ার বিষয়। ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর যুক্তি প্রমাণের নিখাঁদ শৈলীতে লেখা কতিপয় প্রবন্ধ নিবন্ধের সংকলণ তাঁর গ্রন্থ। গ্রন্থটি চমৎকার রচনা শৈলীতে মনোজ্ঞ। ভাবের সম্মোহনে গতিমান। যেন জ্ঞানের চৌমোহনা। জ্ঞান পিপাসুর সুশীতল পানীয়। এর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, যে বিষয়টি নিয়েই তিনি কলম ধরেছেন, সে বিষয়েই জ্ঞান পিপাসুদের ক্ষুধা নিবারণ করার মতো করে লিখেছেন। তা পড়ে নেবার পর মন প্রশান্তি লাভ করে।

গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় চার খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তান আমলে ১ম খন্ডটি বাংলাভাষায় অনুবাদ হয়ে 'মওদূদী রচনাবলী' নামে প্রকাশ হয়েছিল। অনেকেই এ নাম পরিবর্তন করার পরামর্শ দিয়েছেন। আসলে বাংলা ভাষায় গ্রন্থটির প্রতিশব্দ খুঁজে বের করা কষ্টকর তাই, আমরা এখন ভেবেচিন্তে গ্রন্থটির নাম রাখলাম মাওলানা মওদূদীর 'নির্বাচিত রচনাবলী'।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী মাওলানা মওদূদীর সবগুলো গ্রন্থই বংগানুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং অনুবাদ কাজ প্রায়

সম্পন্ন হয়ে এসেছে। এ গ্রন্থটিও তৃতীয় খন্ড পর্যন্ত অনূবাদ সম্পন্ন হয়েছে। ইনশা আল্লাহ সবগুলো খন্ডই এ নামে প্রকাশিত হবে।

গ্রন্থটি দ্বারা চিন্তাশীল মহল উপকৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কুরআন বাহকের পরিচয়—কুরআনের দৃষ্টিতে

দুনিয়ায় মানব জাতির হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্যে সব সময় এমন সব মনীষীদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে, যারা নিজেদের কথা ও কাজের দ্বারা দুনিয়াকে সত্য ও সত্যবাদিতার সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ তাঁদের এ মহান উপকারের বিনিময় যুলুম ও অত্যাচারের আকারে দিয়েছে। তারা তাঁদের পয়গাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাঁদের সত্যবাদিতা অস্বীকার করেছে, তাঁদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাঁদের উপর নির্যাতন চালিয়ে ও তাঁদের কষ্ট দিয়ে তাঁদের সত্য পথ থেকে ফিরাবার চেষ্টা করেছে। এমনি করে তাঁদের প্রতি যুলুম শুধু তাদের বিরোধীরাই করেনি, বরঞ্চ তাঁদের প্রতি যুলুম তাঁদের ভক্ত অনুরক্তরাও করেছে। যেমন তাঁদের মৃত্যুর পর এরা তাঁদের শিক্ষাকে বিকৃত করেছে, তাঁদের পথনির্দেশকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। তাঁদের আনীত কিতাবে রদবদল করেছে এবং স্বয়ং তাদের ব্যক্তিসত্বাকে উদ্ভট খেলতামাশায় পরিণত করে খোদায়ীর রঙে রঞ্জিত করেছে। প্রথমোক্ত যুলুম তো সে মনীষীদের জীবদ্দশায় অথবা তারপর বড়জোর কয়েক বছর চলেছে। কিন্তু শেষোক্ত যুলুম তাঁদের পরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলতে থাকে এবং অনেক মনীষীর সঙ্গে এখনো চলছে।

এ যাবত দুনিয়ায় সত্যের যতো আহ্বানকারীই প্রেরিত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই তাঁদের জীবন অতিবাহিত করেছেন ঐসব মিথ্যা খোদার খোদায়ী নিশ্চিহ্ন করার জন্যে, যাদেরকে মানুষ এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে খোদা বানিয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু সর্বদা এটাই হতে থাকে যে, তাঁদের পরে তাঁদের অনুসারীরা জাহেলী আক্বীদাহ্‌-বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্বয়ং এই মনীষীদেরকেই খোদা অথবা খোদার খোদায়ীতে শরীক বানিয়ে নিয়েছে। আর তাঁদেরকে সে সব প্রতিমার মধ্যে শামিল করে নিয়েছে, যেগুলোকে চূর্ণ করার জন্যে তাঁরা গোটা জীবন পরিশ্রম করে গিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজের সম্পর্কে এমন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে যে, মানবাত্মায় স্বর্গীয় গুনাবলীর সম্ভাবনা ও অস্তীত্ব সম্পর্কে সে খুব কমই একীন রাখে। সে নিজেকে নিছক দুর্বলতা-হীনতার সমষ্টি মনে করে। তার মনে সাধারণত এ মহাসত্যের জ্ঞান ও বিশ্বাস থাকেনা যে,তার এ মাটির দেহে আল্লাহ তায়ালা এমন সব শক্তি সামর্থ দান করেছেন যা তাকে মানুষ হওয়া ও মানবিক গুনাবলীতে ভূষিত থাকা সত্বেও উর্দ্ধজগতে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাদের চাইতেও উচ্চতর মর্যাদায় পৌছাতে পারে। তাইতো দুনিয়ার কোনো মানুষ যখনই নিজেকে খোদার পয়গম্বর হিসেবে পেশ করেছেন, তখন তাঁর স্বজাতির লোকেরাই এই বলে তাঁকে খোদার পয়গম্বর মানতে অস্বীকার করেছে যে, এ তো আমাদেরই মতো রক্ত মাংসের মানুষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন তাঁর মধ্যে অসাধারণ সৌন্দর্য ও মহত্বের জ্যোতি লক্ষ্য করে তারা বিশ্বাসের মস্তক অবনমিত করলো, তখনই আবার তারাও বলে বসলোঃ যে সত্তা এমন অসাধারণ সৌন্দর্য ও মহত্বের অধিকারী, তিনি কখনো মানুষ হতে পারেন না। অতপর একদল লোক তাঁকে খোদা বানিয়ে বসলো, আবার কেউ সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার আত্মপ্রকাশের মতবাদ আবিষ্কার করে বিশ্বাস করে বসলো যে, খোদা তাঁর রুপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কেউ আবার তাঁর মধ্যে খোদায়ী গুনাবলী এবং খোদায়ী কুদরাত ও ক্ষমতার ধারণা করে বসলো। আবার কেউ ঘোষণাই করে দিলো যে, 'তিনি খোদার পুত্র।'

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ

আপন আপন ধর্ম প্রবর্তক সম্পর্কে
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধারণা বিশ্বাস

দুনিয়ার যে কোনো ধর্মপ্রবর্তকের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যাবে তাঁর অনুসারীরাই তাঁর প্রতি অধিক যুলুম করেছে। অলীক কল্পনা ও কুসংস্কারের পর্দা দিয়ে তাকে এমনভাবে ঢেকে রেখেছে যে, আজ তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাওয়াই মুশকিল। এমনকি

তাঁর বিকৃত করা গ্রন্থাবলী থেকে আজ এ ধারণা করাই কঠিন যে, তাঁর মূল শিক্ষা কি ছিলো আর স্বয়ং তিনিইবা কি ছিলেন? তাঁর জন্ম, শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য, তাঁর জীবনের প্রতিটি কথা, এবং তাঁর মৃত্যু চরম আজগুবী ও অলৌকিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ। মোট কথা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনটা একটা অলীক কাহিনী বলেই মনে হয়। তাঁকে এমনভাবে পেশ করা হয় যেনো স্বয়ং তিনিই খোদা ছিলেন কিংবা খোদার পুত্র। অথবা খোদার মূর্তরূপ বা অবতার অথবা অন্ততপক্ষে খোদায়ীর কিছুটা অংশীদার।

বুদ্ধ

উদাহরণস্বরূপ গৌতম বুদ্ধের কথা বলা যায়। বৌদ্ধ ধর্মের গভীর অধ্যয়নের ফলে এতোটুকু অনুমান করা যায় যে, এ মহান ব্যক্তি ব্রাহ্মন্যবাদের বহু ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করেছেন। বিশেষ করে তিনি সে সব অসংখ্য সত্তার খোদায়ী খন্ডন করেন যাদেরকে সে যুগের লোকেরা নিজেদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছিলো। অথচ তাঁর মৃত্যুর পর এক শতাব্দী অতিবাহিত হতে না হতেই তাঁর অনুসারীরা তাঁর সকল শিক্ষা পরিবর্তন করে ফেলে। মূল সূত্রের পরিবর্তে নতুন সূত্র তৈরী করে নেয় এবং তাঁর মূলনীতি ও বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় নিজেদের খেয়াল খুশী অনুযায়ী রদবদল করে নেয়। এক দিকে তারা বুদ্ধের নামে নিজেদের ধর্মে এমন সব আক্বীদাহ্-বিশ্বাস নির্ধারিত করে নিয়েছে যাতে খোদার কোনো অস্তিত্বই ছিলনা। অন্যদিকে তারা বুদ্ধকে সর্ববোধি, বিশ্বনিয়ন্তা এবং এমন এক সত্তা হিসেবে অভিহিত করে যিনি যুগে যুগে বুদ্ধদেবের রূপ ধারণ করে দুনিয়ার সংস্কারের জন্যে আগমন করে থাকেন। তাঁর জন্ম, জীবনী এবং অতীত ও ভবিষ্যত জন্ম সম্পর্কে এমন সব অলীক কাহিনী রচনা করে নিয়েছে যা পড়ে অধ্যাপক উইলসনের মতো পন্ডিত ব্যক্তি বিস্মিত হয়ে বলেনঃ প্রকৃত পক্ষে ইতিহাসে বুদ্ধের কোনো অস্তিত্বই নেই। তিন চার শতাব্দীর মধ্যে এসব কাহিনী বুদ্ধকে সম্পূর্ণ খোদায়ীর রঙে রঞ্জিত করে দিয়েছে। অশোকের যুগে বুদ্ধ ধর্মের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এক বিরাট সম্মেলন

কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয় যে, বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে খোদার দৈহিক প্রকাশ। অথবা অন্য কথায় খোদা বুদ্ধের দেহে রূপান্তরিত হন।

রাম

রামচন্দ্রের সাথেও একই আচরণ করা হয়। রামায়ণ অধ্যয়ন করলে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, রামচন্দ্র একজন মানুষ বই কিছুই ছিলেন না। সততা, ইনসাফ, বীরত্ব, উদারতা, বিনয়, ধৈর্যশীলতা এবং ত্যাগ প্রভৃতি গুনাবলী তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিলো বটে, কিন্তু খোদায়ীর চিহ্নমাত্র তাঁর মধ্যে ছিলনা। কিন্তু তাঁর মধ্যে উচ্চতর মনুষ্যত্ব এবং সে সাথে এতোগুলো ভালো গুণের একত্র সমাবেশ ভারতবাসীর নিকট এক প্রহেলিকা বলে প্রমাণিত হয় এবং তাদের জ্ঞানবুদ্ধি এর সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং রামচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুকাল পর এ ধারণা বিশ্বাস মেনে নেয়া হয় যে, তাঁর মধ্যে বিষ্ণু [১] রূপ পরিগ্রহ করেছেন। আর রামচন্দ্র সেসব সত্তার মধ্যে একজন যাদের রূপ পরিগ্রহ করে দুনিয়ার সংসারের জন্যে বিষ্ণু যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করেন।

কৃষ্ণ

এ ব্যাপারে উল্লেখিত দুজনের তুলনায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সর্বাধিক যুলুম করা হয়েছে। শ্রীভগবতগীতা বিকৃতি ও রদবদলের কয়েক পর্যায় অতিক্রম করার পরও আমাদের কাছে যে অবস্থায় পৌঁছেছে তা গভীরভাবে অধ্যায়ন করলে অন্তত এতোটুকু জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ একেশ্বরবাদী ছিলেন। "আল্লাহ তায়ালা সার্বভৌম

---

১. হিন্দুদের বর্তমান আক্বীদাহ্–বিশ্বাস অনুযায়ী বিষ্ণু জগতের প্রতিপালক খোদা বা দেবতা। সম্ভবত, মূলে ছিলো আল্লাহ তায়ালার রবুবিয়াত গুণের ধারণা–যাকে পরবর্তী কালে একটা স্থায়ী ব্যাক্তিত্ব বলে অভিহিত করা হয়। হিন্দুদের মধ্যে মুর্তিপূজার সূচনা এভাবেই হয় যে, তারা আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিটি গুনকে মূলসত্তা থেকে আলাদা করে একেকটিকে এক এক খোদা বলে অভিহিত করে।–গ্রন্থকার

সর্বশক্তিমান” হওয়ার উপদেশ তিনি মানুষকে দিতেন। কিন্তু মহাভারত বিষ্ণু পুরান, ভগবত পুরান ইত্যাদি গ্রন্থাবলী এবং খোদ গীতা তাঁকে এমনভাবে পেশ করে যে, একদিকে দেখা যায় তিনি বিষ্ণুর দৈহিক প্রকাশ, সর্বকিছুর স্রষ্টা এবং জগতের পরিচালক। অপর দিকে তাঁর প্রতি এমন সব দুর্বলতা আরোপ করা হয়েছে যে, তাঁকে খোদাতো দুরের কথা একজন পূত–চরিত্রবান মানুষ হিসেবে মেনে নেওয়াও কঠিন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নিম্নোক্ত বানী সমুহ পাওয়া যায়ঃ

"আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা; যা কিছু জ্ঞেয় এবং পবিত্র বস্তু তা আমি। আমি ব্রহ্মবাচক ওঙ্কার, আমিই ঋক, সাম ও যজুর্বেদ। আমিই প্রানীর পরাগতি ও পরিচালক, আমি প্রভূ সকল প্রানীর নিবাস, তাদের শুভাশুভের দ্রষ্টা। আমিই রক্ষক এবং হিতকারী, আমি স্রষ্টা এবং সংহর্তা। আমিই আধার এবং প্রলয়স্থান আর আমিই জগতের অবিনাশী কারণ। (সূর্যরুপে) আমিই তাপ বিকিরণ করি এবং জল আকর্ষণ ও বর্ষণ করি। আমি (দেবগনের) অমৃত ও (মর্তগনের) মৃত্যু। আমি অবিনাসী আত্মা, আমিই নশ্বর জগত।" (গীতা–(৯ঃ১৭–১৯দ্রঃ)

"ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ কেউ আমার উৎপত্তির তত্ত্ব জানেনা। কেননা আমি সর্ব প্রকারের দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদি কারণ। যিনি আমাকে আদিহীন জন্মহীন এবং সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানেন, মনুষ্য মধ্যে তিনিই মোহশুন্য হয়ে সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্ত হন।" (গীতা–১০ঃ২–৩)

"হে জিতনিন্দ্র অর্জুন! আমিই সব প্রানির হৃদয়ে অবস্থিত চৈতন্যময় আত্মা এবং প্রাণীগণের উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহার স্বরূপ, দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণুনামক আদিত্য। জ্যোতিষ্কগনের মধ্যে আমি উজ্জ্বল সূর্য। উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি এবং আমি নক্ষত্র গণের মধ্যে চন্দ্র।" (গীতা ১০ঃ২০–২১)

"আমি নাগগণের মধ্যে নাগরাজ অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে রাজা বরুণ আমি এই সমগ্র বিশ্বমাত্র একাংশে ধারণ করে আছি।" (গীতাঃ১০–২৯–৪৪).

"যিনি আমারই কর্মজ্ঞানে সকল কর্মকরেন, আমিই যার একমাত্র গতি যিনি আমার ভক্ত, যিনি সমস্ত বিষয়ে আসক্তিহীন এবং সমস্ত প্রাণীতে দ্বেষশূন্য– তিনি আমাকে লাভ করেন। (গীতা ১১ঃ৫৫)

আমি জন্মরহিত অবিনশ্বর এবং সর্বভূতের ঈশ্বর, তবু নিজের শুদ্ধসত্ব প্রকৃতিতে আশ্রয় করে নিজের মায়া শক্তি বলে আমি যেন জন্মগ্রহন করি, যখনই ধর্মের পতন ও অধর্মের উত্থান হয় তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের রক্ষার জন্যে দুষ্টগণের বিনাশের জন্যে এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যে আমি যুগে যুগে দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হই। " (গীতা ৪ঃ৬–৮)

এসব শ্লোকে গীতার শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্ট খোদা হবার দাবী করেছে।[১] অন্যদিকে পুরান–এ শ্রীকৃষ্ণকেই এমনভাবে চিত্রিত করছে যে গোসলের সময় তিনি গোপীদের পরিধেয় বস্ত্র লুকিয়ে রাখেন।

তাদেরকে উপভোগ করার জন্যে যতোজন গোপী ততোগুলো দেহ ধারণ করেন। আর রাজা পুরক্ষিত যখন সুকমুনিকে জিজ্ঞেস করেন যে, "খোদা তো অবতার স্বরূপ সত্য ধর্ম প্রচারের জন্যে আত্ম প্রকাশ করেন কিন্তু এ আবার কেমন খোদা, যে ধর্মের সকল রীতি নীতি লংঘন করে পরস্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে?" অভিযোগ খন্ডনের জন্যে মুনি এ কৌশলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন,

---

১. গীতা যদি নিজেকে খোদার কিতাব এবং শ্রীকৃষ্ণকে তার বাহক বলে দাবী করতো, তবে উল্লেখিত বাণী সমূহ খোদার বাণী মনে করা হতো এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি খোদায়ীর দাবী আরোপ করা হতোনা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, এ গ্রন্থ নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বাণী হিসেবে পেশ করছে। গোটা গীতার কোথাও এ কথার ইংগিত পর্যন্ত নেই যে, তা খোদার বাণী বা অহী বা ইলহামের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।–গ্রন্থকার

স্বয়ং দেবতা ও কোনো কোনো সময় সৎ পথ থেকে বিচ্যুত হন। কিন্তু তাদের পাপ তাদের নিজেদের উপর কোনো ছাপ রাখতে পারেনা। যেমন আগুন সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া সত্ত্বেও তাকে অভিযুক্ত করা যায় না।"

কোনো প্রখ্যাত ধর্ম গুরুর জীবন এতো নোংরা হতে পারে, বিবেক সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি তা মেনে নিতে পারেনা এবং এ ধারণা করতে পারেনা যে, কোনো সত্যিকার ধর্মগুরু প্রকৃতপক্ষে নিজেকে মানুষ ও সৃষ্টিলোকের প্রভু হিসেবে পেশ করবে। কিন্তু কোরআন ও বাইবেল উভয় গ্রন্থ তুলনামূলক ভাবে অধ্যয়ন করলে এ সত্য আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি তাদের মানসিক ও নৈতিক অধপতনের যুগে কিভাবে জগতের পবিত্রতম মনীষীদের জীবন চরিতকে একদিকে জঘন্যতম রূপে চিত্রিত করেছে যাতে করে নিজেদের যাবতীয় নোংরামী ও দুর্বলতার বৈধতা প্রমাণ করা যায়। অপরদিকে তাঁদের ব্যক্তিত্বকে ঘিরে রচনা করেছে উদ্ভট কাহিনী। এজন্যে আমরা মনে করি শ্রীকৃষ্ণের সাথেও এসব কিছুই করা হয়েছে এবং হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলী তাকে যেভাবে পেশ করেছে তা থেকে তাঁর মুল শিক্ষা ও আসল ব্যক্তিত্ব ভিন্নরূপ হয়ে থাকবে।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম

যে সকল মনীষীর নবুওয়াত জ্ঞাত ও সর্বজন স্বীকৃত তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক যুলুম হয়েছে সায়িদ্যুনা হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি। হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়ার সকল মানুষেরই মতো একজন মানুষ ছিলেন। মনুষত্বের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ঠিক তেমনি ছিলো যেমন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থেকে থাকে। পার্থক্য শুধু এতোটুকু ছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে হিকমাত, নবুওয়াত ও মুজিযা শক্তি দিয়ে একটা অধপতিত জাতির সংশোধনের জন্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রথমত তাঁর জাতিই তাঁকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করে এবং তিন বছর তো তারা তাঁর ভাগ্যবান অস্তিত্বই বরদাশত করেনি। এমনকি তাঁর পূর্ণ যৌবনে তারা তাঁকে হত্যা করার

ফয়সালা করে। কিন্তু এর পরে যখন তারা তাঁর মহত্ব স্বীকার করে নিলো, তখন তারা এতোদূর সীমা লংঘন করে বসলো যে, তারা তাঁকে খোদার পুত্র তথা খোদা আখ্যায়িত করলো। তারপরও তারা এ আকীদাহ্ বিশ্বাস তাঁর প্রতি আরোপ করলো যে, শুলে চড়ে মানুষের গুনাহের কাফ্ফারা আদায় করার জন্যে মসীহ্র আকৃতিতে স্বয়ং খোদা আবির্ভূত হয়েছেন। কারণ মানুষ স্বভাবতই পাপী ছিলো এবং সে নিজের আমল দ্বারা মুক্তি লাভ করতে পারতো না। মায়াযাল্লাহ! একজন সত্যবাদী নবী তাঁর প্রতিপালকের উপর এতো বড় মিথ্যা অপবাদ কেমন করে আরোপ করতে পারতেন? কিন্তু তাঁর ভক্ত অনুরক্তগণ ভক্তি শ্রদ্ধার আবেগে তাঁর প্রতি এসব মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। তাঁর শিক্ষাকে তাদের খেয়াল খুশী অনুযায়ী তারা এমনভাবে বিকৃত করে যে আজকাল একমাত্র কোরআন মজীদ ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো গ্রন্থেই হযরত ঈসা (আঃ) এর জীবনী এবং তাঁর শিক্ষার কোনো নিদর্শনই খুঁজে পাওয়া যায় না। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্টে চার ইনজিল নামে যেসব গ্রন্থ পাওয়া যায়, সেগুলো হযরত ঈসার মধ্যে খোদার আত্মপ্রকাশ তাঁর খোদার পুত্র ও খোদার মুলসত্তা হবার ভ্রান্ত চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ। কোথাও হযরত মরিয়মের প্রতি এ বলে সুসংবাদ দেয়া হয়েছেঃ 'তোমার সন্তানকে খোদার পুত্র বলা হবে।' (লুক–১ঃ ৩৫) কোথাও খোদার রুহ কবুতরের আকৃতিতে ইউসুর নিকট এসে বলেঃ এ 'আমার প্রিয় পুত্র।' (মতি–১৬ঃ১৭)। কোথাও স্বয়ং মসীহ্কে বলতে দেখা যায়ঃ 'আমি খোদার পুত্র। তোমরা আমাকে সর্ব শক্তিমানের ডান পাশে বসে থাকতে দেখবে।' (মারক্স–১৪ঃ৬২) 'কোথাও মসীহ্কে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্র সিংহাসনে বসানো হয়েছে এবং তিনি সেখানে শাস্তি ও পুরস্কারের ফরমান জারি করছেন।' (মতি–২৫ঃ৩১–৪৬)। কখনো হযরত ঈসার মুখ দিয়ে বলানো হচ্ছেঃ 'পিতা আমার মধ্যে আছেন এবং আমি পিতার মধ্যে আছি।' (ইউহান্না–১ঃ৩৮)। কোথাও আবার সে সত্যবাদী মানুষটির মুখ দিয়ে বলানো হচ্ছেঃ 'আমি খোদার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছি।' (ইউহান্না–৮ঃ৪২)। কোথাও তাঁকে এবং খোদাকে সম্পূর্ণ এক সত্তায় পরিণত করা হয়েছে এবং

তার প্রতি এ উক্তি আরোপ করা হয়েছে যেঃ 'যে ব্যক্তি আমাকে দেখলো, সে পিতাকে দেখলো।' এবং "পিতা আমার মধ্যে অবস্থান করে তাঁর কর্মসম্পাদন করেন।" (ইউহান্না ১৪ঃ৯–১০)। কোথাও খোদা তাঁর খোদায়ীর সমস্ত দায়িত্ব মসীহ্র উপর সোপর্দ করে দিচ্ছেন (ইউহান্না ৫ঃ২০–২২)

এসব বিভিন্ন জাতি নিজেদের নবী ও পথ প্রদর্শকদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণার জাল বিস্তার করেছে, তার আসল কারণ হচ্ছে সেই বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন যা সূচনাতেই আমরা উল্লেখ করেছি। তারপর যে জিনিসটি এর সহায়ক হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এসব মনীষীদের পরে অধিকাংশ সময়ে তাঁদের হেদায়াত ও শিক্ষা–দীক্ষা লিপি–বদ্ধ করা হয়নি। আবার কোনো সময়ে এদিকে মনোযোগ দেয়া হলেও তা সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। অতএব তাঁদের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তা এমন ভেজাল, বিকৃত ও রদবদল হয়ে যায় যে খাঁটি ও মেকির মধ্যে পার্থক্য করাই কঠিন হয়ে পড়ে।

এভাবে তাঁদের হেদায়াত সুস্পষ্টভাবে বর্তমান না থাকায় তার ফল এ দাঁড়ায় যে, যতোই দিন যেতে থাকে ততোই সত্য কুসংস্কারের বেড়াজালে আছন্ন হতে থাকে। এমনি করে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সকল সত্যই বিলুপ্ত হয়ে গেলো। বাকী থাকলো শুধু কল্প কাহিনী।

সায়্যিদুনা মুহাম্মদ (সঃ)

দুনিয়ার সকল নবী ও পথ প্রদর্শকের মধ্যে শুধু মাত্র মুহাম্মদ (সঃ) –ই এ বিশেষত্ব লাভ করেন যে, বিগত তেরশ বছর যাবত তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ সঠিক ও অবিকৃত অবস্থায় সুরক্ষিত রয়েছে। আর আল্লাহর মেহেরবাণীতে তা সংরক্ষণের এমন ব্যবস্থা হয়ে গেছে যে, কোনো অবস্থাতেই তা বিকৃত হওয়া সম্ভব নয়। মানুষ কুসংস্কারের দাস ও বিস্ময়কর বস্তুর প্রতি অনুরক্ত হবার কারণে এটা তার জন্যে অসম্ভব ছিল না যে, সে পূর্ণতার সর্বোচ্চ মর্যাদায়

ভূষিত এ মহা মানবকেও কাহিনীর মাধ্যমে কোনো না কোনো প্রকার খোদায়ীর গুণে গুণান্বিত করতো এবং আনুগত্যের পরিবর্তে তাঁকে বিস্ময় প্রকাশ ইবাদত ও পুজার বিষয়বস্তুতে পরিণত করতো কিন্তু নবী পরম্পরায় শেষ পর্যায়ে এমন একজন পথ প্রদর্শক প্রেরণ আল্লাহ তায়ালার অভিপ্রেত ছিলো যিনি মানব জাতির যাবতীয় আমল ও কর্মকান্ডের শাশ্বত আদর্শ ও বিশ্বজনীন হেদায়াতের উৎস হবেন। এজন্যে আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ (সঃ) ইবনে আবদুল্লাহকে সে যুলুম থেকে রক্ষা করেন যা জাহেল ভক্ত-অনুরক্তগণ অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম ও জাতীয় পথ-প্রদর্শকের প্রতি করতে থাকে। প্রথম কথা এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণের বিপরীত নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর সাহাবীগণ, তাবেয়ীন ও মুহদ্দিসগণ তাঁদের নবীপাকের সীরাত সংরক্ষনের স্বয়ং অসাধারণ ব্যবস্থাপনা করেছেন যার কারণে চৌদ্দশ বছর অতীত হবার পরও তাঁর ব্যক্তিত্বকে আজ আমরা এতোটা নিকট থেকে দেখতে পাই,যতোটা নিকট থেকে দেখতে পেতেন তাঁর যুগের লোকজন। দ্বীন ইসলামের ইমামগণ বছরের পর বছর ধরে আপ্রান প্রচেষ্টার পর যে সব গ্রন্থাদি রচনা করেছেন তার গোটা ভান্ডার যদি আজ বিলুপ্ত হয়ে যায় হাদীস ও সীরাত গ্রন্থের একটি পাতাও যদি দুনিয়ায় না থাকে, যার দ্বারা নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবন বৃত্তান্ত জানা যেতে পারে, আর থাকে যদি শুধু আল্লা্র কিতাব কোরআন পাক, তাহলেও এ কিতাব থেকেই ঐ সকল মৌলিক প্রশ্নের জবাব আমরা পেতে পারি, যা এ কিতাবের বাহক সম্পর্কে একজন ছাত্রের মনে জাগ্রত হয়।

আসুন এবার আমরা দেখি-কুরআন তার বাহককে কিভাবে পেশ করে।

রসূল একজন মানুষ

কুরআন মজীদ রেসালাত সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছে তা হচ্ছে রসুলের মানুষ হবার বিষয়টি। কুরআন নাযিল হবার পূর্বে বহু শতাব্দীর ধারণা বিশ্বাস এটাকে একটা মীমাংসিত ব্যাপারে পরিণত করে দিয়েছিল যে, মানুষ

কখনো আল্লাহ্‌র রসূল বা প্রতিনিধি হতে পারে না। জগতের সংস্কার সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিলে খোদা নিজেই মানুষের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন অথবা কোনো ফেরেশতা কিংবা দেবতা প্রেরণ করেন। আর জগতের সংস্কার সংশোধনের জন্যে এযাবত যতোবুযুর্গই এসেছেন–তাঁরা সকলেই অতি মানব ছিলেন। এ ধারণা –বিশ্বাস মানুষের মনের গভীরে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, যখনই খোদার কোনো নেক বান্দাহ মানুষের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌছে দেবার জন্যে আগমন করতেন তখন লোকেরা বিস্ময়ের সাথে প্রথম প্রশ্নই করতো–'এ আবার কেমন রসূল যে আমাদের মতোই পানাহার করে, ঘুমায় এবং চলাফেরা করে? এ কেমন পয়গম্বর যে, আমাদেরই মতো নানান অসুবিধা ভোগ করে? রোগগ্রস্ত হয়? সুখ–দুঃখ ও আনন্দ অনুভব করে? আমাদের হেদায়াতই যদি আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো, তা হলে এ কাজে তিনি আমাদেরই মতো একজন দুর্বল মানুষকে কেন পাঠালেন? খোদা কি স্বয়ং আসতে পারতেন না? প্রত্যেক নবীর আগমনের পরই লোকেরা এসব প্রশ্ন করতো এবং এসবকে বাহানা বানিয়ে তারা আম্বিয়ায়ে কেরামকে অস্বীকার করতো। হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতির নিকট আল্লাহর পয়গাম নিয়ে এলে তাঁকে বলা হলোঃ

مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (المؤمنون: ٢٤)

"এ তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়। সে আসলে তোমাদের উপর মর্যাদাবান হতে চায়। অথচ আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে তিনি অবশ্যই ফেরেশতা পাঠাতেন। (মানুষ কখনো খোদার পয়গম্বর হয়ে আসবে) এমন আজগুবী কথাতো আমাদের পূর্ব পুরুষদের বলতে শুনিনি।"

হযরত হূদ (আঃ) যখন তাঁর জাতির নিকট আল্লাহর পয়গামসহ প্রেরিত হন, তখন সর্ব প্রথম এ আপত্তিই উত্থাপন করা হয়ঃ

مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ
مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ

এ ব্যক্তিতো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ বৈ কিছু নয়। তোমরা যা খাও সেও তাই খায়। তোমরা যা পান করো সেও তা-ই পান করে। তোমরা যদি তোমাদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো, তাহলে নিশ্চিত ক্ষতির সম্মুখীন হবে। (আল-মুমেনুনঃ ৩৩-৩৪)

হযরত মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) যখন ফেরাউনের নিকট সত্যের পয়গাম নিয়ে পৌছুলেন, তখন ঐ একই কারণে তাঁদের কথা মেনে নিতে অস্বীকার করা হলোঃ

أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا (المؤمنون)

আমরা কি আমাদেরই মতো দুজন মানুষের প্রতি ঈমান আনবো? (আল-মুমেনুনঃ৪৭)

ঠিক এ প্রশ্নই তখনো উত্থাপিত হয়েছিল, যখন মক্কায় একজন উম্মী মানুষ চল্লিশটি বছর নীরব জীবন-যাপন করার পর হঠাৎ একদিন ঘোষণা করলেনঃ আমাকে খোদার পক্ষ থেকে মনোনীত করা হয়েছে। মানুষ বুঝতে পারছিলনা যে,তাদেরই মতো হাত-পা, নাক, চোখ, দেহ এবং প্রাণ আছে এমন একজন মানুষ কেমন করে নবী হতে পারে? তারা সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করতোঃ

مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَا
أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ
تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا. (الفرقان:٧-٨)

"এ আবার কেমন রসূল যে খাওয়া দাওয়া করে এবং হাট বাজারে যাতায়াত করে? তার নিকট কোনো ফেরেশতা প্রেরিত হলনা কেন যে তার সাথে থেকে লোকদের ভয় দেখাতো। অথবা নিজের পক্ষে, কোনো ধনভান্ডার অবতীর্ণ

করা হতো কিংবা তাঁর নিকট এমন কোনো বাগান থাকতো যার ফল সে খেতো",–(ফোরকানঃ৭–৮)

রেসালাত মেনে নেবার ব্যাপারে লোকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসই যেহেতু সবচাইতে বেশী প্রতিবন্ধক ছিলো, তাই কোরআন জোরালো ভাষায় তা খন্ডন করে এবং যুক্তি প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে, মানুষের হেদায়াতের জন্যে মানুষই যথোপযুক্ত। কারণ রসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য তো শুধু মানুষকে শিক্ষা দেয়াই নয়, বরঞ্চ এর সাথে সাথে তিনি নিজেও আমল করে দেখাবেন এবং কিভাবে আনুগত্য অনুসরণ করতে হয় তার নমুনাও পেশ করবেন। এ উদ্দেশ্যে যদি কোনো ফেরেশতা কিংবা কোনো অতিমানবকে পাঠানো হতো যার মধ্যে মানবিক বৈশিষ্ট্য থাকতোনা– তাহলে তো মানুষ বলে উঠতো, আমরা কেমন করে তার মতো আমল করতে পারি, যার মধ্যে আমাদের মতো কামনা বাসনা নেই এবং যার প্রকৃতির মধ্যে সেসব শক্তি নেই যা মানুষকে পাপের প্রতি আকৃষ্ট করে?

لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم
مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا (بنی اسرائیل: ۹۵)

যমীনে যদি ফেরেশতা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতো, তাহলে আমরা অবশ্যই তাদের হেদায়াতের জন্যে আকাশ থেকে কোনো ফেরেশতাকেই রসুল করে পাঠাতাম –(বনী ইসরাঈলঃ৯৫)

অতপর সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয় যে, এর আগে বিভিন্ন জাতির নিকট যতো আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত পথ প্রদর্শক পাঠানো হয়েছে–তাঁরা সকলেই নবী মুহাম্মদ (সঃ) এরই মতো মানুষ ছিলেন। প্রতিটি মানুষের মতোই তাঁরা পানাহার করতেন। হাট–বাজার ও রাস্তা–ঘাটে চলাফেরা করতেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ

إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا
كَانُوا خَالِدِينَ - (انبياء: ٧-٨)

"তোমার পূর্বে আমরা যেসব রসূল পাঠিয়েছি, তারাও মানুষই ছিলো। তাদের প্রতি আমরা অহী নাযিল করতাম। তোমরা যদি না জানো তবে জ্ঞানী লোকদের জিজ্ঞেস করে দেখো। সে সব রসূলকে আমরা এমন কোনো দেহ দেইনি যে, তাদের খেতে হতোনা এবং তারা অমর ছিলো–" (আম্বিয়াঃ৭–৮)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ
وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ - (الفرقان: ٢٠)

তোমার পূর্বে আমরা যতো রসূল পাঠিয়েছি–তারা সকলেই পানাহার করতো এবং বাজারেও চলাফেরা করতো– (ফোরকানঃ ২০)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (الرعد: ٣٨)

"তোমার পূর্বেও আমরা বহুসংখ্যক রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্যে আমরা স্ত্রীও বানিয়েছি এবং সন্তানাদি পয়দা করেছি"–(রাআদঃ৩৮)

অতপর রসূলুল্লাহ (সঃ) কে নির্দেশ দেয়া হলো যেনো তিনি তাঁর মানুষ হবার কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দেন, যাতে করে তাঁর মৃত্যুর পর লোকেরা তাঁকে খোদায়ীর গুনে গুনান্বিত না করে, যেমনটি করা হয়েছিল তাঁর পুর্ববর্তী নবীগণকে। বস্তুতঃ কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছেঃ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ - (كهف)

হে মুহাম্মদ! বলে দাওঃ আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র। আমার প্রতি অহী নাযিল করা হয় যে, তোমাদের খোদা শুধুমাত্র এক ও একক–(কাহাফঃ ১১১,হামীমুস সাজদাঃ৬)।

এ বিশদ বিশ্লেষণ শুধুমাত্র মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কেই যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করেনি; বরঞ্চ সকল পূর্ববর্তী আম্বিয়া ও বুযুর্গানে দ্বীন সম্পর্কিত এরূপ ভ্রান্ত ধারণাও দূর করেছে।

রসূলের শক্তি ও অস্বাভাবিক ক্ষমতা

দ্বিতীয় যে বিষয়টি কুরআন মজীদে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে রসূল (সঃ) এর শক্তি ও কুদরত বা অস্বাভাবিক ক্ষমতা। অজ্ঞতা মূর্খতা যখন খোদার নৈকট্য লাভকে খোদায়ীর সমার্থক বানিয়ে দিলো, তখন স্বাভাবিকভাবেই এ আকীদাহ জন্ম নিলো যে, খোদার নৈকট্য লাভকারী লোকেরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে। খোদার কারখানায় তারা বিশেষ কিছু ক্ষমতার অধিকারী হয়। পুরস্কার ও শাস্তি দানের ব্যাপারে তাদের হাত থাকে। গোপন ও প্রকাশ্য সবই তাদের জানা। তাদের মর্জি ও অভিমত অনুযায়ী ভাগ্যের ফয়সালা ওলট পালট হয়। মানুষের লাভ লোকসানে তাদের হাত থাকে। তারা ভালো মন্দের মালিক হয়। বিশ্ব জাহানের সকল শক্তিই তাদের অনুগত হয়। এক নজরে মানুষের মন পরিবর্তন করে তারা তাদের গোমরাহী দূর করতে পারে। এসব ধারণার ভিত্তিতে লোকেরা মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট আশ্চর্য ধরণের প্রশ্ন করতো। কুরআনে এরশাদ হচ্ছেঃ

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ
تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا
تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ
تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ
أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا
نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (بنی اسرائیل)

লোকেরা বলেঃ আমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমার কথা মানিবোনা যতোক্ষণ না তুমি যমীণ থেকে আমাদের জন্যে একটা ঝর্ণা প্রবাহিত করবে; অথবা তোমার জন্যে খেজুর ও

আংগুরের বাগান রচিত হবে এবং তার মধ্যে তুমি স্রোতস্বিনী প্রবাহিত করবে। অথবা আকাশকে টুকরো টুকরো করে আমাদের উপর ফেলে দেবে যা নাকি তুমি দাবী করছো অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে হাযির করবে। অথবা তোমার জন্যে একটা সোনার ঘর তৈরী হবে। কিংবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে। আর তোমার আরোহণকেও আমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত মানবোনা যতোক্ষণ না তুমি সেখান থেকে আমাদের জন্যে একখানা লিপি অবতীর্ণ করবে যা আমরা পড়বো। হে মুহাম্মদ! তুমি বলে দাওঃ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্দ্ধে আমার রব। আমি কি একজন পয়গাম বাহক মানুষ ছাড়া আর কিছু? (বনী ইসরাঈলঃ৯০-৯৩)

খোদা প্রাপ্তি ও বুযুর্গি সম্পর্কে মানুষের যতো ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান ছিলো, সে সবের খন্ডন করে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট করে বলে দিলেন যে, খোদায়ী ক্ষমতা ও খোদায়ী কর্মকান্ডে রসূলের বিন্দুমাত্র অংশ নেই। তিনি আরো বলে দিলেন যে, খোদার হুকুম ছাড়া নবী কাউকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা তো দূরের কথা স্বয়ং তাঁর উপর আপতিত ক্ষতি ও বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষার ক্ষমতাও তার নেইঃ

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ
بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - (انعام: ١٧)

আল্লাহ যদি তোমার কোনো ক্ষতি সাধন করতে চান তবে তিনি ছাড়া তোমাকে রক্ষা করার আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমাকে কোনো কল্যাণ দান করতে চান তাহলেও তিনি সর্বশক্তিমান। (আনআম)ঃ ১৭)

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (يونس: ٤٩)

(হে মুহাম্মদ) বলো, আমার নিজের জন্যে কোনো প্রকার লাভ ও ক্ষতির এখতিয়ার আমার নেই। অবশ্যি খোদা চাইলে সে ভিন্ন কথা। (ইউনুসঃ৪৯)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলে দিলেন যে, নবীর নিকট আল্লাহর ভান্ডারের চাবিও নেই। না তিনি গায়েবের ইলম জানেন আর না তিনি অস্বাভাবিক শক্তির অধিকারীঃ

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ (الانعام ٥٠)

হে মুহাম্মদ, তাদের বলো, আমি তোমাদের বলছিনে যে, আমার নিকট খোদার ধন-ভান্ডার রয়েছে অথবা আমি গায়েব জানি। আর এ কথাও আমি তোমাদের বলছিনে যে আমি একজন ফেরেশতা। আমি তো কেবল সেই অহীরই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি নাযিল হয়। (আন-আম-৫০)

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ
إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (اعراف ١٨٨)

আমি যদি গায়েবই জানতাম, তবে তো আমার নিজের জন্যে সমস্ত ফায়দাই লুটে নিতে পারতাম। আর কোনো ক্ষতিই আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। আসলে আমিতো সেসব লোকদের জন্যে সাবধানকারী ও সুসংবাদদাতা মাত্র যারা আমার কথা মেনে নেয়-(আরাফঃ১৮৮)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলে দিলেন যে, শাস্তি, পুরস্কার ও হিসেব নিকেশে নবীর কোনো হাত নেই। তাঁর কাজ হচ্ছে শুধু আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া এবং মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা। মানুষের হিসেব নিকেশ নেয়া, তাদের পাকড়াও করা এবং তাদের শাস্তি ও পুরস্কার দান করা হচ্ছে খোদার কাজঃ

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ
بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُلْ
لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (الانعام)

৩

হে মুহাম্মদ বলোঃ আমি আমার খোদার নিকট থেকে প্রাপ্ত এক উজ্জ্বল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ তোমরা তো অবিশ্বাস করলে। সেই জিনিস আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই যা পেতে তোমরা তাড়াহুড়া করছো। ফয়সালা করার সমস্ত এখতিয়ার শুধু আল্লাহর। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনি উত্তম ফয়সালাকারী। হে নবী বলে দাওঃ তোমরা যে জিনিসের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছো তা যদি আমার আয়ত্তেই থাকতো তাহলে আমার এবং তোমাদের মধ্যে কবেইনা ফয়সালা হয়ে যেতো। কিন্তু যালেমদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত–তা আল্লাহই ভালো জানেন–(আন–আমঃ ৫৭–৫৮)

وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (الرعد ٤٠)

হে নবী! তোমার কাজ হচ্ছে পয়গাম পৌছে দেয়া আর হিসেব নেয়া আমার দায়িত্ব–(রাআদঃ৪০)

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ (الزمر ٤١)

হে নবী! মানুষের হেদায়াতের জন্যে সত্যসহ এ কিতাব আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। এখন যে কেউ হেদায়াত গ্রহণ করবে সে তা নিজের জন্যেই ভাল করবে। আর যে গোমরাহীতে লিপ্ত হয় সে তার নিজের জন্যেই অমংগল করে। আর তুমি তাদের কোনো যিম্মাদার নও (যুমারঃ৪১)

আরো বলে দেয়া হলো, মানুষের অন্তর ঘুরিয়ে দেয়া কিংবা যারা সত্যকে মেনে চলতে প্রস্তুত নয়, তাদের মধ্যে ঈমান পয়দা করে দেয়া নবীর সাধ্যের অতীত। তিনি পথ প্রদর্শক শুধু এ অর্থে যে, নসীহত ও উপদেশের হক তিনি পুরোপুরি আদায় করেন। আর যে ব্যক্তি সত্যপথ পেতে চায়–তাকে তিনি পথ দেখিয়ে দেন।

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

وَمَا أَنْتَ بِهٰدِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ
يُؤْمِنُ بِآيٰتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ - (النمل: ٨٠، ٨١)

তুমি মৃতকে শুনাতে পারো না। সেই বধিরদেরও তুমি তোমার আওয়াজ পৌছাতে পারোনা, যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যেতে চায়। আর না তুমি অন্ধ লোকদের গোমরাহী থেকে বের করে সোজা পথে এনে দিতে পারো। তুমি কেবল সেই সব লোকদেরই শুনাতে পারো–যারা আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান আনে আর আনুগত্যের মস্তক অবনত করে– (আন–নহলঃ৮০–৮১)।

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۝ إِنَّا
أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا - (فاطر-٣)

কবরের মৃতদেরকে তুমি শুনাতে পারোনা। তুমি তো একজন সাবধানকারী মাত্র। আমরা তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছি" ১ (ফাতেরঃ ২২–২৪)

অতপর সুস্পষ্ট ভাবে এ কথাও বলে দেয়া হলো যে নবী করীম (সঃ) এর যা কিছু ইয্যত, কদর ও মর্যাদা লাভ হয়েছে, তা সবই এ কারণে হয়েছে যে, তিনি আল্লাহ্র আনুগত্য করেন। সঠিক ভাবে আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী চলেন এবং তাঁর প্রতি যে বাণী নাযিল হয় তা হুবহু আল্লাহ্র বান্দাদের নিকট পৌছেদেন। অন্যথায় তিনি যদি আল্লাহ্র ইতায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং আল্লাহ্র কালামের সাথে নিজের মনগড়া কথা মিশিয়ে দেন– তাহলে তাঁর কোনো বিশেষত্বই বাকী থাকে না। বরঞ্চ তিনি আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারেন না।

---

১. কুরআনের অন্য একস্থানে এ কথাটি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে
إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ -
হে নবী! তুমি যাকে চাও, তাকে হেদায়াত করতে পারোনা। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত করেন যারা হেদায়াত কবুলকারী তাদেরকে আল্লাহ্ খুব ভালো করেই জানেন –(কাসাসঃ৫৬)

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ

إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ - (البقرة: ١٤٥)

(হে নবীঃ) তোমার নিকট ইল্‌ম পৌছার পর তুমি যদি তাদের ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ করো, তাহলে নিশ্চিতরূপে তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। (আল –বাকারাহঃ ১৪৫)

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনানুযায়ী এ আয়াত নবী করীম (সঃ) এর চাচা আবু তালিব সম্পর্কে নাযিল হয়। তাঁর যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত, তখন নবী করীম (সঃ) আপ্রাণ চেষ্টা করেন, তিনি যেনো কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন যাতে করে ঈমানের সাথে তার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তিনি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর জীবন দেয়াকেই অগ্রাধিকার দিলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর নবীকে বলেনঃ

(হে নবী, তুমি যাকে চাও, তাকে হেদায়াত করতে পারোনা)। কিন্তু মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরগণের সুবিদিত পদ্ধতি এই যে, কোনো আয়াত নবী–যুগের কোনো ব্যাপারে প্রযোজ্য হলে–তাঁরা সে ব্যাপারটাকে ঐ আয়াতের শানে নুযুল হিসেবে বর্ণনা করেন। এ কারণেই তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত ইবনে উমার (রাঃ) প্রমুখের এ বর্ণনা ও এ সম্পর্কিত অন্যান্য বর্ণনা থেকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়না যে, এ আয়াতটি আবু তালিবের ওফাতের সময়ই নাযিল হয়। বরঞ্চ এগুলো থেকে এতোটুকু মনে হয় যে, এ আয়াতটির বিষয়বস্তুর সত্যতা এ ঘটনায় সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছে। যদিও আল্লাহ্‌র প্রত্যেক বান্দাহ্‌কেই সঠিক পথে আনার আন্তরিক কামনা নবীপাক (সঃ) এর ছিলো। কিন্তু কোনো ব্যক্তির কুফরীর উপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ তাঁর কাছে সর্বাধিক কষ্টকর হয়ে থাকলে এবং কোনো ব্যক্তির হেদায়াত লাভ তাঁর সর্বাধিক কামনার বস্তু হয়ে থাকলে, সে ব্যক্তিটি ছিলেন আবু তালিব। সুতরাং তাকেও যখন তিনি হেদায়াত দান করতে সক্ষম হননি, তখন এ কথা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, কাউকেও হেদায়াত দান করা এবং কাউকেও হেদায়াত থেকে বঞ্চিত করা নবীর ক্ষমতা বহির্ভূত। এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হাতে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ সম্পদ কোনো আত্মীয়তা–বেরাদরির ভিত্তিতে দান করা হয় না। বরঞ্চ করা হয় মানুষের স্বীকৃতি, যোগ্যতা এবং ঐকান্তিক সত্যপ্রিয়তার ভিত্তিতে।

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ - (بقرہ: ١٢٠)

তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরও যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো, তাহলে তোমাকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাচাবার জন্যে কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী হবেনা- (বাকারাঃ ১২০)

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ -

হে মুহাম্মদ, তাদের বলে দাওঃ এ কালামের মধ্যে আমার নিজের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার রদবদল করার এখতিয়ার অমার নেই। আমি তো শুধু সেই জিনিসই মেনে চলি যা আমাকে অহীর মাধ্যমে বলা হয় । অমি যদি আমার রবের নাফরমানী করি তাহলে আমার বিরাট দিনের শাস্তির ভয় আছে। (ইউনুসঃ ১৫)

এসব কথা এ জন্যে বলা হয়নি যে, মায়াযাল্লাহ্। রসূল (সঃ) কর্তৃক কোনো নাফরমানী বা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের সামান্যতম কোনো আশংকাও ছিলো। মূলতঃ এসব কথার উদ্দেশ্য ছিলো দুনিয়ার সামনে এ সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা যে, আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর যে নৈকট্য লাভ হয়েছিল। তার কারণ এ নয় যে, নবীর সাথে আল্লাহ্র কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। বরঞ্চ নৈকট্য লাভের কারণ এই যে, তিনি আল্লাহ্ তায়ালার পরম অনুগত এবং মনে প্রানে তাঁর বান্দাহ্।

নবী মুহাম্মদ (সঃ) নবীদেরই দলভুক্ত একজন

তৃতীয়তঃ যে জিনিসটি কুরআন মজীদে বিশদভাবে বারবার বলা হয়েছে তা হচ্ছে এ যে, মুহাম্মদ (সঃ) কোনো নতুন নবী নন; বরঞ্চ তিনি আম্বিয়ায়ে কেরামের দলভূক্তই একজন এবং

নবুওয়াতের সেই ধারাবাহিকতার একটা আংটা বা সংযোজক–যা সৃষ্টির সূচনা থেকে তাঁর আগমণ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো এবং যার মধ্যে প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক যুগের নবী রসূলগণ শামিল রয়েছেন। কুরআনে হাকীম নবুওয়াত ও রেসালাতকে কোনো ব্যক্তি, দেশ অথবা জাতির জন্যে নির্দিষ্ট করেনা। বরঞ্চ সে পরিষ্কার ঘোষনা করে যে, আল্লাহ্ তায়ালা –প্রত্যেক জাতি, দেশ ও যুগে এমন সব মনীষী পয়দা করেছেন, যারা মানুষকে সিরাতুল–মুসতাকীমের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং গোমরাহীর অশুভ পরিণতির ভীতি প্রদর্শন করেছেনঃ

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ - (فاطر: ٢٤)

এমন কোনো জাতি অতীত হয়নি, যাদের মধ্যে কোনো সাবধানকারী আসেনি–(ফাতেরঃ২৪)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ - (النحل: ٣٦)

আমরা প্রতিটি জাতির নিকট একজন রসূল পাঠিয়েছি (এ পয়গাম সহ)ঃ তোমরা আল্লাহ্র গোলামী করো এবং তাগুতের গোলামী থেকে দূরে থাকো–(আন নহলঃ ৩৬)

আর এসব পয়গাম্বর ও সাবধানকারীদের মধ্যে মুহাম্মদ (সঃ)ও একজন। বস্তুত, এ কথাটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এরশাদ করা হয়েছেঃ

هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ - (النجم: ٥٦)

পূর্ববর্তী সাবধানকারীদের মতো ইনিও একজন সাবধানকারী (আন নাজমঃ ৫৬)

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ - (يس: ٣)

হে মুহাম্মদ! নিশ্চয়ই তুমি রসূলদের অন্তর্ভূক্ত–(ইয়াসীনঃ৩)

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَ
لَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (احقاف: ٩)

হে মুহাম্মদ, বলে দাওঃ আমি কোনো অভিনব রসূল নই। আমি জানিনা আমার সাথে কি আচরণ করা হবে আর তোমাদের সাথেইবা কি আচরণ করা হবে। আমি তো শুধু সে জিনিসই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি অহী করা হয়। আর আমি নিছক একজন প্রকাশ্য সাবধানকারী(আহকাফঃ৯)

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران: ١٤٤)

মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নয়। তার পূর্বেও অনেক রসূল অতীত হয়েছে-(আলে ইমরানঃ ১৪৪)

শুধু তাই নয়; বরঞ্চ এ কথাও বলে দেয়া হলো যে, রসূলে আরাবীর দাওয়াত তো তাই যার দিকে সৃষ্টির সূচনা থেকে সকল হকের আহবানকারী দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। তিনি প্রাকৃতিক দীনেরই শিক্ষা দিয়ে থাকেন-যার শিক্ষা প্রত্যেক নবীরসূল হরহামেশা দিয়ে এসেছেন-ঃ

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ
مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا (البقره - ١٣٧)

তোমরা বলোঃ আমরা ঈমান আনলাম আল্লাহ্‌র প্রতি এবং সে শিক্ষার প্রতি যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে এবং ঐ সবের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের বংশধরদের উপর এবং যা কিছু দেয়া হয়েছে অন্যান্য নবীগণকে। আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করিনা এবং আমরা আল্লাহ্‌রই অনুগত।

তারাও যদি ঠিক সেরূপ ঈমান আনে, যেমনটি তোমরা এনেছ তাহলে তারা হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। (বাকারাঃ ১৩৪-৩৭)।

কুরআন মজীদের এসব সুস্পষ্ট বর্ননা এ সত্যের ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ রাখেনি যে, মুহাম্মদ (সঃ) কোনো নুতন দ্বীন নিয়ে আসেননি আর না তিনি পূর্ববর্তী নবীদের কাউকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা বা তাদের কারো পয়গাম রহিত করার জন্যে এসেছেন। বরঞ্চ তাঁকে তো এ জন্যে পাঠানো হয়েছে যে, যে সত্য দ্বীন প্রথম দিন থেকে সকল জাতির নবীগণ পেশ করে এসেছেন-তাকে তিনি পরবর্তীকালের লোকদের কৃত ভেজাল থেকে মুক্ত করবেন।

মুহাম্মদ (সঃ) এর আগমনের উদ্দেশ্য

এমনি করে কুরআন মজীদ তার বাহকের যথার্থ মর্যাদা নিরূপন করে তার ঐসব কার্যাবলীর বিস্তারিত আলোচনা করেছে, যে গুলো সম্পাদন করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে প্রেরণ করেছেন। সামগ্রিক ভাবে তাঁর এ সব কার্যাবলী দু' ভাগে বিভক্তঃ এক -শিক্ষা বিভাগ,দুই-বাস্তব কর্ম বিভাগ।

তাঁর শিক্ষাদান কাজ

এ বিভাগের কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

একঃ তেলাওয়াতে আয়াত, তাযকিয়ায়ে নফ্স এবং কিতাব ও হিকমতের তা'লীমঃ

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ - (آل عمران: ١٦٤)

আল্লাহ্ ঈমানদারদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি স্বয়ং তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট এমন একজন রসূল পাঠিয়েছেন যিনি তাদের আল্লাহ্র আয়াত শুনান, তাদের তাযকিয়া-(পরিশুদ্ধি) করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাতের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অথচ তারা ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো (আলে ইমরানঃ ১৬৪)

আল্লাহ্র আয়াত শুনানোর অর্থ হচ্ছে-তাঁর বাণীসমূহ হুবহু শুনিয়ে দেয়া। তাযকিয়ার অর্থ-মানুষের জীবন ও আচার-আচরণকে অসৎ কর্মকান্ড, কুপ্রথা ও অন্যায় রীতি-পদ্ধতি থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্দ করে তাদের মধ্যে মহৎ গুণাবলী, পূতচরিত্র এবং সঠিক রীতি পদ্ধতির বিকাশ সাধন করা। আর কিতাব ও হিকমাতের তা'লীম দেয়ার অর্থ হচ্ছে, মানুষকে খোদার কিতাবের সঠিক উদ্দেশ্য ও দাবী বুঝিয়ে দেয়া এবং তাদের মধ্যে এমন অন্তদৃষ্টি সৃষ্টি করে দেয়া, যাতে করে তারা খোদার কিতাবের মর্মমূলে উপনীত হতে পারে। আর তাদেরকে ঔসব কলা-কৌশল শিক্ষা দেয়া যা দ্বারা তারা নিজেদের জীবনের বিভিন্ন ও ব্যাপক দিক সমূহকে পুরোপুরি আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে পারে।

দুইঃ দ্বীনের পূর্ণতাঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔ (المائدہ: ۳)

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করলাম,তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পুরোপুরি দিয়ে দিলাম। আর তোমাদের জন্যে ইসলামের জীবন ব্যবস্থাকে মনোনীত করলাম- (মায়িদাহ্ঃ ৩)

অন্য কথায় কুরআনের প্রেরক তার বাহকের দ্বারা শুধু এতোটুকু খেদমত গ্রহণ করেননি যে, তিনি আয়াত তেলাওয়াত করবেন, লোকের আত্মশুদ্ধি করবেন এবং কিতাব ও হিকমাত

শিক্ষা দেবেন। বরঞ্চ তিনি তাঁর এ নেক বান্দাহ্র দ্বারা এসব কাজের পূর্ণতা সাধন করিয়েছেন। গোটা মানব জাতির জন্যে যতো আয়াত পাঠাবার প্রয়োজন ছিলো.....তা সবই তাঁর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। যেসব অন্যায়-অনাচার থেকে মানব জীবনকে পবিত্র করা বাঞ্ছনীয় ছিলো-তা সবই তাঁর দ্বারা বিদূরিত করে দিয়েছেন। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যেসব গুণাবলীর বিকাশ যতোটা সুন্দরভাবে হওয়া উচিত ছিলো তার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা তাঁর নেতৃত্বে উপস্থাপিত করে দিয়েছেন। তাঁর দ্বারা কিতাব ও হিকমাতের এমন শিক্ষা দিয়ে দিয়েছেন যাতে করে ভবিষ্যতের সকল যুগে কুরআনের বাঞ্ছিত পদ্ধতিতে মানব জীবন গঠন করা যেতে পারে।

তিনঃ তৃতীয় কাজ হচ্ছে ঐ সকল মতবিরোধের মর্ম সুস্পষ্ট করে দেয়া যা মূল দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলো। তারপর সে দ্বীনকে যে পর্দায় আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছিল তা উন্মোচন করে দেয়া এবং তার মধ্যে মিশ্রিত ভেজাল ও সকল প্রকার জটিলতা দূর করে সে সত্য-সঠিক পথ পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত করে দেয়া-যা অনুসরণ করা আবহমান কাল থেকে আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ লাভের একমাত্র পথ ছিলোঃ

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ
اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ـ (النحل: ٦٣-٦٤)

খোদার শপথ (হে মুহম্মদ !) তোমার পূর্বেও আমরা বিভিন্ন জাতির নিকট হেদায়াত পাঠিয়েছি। কিন্তু শয়তান তাদের অপকর্মগুলো তাদের জন্যে মনোমুগ্ধকর বানিয়ে দিয়েছে। বস্তুত, আজ সে-ই তাদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়েছে। আমরা এ কিতাব তোমার প্রতি শুধু এ জন্যে নাযিল করেছি -যেনো তুমি তাদের সামনে সে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারো. যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায় এবং

এজন্যে যে, এ কিতাব তাদের জন্যে রহমত ও হেদায়াত স্বরূপ হবে–যারা তা মেনে চলবে –(আন–নহলঃ ৬৩–৬৪)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا
كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ
مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ
رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - (المائدة: [illegible])

হে আহলে কিতাব! তোমাদের নিকট আমাদের রসূল এসেছেন। তিনি তোমাদের সামনে অনেক সব বিষয় সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যা তোমরা খোদার কিতাব থেকে গোপন করে রাখো। অনেক কথা আবার মাফও করে দেন। খোদার নিকট থেকে তোমাদের কাছে একটি আলোক এবং একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর পসন্দ মতো যারা চলে তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ দেখিয়ে দেন। এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন । এবং তাদেরকে সরল–সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন। (মায়িদাহঃ১৫–১৬)

চারঃ নাফরমানদের ভীতি প্রদর্শন করা, অনুগত বান্দহদের আল্লাহর রহমতের সুসংবাদ দেয়া এবং আল্লাহর দ্বীন প্রচার করাঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا - (احزاب: [illegible])

হে নবী! আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্য ও সুসংবাদদাতা এবং ভয়প্রদর্শনকারী হিসেবে আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহবানকারী ও প্রদীপ হিসেবে (আহযাবঃ ৪৫–৪৬)

দুইঃ তাঁর বাস্তব (আমলী) কার্যাবলী

বাস্তব জীবন ও তৎসংক্রান্ত যেসব দায়িত্ব নবী করীম (সঃ) এর উপর অর্পিত হয়েছিলো–তা নিম্নরূপঃ

একঃ ন্যায়ের নির্দেশ দেয়া, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, হালাল–হারামের সীমা–রেখা নির্ধারণ করা, মানুষকে খোদা ব্যতিত অন্যান্যের দ্বারা আরোপিত বাধা–নিষেধ থেকে মুক্ত করা এবং তাদের চাপিয়ে দেয়া বোঝা লাঘব করাঃ

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - (الاعراف: ١٥٧)

সে তাদেরকে নেক কাজের নির্দেশ দেয়, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। তাদের জন্যে পবিত্র জিনিস সমূহ হালাল এবং অপবিত্র জিনিস সমূহকে হারাম করে। আর তাদের উপর থেকে সেসব বোঝা নামিয়ে দেয় ও সেসব বন্ধন ছিন্ন করে যার দ্বারা তারা আবদ্ধ ছিলো। অতএব যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা করবে এবং সেই আলোর অনুসরণ করবে যা তাঁর সাথে নাযিল করা হয়েছে। তারাই কল্যাণ লাভ করবে (আ'রাফঃ ১৫৭)

দুইঃ খোদার বান্দাহ্‌দের মধ্যে হক ও ইনসাফের সাথে ফয়সালা করাঃ

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا - (النساء: ١٠٥)

হে নবী। আমরা এ কিতাব তোমার প্রতি সত্যসহ নাযিল করেছি যাতে করে তুমি আল্লাহর শিখিয়ে দেয়া আইন–কানুন অনুযায়ী

মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করতে পারো, আর তুমি খেয়ানতকারীদের উকিল না হয়ে পড়-(নিসাঃ ১০৫)।

তিনঃ আল্লাহর দ্বীনকে এমনভাবে কায়েম করে দেয়া যেনো মানব জীবনের সমগ্র ব্যবস্থা তার অধীন হয়ে যায় এবং অন্যান্য সকল ব্যবস্থা তার মুকাবেলায় পরাস্ত হয়ে থাকেঃ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ - (الفتح: ٢٨)

তিনি আল্লাহ যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্যজীবন - ব্যবস্থা সহ পাঠিয়েছেন, যেনো তিনি এ দ্বীনকে সমস্ত বাতিল ব্যবস্থা সমূহের উপর বিজয়ী করেন-(আল ফাতাহঃ২৮)

এমনিভাবে নবী (সঃ) এর কার্যাবলীর এ বিভাগটি রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, নৈতিকতা ও সংস্কৃতির সংস্কার-সংশোধন এবং সৎ ও ন্যায়-নিষ্ঠ সভ্যতা প্রতিষ্ঠার সকল দিকে পরিব্যাপ্ত।

নবুয়্যতে মুহাম্মদীর বিশ্বজনীনতা ও চিরস্থায়ীত্ব

নবুয়্যতে মুহাম্মদীর কাজ কোনো বিশেষ জাতি, দেশ ও যুগের জন্যে নির্দিষ্ট নয়। বরঞ্চ তা গোটা মানব জাতি ও সকল যুগের জন্যে সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - (السبا: ٢٨)

হে মুহাম্মদ ! আমরা তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা হিসেবে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানেনা-(সাবাঃ ২৮)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (اعراف: ١٥٨)

হে মুহাম্মদ বলোঃ হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই খোদার রসূল , যিনি যমীন ও আসমানের বাদশাহীর মালিক। তিনি ছাড়া আর কোনো খোদা নেই, যিনি মৃত্যু ও জীবনদান করতে পারেন। অতএব তোমরা ঈমান আনো খোদার প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যিনি খোদা ও তাঁর নির্দেশাবলীর প্রতি ঈমান রাখেন। তোমরা তার অনুসরণ করো। আশা করা যায় যে, তোমরা সঠিক পথের সন্ধান লাভ করবে (আ'রাফঃ১৫৮)

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ - (انعام: ١٩)

এ কুরআন আমার নিকট অহী করা হয়েছে যেনো এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে তা পৌছুবে-তাদের সকলকে সাবধান করে দিতে পারি (আনয়ামঃ১৯)

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (التكوير: ٢٧-٢٨)

এ কুরআন গোটা জগদ্বাসীর জন্যে নসীহত, (বিশেষ করে) এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে যে তোমাদের মধ্যে থেকে সঠিক পথে চলতে চায়-(তাকবীরঃ ২৭-২৮)

খতমে নবুয়্যত

কুরআন মজীদ নবুয়্যতে মুহাম্মদীর আরো একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের বলে দেয়। তা হচ্ছে এ যে, নবুয়্যত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা তাঁর পর্যন্তই শেষ করে দেয়া হয়েছে। তাঁরপরে পৃথিবীতে আর কোনো নবীর প্রয়োজন রইল না।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ - (احزاب: ٤٠)

মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন বরঞ্চ তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবুয়্যতের ধারাবাহিকতা পরিসমাপ্তকারী (আহযাবঃ ৪০)

এ হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে নবুয়্যতে মুহাম্মদীর বিশ্বজনীনতা, চিরস্থায়ীত্ব ও দ্বীনের পূর্ণতায় অবশ্যাম্ভাবী ফলশ্রুতি। যেহেতু কুরআন মজীদের উপোরোল্লেখিত বর্ণনা সমূহের দৃষ্টিতে মুহাম্মদ (সঃ)এর নবুয়্যত গোটা মানব জাতির জন্যে , কোনো একটি জাতির জন্যে নয়। চিরকালের জন্যে, কোনো একটি যুগের জন্যে নয়। আর তার মাধ্যমে সে কাজও পরিপূর্ণ হয়েছে যার জন্যে দুনিয়ায় নবীগণের আগমনের প্রয়োজন ছিলো। এ কারণে এটা একেবারে ন্যায় সংগত কথা য়ে, তাঁর থেকে নবুয়্যতের ধারাবাহিকতা শেষ করে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টিকে নবী করীম (সঃ) স্বয়ং সুন্দর করে একটি হাদীসে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ "নবীদের মধ্যে আমার উদাহরণ হচ্ছে এমন, যেমন কোনো ব্যক্তি খুব সুন্দর একটা বাড়ী তৈরী করলো এবং গোটা নির্মাণ কাজ শেষ করে শুধু মাত্র একটা ইটের জায়গা খালি রেখে দিলো। এখন যারাই তার চারপাশে ঘুরে ফিরে দেখলো, এ খালি জায়গাটা তাদের অন্তরে খটকা সৃষ্টি করলো এবং তারা বলতে লাগলো এ খালি জায়গাটায় শেষ ইটটাও যদি লাগিয়ে দেয়া হতো তাহলে বাড়ীটা একেবারেই পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। এখন নবুয়্যত প্রাসাদে যে ইটখানির জায়গা খালি আছে, সে ইট হচ্ছি আমি। আমার পরে আর কোনো নবীর আগমন ঘটবেনা।" এ উদাহরণ থেকে খতমে নবুয়্যতের কারণ পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। যখন দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গেলো, আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ বিশদভাবে বর্ণিত হলো, আদেশ -নিষেধ, আকায়েদ -এবাদত, তামাদ্দুন, সমাজ, শাসন ও রাজনীতি মোটকথা মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে পুরোপুরি নির্দেশ দিয়ে দেয়া হলো, দুনিযার সামনে আল্লাহ্‌র কালাম ও রসূলের উত্তম আদর্শ এমন ভাবে পেশ করে দেয়া হলো যে ,তা সকল প্রকার বিকৃতি ও ভেজাল থেকে মুক্ত হলো। সকল যুগেই তার থেকে হেদায়াত গ্রহণ করা যেতে পারে। এখন নবুয়্যতের আর

কোনো প্রয়োজন রইল না। শুধু প্রয়োজন রইল সংস্কার ও স্মরণ করিয়ে দেয়ার কাজ, যার জন্যে হক পন্থী ওলামায়ে কেরাম ও সত্য পন্থী মুমিনদের জামায়াতই যথেষ্ট।

নবী (সঃ) এর প্রশংসনীয় গুণাবলী

শেষ যে কথাটি জানতে বাকী থাকে তা এই যে, এ গ্রন্থের বাহক ব্যক্তিগতভাবে কোন্ ধরণের নৈতিক –চরিত্রের অধিকারী ছিলেন? এ প্রশ্নের জবাবে কুরআন মজীদে অন্যান্য প্রচলিত কিতাবের মতো তার বাহকের পক্ষে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়নি। তাঁর প্রশংসাকে স্থায়ী আলোচ্য বিষয় বস্তুতেও পরিণত করা হয়নি। অবশ্য কথার সূচনাতে শুধু ইশারা- ইংগিতে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ করা হয়েছে। তার থেকে অনুমান করা যায়, সে ভাগ্যবান সত্তার মধ্যে মানবতার কামালিয়াতের সুন্দরতম বৈশিষ্ট্য গুলো বিদ্যমান ছিলোঃ

একঃ কুরআন ঘোষণা করে যে তার বাহক নৈতিক–চরিত্রের উচ্চতম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেনঃ

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم: ٤)

এবং হে মুহাম্মদ! তুমি নিশ্চয়ই মহান চরিত্রের অধিকারী– (নূনঃ ৪)।

দুইঃ কুরআন বলে, তার বাহক এমন দৃঢ় সংকল্প, সঠিক পরিকল্পনাবিদ, সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর এমন নির্ভরশীল ব্যক্তি ছিলেন যে, তাঁর সমগ্র জাতি তাঁকে নির্মূল করে দেয়ার জন্যে বদ্ধ পরিকর হয় এবং তিনি মাত্র একজন সাহায্যকারীসহ এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তখন সে চরম সংকট মুহূর্তেও তিনি মনোবল হারিয়ে ফেলেননি, বরঞ্চ স্বীয় সংকল্পে অটল অবিচল থাকেনঃ

إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ

إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا - (توبه : ٤٠)

স্মরণ করো, যখন কাফেরগণ তাঁকে বের করে দিয়েছিলো এবং যখন পর্বত গুহায় তিনি একজন লোকের সাথে ছিলেন, যখন তিনি তার সাথীকে বলছিলেনঃ চিন্তা করোনা, আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন (তওবাঃ৪০)

তিনঃ কুরআন বলে যে, তার বাহক অত্যন্ত উদার ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি তাঁর নিকৃষ্টতম শত্রুদেরকেও ক্ষমা করে দেয়ার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর এ অকাট্য ফয়সালা শুনিয়ে দিতে হয় যে, তিনি ঐসব লোকদের ক্ষমা করবেন নাঃ

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ - (توبه : ٨٠)

তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো আর নাই করো, যদি সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করো তবু আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। (তওবাঃ ৮০)

চারঃ কুরআন বলে, তার বাহক অত্যন্ত অমায়িক ছিলেন। তিনি কখনো কারো সাথে কঠোরতা অবলম্বন করেননি। এ কারণে মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলোঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ - (آل عمران : ١٥٩)

এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ যে, তুমি তাদের প্রতি নরমদিল। যদি তুমি কর্কশভাষী অথবা কঠিন হৃদয়ের হতে, তাহলে এরা সব তোমার চার পাশ থেকে সরে পড়তো-(আলে ইমরানঃ ১৫৯)

পাঁচঃ কুরআন বলে, তার বাহক খোদার বান্দাহদের সঠিক পথে আনার জন্যে সদা পেরেশান থাকতেন। তারা গুমরাহীর জন্যে

জিদ করলে তাঁর অন্তরে দারুন ব্যথা লাগতো। এমনকি তিনি তাদের জন্যে দুঃখে কাতর হয়ে পড়তেন।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا - (الكهف: ٦)

হে মুহাম্মদ! মনে হচ্ছে তুমি যেনো তাদের জন্যে দুঃখ-চিন্তায় নিজের জীবনটাকেই হারিয়ে ফেলবে যদি তারা একথার উপর ঈমান না আনে-(কাহাফঃ ৬)

ছয়ঃ কুরআন বলে, তার বাহক তাঁর আপন উম্মতের জন্যে পরম ভালোবাসা পোষণ করতেন। তিনি তাদের কল্যাণকামী ছিলেন। তারা ক্ষতিগ্রস্থ হলে তিনি মর্মাহত হতেন। তিনি তাদের জন্যে স্নেহশীল ও দয়া পরবশ ছিলেনঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (توبه: ١٢٨)

তোমাদের নিকট স্বয়ং তোমাদের মধ্য থেকেই এমন একজন রসূল এসেছেন। তোমাদের ক্ষতি করে এমন প্রতিটি জিনিস তার জন্যে কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী। ঈমানদারদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু-(তওবাঃ ১২৮)

সাতঃ কুরআন বলে যে, তার বাহক শুধু আপন জাতির জন্যেই নয় বরঞ্চ গোটা বিশ্ব জগতের জন্যে ছিলেন আল্লাহ্‌র রহমতঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - (انبياء: ١٠٧)

হে মুহাম্মদ! আমরা তোমাকে সমগ্র জগতের জন্যে রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছিঃ (আম্বিয়াঃ ১০৭)

আটঃ কুরআন বলে, তার বাহক রাত্রে ঘন্টার পর ঘন্টা আল্লাহ্‌র ইবাদত করতেন এবং খোদার স্মরণে দাঁড়িয়ে থাকতেনঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ - (المزمل: ٢٠)

হে মুহাম্মদ! তোমার রব জানেন, তুমি রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকো (মুযযাম্মিলঃ ২০)

নয়ঃ কুরআন বলে, তার বাহক একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন। জীবনে কখনো তিনি সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হননি, অনিষ্টকর চিন্তাধারা কখনো তাঁকে প্রভাবিত করেনি, প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে সত্যের বিরুদ্ধে তাঁর মুখ থেকে একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি।

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (النجم: ٢-٣)

হে লোকেরা! তোমাদের সাথী না কখনো সত্য পথ থেকে বিব্রত হয়েছে, না সঠিক চিন্তাভ্রষ্ট হয়েছে, আর না সে মনের ইচ্ছে মতো কথা বলে। (আন–নাজমঃ ২–৩)

দশঃ কুরআন বলে,তার বাহক ছিলেন সারা দুনিয়ার জন্যে অনুসরণ যোগ্য আদর্শ এবং সমগ্র জীবনে চারিত্রিক পরিপূর্ণতার সঠিক মানদন্ড।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - (الاحزاب: ٢١)

রসূলুল্লাহর মধ্যে তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে (আহযাবঃ ২১)।

কুরআন মজীদ বার বার অধ্যয়ন করলে তার বাহকের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য জানতে পারা যায়; কিন্তু এ প্রবন্ধে তার বিশদ বিবরণের অবকাশ নেই। কুরআন অধ্যয়ন করলে যে কোনো লোক দেখতে পারে, প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ গুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত এ কুরআন তার বাহকের যে স্বরূপ পেশ করে তা স্বচ্ছ সুস্পষ্ট ও নির্মল। তাতে না খোদায়ীর কোনো চিহ্ন আছে, না আছে প্রশংসা ও গুণকীর্তনে কোনো অতি রঞ্জন। না তাঁর প্রতি কোনো প্রকার

অলৌকিক ক্ষমতা আরোপ করা হয়েছে। না তাঁকে খোদার কর্মকান্ডের অংশীদার করা হয়েছে। আর না তাঁর প্রতি এমন সব দুর্বলতার অভিযোগ করা হয়েছে-যা একজন পথ প্রদর্শক ও সত্য পথের দিকে আহবানকারীর জন্যে অমর্যাদাকর। যদি দুনিয়া থেকে ইসলামী সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থাবলী বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং শুধু মাত্র বাকী থাকে কুরআন মজীদ, তবুও রসূলে আকরম (সঃ) সম্পর্কে কোনো ভ্রান্ত ধারনা, কোনো সন্দেহ-সংশয় বা আক্বীদাহ ভ্রষ্ট হবার বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকবেনা। আমরা ভালভাবে জানতে পারি, এগ্রন্থের বাহক একজন কামেল মানুষ ছিলেন। সর্বোৎকৃষ্ট নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের সত্যতা স্বীকারকারী ছিলেন। তিনি কোনো নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না। অতিমানবীয় মর্যাদার দাবীও তিনি করতেননা। তাঁর নবুয়্যত ছিলো গোটা বিশ্ব মানবতার জন্যে। আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে তাঁকে প্রেরন করা হয়েছিল। তিনি যখন সেসব দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেন, তখন নবুয়্যতের ধারাবাহিকতা তাঁর পর্যন্ত পৌছার পর সমাপ্ত হয়ে যায়।

হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের কিচ্ছা এবং ইসরাঈলী উদ্ভট রূপকথা

কিছুকাল আগের কথা। তরজমানুল কুরআনের জনৈক পাঠক সূরা সোয়াদের দ্বিতীয় রুকুতে বর্ণিত হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের কিচ্ছা সম্পর্কে নিজের কিছু সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।[১] তাঁকে যদিও তাৎক্ষণিকভাবে একটা সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে ভাবলাম এ কিচ্ছাটা পবিত্র কুরআনের এমন একটা জায়গা, যার সৌন্দর্য সুষমা ইসরাঈলী উদ্ভট কল্পকাহিনীর মলীনতায় ঢাকা পড়ে অধিকাংশ লোকের দৃষ্টির অন্তরালে রয়ে গেছে। যাঁরা প্রচলিত তফসীর বা অনুবাদ গ্রন্থগুলোর সাহায্যে কুরআন অধ্যয়ন করে থাকেন, তারা সাধারণত এ কিচ্ছা সম্পর্কে গভীর সন্দেহে পতিত হন। তাই এ বিষয়ে একটা স্বতন্ত্র নিবন্ধ লেখা প্রয়োজন, যাতে করে কুরআনের মত বিজ্ঞানময় গ্রন্থে এ কিচ্ছা বর্ণনা করার উপকারীতা কি এবং এর প্রকৃত মর্ম কি, তা মানুষ উপলব্ধি করতে পারে।

যে বক্তব্য দিয়ে সূরা সোয়াদ শুরু হয়েছে তা এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত শোনার পর কাফেররা প্রবল গোয়ার্তুমী, হঠকারীতা এবং পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের ভিত্তিতে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহের কওম, আদ জাতি, ফেরাউন, সামুদ জাতি, হযরত লুতের কওম এবং হযরত শোয়েবের কওমের পরিণতি স্মরণ করিয়ে দিতে তাদেরকে সতর্ক করেন যে, মনে রেখ, আমার আইনে কাউকে খাতির করা হয় না। তোমাদের আগে যেই আমার হুকুম অমান্য করেছে, তাকেই কঠোর শাস্তি দেয়া হয়েছে। এখন তোমরা যদি অমান্য কর, তবে আমার আজাব থেকে তোমাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

---

১. সাধারণতঃ প্রাচীন ধাচের তফসীরগুলোতে এ কিচ্ছাটা এমনভাবে বর্জিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তা পড়ে, সে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়।

এই হুশিয়ারী প্রসঙ্গে পরবর্তীতে আল্লাহ বলেন যে, আমার আইন এত কড়া যে, মামুনী ধরনের মানুষের তো কথাই নেই, বড় বড় মর্যাদাবান মানুষ, এমনকি নবী রসূলরা পর্যন্ত যদি আমার নির্ধারিত হক পথ থেকে চুল পরিমাণও এদিক ওদিক হটে যায়, আমি তাকেও পাকড়াও না করে ছাড়ি না। তিনি বলেন

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ- হে নবী! মক্কার কাফেরদেরকে আমার প্রিয় বান্দা দাউদের বিবরণ শুনিয়ে দাও। তিনি কোন পর্যায়ের লোক ছিলেন? ذَا الْاَيْدِ প্রবল ক্ষমতার অধিকারী, বিপুল অর্থবৈভবে সমৃদ্ধ। اِنَّهُ اَوَّابٌ সেই সাথে অত্যন্ত খোদাভীরু, সর্বক্ষণ আপন প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। সোয়াদ-১৭)

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ- وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً كُلٌّ لَّهُ اَوَّابٌ (ص ١٨، ١٩)

দাউদ সকাল-বিকাল এত আবেগ উদ্দীপনা সহকারে আল্লাহকে স্মরণ করতেন যে, পাহাড় ও পক্ষীরাজি পর্যন্ত তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে আল্লাহর জিকরে লিপ্ত হতো। (সোয়াদ ১৮, ১৯)

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (ص ٢٠)

আমি তাঁকে অত্যন্ত মজবুত ও পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য দান করেছিলাম, গভীর প্রজ্ঞা ও বিদ্যাবুদ্ধিতে সমৃদ্ধ করেছিলাম এবং সিদ্ধান্তকর বক্তব্য প্রদানের যোগ্যতা দান করেছিলাম, কিন্তু একটা ব্যাপারে তার সামান্য পদস্খলন হয়ে গেলে আমি তার সাথে কি আচরণ করেছিলাম তা তুমি জান?

وَهَلْ اَتٰكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ- اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ، خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ (ص ٢١، ٢٢)

দেওয়াল টপকিয়ে দাউদের একান্ত কক্ষে [১] যে বিবাদীরা ঢুকে পড়েছিল, তাদের কথা কি তুমি জান? তারা এমন আকস্মিকভাবে অমন স্থানটায় ঢুকে পড়ায় দাউদ যখন হতভম্ব হয়ে পড়লো, তখন তারা বললো! আপনি অস্থির হবেন না। আমরা উভয়ে বাদী ও বিবাদী। একপক্ষ আর এক পক্ষের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে। আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায্য ফায়সালা করে দিন, না হক বিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সত্য পথ দেখান।

মামলাটা কি? এক পক্ষ আর এক পক্ষকে দেখিয়ে বললো!

إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ
فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (ص-٢٣)

এই ব্যক্তি আমার ভাই। অর্থাৎ স্বধর্মীয় ও স্বজাতীয় ভাই। ওর ৯৯টা দুম্বী আছে আর আমার আছে একটা। সে আমাকে বলে যে, তুমি তোমার ঐ দুম্বীটাও আমাকে দিয়ে দাও। এ কথা বলার সময় সে এমন দাপট দেখালো যে আমি দমে গেলাম।

দাউদ আলাইহিস সালাম মামলার বিবরণ শুনে বললেনঃ

لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (ص-٢٤)

এই ব্যক্তি নিজের এতগুলো দুম্বী থাকা সত্ত্বেও যে তোমার এক মাত্র দুম্বী চেয়েছে, সেটা তোমার ওপর তার জুলুম বটে। বস্তুতঃ অধিকাংশ প্রতিবেশী এ রকমই পরস্পরের ওপর আগ্রাসন চালিয়ে থাকে। কেবল ঈমানদার ও সৎ লোকেরা ব্যতিক্রম। তবে এ ধরনের লোকের সংখ্যা কম।(সোয়াদ–২৪)

---

১. এখানে মেহরাব অর্থ মসজিদের মেহরাব নয়। সাধারণ পাঠক অবশ্য এটাই মনে করে থাকে। আসলে এর অর্থ হলো প্রাসাদ।

এই রায় দেয়ার পর হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের চট করে মনে পড়ে গেল যে, এ ধরনের একটা পদস্খলন তো আমারও হয়ে গেছে। তিনি তৎক্ষণাত আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠলেন এবং তওবা ও ইস্তিগফারে আত্মনিয়োগ করলেন।

وظن داود انما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا و
اناب - ص ٢٤

সঙ্গে সঙ্গেই দাউদ (আলাইহিস সালাম)–এর মনে হলো যে, এই মামলা পাঠিয়ে আমি তাকে পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করেছি। তাই তিনি তৎক্ষণাত স্বীয় প্রভুর কাছে ক্ষমা চাইলেন,- সিজদায় পড়ে গেলেন এং বারবার তওবা করলেন। (সোয়াদ–২৪)

এভাবে দাউদ (আঃ) যখন নিজের ত্রুটি স্বীকার করলেন এবং খাটি দিলে তওবা করলেন, তখন আল্লাহ বলেন যে,

فغفرنا له ذالك وان له عندنا لزلفى وحسن ماب - ص ٢٥

"আমি তাঁর সেই ত্রুটি ক্ষমা করে দিলাম। নিশ্চয়ই সে আমার অতি ঘনিষ্ঠ এবং আমার কাছে তার ভালো মর্যাদা রয়েছে"। (সোয়াদ–২৫)

কিন্তু সেইসাথে আমি তাকে কঠোরভাবে সাবধান করে দিলাম এই বলে–

يا داود انا جعلنك خليفة في الارض فاحكم بين الناس
بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ، ان
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما
نسوا يوم الحساب - ص ٢٦

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করেছি। কাজেই তুমি সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে মানুষকেশাসন কর এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।

কেননা এই প্রবৃত্তি তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। যারা আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যায় নিশ্চয়ই তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। কেননা তারা হিসাবের দিনকে ভুলে গেছে" (সোয়াদ–২৬)

আমি শুরুতেই বলেছি যে, সূরা সোয়াদে এই কিসসা বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য হলো, যারা আল্লাহর ভয় করে না এবং তাঁর কঠোর ও আপোষহীন আইন সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া যে, শ্রেষ্ঠতম ন্যায়বিচারক আল্লাহ কাউকে খাতির করেন না এবং আপোস করেন না। তাঁর আইনের সামান্যতম লংঘনের দায়ে কেউ দোষী হলে তাকে তিনি অবশ্যই পারাভূত করেন এবং যত বড় ব্যক্তিত্বই হোক, তাঁর পাকড়াও থেকে রেহাই পায় না। অবশ্য খালেছ মনে তওবা করলে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করলে এবং স্বীয় প্রভুর সামনে দম্ভ ও অহংকারের পরিবর্তে বিনয়ের পথ অবলম্বন করলে তার কথা স্বতন্ত্র। এই সাথে এ কিচ্ছার আরো একটা আনুসাঙ্গিক উপকারিতা রয়েছে যার জন্য এ কিসসা এরূপ মার্জিত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। সেটি হলো এক জন মর্যাদাবান নবী সম্পর্কে ইহুদীদের অপপ্রচার খন্ডন করা।

ইহুদীদের সম্পর্কে এ কথা সবার জানা যে, তারা নিজেদের নবীদের ওপর জঘন্য অপবাদ আরোপ এবং তাদের নির্মল জীবনেতিহাসে কলংক লেপন করতে মোটেই কুণ্ঠা বোধ করেনি। হযরত নূহ (সাঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত লূত (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ) হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত হারুন (আঃ) এক কথায় কোন নবীই তাদের ও কুৎসা রটনা থেকে রেহাই পাননি। [১] তবে

---

১. এর বিস্তারিত বিবরণ জানতে হলে বাইবেলের নিম্নোক্ত অধ্যায়গুলো পড়ুনঃ

হযরত নূহ (আঃ) সম্পর্কে, জন্ম, অধ্যায় ৯, আয়াত ২০–২৫,
হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে, জন্ম, অধ্যায় ১২, আয়াত ১২, আয়াত ১০, অধ্যায় ২০, আয়াত ১–৩

সবচেয়ে বেশী জুলুম তারা করেছে হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সোলায়মান (আঃ) এর ওপর। এ দু'জনকে তারা নবীদের কাতার থেকে বের করে মামুলী রাজা–বাদশার কাতারে নামিয়ে এনেছে। এ দু'জনকে তারা নিছক কূটনীতিক, দিগ্বিজয়ী ও প্রশাসক হিসেবে পরিচিত করেছে। মিথ্যাচার, ধোকাবাজি, নিপীড়ন, আর দুনিয়ার অন্যান্য দিগ্বিজয়ী বীর ও শাসকরা যে সব অপকৌশল দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তার করে থাকে এবং প্রবৃত্তির লিপসা চরিতার্থ করতে রাজারা যে সব পন্থা অবলম্বন করে থাকে সে সবই অবলম্বন করে থাকেন এমন লোক হিসেবে তুলে ধরেছে। এমনকি তারা হযরত দাউদ (আঃ)–এর ওপর ব্যভিচারের এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) এর ওপর শিরকের অপবাদ আরোপ করতেও দ্বিধা করেনি। [১] বনী ইসরাইল জাতি তাদের সেই সব মহান নেতার সাথে এ আচরণ করেছে, যারা তাদেরকে লাঞ্ছনা ও অপমানের আস্তাকুড় থেকে তুলে সম্মান ও গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়েছিলেন। আজ এ জাতি যে ঐতিহাসিক কীর্তি নিয়ে গর্ব করে, তার সব কিছু এই মহান নেতৃবৃন্দের কল্যাণেই তারা লাভ করেছে। আর তাদেরই পূতঃপবিত্র জীবনের ওপর তারা কলিমা লেপন করেছে।

পৃথিবীতে একমাত্র কোরআনই এমন গ্রন্থ, যা এই মহান নবীদের প্রত্যেকের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ ও কলুষমুক্ত করেছে। তাদের প্রকৃত মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে পরিচিত করেছে।

হযরত লূত (আঃ) সম্পর্কে, জন্ম, অধ্যায় ১৯, আয়াত ৩০–৩৮,
হযরত ইসহাক (আঃ) সম্পর্কে, জন্ম, অধ্যায় ২৬, আয়াত ৭–১২
হযরত ইয়াকুব (আঃ) সম্পর্কে, জন্ম, অধ্যায় ২৭, আয়াত ১–২৫, অধ্যায় ১৯, আয়াত ১৬–২৯, অধ্যায় ৩৪, সম্পূর্ণ অধ্যায় ৩৬, আয়াত ২২
হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে, জন্ম, অধ্যায় ৩৭, আয়াত ২–৪,
হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে, গণনা, অধ্যায় ৩১, আয়াত ১–১৮,
হযরত হারুন (আঃ) সম্পর্কে, নির্গমন, অধ্যায় ৩২, আয়াত ১–২৪,

১. বাইবেল, সম্রাট পুস্তক, ১১শ' অধ্যায়, আয়াত ১–১০ দ্রষ্টব্য।

কোরআন যদি না আসতো, তবে আজ তাঁদেরকে কেউ নবী মানা তো দূরের কথা, সম্মানের সাথে তাঁদের নাম উচ্চারণ করাও পছন্দ করতো না। বনী ইসরাইল কোরআনের এই কৃপা ও মহানুভবতাকে স্বীকার নাও করতে পারে। কিন্তু কৃপা ও মহানুভবতা কারো স্বীকৃতির মুখাপেক্ষী নয়। কৃপা কৃপাই এবং মহানুভবতা মহানুভবতাই-চাই তা কেউ স্বীকার করুক বা না করুক।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর ব্যাপারে ইহুদীদের পয়লা ভুল এই যে, তারা তাঁকে নবী বলে স্বীকার করতো না-স্বীকার করতো একজন অবিস্মরণীয় জাতীয় নেতা হিসেবে।[১]

কুরআন এই ধারণা সংশোধন করে বলে যে, তিনি ছিলেন একজন মহান নবী এবং আল্লাহ্ তাঁকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধরের বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত দাউদ ও হযরত সোলায়মানেরও উল্লেখ করে কুরআন মন্তব্য করেছে যে, كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ "তারা সকলেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।" وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ "এদের সকলকেই আমি সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ "আমি তাঁদেরকে বরণীয় করেছি এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখিয়েছি।" أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ এরাই সেই সব লোক, যাঁদেরকে আমি কিতাব, শাসন ক্ষমতা ও নবুয়ত দান করেছি।" এ কথাগুলো বলার পর রসূল (সাঃ)কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

---

১. বাইবেলে তার শুধু এতটুকু ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর তরফ থেকে বনী ইসরাইলের জন্য বাদশাহ মনোনীত হয়েছিলেন এবং আল্লাহর হুকুমে সমসাময়িক নবী তাঁকে 'মসেহ' করেছিলেন, যা বনী ইসরাইলের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে মনোনীত হওয়ার আলামত বলে স্বীকৃত ছিল।

فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ "তাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন। সুতরাং যে পথে তাঁরা চলেছেন, তুমিও সে পথে চল।" (সূরা আনয়াম, ৮৬,৮৭, ৮৮, ৯০, ৯১, ৯২)

ইহুদীরা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের জীবনের ওপর দ্বিতীয় যে জঘন্য কলংক লেপন করেছে, সেটি হলো উরিয়া হিত্তার স্ত্রীকে নিয়ে তাদের রটনা। বাইবেলের ২য় শ্যামুয়েল পুস্তকের ১১শ'–১২শ' অধ্যায়ে এর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। ঐ বিবরণের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে দেয়া হলোঃ

"একদিন অপরাহ্নে দাউদ নিজ প্রাসাদের ছাদের ওপর পায়চারী করছিলেন। এই সময় স্নানরত এক পরমা সুন্দরী রমনীর ওপর তার দৃষ্টি পড়লো। দাউদ খোঁজনিলেন মহিলাটি কে? জানা গেল, সে এলিয়ামের কন্যা ও উরিয়াহিত্তার স্ত্রী বাতসাবা। দাউদ বাতসাবাকে ডেকে পাঠালেন এবং রাতে নিজের কছে রাখলেন। সেই রাতেই সে গর্ভবতী হয়ে গেল। পরে সে দাউদকে নিজের গর্ভবতী হওয়ার কথা জানিয়ে দিল।"

"এরপর দাউদ উরিয়াকে উয়াবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উয়াব তখন বনী আমুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল এবং রাব্বা নগরীকে অবরোধ করে সেখানে অবস্থান করছিল। দাউদ উয়াবকে লিখলেন যে, রণাঙ্গনের সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ স্পেনে চলছে, সেখানে তাকে নিয়োগ কর এবং তারপর তাকে একাকী রেখে সরে যাও, যাতে সে নিহত হয়। উয়াব নির্দেশ মোতাবেক কাজ করলো এবং উরিয়া নিহত হলো।"

এ ভাবে উরিয়াকে খতম করার পর দাউদ ঐ মহিলাকে বিয়ে করলেন এবং তার পেট থেকেই হযরত সোলায়মান জন্ম গ্রহণ করেন।

"দাউদ (আঃ)–এর এ কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি নাতেন নামক নবীকে দাউদের কাছে পাঠালেন। নাতেন তাকে বললেন যে, কোন এক শহরে দুই ব্যক্তি বাস করতো। একজন ছিল

ধনী এবং অপর জন গরীব। ধনী ব্যক্তিরঅনেক গরু ও ছাগল ছিল আর গরীব লোকটার ছিল একটি মাত্র দুম্বী। দুম্বীটিকে সে পরম আদরে লালন পালন করতো। একবার ধনী ব্যক্তির কাছে কয়েকজন অতিথি এল। সে নিজের কোন গরু ছাগল জবাই করতে চাইল না। গরীব লোকটির দুম্বী নিয়ে সে অতিথিদের আপ্যায়ন করলো। এ গল্প শুনে দাউদ ভীষণ রেগে গেলেন এবং বললেন, এমন লোককে অবশ্যই হত্যা করতে হবে এবং গরীব লোকটিকে একটার বদলায় চারটা দুম্বী আদায় করে দেয়া হবে। নাতেন নবী বললেন যে, এই লোক তো তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। অতপর তাকে উরিয়া হিত্তার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিলেন।"

এই গল্পের ভেতর দিয়ে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের চরিত্রের এমন চিত্র আঁকা হয়েছে, যা একজন নবীর তো দূরেরকথা, একজন সাধারণ বাদশাহর পক্ষেও অত্যন্ত লজ্জাজনক। এ গল্প ইহুদী সমাজে শিশুদের পর্যন্ত মুখস্থ ছিল। তাদের সমাজে এটা হযরত দাউদের জীবনের বিখ্যাত ঘটনা রূপে বিবেচিত হতো এবং এর সাথে অদ্ভুদ ধরনের সব টীকাটিপ্পনী সংযুক্ত করে বসিয়ে বসিয়ে বলা হতো। একজন উঁচু দরের নবীর চরিত্রে এই কলংক লেপনকে কুরআন নীরবে বরদাশত করবে, এটা ছিল অসম্ভব। তাই উপরোক্ত আয়াতগুলোতে সে সদুপদেশ দান ও জ্ঞানের কথা বিতরণের সাথে সাথে আসল ঘটনা কি এবং তার সাথে মিথ্যার সংমিশ্রন কতটুকু হয়েছে তাও জানিয়ে দিয়েছে।

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা থেকে ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব যেটুকু জানা যায় তা এই যে, হযরত দাউদ (আঃ) উরিয়ার কাছে এই মর্মে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন যে, সে স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিক। হযরত দাউদ (আঃ)–এর অসাধারন ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সে তালাক দিতে এক রকম বাধ্য বলে অনুভব করছিল। কিন্তু তালাক দেয়ার আগেই দু'জন নেক বান্দা হযরত দাউদের কাছে উপস্থিত হলো এবং এ ঘটনাকে একটা সাজানো অভিযোগের আকারে তার সামনে পেশ করলো। অভিযোগের বিবরণ শুনে হযরত দাউদ (আঃ) এমন ন্যায়সঙ্গত রায় দিলেন, যা এ ধরনের বিবাদের ক্ষেত্রে যথোপযুক

রায় ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝে ফেললেন যে, এ তো আমার প্রতিপালক আমাকে পরীক্ষা করছেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ তওবা করলেন এবং পূর্ণ বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে স্বীয় ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন।

এ বিবরণের সাথে যখন আমরা তাওরাতের বিবরণের তুলনা করি, তখন সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলেই অনুমান করা যায় যে, আসল ঘটনাটা রাষ্ট্র হওয়ার পর. তাকে কিভাবে অতিরঞ্জি করা হয়েছে।

দুশ্চরিত্র ও নোংরা স্বভাবের লোকদের রীতি এই যে, যখন কোন মানুষের-বিশেষতঃ কোন নামকরা ব্যক্তির নামে মামুলী ধরনের কোন কুৎসা তাদের কানে আসে, অমনি তাদের কল্পনা শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং নিছক মনগড়া অনেকগুলো সম্ভাব্য ঘটনারূপ সংযুক্ত করে তাকে এমনভাবে রটাতে থাকে যে সেটা একেবারেই সত্য ঘটনা মনে হতে থাকে। যত বড় উঁচু দরের মানুষই হোক না কেন, প্রত্যেক মানুষের দ্বারাই এমন কিছু না কিছু কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে যাকে সহজেই খারাপ রূপ দেয়া সম্ভব। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম যে কাজটি করেছিলেন তা যদিও বনী ইসরাইলের সমাজে একটা প্রচলিত প্রথা ছিল [১] এবং সেই প্রথা দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তাঁর এ পদস্খলনটা হয়ে গিয়েছিল, তথাপি যেহেতু এটা একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির কাজ ছিল, তাই তা সঙ্গে সঙ্গেই জানাজানি হয়ে যায়। আর ঘটনা যতটুকু, তার সাথে

---

১. কারো কাছে অন্য কারো স্ত্রী ভালো লাগলে তাকে তালাক দিতে অনুরোধ করা ইসরাইলী সমাজে দূষণীয় ছিল না। অনুরোধকারীও এতে কুণ্ঠাবোধ করতো না, যাকে অনুরোধ করাহতো সেও এতে বিরক্ত হতো না। বরং কোন বন্ধুকে খুশী করা বা তার কষ্ট দূর করার জন্য নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার সাথে বিয়ে দেয়া অত্যন্ত মহৎ চরিত্রের পরিচায়ক বিবেচিত হতো। মদিনায় কতক আনসার তাদের মোহাজের ভাইদের খাতিরে নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে তাদের সাথে বিয়ে দিতে যে রাজী হয়ে গিয়েছিলেন, সেটা ইহুদী চরিত্রের এই মহৎ দিকটির প্রভাবেই সম্ভব হয়েছিল।

লোকেরা আরো কিছু রটনা যুক্ত করে অতিরঞ্জিত করতে আরম্ভ করে। তিনি উরিয়ার কাছে দাবী জানিয়েছিলেন, তার স্ত্রীকে তালাক দিতে। বাস্ আর যায় কোথায়। এ থেকেই এটাও অনুমান করা হলো যে, দাউদ আলাইহিস সালাম উরিয়ার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত ছিলেন।

এখান থেকে আবার আর একটা বিষয়ও ঘাটাঘাটি শুরু হলো যে, এই আসক্তিটা জন্মালো কিভাবে? শেষ পর্যন্ত কোন উর্বর মস্তিষ্কে এ ধারণা গজিয়ে উঠলো যে, সম্ভবত উনি নিজের প্রাসাদের ছাদের ওপর থেকে তাকে গোছল করতে দেখে ফেলেছিলেন। কিন্তু 'সত্যবাদিতা'র পরাকাষ্ঠা দেখানোর অভিপ্রায়ে তারা আর "সম্ভবত" বলাটা সমিচীন মনে করলো না। তাই তারা 'সম্ভবত' কথাটা বাদ দিয়ে পুরো নিশ্চয়তার সূরেই ব্যাপারটা প্রচার করলো। এভাবে ক্রমান্বয়ে এটা একটা সত্য ঘটনায় পরিণত হলো। অথবা আসক্তি বা আকর্ষণ জন্মাবার আরো বহু কারণ থাকা সম্ভব ছিল। হতে পারে, হযরত দাউদ (আঃ) ঐ মহিলার উচ্চতর যোগ্যতা ও প্রতিভার কথা শুনে তাকে পছন্দ করে ফেলেছিলেন। কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ এ ধরনের ঘটনায় সব সময় খারাপ সম্ভাবনাই আবিষ্কার করতে উদ্যোগী হয়ে থাকে।

অতপর লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, হযরত দাউদ (আঃ) ঐ মহিলার প্রতি আকৃষ্ট, তখন তাদের অবোধ মন কিছুতেই এটা মেনে নিতে রাজী হলো না যে, একজন রাজা একটি মহিলার প্রতি আসক্ত হবে, আর তাকে লাভ না করে ক্ষান্ত থাকবে। এ জন্য তারা আরো এক দাপ অগ্রসর হয়ে এটাও অনুমান করে নিল যে, হয়তো রাজা সেই মহিলাকে তলব করে এনেছিল এবং তার সাথে ব্যভিচার করেছিল। অতপর এটাও হয়তো'র পর্যায় অতিক্রম করে "নিশ্চিয়"-তে রূপান্তরিত হলো এবং তার সাথে গর্ভধারণের তত্ত্বটাও সংযোজিত হলো।

ইসরাইল জাতি তখন পর্যন্ত একটা জীবন্ত জাতি ছিল। তাদের সমাজে এমন লোকও বেচে ছিল, যারা কোনো প্রতাপশালী লোককেও ভুল ধরিয়ে দিতে ইতস্তত করতোনা। এই কাহিনী যখন

ছড়িয়ে পড়লো, তখন এ ধরনের লোকদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি হযরত দাউদের (আঃ) কাছে চলে গেল। তারা রূপক অভিনয়ের প্রক্রিয়ায় তাকে সতর্ক করলো। এতে তিনি তৎক্ষণাত নিজের কৃতকর্ম থেকে তওবা করলেন। কিন্তু সম্ভবত এই তওবার খবর মানুষ জানতে পারেনি। অথবা জানতে পারলেও অসৎ মনোবৃত্তিধারী লোকেরা তা বিশ্বাস করতে পারেনি। যাহোক, তওবার পর হযরত দাউদ (আঃ) উরিয়ার স্ত্রীর চিন্তা মন থেকে মুছে ফেললেও লোকেরা সে চিন্তা পরিত্যাগ করেনি। উরিয়া একজন সামরিক কর্মকর্তা ছিল। তার কোনোঅভিযানে যাওয়া কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না। যুদ্ধে তার নিহত হওয়াও অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু যেহেতু মানুষের মনে ঐ ঘটনার স্মৃতি জাগরুক ছিল এবং একজন নবী রাজা হলে আর একজন ভোগবাদী মানুষ রাজা হলে তাদের চরিত্রে ও আচরণে কি পার্থক্য হয়, ইহুদীরা নিজেদের সহজাত অসৎ মনোবৃত্তির দরুন সেটা অনুধাবন করতে অক্ষম ছিল। তাই উরিয়া যখন যুদ্ধে গিয়ে মারা গেল , তখন তারা এরূপ অনুমান করে নিল যে, দাউদ আলাইহিস সালাম তার স্ত্রীর ওপর আসক্ত ছিলেন এবং একজন বাদশাহ হিসেবে পথের কাটা উরিয়াকে সরিয়ে দিয়ে তার স্ত্রীকে লাভ করার ক্ষমতা তার ছির বিধায় তিনি নিশ্চয়ই দুরভিসন্ধিমূলকভাবে উরিয়াকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন এবং সে যাতে নিহত হয়, তার জন্য চক্রান্ত করেছিলেন। এ অনুমানটাও সহজেই নিশ্চিত বিশ্বাসে রূপান্তরিত হলো। অতপর আরো অগ্রসর হয়ে উয়াবকে চিঠি লেখার উপাখ্যানও তৈরী হয়ে গেল।

একজন পচন্দসই মহিলা বিধবা হয়ে গেলে তাকে বিয়ে করাটা দুষণীয় কিংবা অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু (বাইবেলের বর্ননা অনুসারে) হযরত দাউদ (আঃ) যখন বাতসাবাকে বিয়ে করলেন, তখন ইসরাইলী জনসাধারণ মনে করলো যে, তবে তো এ সংক্রান্ত যত গুজব শুনা যাচ্ছিল সবই সত্য। এখানে পুনরায় ইসরাইলীদের কুৎসিত মনোবৃত্তির মুখোস উন্মোচিত হলো। এ ধরনের ঘটনায় সব সময় দুটো সম্ভাবনা থাকে এবং দু'টোই সমান শক্তিশালী। এমনও হতে পারে যে, একজন মানুষ তার ভালো লাগা

মহিলাকে পাওয়ার কোনো চেষ্টাই করেনি। কিন্তু সে বিধবা হওয়ার পর কোনো নৈতিক ও আইনগত বাধা না তাকায় তাকে বিয়ে করেছে। আবার এমনও হতে পারে যে, সে তাকে পাওয়ার জন্য অন্যায় চেষ্টা-তদবিরে লিপ্ত ছিল। এই দুটো সম্ভাবনার একটিকে অপরটির ওপর নিশ্চিতভাবে অগ্রগন্য মনে করা সাক্ষ্য প্রমান ছাড়া সম্ভব বা সমীচীন নয়। তবে এরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য মানুষের স্বভাব ও মানসিকতার মুখোস উন্মোচিত হয়ে থাকে। সৎ মনোবৃত্তিধারী লোকেরা সব সময় ভালো সম্ভাবনার কথাই ভাবে। বিশেষত যে ব্যক্তি এ ধরনের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট, সে যদি সৎ সদাচারী হয়ে থাকে তা হলে সৎ মনোবৃত্তিধারী মানুষ তাকে দোষমুক্ত বলেই রায় দিবে।[১] কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা সর্বদা প্রত্যেক ব্যাপারেই দোষ ও মলিনতা অন্বেষণ করে থাকে। তার স্বভাবই নোংরামী কামনা করে। তাই সকল ব্যাপারে সে খারাপ সম্ভাবনাকেই অগ্রগণ্য মনে করে। এমনকি সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা যদি তার ধারণা ও অনুমান খন্ডন হয়, তবুও ভিতর থেকে তার মন তাতে সায় দেয় না।

এ পর্যন্ত পৌছে কুরআন ও বাইবেলের মধ্যে পার্থ্যক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আলো ও আঁধারে যতখানি পার্থক্য এ দুটোর ঠিক ততখানি। কুরআন বনী ইসরাইলের একজন স্মরনীয়-বরনীয় নেতার জীবনকে উজ্জল ও নির্মল করে তুলে ধরে এবং তার চরিত্রের একটি মামুলি পদস্খলনের কালিমাকেও ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার না করে ছাড়ে না। পক্ষান্তরে বনী ইসরাইল যে গ্রন্থকে

---

১. ভালো ধারণা পোষণ করার জন্য হযরত দাউদ (আঃ)-এর সমগ্র জীবনেতিহাস সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট ছিল। খোদ বাইবেলের যেখানে এ কিচ্ছা বর্ণিত হয়েছে, তার আগে ও পরে হযরত দাউদ (আঃ)-এর পূর্ণ জীবন চরিত লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেটা পড়ে যে কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, যে ব্যক্তি এমন উদারচেতা ও খোদাভীরু ছিলেন, তার দ্বারা এই বাইবেলেই আল্লাহর এই মহান বান্দাহর প্রতি যে সব অপকর্মের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, তা কেমন করে সংঘটিত হতে পারে।

পবিত্র গ্রন্থ বলে দাবী করে তা তাদের কিংবদন্তীর নায়কের এমন চিত্রও তুলে ধরে না, যা একজন সৎ স্বভাবসম্পন্ন মানুষের মনে থাকার কথা। বরঞ্চ তার এমন ভাবমূর্তি তুলে ধরে যা ঐ জাতির অত্যন্ত দুশ্চরিত্র খামখেয়ালী লোকেরা তৈরী করেছিল। ইহুদী ও খৃষ্টানরা এ কিতাবকে আল্লাহর কিতাব বলে থাকে। অথচ এর এক দু' জায়গায় নয়, শত শত জায়গায় এমন বক্তব্য ও এমন ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে, যা আল্লাহ দূরে থাক, একজন ভদ্র ও সভ্রান্ত মানুষের মনোভাবও প্রতিফলিত করে না।

ইসরাইলী চরিত্রের মহত্বের নমুনা এখানেই শেষ নয়। এর চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা যদি দেখতে চান তাহলে কুরআন ঐ জাতির নবীদের পক্ষে সাফাই দেয়াতে তারা কি ভাবে ক্ষিপ্ত হয়েছে, সেটাই লক্ষ্য করুন। কুরআনে যখন বনী ইসরাইলের আম্বিয়ায়ে কেরামের পক্ষ নিয়ে তাদের আরোপিত প্রতিটি অপবাদ প্রক্ষালন করেছে, তখন তারা কোথায় খুশী ও কৃতজ্ঞ হবে, তার বদলে তারা আরো ক্ষুব্ধ হয়েছে এবং এই মহৎ উদ্যোগকে রুখে দাঁড়িয়েছে। কুরআন যে সব কলংক থেকে নবীগণকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করেছে, তারা পুনরায় সে সব কলংক কালিমা দ্বারা তাদেরকে কলুষিত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় মদিনায় ইহুদীরা বিদ্যমান ছিল। আর কুরআন নাযিল হওয়ার কয়েক বছর পর যখন মুসলমানরা এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে, তখন বিপুল সংখ্যক ইহুদীর সাথে মুসলমানদের মেলামেশা করার সুযোগ হয়। তারা প্রত্যেক নবী সম্পর্কে যে সমস্ত পুরানো মনগড়া উপাখ্যান তাদের সমাজে প্রচলিত ছিল, তা সব একে একে মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করতে আরম্ভকরলো। এর ফল হয়েছে এই যে, মুসলিম তফসীরকারদের লেখা অনেকগুলো তফসীর গ্রন্থ ঐ সব অপপ্রচার দ্বারা দূষিত হয়ে গেল। প্রচলিত তফসীরগ্রন্থসমূহের পাঠকদের কাছে এটা অজানা থাকার কথা নয়। বস্তুত হযরত দাউদের (আঃ) কিস্সাও এই অপপ্রচার দ্বারা প্রভাবিত। মদীনার ইহুদীরা উরিয়ার স্ত্রীর গল্প এত ব্যাপকভাবে মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়েছিল যে, কুরআন শরীফের

এই রুকুর তফসীর তারা বাইবেলের এ ভিত্তিহীন ইসরাইলী লোকগাঁথার অনুকরণেই করতে আরম্ভ করেছিলেন। এতে করে শেষ পর্যন্ত কুরআনের ভাবগত ও তত্ত্বগত বিকৃতি সংঘটিত হওয়ার আশংকা দেখা দিল। অবশেষে হযরত আলী (রাঃ)-কে ঘোষণা করতে হয়েছিল যে, যে ব্যক্তি উরিয়া হিত্তার উপাখ্যান প্রচার করবে, তাকে ১৬০ ঘা বেত মারা হবে। এর মধ্যে ৮০ ঘা মিথ্যা অপবাদের জন্য এবং ৮০ ঘা একজন নবীর অবমাননার জন্য। [১]

এবার এই কিচ্ছা প্রসঙ্গে আমাদের তফসীরকারদের মতামত ও বিশ্লেষণমূলক বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক।

(১) সাধারণভাবে তফসীরকারগন এবং বিশেষত ইতিহাস নির্ভর তফসীর করা যাদের বৈশিষ্ট্য, তারা ইহুদীদের প্রচারিত কিচ্ছাই বর্ণনা করে থাকেন। এঁদের মতে হযরত দাউদ আলাইহিস স্যালাম যে গুনা থেকে তওবা করেছিলেন, সেটা ব্যভিচারেরই গুনাহ। কিন্তু কুরআনের ভাষা এই বক্তব্যকে সমর্থন করেনা। কুরআনে ফরিয়াদীর যে অভিযোগ উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছেঃ قَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ص ٢٣

"সে আমাকে বললো যে, এ দুম্বীটাও আমাকে দিয়ে দাও। আর কথা বলার সময় সে এমন চোটপাট ও দাপট দেখালো যে, তা আমাকে ভড়কে দিল" (সূরা সোয়াদ, ২৩)।

সে এ কথা বলেনি যে, অভিযুক্ত আমার কাছ থেকে দুম্বী ছিনিয়ে নিয়েছে, কিংবা আমাকে হত্যা করিয়ে ছিনিয়ে নেয়ার ফন্দি এঁটেছে।

২। কোনো কোনো তফসীরকারকের মতে উরিয়ার সাথে বাতসাবার বিয়ে হয়নি, কেবল বাগদান হয়েছিল। একজন মুসলমান ভাইয়ের বাগদত্তাকে আবার বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোটাই ছিল হযরত দাউদ (আঃ)-এর ভুল। কিন্তু কুরআনের ভাষা এ অভিমতও সমর্থন করে না। রূপক অভিযোগটিতে যে শব্দ এসেছে তা হলো وَلِيَ نَعْجَةٌ

১। তফসীরে কাশশাফ, তফসীরে কবীর ও তফসীরে বায়জাবী দ্রষ্টব্য।

وَلِىَ نَعْجَةٌ (আমার একটি মাত্র দুম্বী আছে) এর অর্থ এই যে, দুম্বীটা তার মালিকানাধীনই ছিল। ব্যাপারটি এমন ছিল না যে, সে, দুম্বীটা কিনতে চেয়েছিল এবং তার ধনী ভাই তার ডাকের ওপর ডাক দিয়েছিল।

৩। কোনো কোনো মুফাস্সিরের মতে হযরত দাউদের (আঃ) ভুল ছিল এতটুকু যে, ঐ মহিলার স্বামী মারা গেলে তার দুঃখের যতটা সমব্যথী হওয়া তাঁর উচিত ছিল, তা তিনি হননি। আর তা হননি শুধু এ জন্য যে, তিনি ঐ মহিলার প্রতি দুর্বল ছিলেন। কিন্তু এটা একটা অলীক ও উদ্ভট তত্ত্ব। কুরআনে ফরীয়াদীর মুখ দিয়ে যে রূপক অভিযোগটি তুলে ধরা হয়েছে, সেটা এই তত্ত্বের আলোকে সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যায়।

৪। মুফাস্সিরদের একটি গোষ্ঠী মনে করে যে, নারী ঘটিত উপাখ্যানটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। আসল ব্যাপার হলো, হযরত দাউদ (আঃ) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়েছিল এবং কয়েকজন দেয়াল টপকে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু হযরত দাউদ (আঃ) ব্যাপার বুঝতে পেরে যেই সামনে গেলেন, অমনি তারা ভিতরে ঢুকার একটা অজুহাত দাড় করানোর জন্য এই বানোয়াট মামলা তৈরী করে ফেলে। দাউদ (আঃ) তাদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা করেন। পরে হয় তিনি এই ভেবে অনুশোচনা করলেন যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা করাটাই তার মর্যাদার সাথে বেমানান ছিল, অথবা এই ভেবে অনুতপ্ত হলেন যে, তিনি কোনো প্রমাণ ছাড়াই কেবল অনুমানের ভিত্তিতে তাদেরকে শত্রু ভেবে নিয়েছেন এবং তাদেরকে শাস্তি দিতে চেয়েছেন। এই দুটোর যে কোনো একটার জন্যই তিনি অনুতপ্ত হন এবং তওবা ও ইস্তিগফার করেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যার ওপর কয়েকটা আপত্তি অনিবার্যভাবেই ওঠে।

প্রথমতঃ এটা এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয় যে, কুরআনে এত গুরুত্ব দিয়ে তার উল্লেখ করা হবে।

দ্বিতীয়তঃ কুরআনের কোনো শব্দ দ্বারাই বুঝা যায় না যে, তারা হত্যার উদ্দেশ্যে এসেছিল এবং হযরত দাউদ তাদের কাছ

থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন বা বিনা প্রমাণে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন বা বিনা প্রমাণে তাদের ওপর খারাপ ধারণা পোষণ করেছিলেন বলে অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

তৃতীয়তঃ কুরআনের ভাষা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দুম্বী সংক্রান্ত অভিযোগের ব্যাপারে নিজের রায় দেয়া মাত্রই হযরত দাউদের (আঃ) ধারণা হলো যে, এই রূপক অভিযোগও এই রায়ের সাথে খোদায়ী পরীক্ষার একটা যোগসূত্র অবশ্যই ছিল এবং তার জন্যই তিনি ক্ষমা চেয়েছিলেন।

চতুর্থতঃ তারা যদি সত্যিই দুশমন হয়ে থাকে এবং হত্যার মতলবেই এসে থাকে, তাহলে তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা অবৈধ ছিল না এবং এ জন্য তাকে এরূপ তিরস্কার করার কোনো প্রয়োজন ছিলনা যে, يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً (ص ٢٦)

(হে দাউদ! আমি তোমাকে খলীফা মনোনীত করেছি)।

আর যদি তারা দুশমন না হয়ে থাকে তা হলে তাদের রূপক মোকদ্দমাটিকে কেবল অজুহাত বলে উড়িয়ে দেয়ার কোনো অবকাশ থাকে না। রূপক এর একটা গভীর তাৎপর্য থাকা চাই। তাছাড়া এ মোকাদ্দমাটি যে কেবল অজুহাত দাঁড় করানোর জন্য তৈরী করা হয়েছিল, সে ব্যাপারে কুরআনে কিছু আভাস থাকা দরকার ছিল।

৫। কোনো কোনো তফসীরকারদের মতে, আসলে হযরত দাউদ (আঃ) নিজের জন্য নয়, বরং তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আগমনকারীদের জন্যই ক্ষমা চেয়েছিলেন। কিন্তু তেমন হলে পরীক্ষার উল্লেখ একেবারেই অর্থহীন এবং তোমাকে খলীফা বানিয়েছি বলে সতর্ক করা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়।

৬। বর্তমান যুগের মুফাসসিরগণের অভিমত এই যে, হযরত দাউদ (আঃ)-এর 'ইস্তিগফার' আসলে হত্যাকারীদের জন্য ছিল না। তিনি যেই দেখলেন যে, তারা হত্যার দুরভিসন্ধি নিয়ে এসেছে,

অমনি আল্লাহর কাছে হিফাযত ও আশ্রয় প্রার্থনার জন্য দোয়া করলেন। এই ব্যাখ্যার ভিত্তি এই যে, তারা 'ইস্তিগফার' শব্দটাকে আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করেন অর্থাৎ আল্লাহ তাকে রক্ষা ও নিরাপত্তা দান করুন এই প্রার্থনা। কিন্তু প্রথমত এ ব্যখ্যা আরবী বাকরীতির পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত এটা নিদারুণ অশোভন কথা যে, দাউদ আলাইহিস সালামের মত বীর সৈনিক মাত্র দু'জন শত্রুকে দেখে এত ভড়কে যাবেন যে, তাদের মোকাবিলা না করে রুকু-সিজদা করতে আরম্ভকরে দেবেন। তৃতীয়ত এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে (وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ) (দাউদ মনে করলো আমি তাকে পরীক্ষায় ফেলেছি) (فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ) ("তাকে আমি ক্ষমা করলাম") এবং (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً) ("হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা করে পাঠিয়েছি।") (সূরা সোয়াদ, ২৪, ২৫, ২৬)। এই কথাগুলো সবই নিরর্থক ও তাৎপর্যহীন হয়ে যায়।

৭। কারো কারো মতে হযরত দাউদ (আঃ)-এর ভুলটা ছিল এই যে, তিনি মাত্র এক পক্ষের বক্তব্য শুনে রায় দিয়ে ফেললেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য শুনলেন না। কিন্তু এ ব্যখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা প্রথমত কুরআনে অপর পক্ষের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়নি বলে যে তিনি তার বক্তব্য শোনেননি, এ কথা বলা যায় না। হতে পারে যে, সে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল বলেই তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। কুরআনের সাধারণ রীতি এই যে, সে নিষ্প্রয়োজন খুটিনাটির বিবরণ দেয় না। দ্বিতীয়তঃ এ ব্যাখ্যার নিরীখে (وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ) ("তুমি প্রবৃত্তির খায়েশ মোতাবেক চলো না, পাছে এটা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত না করে দেয়।") এ হুশিয়ারিটা বেখাপ্পা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এক পক্ষের বক্তব্য শুনে রায় দেয়াতে হযরত দাউদ (আঃ) -এর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত ছিল না যে, তাতে প্রবৃত্তির অনুসরণের দায়ে দোষী হতে হবে। বড় জোর একে বিচারকার্য পরিচালনা বিধির একটা অনিচ্ছাকৃত লংঘন বলা যেতে পারে এবং এর জন্য সতর্ক করতে হলে তা ভিন্ন পদ্ধতিতে হওয়ার কথা।

৮। কতক লোক একেবারেই ভিন্ন ধরনের একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারা বলেন যে, হযরত দাউদ (আঃ) নিজের সময়কে চার ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। একদিন শুধু আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। একদিন মোকদ্দমার বিচার করতেন। একদিন নিজের পারিবারিক বিষয় তদারক করতেন। একদিন বনী ইসরাইলকে ওয়াজ নসিহত করতেন। সময়কে তিনি এভাবে ভাগ করেছিলেন ওহীর নির্দেশ ছাড়া। অথবা নবীর পক্ষে ওহীর বিরুদ্ধে কোন কাজ করা অনুচিত। সময়কে এভাবে ভাগ করার জন্য এবং আল্লাহর নবীর পক্ষে বেশীর ভাগ সময় ওয়াজ নসিহত ও মোকদ্দমার বিচারে ব্যয় করা উচিত বিধায় আল্লাহ তাঁকে সাবধান করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যায় একাধিক দুর্বল দিক রয়েছে।

প্রথমত, সময় ভাগ করা সংক্রান্ত তথ্য একটা বিরল রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির এটা হযরত ইবনে আব্বাসের সূত্র থেকে উদ্ধৃত করেছেন। একই হযরত ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে মাসরূক ও সাঈদ বিন জুবাইর যে সবল বর্ণনা দিয়েছেন তা আমাদের মতামতকেই সমর্থন করে। (مَا زَادَ دَاوُدُ عَلٰى اَنْ قَالَ اَنْزِلْ لِيْ عَنْهَا) হযরত দাউদ শুধু এতটুকু করেছিলেন যে, তাকে তালাক দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।) এই হলো মাসরূক ও সাঈদ বিন জুবাইয়েরের রেওয়ায়েত। কুরআনের এ বাক্যটিও এই মত সমর্থন করে যে, (لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ) ("তার এত দুম্বী থাকা সত্ত্বেও তোমারটা চেয়ে সে নিশ্চয়ই তোমার উপর অবিচার করেছে" (সূরা সোয়াদ, ২৪)।

দ্বিতীয়ত, হযরত ইবনে আব্বাসের এই প্রথমোক্ত রেওয়ায়েত যদি কারো বিবেচনায় না থাকে, তা হলে সে কুরআনের এ আয়াত কয়টির সঠিক মর্ম উদ্ধার করতে তো পারবেই না, অধিকন্তু তাকে আয়াতের সুস্পষ্ট শাব্দিক অর্থের বিপরীত মর্ম গ্রহণ করতে হবে। কোন বাক্যের শব্দ যদি এত জটিল হয় যে, তা তার বক্তব্য প্রকাশে একেবারেই অক্ষম হয়ে যায়, বরং বাইরের একটি নির্দিষ্ট রেওয়ায়েত তার ব্যাখ্যাকারী হিসেবে সামনে না থাকলে পাঠক তার

সম্পূর্ণ বিপরীত মর্ম উদ্ধার করতে বাধ্য হয়, তবে এ ধরনের বাক্য আল্লাহর কিতাবে তো দূরের কথা, কোন মানুষের লেখা বইতে থাকাও অত্যন্ত দোষণীয়। রেওয়ায়েতটি যদি ঐ বাক্যের আপাত বোধগম্য অর্থের অধিকতর ব্যাখ্যা দানকারী হয়, তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে সহায়ক। কিন্তু সেটা যদি আপাত বোধগম্য অর্থ থেকে বক্তব্যকে অন্য দিকে নিয়ে যায়, তা হলে এ ধরনের রেওয়ায়েতকে সহায়ক ও ব্যাখ্যাকারী না বলে পরিপূরক বলতে হবে। আর সে ক্ষেত্রে এ কথা না বলে উপায় থাকে না যে, এই পরিপূরক রেওয়ায়েতটি ছাড়া কুরআন অসম্পূর্ণ।

তৃতীয়ত, হযরত ইবনে আব্বাস নিজেও আল্লাহর পক্ষ থেকে তিরস্কার করার কারণ কি, তাঁর তফসীর হিসেবে এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেননি। যে বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এটি বর্ণনা করেছেন তা এই যে, বাদী বিবাদীদ্বয়কে দেয়াল টপকে প্রাসাদে আসতে হলো কেন। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে, সে দিনটা ছিল হযরত দাউদের (আঃ) ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট। সেদিন তিনি নিজ প্রাসাদেই অবস্থান করছিলেন। আর ইবাদাতের জন্য এক দিন নির্দিষ্ট করাতে আল্লাহ্‌ সতর্ক করে দিয়েছেন বলে যে দাবী করা হয়েছে, সেটা ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের আভাস ইংগীতেও বলা হয়নি।

চতুর্থত, মুফাসসিরগণ যে কথা বলছেন, সেটাই যদি প্রকৃত ব্যাপার হয়ে থাকে, তা হলে বাদী-বিবাদীর পুরো মোকদ্দমার বিবরণ তুলে ধরার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কোন ঘটনার এমন খুঁটিনাটির বিবরণ দেয়া কুরআনের রীতি নয়, যা দ্বারা মূল বক্তব্য বিষয়ের ওপর আলোকপাত হয়না। এ উদ্দেশ্যে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হতো যে, লোকেরা পরস্পরের ওপর জুলুম চালাতে লাগলো এবং এ ধরনের একটা ঘটনা আমি দাউদকে (আঃ) সতর্ক করার জন্য তার কাছেও পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

পঞ্চমত, খুব বেশী পরিমাণে ইবাদাত করা এমন কোন জিনিস নয় যাকে প্রবৃত্তির অনুসরণ বলা যেতে পারে। কুরআনের কোথাও এ কাজকে প্রবৃত্তির প্ররোচিত কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়নি এবং অধিক মাত্রায় ইবাদাত করার জন্য কাউকে তিরস্কার

করা হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত কোথাও পাওয়া যায় না। তা হলে কিভাবে এটা ধারণা করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ তার ইবাদাতে বিভোর বান্দাহকে ইবাদাতের বাড়াবাড়ির জন্য এই বলে সতর্ক করতে পারেন যে, "প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণ কর না, কেননা এটা তোমাকে গোমরাহ করে দেবে"।

এ সব কারণে আমার কাছে শেষোক্ত ব্যাখ্যাটিও গ্রহণযোগ নয়।

এ সমস্ত সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বাতিল হওয়ার পর একমাত্র আমরা যেটা গ্রহণ করেছি, সেটাই অবশিষ্ট থেকে যায়। কিছু সংখ্যক প্রাচীন তফসীরকারও আমাদের এই মতের সহগামী ও সমর্থক। সে ব্যাখ্যা এই যে, ঘটনাটা উরিয়ার স্ত্রীকে নিয়েই আবর্তিত। তবে এর মধ্যে নির্ভেজাল সত্য শুধু ততটুকুই যে, হযরত দাউদ (আঃ) সমসাময়িক ইসরাইলী সমাজের প্রচলিত প্রথা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উরিয়াকে অনুরোধ করেছিলো তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য। এ ব্যাখ্যাটাকে অন্যান্য ব্যাখ্যার ওপর প্রাধান্য দেয়ার আরো একটা কারণ এই যে, উরিয়ার স্ত্রী সংক্রান্ত ঘটনা যদি একেবারেই ভুয়া ও ভিত্তিহীন হতো, তা হলে কুরআন এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ভাষায় তা খণ্ডন করতো, যেমন হযরত সোলায়মানের ব্যাপারে কুফুরী, শিরক ও যাদু-টুনার অভিযোগকে খণ্ডন করেছে। [১] কেননা ইহুদী সমাজে এ কিসসাটা একটা সত্য ঘটনা হিসেবেই প্রসিদ্ধ ছিল। আর কুরআনের পক্ষে এটা অসম্ভব যে, সে একজন নবীর কথা উল্লেখ করবে, অথচ তার ওপর আরোপিত অপবাদের গ্লানী যথারীতি [illegible] বহাল থাকতে দেবে। [২] এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে কেউ কেউ দ্বিধা বোধ করে থাকেন, তার একমাত্র কারণ এই যে, নবীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের ভুল-ভ্রান্তির অভিযোগ তোলা নবীদের নিষ্পাপ হওয়া সংক্রান্ত আকীদার পরিপন্থী বলে মনে হয়। কিন্তু যারা এরূপ

---

১. সূরা বাকারার ১২শ রুকু দ্রষ্টব্য।

২. বিশেষত যখন কুরআনের নিজস্ব বিবরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটা কিসসা বাইবেলে বিদ্যমান এবং তার ভিত্তিতেই একজন নবীর ওপর কুধারণা পোষণ ও অপবাদ রটনা করা হচ্ছিল।

মতামত পোষণ করেন তারা সম্ভবত এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেননি যে, নিষ্পাপ হওয়াটা আসলে নবীদের জন্মগত অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য নয়, বরং আল্লাহ তাঁদেরকে নবুয়ত নামক সু মহান পদটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করার সুযোগ দানের জন্য একটা হিতকর ব্যবস্থা হিসেবে ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেছেন। নচেত আল্লাহর এই সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাটা যদি ক্ষণিকের জন্যও তাদের ব্যক্তিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সাধারণ মানুষের যেমন ভুলত্রুটি হয়ে থাকে, তেমনি নবীদেরও হতে পারে। এটা একটা বড়ই মজার কথা যে, আল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে প্রত্যেক নবী থেকেই কোন না কোন সময় নিজের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে নিয়ে দুটো একটা ভুল-ভ্রান্তি ঘটে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, যাতে মানুষ নবীদেরকে খোদা মনে করে না বসে এবং তারা যে মানুষ, খোদা নন, সেটা বুঝতে পারে।

এ কিস্সাতে আরো দুটো ছোটখাট ভুল ধারণা রয়েছে, যা কিংবদন্তীর আকারে প্রচারিত হয়ে থাকে।

একটি এই যে, হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের ৯৯ জন স্ত্রী ছিল। এ ভ্রান্ত ধারণার উৎস এই যে, কুরআনে বর্ণিত রূপক মোকদ্দমাটিতে ৯৯টি দুম্বীর উল্লেখ রয়েছে। অথচ প্রকৃত পক্ষে ৯৯ সংখ্যাটা প্রাচুর্য্য ও আধিক্য নির্দেশ করে, অবিকল এই সংখ্যা নয়। ফরিয়াদী আসলে উপমার আকারে এ কথাই ইংগিতে বলতে চেয়েছিল যে, আপনার সামনে তো বহু নারী আছে এবং আপনি বহু নারীকে বিয়ে করতে সক্ষম।

দ্বিতীয়টি এই যে, যে ক'জন লোক বিচার প্রার্থী ও আসামী হয়ে হযরত দাউদের কাছে এসেছিল, তারা মানুষ নয় ফেরেশতা ছিল। দেয়াল টপকে প্রাসাদে প্রবেশ করার কারণেই এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এটা একটা অত্যন্ত দুর্বল তত্ত্ব। মানুষের বেশে ফেরেশতারা আসবেন সেটা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু ফেরেশতাদের আসার কোন প্রয়োজন যেমন নজরে পড়ে না, তেমনি দেয়াল টপকানোটাও এমন কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয় যে, মানুষের

অসাধ্য হবে এবং কেবল ফেরেশতাদের পক্ষেই সম্ভব হবে। সুতরাং আল্লাহ যখন স্পষ্ট করে বলেননি যে, তারা ফেরেশতা ছিল, তখন আমরা মনগড়াভাবে তাদেরকে ফেরেশতা বানিয়ে দেব, এর কোন কারণ নেই।

অনেকে তাদের ফেরেশতা হওয়ার পক্ষে এ যুক্তিও দিয়েছেন যে, হযরত দাউদ (আঃ) তাদেরকে দেখে ভড়কে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ যুক্তিটাও ধোপে টেকার মত নয়। কোন ব্যক্তি যখন নিজের একান্ত নিভৃত কক্ষে অবস্থান করে, যেখানে অন্য কারো আসার কথা কল্পনাও করা যায় না, সেখানে অকস্মাৎ কেউ দেয়াল টপকে ঢুকে পড়লে তার আতংকিত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে এমন কি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো যে, আগন্তুকদেরকে ফেরেশতাই ভাবতে হবে? (তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮)

সূরা নামলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকুতে সাবার রাণী ও হযরত সোলায়মানের (আঃ) কিসসা বর্ণিত হয়েছে। এ কিসসার সারসংক্ষেপ এই যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) যখন হুদহুদের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, সাবা জাতি সূর্য পূজাসহ নানাবিধ শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, তখন তিনি সেই জাতির রাণীকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। [১] রাণী এ সম্পর্কে নিজের ওমারা ও সভাসদদের সাথে পরামর্শ করলেন। তারা বললো যে, আমরাও একটা শক্তিধর জাতি। আমরা বিনা যুদ্ধে কারো আনুগত্য মেনে নেবনা। কিন্তু রাণী যুদ্ধ প্রস্তাবে সম্মত হলেন না এবং তার ফল ভালো হবে না এ কথা জানিয়ে আপোষমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করলেন। অতপর সর্বসম্মতভাবে একটা বহু মূল্যবান উপঢৌকন হযরত সোলায়মানের (আঃ) কাছে পাঠানো হলো। হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেন, তোমাদের উপঢৌকনের আমার প্রয়োজন নেই। আমি চাই তোমাদের ইসলাম গ্রহণ বা বশ্যতা স্বীকার। মোট কথা, যুদ্ধের ঘোষণা জারি হয়ে গেল। ঘোষণার পর হযরত সোলায়মান (আঃ) স্বীয় সভাসদদের সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে রাণীর সিংহাসনটা আমার কাছে নিয়ে আসতে পারে? এক জ্বিন বললো, আমি এই রাজ দরবারের বৈঠক সমাপ্ত হওয়ার আগেই সিংহাসনটা তুলে আনবো। আরেক ব্যক্তি যার "আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে জ্ঞান ছিল" বললো, আমি চোখের পলকের মধ্যেই ওটা এনে হাজির করে দিচ্ছি। বস্তুত সে এক নিমিষেই সিংহাসন হাজির করলো। এ প্রসঙ্গে হযরত শাহ আব্দুল কাদের তার তফসীর গ্রন্থ মোজেজুল কুরআনে লিখেছেন,

---

১. উল্লেখ্য যে, সাবা রাজ্যটি আরব সাম্রাজ্যের ইয়ামন অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার শাসক ছিলেন।

"কাফের যতক্ষণ ঈমান না আনে, তার মাল হালাল কিন্তু যখন সে মুসলমান হয়ে যায়, তখন আর হালাল থাকে না।"

অতপর হযরত সোলায়মান (আঃ) যখন সিংহাসনটাকে সামনে উপস্থিত দেখতে পেলেন, বেএখতিয়ার বলে উঠলেন যে, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ ছাড়া কিছু নয়। তিনি আমাকে পরীক্ষা করছেন যে, আমি কৃতজ্ঞ বান্দাহর মত তার নেয়ামতের হক আদায় করি, না কাফেরদের মত নেয়ামতের নাশুকরী করি। এখানে পুনরায় হযরত শাহ সাহেব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ

"অর্থাৎ বস্তুগত উপকরণের সাহায্যে সিংহাসন আসেনি। আল্লাহর মেহেরবানী যে, আমার সহকর্মী এমন মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে যে, তার দ্বারা অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে।.... তিনি কিতাবের জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও তাঁর কালামের কার্যকর প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ঐ ব্যক্তি ছিলেন হযরত সোলায়মানের (আঃ) উজীর আসফ।"

উল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং হযরত শাহ সাহেবের ব্যাখ্যা সম্পর্কে এক ব্যক্তি নিম্নলিখিত আপত্তিসমূহ ব্যক্ত করেছেন এবং আমাকে তার জবাব দিতে অনুরোধ করেছেনঃ

১. অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা অন্যের সম্পদ হরণ করা একজন নবীর পক্ষে শোভনীয় মনে হয় না। একজন যুদ্ধরত কাফেরের সম্পদ হালাল, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু তিনি যুদ্ধের ময়দানে গনিমত লাভ করার পরিবর্তে অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে মানুষের সম্পদ তুলে আনবেন এটা একজন নবীর পরহেজগারীর সাথে মানানসই নয়। তাঁর এ ধরনের কার্যলাপের উর্ধে থাকা উচিত।

২. সাবার রাণীর সিংহাসন তুলে আনাকে হযরত সোলায়মানের (আঃ) মোজেজা বলা চলে না। এটা বরঞ্চ তাঁর একজন মোসাহেবের কেরামতি। যে নবী জ্বিন ও শয়তানদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলেন। তিনি নিজের অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে কি সিংহাসনটা আনতে পারতেন না?

৩. বাইবেল ও তালমুদে যেখানে বনী ইসরাইলী নবীদের বিস্তারিত জীবনী লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেখানে হযরত সোলায়মান (আঃ) কর্তৃক এভাবে সিংহাসন তুলে আনতে বলার কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

নিম্নে এই আপত্তিগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাচ্ছে। প্রথমে এ কথা অনুধাবন করা দরকার যে, ইসলাম যেমন মানুষের সার্বভৌম শাসনের পক্ষপাতি নয়, তেমনি তা সাম্রাজ্যবাদেরও সমর্থক নয়। ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ ও শাসন ব্যবস্থা দুনিয়ায় যাবতীয় রাজনৈতিক মতবাদ ও শাসন ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তির লালসার পরিবর্তে নিরেট যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক নীতিমালার ওপর এ মতবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ মতবাদের সার নির্যাস এই যে, পৃথিবীকে শাসন করার অধিকার একমাত্র ন্যায়পরায়ন ও সৎ লোকদের। আর ন্যায়পরায়ন ও সৎ লোক হচ্ছে তারাই, যারা আল্লাহর আদেশের অনুগত ও তাঁর প্রদর্শিত পথ ও নীতির অনুসারী। যারা আল্লাহর দেয়া শক্তি ও ক্ষমতাকে তাঁর আইন ও বিধানের যথাযথ অনুকরণ ও অনুসরণে ব্যবহার করে এবং যারা শুধু নিজের ও নিজের জাতির স্বার্থই নয় বরং সমগ্র মানব জাতির নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত স্বার্থ ও কল্যাণের প্রতি যত্নবান। এ ধরনের মানুষ কোন জাতি বিশেষের সম্পদ নয় বরং সমগ্র মানব জাতির অভিন্ন সম্পদ। সারা পৃথিবীতে আল্লাহর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা আর আল্লাহর বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট ও জালেমদের শাসন থেকে এবং এই জালেম ও পথভ্রষ্ট লোকদের রচিত অন্যায় আইনের নিগড় থেকে মুক্ত করা একমাত্র তাদেরই কর্তব্য এবং তাদেরই দায়িত্ব। পক্ষান্তরে যাদের কাছে আল্লাহর পথনির্দেশ নেই, আল্লাহর আইন নেই এবং এমন নিষ্কলুষ ও পবিত্র মনও নেই যে, স্বার্থপরতা ও অহংকারের উর্ধে উঠে নির্ভেজাল মানব কল্যাণের জন্য শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, তাদের কখনো এ অধিকার থাকতে পারে না যে, সরকার ও সাম্রাজ্য পরিচালনার বাগডোর তাদের হাতে থাকবে। তারা স্বজাতি কিংবা বিজাতি যারই শাসক হোক না কেন, সর্বাবস্থায়ই

অত্যাচারী। সৎ ও ন্যায়পরায়ন লোকদের অধিকার রয়েছে যে, ক্ষমতা থাকলে তাদের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারে।

এ ব্যাপারে ইসলামের বিধি এই যে, প্রথমে তাদেরকে ইসলামী আদর্শ ও জীবন পদ্ধতি গ্রহণের দাওয়াত দিতে হবে। দাওয়াত মেনে নিয়ে আল্লাহর বিধানের অনুগত হয়ে গেলে তারা সৎ ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে যাবে এবং যোগ্যতা অনুসারে শাসন কার্যে অংশ গ্রহণের অধিকারও তাদের থাকবে। কিন্তু তারা দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার কোন অধিকার তাদের থাকবে না। শক্তি প্রয়োগে পরাভূত করে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিতে হবে এবং তাদেরকে অবশ্যই ইসলামের রাজনৈতিক ক্ষমতার অনুগত হয়ে থাকতে হবে, যাতে তারা আর না হোক, আল্লাহর যমীনে কোন রকমের অনাচার ও নৈরাজ্য যেন বিস্তার কতে না পারে। অবশ্য তাদের কুফরী ও শিরকে লিপ্ত হওয়ার যে গুনাহ্ তার শাস্তি আল্লাহ কিয়ামতের দিন দেবেন। পৃথিবীতে যে কোন আকীদা ও যে কোন ধর্মের অনুসারী হতে তাদের অবাধ স্বাধীনতা থাকবে।

এই নীতিগত বিষয়টি বুঝে নেয়ার পর এখন হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালামের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করুন। তিনি আল্লাহর নবী। আল্লাহ তাঁকে সত্যের জ্ঞান দান করেছেন। وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا (النمل: ١٥) আমি দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান দান করেছি। (নামল, ১৫)। সৎ চরিত্র ও সৎ কর্ম উভয় দিক দিয়েই তাঁদের উভয়কে দুনিয়ার কাফের ও সাধারণ মুমিন নির্বিশেষে সকলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল। (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ) "আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা যিনি আমাদের দু'জনকে তাঁর বহুসংখ্যক মুমিন বান্দার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন" (নামল–১৫)। আল্লাহর আনুগত্য ও ফরমাবরদারীতে তিনি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ। (نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) "কত সুন্দর বান্দা! সে অত্যন্ত ফরমাবরদার" (সূরা সোয়াদ–৩০)। আর তাঁর মহান পিতা হযরত দাউদ (আঃ)–এর মুখ দিয়েই আল্লাহ তাঁর এ আইন জারি

করিয়েছেন যে, যমীনের বৈধ উত্তরাধিকারী ও খেলাফতের প্রকৃত হকদার একমাত্র সৎ বান্দারা।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ
الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (انبيا: ١٠٥)

"জাবুর গ্রন্থে আমি উপদেশ দেয়ার পর এ কথা লিপিবদ্ধ করেছি যে, আমার সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বান্দারাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী" (আম্বিয়া–১০৫)।

আর এর ভিত্তিতেই হযরত সোলায়মান (আঃ) ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার ইসলামী সাম্রাজ্যে শাসন কার্য পরিচালনা করছিলেন।

এমতাবস্থায় তিনি জানতে পারলেন যে, একটি জাতি সূর্যের পূজা ও শয়তানের পদানুসরণে লিপ্ত রয়েছে এবং সত্য পথ থেকে দূরে সরে গেছে।

يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

"তারা সূর্যের পূজায় লিপ্ত। শয়তান তাদের অপকর্মগুলোকে তাদের সামনে সুন্দর বানিয়ে রেখেছে। এভাবে তাদেরকে সঠিক পথ থেকে দূরে হটিয়ে দিয়েছে। ফলে তারা সত্য পথের সন্ধান পাচ্ছে না" (নামল–২৪)।

ইসলামী রীতি অনুসারে তিনি সে জাতির নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে দাওয়াত দিলেন যে, হয় ইসলাম গ্রহণ কর, নচেত ইসলামী সরকারের বশ্যতা স্বীকার কর। কেননা শয়তানের পথের অনুসারী থাকা অবস্থায় আল্লাহর যমীনে শাসন চালানোর অধিকার তোমাদের নেই।

أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (النمل: ٣١)

"আমার ওপর আধিপত্য খাটিও না। আত্ম সমার্পন পূর্বক আমার কাছে চলে এস" (নামল–৩১)।

এ চিঠিটা পড়ে ঐ জাতির রাণী ঈমানের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (النمل-٤٢)

"আমরা ইতিপূর্বেই জ্ঞান লাভ করেছি এবং ইসলাম গ্রহণ করেছি" (নামল-৪২)।

কিন্তু জাতীয় আভিজাত্যবোধ ও পৈতৃক ধর্মের টান তাকে কার্যত ইসলাম গ্রহণে বিরত রাখে।

وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ

مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ (النمل:٤٣)

"সে আল্লাহ ছাড়া অন্য যে সব জিনিসের পূজা করতো, তা তাকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করে রেখেছিল। কেননা সে কাফের জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল" (সূরা নামল-৪৩)।

রাণী তার সভাসদদের মতামত চাইলে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু রাণী তাদেরকে বিরত রাখে এবং হযরত সোলায়মানকে (আঃ) উপঢৌকন পাঠিয়ে সন্তুষ্ট করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু হযরত সোলায়মান (আঃ) সেই উপঢৌকন প্রত্যাখান করেন। কেননা তিনি দুনিয়াদার বাদশাহদের মত ধনলিপ্সু নন। বরং তিনি ছিলেন মানুষকে আল্লাহর দীনের অনুসারী করা অথবা নিদেনপক্ষে খোদাদ্রোহী সরকারকে উৎখাত করে তদস্থলে আল্লাহর বিধানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে আল্লাহর নির্দেশক্রমে নিয়োজিত। এ জন্য তিনি সাবার রাণীর উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করে তাকে যুদ্ধের হুমকি দিলেন।

قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم

بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ

لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (النمل: ٣٦-٣٧)

"সোলায়মান সাবার রাণীর দূতকে বললেন, তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ

তোমাদের তুলনায় আমাকে অনেক ভালো সম্পদ দান করেছেন। তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে তোমরাই স্ফূর্তি কর গিয়ে। হে দূত! তুমি তোমার নেতৃবৃন্দের কাছে ফিরে যাও। আমরা এমন সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের ওপর চড়াও হবো, যা থেকে তাদের নিস্তার নেই। তখন আমরা তাদেরকে অপমানিত করে নিরূপায় অবস্থায় রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করে ছাড়বো" (নামল-৩৬, ৩৭)।

এ হুমকি ফলদায়ক হলো এবং রাণী স্বয়ং বশ্যতা মেনে নিয়ে হযরত সোলায়মানের (আঃ) সাথে সাক্ষাত করতে বাইতুল মাকদাসে উপনীত হলো।

রাণীর পৌঁছার পূর্বে হযরত সোলায়মান (আঃ) সভাসদদের কাছে বললেন যে, তোমরা রাণীর আগমনের পূর্বেই তার প্রাসাদের ভেতর থেকে সিংহাসনটা নিয়ে এস। এ আদেশ প্রদানের কারণ এটা ছিল না যে, সিংহাসনের বিবরণ শুনে হযরত সোলায়মানের (আঃ) মুখে লালা এসে গিয়েছিল এবং তিনি সেটা হস্তগত করতে হন্যে হয়ে উঠেছিলেন। বরং এর আসল উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দেয়া শক্তির এমন প্রদর্শনী করা যাতে সে থতমত খেয়ে জিম্মী হয়ে বসবাস করার পরিবর্তে ঈমানের নেয়ামত লাভ করে এবং মুমিন হয়ে বসবাস করে। এ জন্য সিংহাসন আনানো হলো। রাণী যখন হাজির হলো তখন তারই সিংহাসন তার সামনে অচেনা করে রাখা হলো।

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ
مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (النمل: ٤١)

"সোলায়মান বললেন, তোমরা রাণীর সিংহাসনটা অচেনা করে রেখে দাও দেখি সে হেদায়াত লাভ করে, না পথভ্রষ্টই থেকে যায়"। (নামল-৪১)

রাণী সিংহাসন দেখেই চিনে ফেললো যে, এটা তারই সিংহাসন। এই মোজেজা তার চোখ খুলে দিল। যে ঈমান হযরত সোলায়মানের (আঃ) প্রথম দাওয়াতের সময় একটা ঝলক

দেখিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল, পূর্ণ দীপ্তি নিয়ে তার মন-মগজকে উদ্ভাসিত করলো।

قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (النمل: ٤٢)

"সে বললোঃ এ যেন আমার সেই সিংহাসনটাই। আসলে আমরা ইতিপূর্বেই (আপনার দাওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে) জ্ঞান লাভ করেছিলাম এবং (মনে মনে) ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম" (নামল-৪২)।

এই ব্যাখ্যা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এতবড় একজন নবী কেবল অলৌকিক ক্ষমতার জোরে অন্যের সম্পদ হস্তগত ও আত্মসাৎ করেছিলেন এ ধারণা ঠিক নয়। আসলে সেখানে হস্তগত ও আত্মসাতের ঘটনাই ঘটেনি। বরং একটি মোশরেক জাতির রাণীকে এবং তার সাম্রাজ্যের কর্মকর্তাদেরকে আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতার একটা নমুনাই শুধু দেখানো হয়েছিল এবং তাও নিছক তামাসা করার মতলবে নয় বরং তারা শিরক ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর নির্ভেজাল আনুগত্য গ্রহণ করুক এই উদ্দেশ্যে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন হযরত সোলায়মানের (আঃ) নিষ্ঠা ও একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করার প্রবণতার স্বপক্ষে যে সাক্ষ্য দিচ্ছে, তা প্রশ্নকারীর উল্লিখিত সন্দেহসমূহ খন্ডনের জন্য যথেষ্ট। সাবার রাণী তাকে এক বহু মূল্যবান উপঢৌকন দিলে তিনি এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, আমার প্রভু আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা তোমার ধনসম্পদের চেয়ে উত্তম। রাণীর সিংহাসন যখন মুহূর্তের মধ্যে তার কাছে পৌঁছলো, তখন নিজের শক্তি ও দাপটের গর্ব সংক্রান্ত একটি বাক্যও তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়নি, বরং বে-এখতিয়ার আল্লাহর অনুগ্রহের প্রশংসা করেন এবং কৃতজ্ঞতার বশে সিজদায় পতিত হন। এরপর যখন সাবার রাণী বশ্যতা স্বীকার করে দরবারে এলো তখন তার রাজ্যের কোন অংশ চাওয়া হলো না। কোন বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা তার কাছে দাবী করা হলো না। তার রাজ্যকে ওছি রাজ্য কিংবা রক্ষিত রাজ্যে পরিণত করার মত কোন প্রস্তাব দেয়া হলো না। সেখানে আবাসিক

প্রতিনিধি বা হাই-কমিশনার নিয়োগেরও কোন কথা তোলা হলো না। এ সব বাদ দিয়ে একটি মাত্র জিনিস তার সামনে পেশ করা হলো। সেটি হলো, ইসলামের চিরসত্য কলেমা। আর তার সমর্থনে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তির একটি নমুনা (অর্থাৎ রাণীর নিজের সিংহাসন) তাকে দেখানো হলো, যাতে সে হেদায়াত লাভ করতে পারে। এই মোজেজা দেখে রাণী উচ্চস্বরে বলে ওঠে–

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজের ওপর অবিচার করেছি। (এখন) সোলায়মানের সাথে বিশ্ব প্রভু আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম" (সূরা নামল–৪৪)।

আর এতেই ইসলামী সমাজের শাসক সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন যে, তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করা যাক। অর্থাৎ ইয়ামান থেকে রাণীর সিংহাসনটা আনানোর মোজেযা হযরত সোলায়মান (আঃ) –এর পরিবর্তে অন্য এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হলো কেন? এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ কাজটা আল্লাহরই অনুমতি ও তারই প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সম্পন্ন হয়েছিল। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ কাজটা তাঁর নবীকে দিয়েও করাতে পারতেন। কিন্তু তিনি যখন এ কাজের জন্য নবীর পরিবর্তে অন্য একজনকে মনোনীত করেছেন এখন নিশ্চয়ই এতে কোন রহস্য নিহিত রয়েছে। সেই রহস্যটা কি? এ ব্যাপারে নিশ্চয়তার সাথে কিছু বলা যায় না। তবে চিন্তাভাবনা করে আমার যেটা বুঝে এসেছে, সেটা এই যে, হয়তো এখানে জ্বিনদের আগুনজাত শক্তি এবং মানুষের খোদায়ী জ্ঞানজাত শক্তির পার্থক্য দেখানো কাম্য ছিল। ১

---

১. এখানে কিস্সার এ দিকটা স্মরণ রাখা দরকার যে, সোলায়মানের (আঃ) দরবারের একজন মহাশক্তিধর জ্বিন বলেছিল যে, আমি দরবারের বৈঠক শেষ না হতেই ইয়ামান থেকে সিংহাসন তুলে আনবো। কিন্তু যে মানুষটির কাছে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান ছিল সে চোখের পলকেই সিংহাসন এনে দিল।

যদিও মানুষ দেহের খাঁচায় আবদ্ধ থেকে স্বীয় সীমিত বস্তুগত শক্তি দ্বারা কোন অস্বাভাবিক কাজ করতে সমর্থ হয় না এবং এদিক দিয়ে জ্বিনদের আগুনে সত্তা মানুষের মেটে সত্তার তুলনায় অনেক বেশী শক্তিমান। কিন্তু যখন খোদায়ী জ্ঞানের শক্তি মানুষের সাথে যুক্ত হয়, তখন সে সকল শক্তিধর সৃষ্টির চেয়েও শক্তিশালী হয়ে যায়। এই গুণগত শক্তি যদি একজন নবীর মাধ্যমে দেখানো হতো, তা হলে এ কথা বলার অবকাশ ছিল যে, নবীতো জ্বিন ও মানুষ সকলের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ। তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হওয়াতে মানুষ হিসেবে মানুষের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। এ জন্য আল্লাহ একজন সাধারণ মানুষকে দিয়ে–যিনি নবী নন–এই জ্ঞানগত শক্তি জাহির করে দেখালেন, যাতে সত্য সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে যায় এবং বিন্দুমাত্রও সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ না থাকে।

পরবর্তী প্রশ্ন এই যে, এ ঘটনার যে বিবরণ কুরআনে রয়েছে তা বাইবেল ও তালমুদে নেই কেন? এর জবাব আপনি কুরআন ও ঐ সব গ্রন্থের তুলনামূলক অধ্যয়ন করলে আপনা থেকে পেয়ে যাবেন। বাইবেল ও তালমুদে সব ধরনের সত্য মিথ্যা গল্পের সমাবেশ ঘটেছে এবং তাতে অধিকাংশই আসল বাদ দিয়ে নকল বাছাই করা হয়েছে। পাতার পর পাতা পড়ে যাওয়ার পর হঠাৎ কোথাও একটা কাজের কথা পেলেও পেতে পারেন। যে কিসসা বলা হবে তার নিষ্প্রয়োজন খুটিনাটি তো অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু সত্যিকার জ্ঞানের কথা, উপদেশের কথা, কোন ধর্মীয়, নৈতিক অথবা শরীয়ত ও রাজনীতি সংক্রান্ত কোন শিক্ষামূলক তত্ত্ব খুব কমই পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে কুরআনে সকল নিষ্প্রয়োজন খুটিনাটি তথ্য বাদ দিয়ে নবীদের জীবনের উৎকৃষ্টতম নির্যাস বের করে রাখা হয়েছে। এতে কেবল সেই সব তত্ত্বই পেশ করা হয়েছে যাতে সর্বকালের সর্বজাতির মানুষের জন্য অসংখ্য পথ নির্দেশীকা রয়েছে, অর্থহীন ঐতিহাসিক চুলচেরা বিবরণ ঐ সব কিতাবে প্রচুর রয়েছে, কিন্তু কুরআনে কোথাও নেই। শিক্ষামূলক সত্য ঘটনাবলীর সবই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে অথচ ঐ সব কিতাবে তা নেই।

ব্যাপারটা শুধু এতটুকুই নয়, বরং আরো দুঃখজনক। বহু সংখ্যক নবীর জীবনকে বাইবেল ও অন্যান্য ইসরাইলী জনশ্রুতিতে এমনভাবে পেশ করা হয়েছে, তাদেরকে নবী মানা তো দূরের কথা, কোন উচুদরের মহৎ মানুষ মনে করাও কাঠিন। এটা শুধু কুরআনেরই কৃতিত্ব যে সে নবীদের জীবনকে ঐ সব ইসরাইলী কলুষ-কালিমা থেকে মুক্ত করেছে এবং দুনিয়াতে ঐ সব পূণ্যাত্মা ব্যক্তিবর্গের যথোচিত গৌরব ও মাহাত্ম্য নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেছে। হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত লূত (আঃ) হযরত ইসহাক (আঃ) হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ) হযরত হারুন (আঃ) হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সোলায়মানের (আঃ) ঘটনাবলী বাইবেলে পড়ে দেখুন, কত কালো দাগ তাদের জীবনে দেখতে পাবেন। আর কুরআনে পড়ুন, মনে হবে যে মহত্ব ও গৌরবে মন্ডিত আকাশে তারা যে দেদিপ্যমান নক্ষত্রমন্ডলী। খোদ হযরত সোলায়মানকে (আঃ) ইসরাইলী গাজাখুরী গল্পসমূহে নবুয়ত তো দূরের কথা, ঈমান থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়েছে। বাইবেলে বলা হয়েছে যে, শেষ বয়সে তিনি এমন নারীপূজায় লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে, শিরকে পর্যন্ত নিমজ্জিত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে কুরআন বলে যে, তিনি অতি উৎকৃষ্ট মানের মুমিন এবং আল্লাহর সুমহান নবী ছিলেন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ রকমই ছিলেন।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের রুচী এত নীচে নেমে গিয়েছিল যে, নিজেদের ধর্ম গ্রন্থে নিজেদের নবীগণের চরিত্রকে মিথ্যা কিসসা কাহিনী দ্বারা কলংকিত করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। বরঞ্চ কুরআন মজিদ যখন সেই সব মহামানবের মহৎ গুনাবলী, অনুপম চরিত্র ও উচ্চাঙ্গের কীর্তি ও অবদানের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে, তখনও তা মেনে নেয়নি। তারা বিশ্বাসই করতে পারেনি যে, মানুষের জীবন কখনো এত পবিত্র ও নিষ্কলুষ হতে পারে। মানবীয় চরিত্র কখনো এত মহৎ হতে পারে এবং মাটি ও পানির তৈরী আদম সন্তান কখনো এত নির্মল মনা, এত উদারচেতা এবং এত আল্লাহ-নিবেদিত হতে পারে। এ সব জিনিস তাদের

কল্পনারও অতীত ছিল। এ জন্য কুরআন নাযিল হওয়ার পর ইসরাইলী মানসিকতা পুনরায় তৎপর হয়ে উঠলো। পবিত্র কুরআনে নবীগণের যে সব কিসসা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, একটি একটি করে তার ওপর হাত সাফাই শুরু হলো এবং প্রত্যেকটির জীবনী শক্তি বের করে ফেলা হলো। পবিত্র কুরআনের বাকরীতি এই যে, তা কিসসার নিষ্প্রয়োজন খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে কেবল দরকারী অংশটুকু বর্ণনা করে। এতে করে ঘটনার বিভিন্ন অংশের মাঝে যে শূন্যতা থেকে যায়, পাঠক নিজের চিন্তাভাবনা দ্বারা অথবা বাইরের কোন তথ্য তার জানা থাকলে তা দ্বারা সে শূন্যতাটুকু পূরণ করতে পারে। কিন্তু ইসরাইলী বিকৃত রুচিতে আক্রান্ত লোকেরা এ শূন্যতাকে পূরণ করলো রূপকথা দিয়ে। আর সে রূপকথাও এত কুৎসিত ও ন্যাক্কারজনক যে, তার সংমিশ্রণে এই কিসসাগুলোর সমস্ত নৈতিক উপকারিতা নষ্ট হয়ে গেল। দুর্ভাগ্যক্রমে 'কাসাসুল কুরআন' (কুরআনের কিসসা) নামধারী তাফসীরগুলোতে এই সব ইসরাইলী কল্পকথার ব্যাপক সমাবেশ ঘটেছে এবং কুরআন অধ্যয়নকারীদের মনের বেশীর ভাগ দ্বন্দ্ব এ সব কল্পকথা থেকেই জন্ম নিয়ে থাকে।

হযরত সোলায়মান (আঃ) ও সাবার রাণীর এই কিসসাটাই দেখুন। কুরআনের সহজ-সাবলীল বর্ণনায় হযরত সোলায়মানের (আঃ) নির্মম চরিত্রের কি নিখুঁত চিত্র অংকিত হয়েছে। কিন্তু ইসরাইলী কদর্য মানসিকতার হস্তক্ষেপ এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে এক এক করে বিচ্ছিন্ন করে ছেড়েছে। এগুলোকে স্বীয় উচ্চ অবস্থান থেকে এমন নিম্ন ভাগাড়ে নিক্ষেপ করেছে যে, এতে কোন শিক্ষামূলক ও উদ্দীপনামূলক উপাদান আর অবশিষ্ট নেই। এমন কি পাঠক যদি এই আলোকে এই কিসসা পড়ে তবে তাকে স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে হবে যে, কুরআনে এ কিসসার প্রয়োজনইবা কি ছিল।

সাবার রাণীর উপঢৌকন ফেরত দেয়ার যে কারণ কুরআনে বলা হয়েছে তা উপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসরাইলী মানসিকতার প্রভাবে তার যে অপব্যাখ্যা হয়েছে তাও শুনুন।

রাণী নাকি দু'শ দাস ও দু'শ দাসীকে একই পোশাক পরিয়ে পাঠিয়েছিলেন, যার ফলে কোনটা দাস এবং কোনটা দাসী তা নির্ণয় করা যাচ্ছিল না। এভাবে সে হযরত সোলায়মানের (আঃ) বুদ্ধিমত্তা যাচাই করতে চেয়েছিল। হযরত সোলায়মানের (আঃ) কাছে যখন এই দাসদাসীর দলটি এল, তিনি দাস ও দাসীদেরকে পৃথক করে ফেললেন এবং বললেন—এদেরকে নিয়ে যাও। 'এ ধরনের উপঢৌকন নিয়ে তোমরাই খুশী থাকগে।' এ ব্যাখ্যার পর এখন হযরত সোলায়মানের (আঃ) জবাবটাও একটু দেখুন। এখন কি এতে আর কোন প্রাণ আছে? আছে কি কোন উচ্চ নৈতিক চেতনা ও প্রেরণা?

সিংহাসন উঠিয়ে আনার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য কি, তাও ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এখন ইসরাইলী রূপকথার আলোকে এর যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে সেটাও দেখুন। হুদহুদ নাকি সাবার রাজকীয় সিংহাসনের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছিল হযরত সোলায়মানের (আঃ) কাছে। পুরো সিংহাসনটাই স্বর্ণ ও মূল্যবান মনি-মুক্তায় তৈরী। কারিগরির সে এক অপূর্ব নিদর্শন, এক অমূল্য রত্ন। হযরত সোলায়মান (আঃ) এসব প্রশংসা শুনে অস্থির হয়ে গেলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, সাবার রাণী ও রাজকীয় পরিষদবর্গকে নিয়ে সৈন্যবাহিনী আসছে; তখন তিনি ভাবলেন যে, এসব লোক যদি মুসলমান হয়ে যায় তা হলে আর এ সিংহাসন হস্তগত করা যাবে না। তাই তিনি হুকুম দিলেন যে, ওদের আগার আগেই সিংহাসনটা নিয়ে আস। তা হলে বুঝুন, এ ব্যাখ্যায় নবীর মর্যাদার কি সর্বনাশটা করা হয়েছে। কোথায় সেই মহৎ উদ্দেশ্য আর কোথায় এই লোভলালসা! ঘটনাটাকে কোন্ উচ্চ মান থেকে কোন আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা হয়েছে, ভেবে দেখুন!

সিংহাসনকে রাণীর সামনে উপস্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল তাকে এ কথা বুঝিয়ে দেয়া যে, তুমি যে পরম প্রিয় ধনকে তালাবদ্ধ করে অনেক চৌকি পাহারার ব্যবস্থা করে এসেছ, তা এখন এখানে হাজির। খোদায়ী জ্ঞানের কি অপরিসীম শক্তি, এটা তারই একটা নমুনা এবং তা তুমি স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছ। ঈমানের বুদ্ধিবৃত্তির যুক্তিপ্রমাণের পাশাপাশি এই বস্তুগত প্রমাণটিও এ জন্যই উপস্থাপন

করা হয়েছিল যেন এই মহিলা কোন না কোনভাবে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়। স্বয়ং হযরত সোলায়মান (আঃ) এ কাজের উদ্দেশ্য এ ভাবেই ব্যক্ত করেছিলেন যে–

نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ

"আমরা দেখবো সে হেদায়াত লাভ করে, না পথভ্রষ্টই থেকে যায়" (সূরা নামল–৪১)।

কিন্তু এত সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ব্যাপারটাও রূপকথা প্রিয় লোকদের মস্তিষ্কের নাগালের বাইরেই থেকে গেল। তারা সিংহাসন পেশ করার ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) রাণীর বুদ্ধি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য সিংহাসনটার কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন করে তার সামনে রাখলেন এবং দেখলেন সে চিনতে পারে কিনা। বস্তুত নবীদের কাজকে যখন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে দেখা হয় তখন তা এ রকমই মনে হয়, যেন তাতে কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নেই এবং কোন মহৎ ও নিগূঢ় রহস্য ও কল্যাণ নিহিত নেই।

সবচেয়ে বাজে ও নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ কথা যেটা এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তা হলো কাঁচ নির্মিত প্রাসাদে সাবার রাণীর উপস্থিতি সংক্রান্ত। কুরআনে বলা হয়েছে, হযরত সোলায়মান (আঃ) রাণীর সামনে তার সিংহাসন উপস্থাপিত করার পর তাকে নিজের শীশমহল (কাঁচের প্রাসাদ) দেখালেন। সেই প্রাসাদের মেঝেও ছিল কাঁচের তৈরী। রাণী প্রাসাদে ঢুকে কাঁচের মেঝেকে পানি মনে করে পায়ের ওপর থেকে কাপড় তুলতে লাগলো। হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেন, এটা পানি নয়, কাঁচের মেঝে। এবার রাণীর মানস চক্ষু পুরোপুরি প্রস্ফুটিত হলো। তার মন সাক্ষ্য দিল যে, যে ব্যক্তি এত বড় সাম্রাজ্য, এত বিপুল ধনরত্ন, এত বিপুল বিলাস–ব্যাসনের অধিকারী এবং এমন অসাধারণ ক্ষমতাশালী যে, চোখের নিমেষে কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে আমার আস্ত সিংহাসনটা নিয়ে আসতে পারে, আর এত পরাক্রম ও দাপট সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এমন মহৎ চরিত্র, এমন নিষ্কলুষ ও নিরহংকার মন এবং এমন

খোদাভীরু ও খোদাভক্ত, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন পরম সত্যবাদী মানুষ এবং তাঁর নবুয়তের দাবীকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ থাকতে পারে না। এ জন্যই সে অকুণ্ঠ চিত্তে বলে উঠলোঃ

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ۔

"হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজের ওপর বড়ই জুলুম করেছি যে, এতদিন তোমাকে বাদ দিয়ে সূর্যের পূজা করেছি। এখন আমি সোলায়মানের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সেই আল্লাহর দাসত্ব কবুল করলাম, যিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রভু।"

এতো গেল কুরআনের বর্ণনা। এখন আসুন, ইসরাঈলী মানসিকতার অধীন যে তাফসীর করা হয়েছে, তাও দেখুন। এতে বলা হয়েছে যে, যে সব জ্বিন ও শয়তান হযরত সোলায়মানের (আঃ) অনুগত ছিল, তারা আশংকা করলো যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) সম্ভবতঃ সাবার রাণীর ওপর আসক্ত হয়ে যেতে পারেন। এ জন্য তারা বললো যে, এ মহিলা জ্বিন বংশোদ্ভূত। এর পা মানুষের মত নয় বরং গাধার মত ক্ষুর বিশিষ্ট। হযরত সোলায়মান এ বর্ণনার সত্যতা নিরূপনের জন্য একটা কাঠের প্রাসাদ নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন। সেই প্রাসাদের মেঝেও হবে কাঁচের তৈরী এবং মেঝের নীচে পানি ভরে দিতে হবে। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, রাণী যখন সেখানে প্রবেশ করবে, তখন পানি দেখে পায়ের ওপর থেকে কাপড় তুলে ফেলবে। এভাবে তার পা দেখবার সুযোগ হয়ে যাবে। নাউজুবিল্লাহ! একি কোন নবীর কিসসা, না একজন ভোগবিলাসী লম্পট রাজার কাহিনী।

চিরাচরিত কদর্য অভিরুচী এবং হীন মানসিকতা নিয়ে ইসরাইলীরা তাওরাতের শিক্ষাকে বিকৃতি করার পর কুরআনের শিক্ষাকেও বিকৃত করা এবং নবীদের পবিত্র জীবনের ওপর নিজেদের উদ্ভট কল্পনার কালিমা লেপন করার জন্য কিভাবে হন্যে হয়ে উঠেছিল, তারই কয়েকটা নমুনা এখানে উল্লেখ করা হলো। আল্লাহর শোকর যে, তিনি কুরআনকে তাঁর মূল ভাষায় সংরক্ষিত করেছেন। ফলে যে কোন ব্যক্তি এর সাহায্যে কোনটা রূপকথা আর

কোনটা প্রকৃত ঘটনা তা নির্ণয় করতে সক্ষম। এই কুরআনের উপস্থিতি সত্ত্বেও কেউ যদি ইসরাইলী কিংবদন্তীর প্রতিই বেশী আকৃষ্ট থাকে এবং তাদের রূপকথাকেই যদি কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সঠিক মাধ্যম বলে মনে করতে থাকে, তা হলে এটা কেবল তার নিজেরই বিভ্রান্তি, আর কারো নয়।

(তরজমানুল কুরআন, রবীউসসানী–১৩৫৫, জুলাই–১৯৩৬)

জ্বিনের বাস্তবতা

(কয়েক বছর আগে প্রকাশিত একখানা বই-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে এ নিবন্ধটা লেখা হয়েছিল। লেখক ঐ বইখানিতে জ্বিনের ব্যাপারে কিছু মতামত প্রকাশ করেছিলেন। আমি প্রাথমিক পর্যায়ে ঐ মতামতের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করেছিলাম। পরে একজন লেখক আমার সমালোচনার পশ্চাদধাবন করলেন। তার জবাবেই এ নিবন্ধ লেখা। একটা পুরানো বিতর্ককে পুনরুজ্জীবিত করা নয় বরং নিছক জ্ঞানান্বেষণ ও তাত্ত্বিক অনুশীলনই এর উদ্দেশ্য। এ জন্য উভয় লেখকের নাম বাদ দেয়া হয়েছে।

আধুনিক যুগের সম্ভবতঃ উনবিংশ শতকের শেষার্ধে জ্বিনের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহের সূচনা হয়। যে জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায় না, সে জিনিসকে কেবল ধর্মগ্রন্থের সনদের ভিত্তিতে বাস্তব বলে মেনে নেয়া ঐ সময় খুবই লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন লজ্জাজনক কাজ কেবলমাত্র সেই সব লোকই করতে পারতো যারা তৎকালীন জ্ঞানীজনের চোখে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও কল্পনাবিলাসী কাঠ মোল্লা সাব্যস্ত হতে প্রস্তুত থাকতো। এ পরিস্থিতিতে যে সব মুসলমান নিজেদের বৈষয়িক উন্নতির জন্য আপন অমুসলিম প্রভুদের দৃষ্টিতে যুক্তিবাদী ও কৃষ্টিবান সাব্যস্ত হওয়া জরুরী মনে করতো, তারা একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কুরআন অধ্যয়ন শুরু করে। উনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদী, ইন্দ্রিয়পুজারী ও নিসর্গবাদী লোকেরা যে যে অতি প্রাকৃতিক তত্ত্বকে মেনে নিতে অক্ষম হতো, এই সব নব্য কৃষ্টিবান মুসলমান সেই সেই তত্ত্বের এমন উদ্ভট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিল যে, ঐ তত্ত্ব কুরআন থেকেও খারিজ হলো না আবার কুরআনের প্রাথমিক মূলনীতি ও ভাবধারার সাথে মৌলিক মত পার্থক্য পোষণকারী আধুনিকতাবাদীদের চিন্তাধারার সাথেও তার পুরোপুরি মিল রচিত হলো। এই মিল ও সমন্বয় সৃষ্টি করতে গিয়ে কুরআনের যে সব উক্তিকে বিকৃত করা হলো, ইবলিশ শয়তান ও জ্বিন সংক্রান্ত

উক্তিগুলো তার অন্যতম। বলা হলো যে, এসব শব্দ দ্বারা এমন কোন সৃষ্টিকে বুঝায় না, যার মানুষ থেকে আলাদা কোন অতিপ্রাকৃতিক সত্তা আছে। বরং এ শব্দ দ্বরা কোথাও মানুষের নিজস্ব পাশবিক বৃত্তিগুলোকে বুঝানো হয়েছে। যাকে শয়তান নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোথাও এর অর্থ, অসভ্য, জংলী ও পাহাড়ী ভৌতিক শক্তিসমূহ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এ দ্বারা লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শুনতো এমন লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ সব বিশ্লেষণ এত ফালতু যে, যাদের আরবী ভাষা ও কুরআন সম্পর্কে কানাকড়িও জ্ঞান নেই অথবা যাদের আল্লাহ ও আখিরাতের ভয়ের চাইতে মানুষের ভয় বেশী, কেবল তারাই এ ধরনের বিশ্লেষণে লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর যে অবস্থা মুসলমানদের অতিক্রম করতে হয়েছে তাতে এ দুটো ব্যাপারই একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে শুধু এটাই নয়, এর চেয়েও ফালতু ব্যাখ্যা কুরআনে করা হয়েছে। আর নিয়তির পরিহাস এই যে, এ কাজটা আরবী ভাষা ও কুরআনের পান্ডিত্য এবং ইসলাম রক্ষার গালভরা দাবী নিয়েই করা হয়েছে।

মানব জাতির ওপর দিয়ে যেমন নানা ধরনের যুগ অতিবাহিত হয়েছে, তেমনি এ যুগটাও বাসি হয়ে গেছে। এখন খোদ ইউরোপেই আধ্যাত্মিকতা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগতের বাইরের ইন্দ্রিয়াতীত এক গোপন বিশ্বের অস্তিত্ব মানে–এমন এক বিরাট গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। এ জন্য এখন জ্বিন ও শয়তানের অস্তিত্ব স্বীকার করাতে আগেকার মত ঝুঁকি নেই। তথাপি সে যুগটার প্রভাব এখনও পুরোমাত্রায় উৎখাত হয়নি। অতিপ্রাকৃতিক হওয়ার সাথে অলৌকিকত্ব এমন কোন ব্যাপার মেনে নিতে অনেকের মনমগজ এখনো প্রস্তুত নয়। আলোচ্য বইখানাতে সেই ফেলে আসা যুগের কিছু কিছু প্রভাব আমাদের নজরে পড়েছে। মওলানা সাহেব কুরআনের অকাট্য উক্তি সমূহের প্রেক্ষাপটে এটা স্বীকার না করে পারেননি যে, 'জ্বিন' শব্দটি দ্বারা মানুষ থেকে আলাদা আগুনের তৈরী এক জাতের প্রাণীকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু যেহেতু কুরআনে জায়গায় জায়গায় জ্বিনদের কিছু অলৌকিক কর্মকান্ডের উল্লেখ

রয়েছে এবং সেগুলোকে কুরআনে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, হুবুহু সেভাবে মেনে নেয়া বিজ্ঞান সম্মত ও যুক্তিসম্মত মনে হয় না, সেহেতু তিনি যেনতেন প্রকারে ব্যাখ্যা দিয়ে দু'প্রকার জ্বিনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন। একটি হলো, সেই বিশেষ ধরনের সৃষ্টি, যা আগুনের তৈরী এবং মানুষ থেকে জাতগতভাবেই আলাদা। দ্বিতীয়ত মানুষেরই একটা বিশেষ শ্রেণী। তবে সেটা কোন্ শ্রেণী এবং কোন কারণে তাদের জ্বিন নামকরণ করা হলো, তা তিনি নিজেও জানেন না। আর সে সম্পর্কে কারো উদ্ধৃতি দিয়েও কিছু বলতে পারেন না।

আমাদের বন্ধু ……… আল্লাহর অনুগ্রহে এই সব প্রভাব থেকে মুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক জায়গায় জ্বিনের মানুষ হওয়ার ধারণা তাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মাওলানা সাহেব যে সবলেছেন, "কুরআনে যেখানে যেখানে জ্বিন ও মানুষের এক সাথে উল্লেখ রয়েছে, সেখানে জ্বিন শব্দের অর্থ আগুনের তেরী সৃষ্টি নয় বরং মানুষেরই একটা শ্রেনী" সে কথার সাথে তিনি একমত নন বটে। তবে বিশেষভাবে হযরত সোলায়মানের জ্বিনদের সম্পর্কে ইনিও এই ধারণাই পোষণ করেন যে, তারা মানুষই ছিল, আগুনের তৈরী আসল জ্বিন নয়। কেননা তাদেরকে দেখা যেত। তারা মানুষের মত ডুব দিতো এবং বিভিন্ন রকমের তৈজসপত্র বানাতো।

দুটো মূলনীতিঃ

এই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে দুটো মূলনীতি মনে বদ্ধমূল করে নেয়া দরকারঃ

প্রথমটি এই যে, আল্লাহ যখন নিজের জ্ঞানের ভান্ডার থেকে এমন কোন জিনিস সম্পর্কে আমাদেরকে ওয়াকিফহাল করতে চান, যা আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতির আওতা বহির্ভূত, তখন অনিবার্যভাবে তিনি সেই জিনিসকে আমাদের ভাষার এমন কোন শব্দ দ্বারাই প্রকাশ করেন, যে শব্দ দ্বারা আমরা ঐ জিনিসের নিকটতম সাদৃশ্যপূর্ণ কোন জিনিসের নামকরণ করেছিলাম। কারণ

এভাবেই আমরা ঐ জিনিসটা সম্পর্কে মোটামুটি একটা সঠিক ধারণা পোষণ করতে পারি, যা আল্লাহর জানা কিন্তু আমাদের অজানা। কোন রকম সম্বন্ধ ও ভাবগত সম্পর্ক ছাড়াই আল্লাহ একটা নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা কোন জিনিসের নামকরণ করবেন এটা হতেই পারে না। কেননা সে ক্ষেত্রে অন্যান্য শব্দ বাদ দিয়ে এ বিশেষ শব্দটাকে অগ্র গণ্য মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। তা যদি হতো, তা হলে "জান্নাত" শব্দটা দ্বারা যে জিনিস বুঝানো হয়েছে, তার জন্য "জান্নাত" শব্দটা "জাহান্নাম" শব্দের তুলনায় অগ্রাধিকার পেত না। আর যে জিনিসের নামকরণ "নূর" (আলো) দিয়ে করা হয়েছে তার জন্য "নার" (আগুন) শব্দটার প্রয়োগও "নূর" শব্দের মতই বৈধ হতো।

দ্বিতীয়টি এই যে, মানবীয় ভাষার যে শব্দের একটা অর্থ অভিধান ও প্রচলিত বাগধারা অনুসারে সুবিদিত ও সুনির্দিষ্ট, সেই শব্দকে যখন আল্লাহ স্বীয় কিতাবে ব্যবহার করেন, তখন আবশ্যিকভাবে আল্লাহর কিতাবেও ঐ শব্দের সেই সুপরিচিত আভিধানিক ও প্রবাচনিক অর্থই গৃহীত হবে। অবশ্য যদি কোন সুস্পষ্ট সূচক বা প্রতিক দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ এই বিশেষ শব্দটাকে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অথবা স্থায়ীভাবে সর্বত্র সাধারণ অর্থ থেকে পৃথক একটা বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেছেন, তাহলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। এ ধরনের কোন প্রতিক বা সূচক যখন থাকে না, তখন অভিধানও বাগধারার তোয়াক্কা না করে আল্লাহর কিতাবের কোন শব্দের মনগড়া একটা অর্থ গ্রহণ করা কোন ক্রমেই বৈধ হতে পারে না। এ রকম যথেচ্ছ অর্থ গ্রহণের দ্বার একবার খুলে দিলে অতঃপর তা তফসীর ও ব্যাখ্যার সীমা ডিঙ্গিয়ে বিকৃতি ও রদবদলের পর্যায়ে গিয়ে পৌছবে। এরপর মনগড়া ও আনুমানিক তফসীরের পাগলা ঘোড়া আর কোথাও গিয়ে থামতে চাইবে না।

"জ্বিন" শব্দের আভিধানিক অর্থ

পয়লা মূলনীতি অনুসারে আমাদের অনুসন্ধান চালাতে হবে যে, আরবী ভাষায় 'জ্বিন' শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে এবং কোন অর্থ বুঝানোর জন্য আরবরা এ শব্দের উদ্ভব ও প্রচলন ঘটিয়েছিল।

'জ্বিন' শব্দের মূল ধাতুরূপ(جنن)এই তিনটি অক্ষরের সমবায়ে গঠিত। এ ধাতুরূপের কেন্দ্রীয় ধারণা হলো প্রচ্ছন্নতা বা গোপনীয়তা। এ ধাতুরূপ থেকে যত শব্দ নির্গত হয়ে থাকে তার সব কটিতে এ ধারণা বিদ্যমান। ইমাম রাগেব বলেনঃ "জ্বিন শব্দের মূল কথা হলো, কোন জিনিসকে ইন্দ্রিয়ানুভূতির আড়াল করা।" 'লিসানুল আরব' ও ইবনে দুরায়েদের 'জামহারা' তে বলা হয়েছে, "যে জিনিসই তোমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়, সেটাই তোমার জন্য 'জ্বিন' হয়ে যায়।" এ জন্যই আরবীতে 'জানান' বলা হয় প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তর ভাগকে যা চোখে দেখা যায় না। আত্মাকে 'জানান' বলা হয় এ জন্য যে, তা দেহের ভেতরে প্রচ্ছন্ন থাকে। হৃদয়কেও 'জানান' বলা হয়। কেননা তা বুকের খাঁচার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। বাড়ীর উঠানকে 'জানান' বলা হয় এ জন্য যে, তা চার দেয়ালে ঘেরা থাকে। বাগানকে 'জান্নাত' বলা হয় এ জন্য যে, গাছগাছালীর ঝোঁপের আড়ালে তার মাটি লুকিয়ে থাকে। বাগান যদি এরূপ মাটিকে ঢেকে না ফেলে তবে তাকে জান্নাত বলা হয় না। শিশু যতক্ষণ মায়ের পেটে থাকে, তাকে 'জানীন' বলা হয়। জরায়ুকেও জানীন বলা হয়। দাফনকৃত মৃতদেহকেও জানীন বলা হয়। এমন কি যে কোন গুপ্ত জিনিসকে জানীন বলা যাবে। গুপ্ত আক্রোশকেও বলা হয় "হিকদে জানীন"। কবরকে বলা হয় 'জানান'। কাফনের ওপরও এ শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। দাফনের একটা প্রতিশব্দ ইজনান। হাদীসে বলা হয়েছেঃ

وَلِيَ دَفْنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجْنَانَهُ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ

(আলী (রা) ও আব্বাস (রাঃ) রসূল (সঃ) এর দাফনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।) পর্দা ও ঢালকে "জান্নাহ" বলা হয়। কুরআনে বলা হয়েছেঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً

মুনাফিকরা তাদের শপথকে তাদের মুনাফেকী লুকিয়ে রাখার জন্য পর্দা হিসাবে গ্রহণ করেছে।" (সূরা কাফেরুনঃ২)

جَنَّهُ وَجَنَّ عَلَيْهِ অর্থাৎ তাকে ঢেকে ফেললো।

কুরআনে আছে, فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ

"যখন রাতের আঁধার তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।"

'ইজনান' অর্থ আচ্ছাদিত করা এবং 'ইসতিজনান' অর্থ আত্ম গোপন করা। রাতের ঘুট ঘুটে অন্ধকারকে 'জান্নুন', 'জানানুন' ও 'জুনুনুন' বলা হয়। কেননা তা সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে দেয়। কবি দুরাইদ ইবনুস সাম্মা বলেনঃ

وَلَوْ لَا جُنُوْنُ الَّيْلِ اَدْرَكَ رَكْضُنَا

"রাতের ঘুট ঘুটে অন্ধকার যদি আমাদের হাতগুলোকে আচ্ছন্ন করে না দিত"-

কবি নুজালী বলেনঃ

حَتّٰى يَجِيْئَ وَجَنَّ الَّيْلِ يُوْغِلُهُ

"অবশেষে সে যখন আসবে তামাসাচ্ছন্ন রাতে"-

গুপ্ত রহস্য ও গোপনীয়তাকেও 'জুন' বলা হয়।

একটি প্রবচন রয়েছেঃ لَا جِنَّ بِهٰذَا الْاَمْرِ

অর্থাৎ এ ব্যাপারে কোন গোপনীয়তা নেই جِنُّ النَّاسِ اَوْ جَنَانُ النَّاسِ মানুষের সেই বিপুল সমাবেশকে বলা হয় যেখানে কেউ হারিয়ে গেলে সে কোথায় আছে তার আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, আরবী ভাষায় যে ধরনের সৃষ্টিরই 'জ্বিন' নামকরণ করা হবে তা সর্বাবস্থায়ই ধরা ছোয়ার অতীত অথবা কমের পক্ষে অদৃশ্য হবেই। যে সৃষ্টির মধ্যে এই গোপনীয়তার বৈশিষ্ট্য থাকবে না, তাকে এই নামে আখ্যায়িত করা

যাবে না। জ্বিনদের নামকরণের কারণ হিসেবে সকল বড় বড় অভিধানবিদ সর্ব সম্মতভাবে এ কথাই লিখেছেন। ইবনে দুরাইদ প্রণিত জামহারা, ইমাম রাগেবের মুফরাদাত, সিহাহ, কামুস, লিসানুল আরব, তাজুল আরুস এক কথায় আরবীর যে কোন প্রামাণ্য অভিধানগ্রন্থ খুলে দেখুন, সবটাতে এ কথাই লেখা রয়েছে যে, জ্বিন এর এরূপ নামকরণের কারণ এই যে, তারা দৃষ্টির অন্তরালে থাকে।

ব্যবহারিক আরবী ভাষায় জ্বিন শব্দের প্রয়োগ

অভিধানের পর আরবদের প্রচলিত বাগধারার প্রতি দৃষ্টি দিলে জানা যায় যে, কুরআন আপনা থেকেই একটা অভিনব পরিভাষা হিসাবে এটা প্রবর্তন করেনি। 'জ্বিন' নামক একটা অতিপ্রাকৃতিক সৃষ্টির অস্তিত্বের কথা আরবদের মধ্যে আগে থেকেই আলোচিত হয়ে আসছিল। এই সৃষ্টি জন্মগতভাবেই অদৃশ্য ও ধরা ছোঁয়ার অতীত বলে তারা বিশ্বাস করতো। তবে সময় সময় তাদেরকে বিভিন্ন রূপে দেখা যেত। তারা এও বিশ্বাস করতো যে, জ্বিনরা অস্বাভাবিক কার্যকলাপ করতে সক্ষম এবং প্রাকৃতিক জগত ও প্রাণীদেহের ওপর তারা নানাবিধ উপায়ে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাদের ধারণা এই ছিল যে, এ সৃষ্টি বিশেষ বিশেষ স্থানে আপন দখল ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং এ ধরনের স্থানগুলোকে তারা ارض مجنة বা 'ভূতুড়ে জায়গা' বলে আখ্যায়িত করতো। জনশূন্য প্রান্তর ও নিবীড় বনানী সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিল যে, ওগুলো কোন না কোন জ্বিনের দখলে থাকে। এ জন্য যখন তারা কোন মরু প্রান্তরে রাত্রি যাপন করতো তখন বলতোঃ

نَعُوذُ بِعَزِيزِ هٰذَا الْوَادِيْ مِنَ الْجِنِّ اللَّيْلَةَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ

"অর্থাৎ আমরা এই প্রান্তরের জ্বিন প্রভুর আশ্রয় চাই এবং প্রার্থনা করি যে, আজ রাতে তিনি যেন আমাদেরকে এখানে নিরাপদে থাকতে দেন।"

নির্জন বাড়ীগুলো সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিল, এ গুলোতে জ্বিন চড়াও হয়ে থাকে। এ জন্য যে ব্যক্তি কোন নির্জন বাড়ীতে রাত কাটাতো তার সম্পর্কে বলা হতো যে, সে রাত্রে জ্বিনদের মেহমান ছিল। কবি আখতাল বলেনঃ

وَبِتْنَا كَأَنَّا ضَيْفُ جِنٍّ بِلَيْلَةٍ

"আমরা যেন জ্বিনদের মেহমান হয়ে রাত যাপন করলাম।"

প্রাগৈসলামিক যুগের আরবরা কোন নতুন বাড়ী তৈরী করলে প্রথমে জ্বিনদের নামে কুরবানী করতো, যাতে তারা বাড়ীর অধিবাসীদের কষ্ট না দেয়। এ দিকে ইংগীত করেই এক হাদীসে বলা হয়েছে যে-

أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ

অর্থাৎ রসূল (সঃ) জ্বিনদের নামে কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন।

কোন মানুষ পাগল হয়ে গেলে আরবরা মনে করতো যে, তাকে জ্বিনে ধরেছে। এ জন্য তারা তাকে 'মাজনুন' বলতো। পবিত্র কুরআনেও তাদের এ ধারণার উল্লেখ করা হয়েছে যে-

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ (سبا: ٨)

অর্থাৎ মোশরিকরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলতো যে, এ মানুষটি হয় আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, নতুবা তার কাছে জ্বিন আসে।

গাভী যখন পানি খেতে চাইত না তখন বলদকে পিটানো হতো। কেননা প্রচলিত ধারণা ছিল এই যে, বলদের মাথার ওপর জ্বিন চড়াও হয় তাই সে গাভীকে পানি খেতে দেয় না।

তাদের ধারণা ছিল এই যে, প্রত্যেক মানুষের সাথেই একটা জ্বিন থাকে। এ জন্য জ্বিনকে তারা 'তাবে' তথা সহজাত বলতো। যে কোন অস্বাভাবিক জিনিসকে জ্বিনের অবদান বলে আখ্যায়িত করা হতো। এ জন্য একজন কর্মঠ ব্যক্তি সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল

যে, তার ওপর জ্বিন প্রভাব বিস্তার করে। এ জন্য তাকে 'জিন্নী' অর্থাৎ জ্বিন প্রভাবিত বলা হতো (লোকটিকে জ্বিন বলা হতো না) প্রত্যেক কবির একটা নির্দিষ্ট জ্বিন থাকতো এবং সেই জ্বিনই তাকে দিয়ে কবিতা রচনা করাতো। কারো ক্ষমতা খর্ব হয়ে গেলে বলা হতো نَفَرَتْ جِنُّهُ অর্থাৎ যে জ্বিনের বলে বলিয়ান হয়ে সে এ যাবত কাজ করছিল, সে পালিয়ে গেছে। অসাধারণ রূপবতী কোন মহিলাকে তারা রূপক অর্থে 'জিন্নিয়া' অর্থাৎ পরী বলতো। কেননা তারা মনে করতো, জ্বিন নারীরা মানুষের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী হয়ে থাকে।

জ্বিনদের এইসব অতিমানবিক গুণ ও ক্ষমতার কারণে আরবরা তাদেরকে আল্লাহর আত্মীয়স্বজন মনে করতো। কুরআনে বলা হয়েছে- وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا (الصافات: ١٥٨) "তারা আল্লাহ ও জ্বিনদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন বিদ্যমান বলে ধরে নিয়েছে" (সূরা সাফ্‌ফাতঃ ১৫৮)। আর এ কারণেই তারা জ্বিনদেরকে আল্লাহর ইবাদতে শরীক করতো।

بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (سبا: ٤١)

"বরঞ্চ তারা জ্বিনদের ইবাদত করতো এবং তাদের অধিকাংশ জ্বিনদের ভক্ত ছিল" (সূরা সাবাঃ৪১)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ
وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ (الانعام: ١٠١)

"তারা আল্লাহর সাথে জ্বিনদেরকে শরীক ঠাউরে নিয়েছে। অথচ আল্লাহই তাদের সৃষ্টিকর্তা। আর কোন জ্ঞান ছাড়াই তারা আল্লাহর জন্য কিছু ছেলেমেয়ে অনুমান করে নিয়েছে" (সূরা আনয়ামঃ১০১)। তাছাড়া তারা বিপদ আপদ ও ভয়ভীতির সময় জ্বিনদের আশ্রয় প্রার্থনা করতো।

كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ[১] (الجن: ٦)

---

১. অর্থাৎ জ্বিনদের মধ্য থেকে কতক লোকের কাছে কিছু কিছু মানুষ

জাহেলী যুগের আরবরা ফেরেশতাদেরকে জ্বিন বলতো। কবি আ'শা বলেনঃ

وَسَخَّرَ مِنْ جِنِّ الْمَلَائِكِ تِسْعَةً
قِيَامًا لَدَيْهِ يَعْمَلُونَ بِلَا أَجْرِ

"তিনি জ্বিন জাতীয় ফেরেশতাদের মধ্য থেকে নয়জনকে আপন অনুগত করে নিয়েছেন। এরা তার সামনে দন্ডায়মান থাকে এবং বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে।"

প্রাগৈসলামিক যুগের আরবরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর মেয়ে মনে করতো। কুরআনের একাধিক জায়গায় এ বিষয়ে ইংগিত করা হয়েছে। যথাঃ

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا (الزخرف: ١٩)

"ওরা ফেরেশতাদেরকে—যারা হচ্ছে আল্লাহর বান্দা—মেয়ে (অথবা দেবী) সাব্যস্ত করে নিয়েছে" (সূরা জুখরুফ—১৯) এবং

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا (بني إسرائيل: ٤٠)

"তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে পুত্র সন্তান দিয়ে ধন্য করেছেন আর নিজের জন্য ফেরেশতাদের মধ্য থেকে মেয়ে বাছাই করে রেখেছেন?" (সূরা বনী ইসরাইল ৪০)।

এসব অখন্ডনীয় দৃষ্টান্তের মোকাবিলায় এমন একটি দৃষ্টান্ত আরবদের বর্ণনা থেকে পেশ করা যাবেনা, যা দ্বারা বুঝা যায় যে,

---

আশ্রয় প্রার্থনা করতো। উল্লেখ্য যে, এ আয়াতে একই জায়গায় জ্বিন ও ইন্‌স্‌ (মানুষ) এর উল্লেখ রয়েছে। আর জ্বিন যে কোন ক্রমেই মানুষের জাতিভুক্ত হতে পারে না, সেটা সুস্পষ্ট। সুতরাং মাওলানা সাহেব যে বলেছেন যে, "কুরআনে যেখানে যেখানে জ্বিন ও ইন্‌স্‌ শব্দ দুটি একত্রে উল্লিখিত হয়েছে, সেখানে জ্বিন অর্থ আগুনের তৈরী জ্বিন নয়, বরং মানুষেরই একটা শ্রেণী"—এটা এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে খন্ডন করা হয়েছে।

আরবরা কখনো 'জ্বিন' শব্দটি প্রকৃত অর্থে মানুষের ওপরও প্রয়োগ করতো। বরঞ্চ যাবতীয় দৃষ্টান্ত থেকে এ কথাই প্রমানিত হয় যে, জ্বিন ও মানুষকে সম্পূর্ণ পৃথক দুটো জাতি মনে করতো। উদাহরণ স্বরূপ কবি বদর বিন আমের বলেনঃ

وَلَقَدْ نَطَقْتُ قَوَافِيًا إِنْسِيَّةً   وَلَقَدْ نَطَقْتُ قَوَافِيَ التَّجْنِيْنِ

"আমি মানুষ সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়েও আলোচনা করেছি। আর জ্বিন সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়েও আলোচনা করেছি।"

কবি ইমরান বিন হাত্তান আল হারারী বলেনঃ

قَدْ كُنْتُ عِنْدَكَ حَوْلًا لَا تَرُوْعُنِيْ   فِيْهِ رَوَائِعُ مِنْ إِنْسٍ وَلَا جَانِ

"আমি তোমার কাছে এক বছর থেকেছি। এই সময়ে মানুষ অথবা জ্বিন সম্পর্কে কোন বিস্ময়কর তথ্যই আমাকে বিস্ময়াপন্ন করতে পারেনি।"

এরপর নেতৃস্থানীয় আরবী ভাষাবিদদের সর্বসম্মত অভিমত লক্ষ্য করুন। জওহারী তার সিহাহ নামক অভিধান গ্রন্থে বলেনঃ

اَلْجِنُّ خِلَافُ الْإِنْسِ سُمِّيَتْ بِذَالِكَ لِأَنَّهَا تَخْفٰى وَلَا تُرٰى ـ

"জ্বিন" হলো ইন্‌সের বিপরীতার্থবোধক। জ্বিনের এ নামকরনের কারণ এই যে, তারা গুপ্ত থাকে, তাদেরকে চোখে দেখা যায় না।"

ইবনে সাইয়েদা বলেনঃ

اَلْجِنُّ نَوْعٌ مِّنَ الْعَالَمِ سُمُّوْا بِذَالِكَ لِاجْتِنَانِهِمْ عَنِ الْأَبْصَارِ وَلِأَنَّهُمْ اسْتَجَنُّوْا مِنَ النَّاسِ فَلَا يُرَوْنَ ـ

"জ্বিন এক ধরনের সৃষ্টি। চোখের অগোচরে থাকে এবং দেখা যায় না বলে তাদের এ নাম প্রচলিত হয়েছে।"

ইবনে দুরাইদ বলেনঃ

وَالْجِنُّ خِلَافُ الْإِنْسِ ـ "জ্বিন হলো ইন্‌সের বিপরীত"।

কতিপয় দিক নির্দেশক তথ্য

উপরোক্ত আলোচনা থেকে কয়েকটি তথ্য সুস্পষ্টরূপে জানা গেলঃ

প্রথমত, আরবী ভাষায় আভিধানিকভাবে 'জ্বিন' শব্দের অর্থ আমাদের ভাষায় 'প্রচ্ছন্ন' ও 'গোপনীয়'-এর অর্থ যা ঠিক তাই। সৃষ্টি জগতের কোনো সৃষ্টির নাম হিসেবে এ শব্দটি ব্যবহৃত হলে সে সৃষ্টিকে অবশ্যই স্বভাবত গুপ্ত ও দৃশ্যপট থেকে অন্তর্হিত হতে হবে। এমনকি তার প্রকাশ্য ও দৃশ্যমান হওয়াটাই অস্বাভাবিক ও অলৌকিক বিবেচিত হবে। মানুষ যেমন স্বভাবতই দৃশ্যমান ও প্রকাশ্য, তেমনটি হওয়া চলবে না। উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন, 'তরল' শব্দটা সব সময় এমন জিনিসের ওপরই প্রয়োগ করতে হয় যা স্বভাবতই প্রবাহমান। কখনো যদি তা জমাট অবস্থায় থাকে তবে তার জমাটবদ্ধতাকে অস্বাভাবিক গণ্য করতে হবে। যেমন পানি। কিন্তু স্বভাবতই জমাট, এমন কোনো জিনিসকে যদি তরল বলা হয় (যেমন পাথর) যার জমাট হওয়া নয় তরল হওয়াটাই অস্বভাবিক, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই বলবেন যে, লোকটি 'তরল' শব্দের অর্থ জানে না এবং শব্দটাকে সে তার উৎপত্তিগত অর্থের বিপরীত অর্থে ব্যবহার করছে। এমনিভাবে পবিত্র কুরআনে যদি 'জ্বিন' (গোপনীয় ও অদৃশ্য) শব্দটাকে স্বভাবতঃ 'অদৃশ্য ও গোপন, নয় বরং জন্মগত ও প্রকৃতিগতভাবেই দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত, (যেমন মানুষ) এমন কোনো সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতো, তাহলে নাউজুবিল্লাহ, এটাই প্রমাণিত হতো যে, এ গ্রন্থের প্রণেতা হয় পাগল, নচেত জ্বিন শব্দের অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ। নিশ্চিত বিশ্বাস রাখুন যে, সেটা যদি হতো, তাহলে দুনিয়ার সমস্ত অনারব জাতি সমূহ কুরআনের ওপর ঈমান আনলেও একজন আরবও ঈমান আনতো না। কেননা অস্বাভাবিক ও অলৌকিকভাবে কখনো জ্বিনের প্রকাশ্য ও দৃশ্যমান হয়ে পড়ার কথা সে মানতে পারে, কিন্তু দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়ানুভূত মানুষকে 'জ্বিন' নামে আখ্যায়িত করা হবে, এটা মেনে নেয়া তার পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। যখন আরবের কাফেররা

বলেছিল যে, কোনো একজন অনারব এসে মুহাম্মদ (সাঃ)কে কুরআন শিখায়, তখন এ বক্তব্যের স্বপক্ষে তারা কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি। আর যখন কুরআন এ অপবাদের জবাব দিল যে—

لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ (النحل:١٠٣)

"যে ব্যক্তিকে তারা শিক্ষক বলে অভিহিত করছে, সে তো অনারব ভাষাভাষী অথচ কুরআনের ভাষা হচ্ছে প্রাঞ্জল আরবী।"

তখন এ জবাব শুনে সমগ্র আরববাসী হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন যদি আরববাসী কুরআনে মানুষের ওপর 'জ্বিন' শব্দের প্রয়োগের একটা দৃষ্টান্তও পেত, তা হলে তার মুখের ওপরই বলে দিত যে, এ কোথাকার প্রাঞ্জল আরবী ভাষা, যাতে মানুষকে 'জ্বিন' বলা হচ্ছে?

দ্বিতীয়ত, আরবে আবহমানকাল থেকে 'জ্বিন' শব্দটি এমন একটি পরিভাষা হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও সর্বজনবিদিত ছিল, যা এক অতিপ্রাকৃতিক ও অশরিরী জীবের অর্থবোধক ছিল। সেই জীবটি সচরাচর ইন্দ্রীয় দ্বারা অনুভূত হতো না, তবে কখনো কখনো ভূত প্রেতের আকারে দেখা দিত এবং আরবদের বিশ্বাস ছিল যে, ঐ জীবটি অস্বাভাবিক ও অতিপ্রাকৃতিক পন্থায় তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সুতরাং যখনই কুরআন সেই সর্বজনবিদিত শব্দটি ব্যবহার করলো, তখন অনিবার্যভাবেই তা শব্দটির চিরাচরিত ও উৎপত্তিগত অর্থেই গৃহীত হলো। কুরআন নিজেই বলেছে যে, সে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে তার প্রথম শ্রোতা আরবরা তা বুঝতে পারে।

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (يوسف:٢)

"নিশ্চয় আমি এ গ্রন্থ আরবীতে পড়ার যোগ্য গ্রন্থ করে নাজিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার" (সূরা ইউসুফঃ২)

কুরআনে যদি আরবের জানা-চেনা ও প্রচলিত শব্দ, পরিভাষা ও বচনভঙ্গী ব্যবহৃত হতো অথবা যদি আরবদের ভাষায় কোনো

শব্দকে তার সুবিদিত অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থে ব্যবহার করাও হতো, তাহলেও তা মূল আভিধানিক ও উৎপত্তিগত অর্থের বিপরীত হতো না এবং আরবদের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে ঐ বিশেষ অর্থটা বিশ্লেষণ করা হতো। কেবলমাত্র এরূপ অবস্থাতেই কুরআনের ঐ দাবী সত্যে পরিণত হতে পারতো। কিন্তু আপনি 'জ্বিন' শব্দের যে অর্থ ব্যক্ত করছেন, তা একে তো আরবদের প্রচলিত ভাষায় অজ্ঞাত ও অপরিচিত। অধিকন্তু কুরআনেও তা এমন কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, যা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কুরআন নাজিল হওয়ার সময় আরবরা সচরাচর এর যে অর্থ গ্রহণ করতো, এখানে তা সেই অর্থে গৃহীত হয়নি। এখন যদি আপনার বক্তব্য মেনে নেয়া হয়, তাহলে কুরআন নিজের সহজবোধ্য ভাষায় নাজিল হওয়া সম্পর্কে যে দাবী করেছে, সে দাবী বাতিল বলে গণ্য হয়।

তৃতীয়ত, কুরআনের একাধিক জায়গায় আরবদের একটা বাতিল আকীদার উল্লেখ করেছে। সেটা এই যে, তারা জ্বিন ও ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বে শরীক মানতো। তাদেরকে আল্লাহর জাতিগোষ্ঠী ও বংশধর ভাবতো। তাদের কাছে আশ্রয় চাইতো এবং তাদের পূজা করতো। এই আকীদাকে এই বলে খন্ডন করা হয়েছে যে, জ্বিনেরা আল্লাহর শরীকও নয়, তার সন্তানও নয়, বরং মানুষের মতই একটা সৃষ্টি। পার্থক্য শুধু এই যে, মানুষ মাটি থেকে এবং জ্বিন আগুন থেকে সৃজিত হয়েছে। তবে উভয়েই আল্লাহর একই রকমের আজ্ঞাবহ। উভয়ে আল্লাহর কাছে সমানভাবে দায়ী এবং নাফরমানীর বেলায় উভয়ের শাস্তি সমান। অতএব মানুষ কর্তৃক জ্বিনের পূজা করা একটা নিরেট মূর্খতা ও চরম অজ্ঞতার কাজ। উপরন্তু এটা মানুষের জন্য অবমাননাকর। কেননা মানুষ একটা উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন জাতি। জ্বিনদের প্রতিনিধি ছিল ইবলিস। তাকে আদমের সামনে সিজদা করতে বলা হয়েছিল। অগ্রাহ্য করাতে সে আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত ও ধিকৃত হলো। মানুষকে রসূল ও খলীফার মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে। আর জ্বিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাঁর আনুগত্য ও

অনুসরণ করতে। সূরা আহকাফের শেষ ও সূরা জ্বিনের প্রথম রুকুতে এ নির্দেশ বিধৃত। তাছাড়া মানুষের মধ্য থেকেই একজন মনোনীত ব্যক্তিই হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম এই দুর্লভ সম্মানে ভূষিত হন যে, জ্বিনদেরকে তার অনুগত করা হয়। কুরআনের এসব তথ্যে যে 'জ্বিন' শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে,তা দ্বারা যদি আরবরা যাকে আল্লাহর কর্তৃত্বে ও ইবাদাতে শরীক বানাতো' (সেই সৃষ্টিকে বুঝানো হয়) কেবলমাত্র তা হলেই আরবদের ভ্রান্ত আকিদা খন্ডন করার উদ্দেশ্যে বলা কুরআনের এ সমস্ত উক্তি অর্থবহ হতে পারে। নচেত 'জ্বিন' দ্বারা যদি মানুষই বুঝানো হতো তা হলে তা কোনোভাবেই আরবদের ভ্রান্ত আকিদা খন্ডন করতে পারতো না এবং 'জ্বিন' সম্পর্কে আরবরা যে ধ্যান-ধারণা পোষণ করতো তা যেমন ছিল তেমনই থেকে যেত।

চতুর্থত, জ্বিন শব্দের উল্লেখ দ্বারা কুরআনের কোনো এক বা একাধিক জায়গায় যদি মানুষ অথবা মানুষের কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে বুঝানোই কুরআনের অভিপ্রায় হতো, তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, সেটা 'জ্বিন' শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত করার কি প্রয়োজন ছিল। সেটা 'ইনসান, শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হলো না কেন! অনর্থক এমন শব্দ ব্যবহার করার কি দরকার ছিল, যা দ্বারা আগুনের সৃষ্ট জ্বিন এবং মাটির সৃষ্ট জ্বিনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে? এ ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে এটা একটা গুরুতর নীতিগত প্রশ্ন। আমাদের যুগের বেশীর ভাগ অভিনব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকারীরা কুরআনের শব্দসমূহের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে এ সব প্রশ্ন এড়িয়ে যান। তারা এ দিকটা নিয়ে কখনো চিন্তাভাবনা করেন না যে, যখন কোনো নির্দিষ্ট অর্থ ব্যক্ত করার জন্য সুবিদিত ও প্রচলিত শব্দ আরবী ভাষায় বিদ্যমান এবং খোদ কুরআনও ঐ অর্থ ব্যক্ত করার জন্য যথাস্থানে সেই শব্দটি ব্যবহার করেছে, তখন সে অন্য কোনো বিশেষ জায়গায় সেই অর্থ ব্যক্ত করার জন্য (যদি সেখানেই যথার্থই সেই একই অর্থ ব্যক্ত করা তার অভিপ্রায় হয়ে থাকে) অন্য কিছু শব্দ ব্যবহার করবে-এর কি কারণ থাকতে পারে? বিশেষত সেই নয়া শব্দ যখন ঐ ব্যক্তকারী হিসেবে সুবিদিত

ও প্রচলিত নয় এবং কখনো ছিলও না। উদাহরণ স্বরূপ প্রকৃত ব্যাপার যদি এই হয়ে থাকে যে, হযরত সোলায়মানকে (আঃ) মিসর অথবা অন্যান্য জায়গা থেকে সুদক্ষ ডুবুরী, তৈজসপত্র নির্মাতা, গৃহনির্মাণের মিস্ত্রি, পাথর খোদাই–এর শিল্পী ও কারিগর মানুষ সরবরাহ করা হয়েছিল, তা হলে এ কথা বলতে অসুবিধা কি ছিল যে, আমি সোলায়মানকে (আঃ) অমুক কাজে সুদক্ষ মানুষ যোগাড় করে দিয়েছিলাম? এ মনোভাবটা ব্যক্ত করার জন্য কি আল্লাহ তায়ালার শব্দের অভাব পড়ে গিয়েছিল যে, তাকে অনন্যোপায় হয়ে 'জ্বিন' ও 'শয়তান' ইত্যাকার শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছিল?[১] যেখানে মানুষের প্রসঙ্গে কিছু বলতে হয়েছে, সেখানে ইনসান বা বনী আদম শব্দ কি আল্লাহ ব্যবহার করেননি? আর যদি বিশেষ বিশেষ মানুষের মধ্যে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে যে, তা ব্যক্ত করতে 'জ্বিন' ও 'শয়তান' শব্দগুলোকে রূপক অর্থে ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তা হলেও এ কথাটা স্পষ্ট করে বলে দিতে কি বাধা ছিল যে, এ সব 'জ্বিন' মানুষ জাতীয় ছিল?

কুরআনে জ্বিনের অর্থ সম্পর্কে স্পষ্টোক্তি

উপরোক্ত তথ্যসমূহ হৃদয়ঙ্গম করার পর এখন দেখুন, কুরআন 'জ্বিন' শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহার করেছে। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করেন যে, কুরআনে "জ্বিন" ও "ইনসান"–এর স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এক জায়গায় নয় একাধিক জায়গায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে, জ্বিন আগুনের তৈরী এবং মানুষ মাটির তৈরী। জ্বিন শব্দটি ব্যবহার করার সাথে সাথে যখন তার এই অর্থও কুরআন নিজেই স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে তখন যেখানেই এই শব্দের উল্লেখ থাকবে, সেখানে এর উল্লিখিত অর্থই গ্রহণ করা উচিত যা ইতিপূর্বেই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত এটাই বিবেকের দাবী।[২] এর বিপরীত

---

১. সূরা সাবা ২য় রুকু এবং সূরা সোয়াদ ৩য় রুকু দেখুন।

২. এ কথা সত্য যে, কুরআনে দু'জায়গায় 'জ্বান' (জ্বিনের বহুবচন)

অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করতে হলে এই দ্বিতীয় অর্থের স্বপক্ষে কুরআনে অনুরূপ সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকা চাই অথবা যিনি এরূপ অর্থ গ্রহণ করবেন তার কাছে এমন অকাট্য প্রমাণাদি থাকা চাই, যার ভিত্তিতে কুরআনের স্পষ্টোক্তির বিপরীত অর্থ গ্রহণ করা বৈধ হতে পারে। যদি কুরাআনে এর সমর্থন থেকে থাকে, তবে অনুগ্রহ পূর্বক এরূপ একটি মাত্র আয়াতই উল্লেখ করুন, যাতে 'জ্বিন'কে মানুষ অর্থে ঠিক সেই রূপ স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে, যেরূপ স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে জ্বিনকে আগুনের তৈরী সৃষ্টি হিসাবে। যদি তেমন না থেকে থাকে তা হলে আমাদের অধিকার রয়েছে আপনার যুক্তি–প্রমাণ ততটা সবল কিনা যাচাই করে দেখার, যাতে কুরআনে জ্বিনের যে অর্থ স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে তা বাদ দিয়ে আপনার প্রস্তাবিত অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হতে পারে।

'জ্বিনের' অর্থ মানুষ হওয়ার পক্ষে প্রথম যুক্তি

মওলানা..... সাহেব যে কারণে এরূপ ধারণা পোষণ করেছেন যে, জ্বিন এক শ্রেণীর মানুষ, সে কারণটি তার নিজের ভাষায় এরূপঃ

"জ্বিন শব্দটি কুরআনে কেবল মক্কী সূরাগুলোতে এসেছে। মাদানী সূরাতে কোথাও এর উল্লেখ হয়নি। আর 'ইনস' শব্দটা কোথাও জ্বিন বা জ্বান ছাড়া ব্যবহৃত হয়নি। এ থেকে ধারণা হতে পারে যে জ্বিন ও ইনস শব্দ দুটো যেখানে যেখানে একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে জ্বিনের অর্থ আগুনের তৈরী প্রাণী নয়, বরং মানুষেরই একটা শ্রেণী।"

শব্দটি সাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথমত খোদ কুরআনেই অন্যত্র এই মর্মে ثعبان এবং حيّة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, ওখানে 'জ্বান' শব্দটি কোন্ অর্থে এসেছে। দ্বিতীয়ত, 'জ্বিন' শব্দটি সাপ অর্থে আরবীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই অবস্থা ভেদে কোথাও 'জ্বান' অর্থে সাপ বুঝানো হয়ে থাকলে তা যে কোনো আরবী জানা লোক নিজেই বুঝে নিতে পারে।

আমি জিজ্ঞাসা করি যে, এটা কি কোনো যুক্তি হলো? কোনো সূরার মক্কী বা মাদানী হওয়ায় এবং জ্বিনের সাথে ইনস্ শব্দ ব্যবহৃত হওয়া না হওয়াতে জ্বিনের অর্থের কি আসে যায়? যে আয়াতগুলোতে জ্বিন ও ইনস্ শব্দদ্বয় এক সাথে ব্যবহৃত হয়েছে, সে আয়াতগুলোর সবকটি আপনি পড়ে দেখুন তো! কোথাও আপনি এমন কোনো আভাস-ইংগীত পাবেন না, যার দ্বারা উল্লিখিত ইনস্ শব্দটির আ'ম (সাধারণ) এবং জ্বিন শব্দটির খাস্ (বিশেষ) হওয়া প্রমাণিত হয়। যেখানেই জ্বিন ও ইনস্ শব্দ দুটো معطوف ও معطوف عليه (সংযোজক ও সংযোজিত পদ) এর আকারে উল্লিখিত হয়েছে, সেখানে ঐ عطف (সংযোজন) এর কাজটি عطف الخاص على العام (বিশেষ পদের ওপর সাধারণ পদের সংযোজন) প্রক্রিয়ার যেমন সম্পন্ন হয়নি। তেমনি তা عطف العام على الخاص (সাধারণ পদের ওপর বিশেষ পদের সংযোজন) প্রক্রিয়াতেও সম্পন্ন হয়নি। আবার তা عطف الشئ على مرادفه (সমার্থক পদদ্বয়ের সংযোজন) প্রক্রিয়াতেও সমপন্ন হয়নি। এই তিন ধরনের عطف এর কোন্‌টি সম্পন্ন হয়েছে, তা নিরূপণ করার জন্য শ্রোতাকে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে معطوف ও معطوف عليه এর মধ্য থেকে একটি عام এবং অপরটি خاص অথবা দুটোই সমার্থক। উদাহরণ স্বরূপ,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ

হে আমার প্রভু! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, আমার ঘরে যারা মুমিন হয়ে প্রবেশ করবে তাদেরকে এবং সকল মুমিন নারী ও পুরুষকে ক্ষমা কর" (সূরা নূহ, ২৮)

শ্রোতা নিজেই বুঝতে পারে যে, এ আয়াতে যে عطف হয়েছে তা عطف العام على الخاص ধরনের। অথবা

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ (الاحزاب)

"যখন আমি সকল নবীর কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার ও নূহের কাছ থেকেও অঙ্গীকার নিয়েছিলাম" (সূরা আহযাব, ৭)।

এ আয়াতে যে عطف হয়েছে তা যে عطف الخاص على العام ধরনের তা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়। অথবা قال قولا كذبا و مينا "সে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বললো।" এ বাক্যটিতে যে عطف হয়েছে, তা عطف الشئ على مرادفه (সমার্থক শব্দদ্বয়ে عطف)। مين ও كذب শব্দ দুটোর অর্থ জানা থাকলে যে কেউ عطف এর এ ধারণাটি বুঝতে পারে। সুতরাং 'জ্বিন' ও ইনস্ শব্দ দুটোতে যখন এই তিন ধরনের عطف এর কোনটাই নেই, তখন স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এই দুটোর মধ্যে যে واو عطف রয়েছে তা, সাধারণ সংযোজনই বুঝায়। কেননা অভিধান (لغت) পরিভাষা (عرف) কিংবা কোন যুক্তি নির্ভর প্রাসংগিকতা (قرينة عقلى) থেকে বুঝা যায়না যে, এই দুটো শব্দের মধ্যে বিশেষ-নির্বেশেষে (عموم وخصوص) অথবা সমার্থকতার (ترادف) সম্পর্ক রয়েছে। কুরআনের বিশেষ পরিভাষায় এ দুটোর মধ্যে যদি বিশেষ-নির্বেশেষে সম্পর্ক থাকত ব্যাপারটা খুলাখুলি ব্যক্ত না করেই সে যদি নিছক واو عطف (সংযোজন অব্যয়) ব্যবহার করেই ক্ষান্ত থাকত তা হলে এটা তার ভাষাগত ত্রুটিরূপে চিহ্নিত হত। এ উদ্দেশ্যে তার অজ্ঞতা الإنس والجن منهم "মানুষ এবং মানুষেরই বংশোদ্ভূত জ্বিন" এ কথাটি বলাই উচিত ছিল, যাতে শ্রোতারা বুঝতে পারে যে, এখানে 'জ্বিন' নামে যে গোষ্ঠীটাকে বুঝানো হচ্ছে, তা অভিধান ও পরিভাষার বিপরীত মানুষেরই একটা শ্রেণী।

তবে আমাদের এই عطف معطوف (সংযোজন তত্ত্বের) বিতর্কে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। লেখকের দাবী এইযে, কুরআনে যত জায়গায় 'জ্বিন' ও 'ইনস' শব্দ দুটোর একত্র সমাবেশ ঘটেছে, সর্বত্রই 'জ্বিন' শব্দ দ্বারা যুক্তি নির্ভর প্রাসঙ্গিকতা (আরবী....) থেকে বুঝা যায় না যে,এই দুটো শব্দের মধ্যে মানুষেরই একটা শ্রেণী বা গোষ্ঠিকে বুঝানো হয়েছে। এবার যে আয়াতগুলোতে এই দুটো শব্দ একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো পড়তে থাকুন। এ সব আয়াতের মধ্যেই যদি আপনি এমন একাধিক আয়াতের সন্ধান পান, যাতে এই দুটো গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ আলাদা

জাতি হিসেবে পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে, তা হলে লেখকের দাবী আপনা-আপনি বাতিল হয়ে যাবে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ط
وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ - (الحجر: ٢٦،٢٧)

''আমি মানুষকে কালো পচা-কাদা থেকে সৃষ্টি করেছি। আর এর আগে জ্বিনদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম লু'র উত্তাপ থেকে'' (সূরা আল হিজর-২৬, ২৭)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ
مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ - (الرحمن: ١٤،١٥)

" তিনি মানুষকে মেটে পাত্রের ন্যায় শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে সৃজন করেছেন, আর জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা থেকে " (সূরা রহমান ১৪-১৫)

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ - (الرحمن: ٣٩)

"সেদিন কোন মানুষকেও তার গুনাহর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না, আর কোন জ্বিনকেও নয়।" (সূরা রহমান-৩৯)।

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (الرحمن: ٥٦)

"তাদের আগে বেহেশতের সেই হুরদেরকে কোন মানুষও স্পর্শ করেনি, কোন জ্বিনও নয়" (সূরা রহমান, ৫৬)।

كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ - (الجن: ٦)

"মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ জ্বিনদের মধ্য থেকে কারো কারো আশ্রয় প্রার্থনা করতো।" (সূরা জ্বিন, ৬)।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلٰئِكَةِ أَهٰؤُلَاءِ
إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ - قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا
مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ
بِهِمْ مُّؤْمِنُونَ ط (سورة سبا: ٤٠،٤١)

"যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে একত্রিত করবেন, অতঃপর ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, এরা কি তোমাদেরই পূজা করতো? তারা বলবে, আপনি পবিত্র। আমাদের মনিব ওরা নয় আপনি। আসলে এরা আমাদের নয়, জ্বিনদের পূজা করতো এবং তাদের অধিকাংশ প্রকৃতপক্ষে জ্বিনদের প্রতিই বিশ্বাস ছিল।" (সূরা সাবা ৪০-৪১)

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا - (صفت : ١٥٨)

"তারা আল্লাহ্ ও জ্বিনদের মধ্যে সম্পর্ক পাতিয়ে রেখেছিল।"

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا - (انعام : ١٢٩)

"আর যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে সমবেত করবেন এবং বলবেনঃ ওহে জ্বিন জাতি তোমরা তো মানুষের মধ্য থেকে অনেককে পদানত করলে। আর মানুষের মধ্য থেকে যারা তাদের বন্ধু ছিল তারা বলবে; হে আমাদের মনিব! আমরা পরস্পরের দ্বারা বেশ উপকৃত হয়েছিলাম। অবশেষে তুমি আমাদের জন্য চূড়ান্ত মুহূর্ত নির্ধারণ করেছিলে, সেই মুহূর্তটা ঘনিয়ে এল।" (সূরা আনয়াম, ১২৯)।

এ সমস্ত আয়াত থেকে কি প্রমানিত হচ্ছে? জ্বিন ও মানুষ দুটো ভিন্ন ভিন্ন ও বিপরীত বংশোদ্ভূত হওয়ার, না উভয়ের একই বংশোদ্ভূত হওয়ার কথা প্রমাণিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় যুক্তি

দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, ইবলিস ও তার বংশধর যারা কুরআনের বর্ণনা অনুসারে 'জ্বিন' বংশোদ্ভূত-তাদেরকে আল্লাহ্ অদৃশ্য বলে উল্লেখ করেছেন।

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ (الاعراف-٢٧)

"শয়তান ও তার বংশধর তোমাদেরকে দেখতে পায় অথচ তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না।" (আরাফ-২৭)।

কিন্তু হযরত সোলায়মানের (আঃ) কাছে যে জ্বিনেরা ছিল, তারা দৃশ্যমান ছিল এবং মানুষের মতই কাজ করতো, কাজেই হযরত সোলায়মানের (আঃ) জ্বিনের আগুনের সৃষ্টি জ্বিন নয়, বরং মানুষ।

এ যুক্তির জবাবে সহজেই এ কথা বলা যায় যে, হযরত সোলায়মানের (আঃ) জ্বিনদের সম্পর্কে কুরআনের কোথাও বলা হয়নি যে, তাদেরকে দেখা যেত, মানুষের বেশে ছিল এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) ছাড়া অন্যরা তাদেরকে দেখতে পেত। সুতরাং কুরআনের যে আয়াত আপনি নিজের যুক্তির সমর্থনে পেশ করছেন,তা হযরত সোলায়মানের জ্বিনদের বর্ণনা সম্বলিত আয়াতগুলোর বিরোধী নয়। আপনার এ ধারণা কুরআনে কোথায় এ কথা বলা হয়েছে যে, তারা মানুষের মত ডুবুরির কাজ করতো, মানুষের মত তৈজসপত্র বা দালান তৈরী করতো, কিংবা মানুষের মত তাদেরকে বেঁধে রাখা হতো? সেখানে তো কেবল সাধারনভাবে ডুবুরীর কাজ, দালান ও তৈজসপত্র তৈরীর কাজের উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বলে তারা মানুষের মতই ডুবুরী ইত্যাদির কাজ করতো,তা তো বুঝা যায় না। অবশ্য এটা যদি প্রমাণ করে দেয়া হয় যে, মানুষ যেভাবে ডুবুরির কাজ করে সেভাবে ছাড়া ডুবুরির কাজ করাই সম্ভব নয় এবং মানুষ যে পদ্ধতিতে তৈজসপত্র ইত্যাদি নির্মাণ করে থাকে, কেবলমাত্র সেই পদ্ধতিতেই তা করা সম্ভব, তাহলে অবশ্য মেনে নেয়া যায় যে,তারা মানুষের মতই ডুবুরিগিরি ও অন্যান্য কাজ করতো। মানুষের কাজ অন্য কেউ করলেই তাকে মানুষ বলা যদি সঠিক হতো, তাহলে, নাউজুবিল্লাহ, আল্লাহকেও কেউ মানুষ বলে বসতে পারে। কেননা মানুষের করণীয় অনেক কাজ-যথা কথা বলা, দেখা, শুনা প্রভৃতি আল্লাহ করে থাকেন বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, এ দিকটা অগ্রাহ্য করে যদি এ কথা মেনেও নেয়া হয় যে,তাদেরকে মানুষের মত দেখা যেত এবং কুরআনে তাদের যে সব কাজের উল্লেখ রয়েছে তা তারা মানুষের অনুসৃত পদ্ধতিতেই করতো,তথাপি যে আয়াতের উদ্ধৃতি আপনি দিয়েছেন,তা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে,তারা অদৃশ্য ছিল না। কেননা কোন সৃষ্টি অদৃশ্য হলেই তা মোটেই দেখা যাবে না এবং অলৌকিক ঘটনা হিসাবেও কখনো দৃশ্যমান হবে না, এ কথা বলা যায় না। কুরআনে জ্বিন বংশোদ্ভুত শয়তানের অদৃশ্য হওয়ার কথা তো মাত্র এক জায়গাতেই বলা হয়েছে। কিন্তু ফেরেশতাদের এ বৈশিষ্ট্যের কথা একাধিক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ

إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ - (انفال: ٤٨)

অর্থাৎ শয়তান তার বন্ধুদেরকে বললো যে, আমি ফেরেশতাদের সেই বিশাল বাহিনী দেখতে পাচ্ছি, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। (আনফাল–৪৮)

فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا - (التوبہ: ٤٠)

"অতপর আল্লাহ তার ওপর (রসূল সাঃ–এর ওপর) স্বীয় প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাঁকে এমন সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করলেন, যাকে তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে না।" (তওবা–৪০)

وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا - (التوبہ: ٢٦)

"আল্লাহ সেই বাহিনী নাজিল করলেন যা তোমরা দেখনি।" (তওবা–২৬)।

إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا - (احزاب: ٩)

"যখন তোমাদের ওপর বাহিনীগুলো হামলা চালালো, তখন আমি তাদের ওপর বার্তা পাঠালাম এবং এমন বাহিনী পাঠালাম যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি।" (আহযাব–৯)।

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَٰئِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ - (سورة فرقان: ٢٢)

"যে দিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে সেদিন অপরাধীদের কল্যাণ থাকবে না।" (ফুরকান -২২)

এতদসত্তেও কুরআনেই একাধিক জায়গায় বলা হয়েছে যে, ফেরেশতারা মানুষের বেশে এসেছেন এবং শুধু নবীগণ নয় সাধারণ মানুষও তাদেরকেও দেখেছে এবং তাদের কথাও শুনেছে । প্রশ্ন এই যে, এত সব ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ দেখে আপনি ফেরেশতাদের সম্পর্কেও কেন বললেন না যে, ওরাও মানুষেরই একটি শ্রেণী? অদৃশ্য হওয়ার দিক দিয়েতো দুটোই সমান। মানুষের বেশে দৃশ্যমান হওয়ার ঘটনা ফেরেশতাদের বেলায় অনেক এবং জ্বিনদের বেলায় শুধু একটি। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এতদসত্ত্বেও আপনি ফেরেশতাদের ব্যাপারে এ কথা স্বীকার করেন যে,আল্লাহর নির্দেশে মোযেজা ও অলৌকিক ঘটনা হিসেবে বারংবার তারা মানুষের রূপ ধারণ করেছেন। অথচ জ্বিনদের ব্যাপারে এ ধরনের একটা ঘটনা শুনে আপনার খেয়াল হলো না যে, হযরত সোলায়মানের নজিরবিহীন দোয়া কবুল করে আল্লাহ যেমন অলৌকিকভাবে বাতাস ও পাখীদেরকে তার অনুগত করে দিয়েছিলেন এবং তাকে জীবজন্তুর ভাষা শিখিয়ে ছিলেন, তেমনি অলৌকিকভাবে তিনি জ্বিনদেরকেও দৃশ্যমান ও ধরা ছোঁয়ার আওতাধীন করে দিয়ে থাকতে পারেন। আপনি বরঞ্চ ঠিক এর বিপরীতপথে ধাবিত হলেন। কুরআনের সমস্ত অকাট্য বর্ণনা এবং আরবী অভিধান ও পরিভাষার বিপরীত আপনি এরূপ ব্যাখ্যা করা পছন্দ করলেন যে, শুধুমাত্র এই বিশেষ জায়গাটিতে 'জ্বিন' শব্দ দ্বারা মানুষকে বুঝানো হয়েছে। আর মওলানা..... সাহেব তো আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। এই একটি মাত্র দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে তিনি মানুষের একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর নামই 'জ্বিন' ধরে নিয়েছেন। অথচ এর স্বপক্ষে তিনি কুরআন থেকে কোন প্রমাণ তো পানইনি, অধিকন্তু কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ এবং প্রচলিত আরবী বাকরীতির অকাট্য সাক্ষ্য এর বিপক্ষে। এত বড় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার আগে এ কথা ভেবে দেখা কি ভালো ছিলনা যে, একটা

অদৃশ্য সৃষ্টিকে দৃশ্যমান বানিয়ে দেয়া আল্লাহর পক্ষে এমন কি অসম্ভব কাজ যে, তা থেকে গা বাচানোর জন্য এত কষ্ট করা ও এত কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়লো? যখন আপনি ফেরেশতার মত এত সূক্ষ্ম সৃষ্টির দৃশ্যমান হওয়াকে মেনে নিয়েছেন, তখন শয়তানের মত স্থূল সৃষ্টির দৃশ্যমান হওয়াকে আপনার এত অসম্ভব মনে হয় কেন? পবিত্র কুরআনে জিনদের সম্পর্কে কেবল এতটুকু তথ্যই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আগুনের সৃষ্টি। কিন্তু জিবরাইল ফেরেশতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি একটি "রূহ" আর তা-ও আল্লাহ প্রদত্ত রূহ। আল্লাহ বলেনঃ

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (مريم ١٧)

"অতপর আমি তার কাছে আমার রূহকে পাঠালাম এবং সেই রূহ তার কাছে গিয়ে দিব্যি একজন মানুষের আকারে দেখা দিল" (সূরা মরীয়ম-১৭)

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (الشعراء ١٩٢-١٩٣)

"এই কুরআন বিশ্ব প্রভুর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে। বিশ্বস্থ রূহ এটি নিয়ে নাজিল হয়েছে।" (সূরা শুয়ারা, ১৯২-১৯৩)।

নৈসর্গিক বস্তুর প্রভাব থেকে একেবারেই মুক্ত 'রূহুল্লাহ'র যখন আল্লাহর ইচ্ছায় দৃশ্যমান হয়ে যাওয়া সম্ভব, তখন নৈসর্গিক বস্তু ও বস্তুর স্থূলতার নিকটতর পদার্থ আগুনের আকার ধারণ করা কোন্ কারণে অসম্ভব ও বুদ্ধির অগম্য হবে যে, তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য কুরআনে কৃত্রিম ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে?[১] বস্তুত কুরআনের দৃষ্টিতে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সত্তাই মানুষের কাছে চির অদৃশ্য।

---

১. যে আগুন দিয়ে জিন তৈরী হয়েছে, তা আমার মতে এই আগুন নয়, রাসায়নিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় বস্তুগত অবয়বে যার উদ্ভব হয়েছে। বরঞ্চ তা আমাদের নৈমিত্তিক আগুন থেকে আলাদা এক বিশেষ ধরনের আগুন। মানুষের ভাষায় এটা ব্যক্ত করার জন্য نار বা আগুনের চেয়ে বোধগম্য কোনো শব্দ ছিল না বলেই আল্লাহ এই

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ - (انعام : ١٠٤)

"তাকে কেউ দেখতে পায় না। অথচ তিনি সবাইকে দেখতে পান" (সূরা আনয়াম ১০৪)।

قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرٰىنِىْ (اعراف : ١٤٣)

"মূসা (আঃ) বললেনঃ হে আমার প্রভু! আমাকে দেখা দিন। আমি আপনাকে দেখবো। আল্লাহ বললেনঃ আমাকে কখনো দেখতে পাবে না।" (আরাফ ১৪৩)।

চূড়ান্ত অদৃশ্যমানতা একমাত্র আল্লাহর চিরন্তন স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টি জগতের কারো এ বৈশিষ্ট্য স্বভাবগত ও চিরন্তন নয়। অবশ্য কোনো কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহ এমনভাবে তৈরী করেছেন যে, তাদেরকে সচরাচর দেখা যায় না। তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে দৃশ্যমান করে দিতে অথবা আমাদের দৃষ্টিকে তাদের সূক্ষ্মতর অবয়বকে দেখার মত তীক্ষ্ণতা দান করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম।

তৃতীয় যুক্তি

আপনি এবং মাওলানা...........সাহেব এ যুক্তিও দিতে চেষ্টা করেছেন যে, হযরত সোলায়মানের (আঃ) কাছে যে সব ডুবুরী ও

শব্দ দ্বারা ওটাকে ব্যক্ত করেছেন। ব্যাপারটা ঠিক এ রকম যে, اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ("আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর আলো") এই আয়াতটিতে যে আলোর উল্লেখ রয়েছে, তা আমাদের নৈসর্গিক জ্যোতিষ্ক সমূহ থেকে নির্গত আলোক রশ্মি নয় বরং অতিশয় নির্মল ও পবিত্র একটি জিনিস, যা মানুষকে হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য 'নূর' বা জ্যোতি শব্দটির চেয়ে বোধগম্য কোনো শব্দ নেই। তবুও যদি মেনেও নেই যে, কার্বন ও অক্সিজেনের সম্মিলনজনিত উত্তাপ থেকে যে আগুন তৈরী হয়, জ্বিনেরা সেই আগুনেরই সৃষ্টি, তাহলেও স্বীকার করতে হবে যে, অনৈসর্গিক ফেরেশতার তুলনায় নৈসর্গিক জ্বিনদের দৃশ্যমান হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও বোধগম্য।

রাজমিস্ত্রি ইত্যাদি ছিল, তাদেরকে "শয়তান" বলা হয়েছে। আর শয়তান শব্দটা জ্বিন ছাড়াও মানুষের ওপরও প্রয়োগ করা হয়েছে। এ জন্য আপনার বক্তব্য এই যে, এইসব রাজমিস্ত্রি ও ডুবুরীদেরকে দৃশ্যমান হওয়া ও মানুষের পেশাভুক্ত কাজ করার সুবাদে "মানুষ শয়তান" মনে করা যেতে পারে।

এটাকে যুক্তি না বলে আমি ভুল বুঝাবুঝি বলবো। প্রথমত, কুরআনে হযরত সোলায়মানের কারিগর ও ভৃত্যদের ক্ষেত্রে শুধু 'শয়তান' নয়, জ্বিন শব্দেরও প্রয়োগ হয়েছে। যেমনঃ

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ (النمل ١٧)

"সোলায়মানের জন্য মানুষ, জ্বিন ও পাখীর সমন্বয়ে তার বাহিনী সংগঠিত করা হয়েছিল" (নামল-১৭)

وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ .... آية ١٢
.... يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَ
جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ .. (١٣) . فَلَمَّا قَضَيْنَا
عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ
تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ - (سبا: ١٤)

"কিছু সংখ্যক জ্বিন সোলায়মানের সামনে আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে কর্মরত ছিল........ তিনি যা চাইতেন তারা তাই বানাতো, বড় বড় ভবন, ভাস্কর্য, পুকুরের মত বড় বড় থালা এবং বড় বড় স্থির ডেগচি।........অতঃপর, যখন আমি সোলায়মানের মৃত্যুর ফায়সালা কার্যকরী করলাম, তখন মাটির যে কীটগুলো সোলায়মানের লাঠি খেয়ে দিচ্ছিল তারা ছাড়া আর কেউ তার মৃত্যুর সংবাদ তাদেরকে জানায়নি। সোলায়মান যখন মাটিতে পড়ে গেলেন তখনই তাদের কাছে এ রহস্য উদঘাটিত হলো যে, অদৃশ্য ব্যাপারগুলো যদি

তাদের জানা থাকতো, তাহলে তাদের এতদিন এমন অবমাননাকর ভৃত্যগিরির যাতনা ভোগ করতে হতোনা" ১ (সূরা সাবাঃ আয়াত-১২, ১৩, ১৪)।

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সেই সব ডুবুরী ও রাজমিস্ত্রি জ্বিনই ছিল, মানুষ নয়। তাছাড়া এখানে একটা বিষয় আপনার ও মাওলানা সাহেবের উভয়েরই দৃষ্টির আগোচরে রয়ে গেছে। সেটি এই যে, কুরআনে কোথাও শুধুমাত্র "শয়তান" শব্দটি বলে তা দ্বারা মানুষকে বুঝানো হয়নি, বরঞ্চ ইবলিশ ও তার বংশধরকেই

---

১. এখানে লক্ষ্যণীয় যে, শেষেক্তো আয়াতটিতে 'জ্বিন' শব্দের সাথে 'ইনস' শব্দের সমাবেশ ঘটেনি। এতে এ কথারও আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, এই জ্বিনগুলো অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার দম্ভে বিভোর ছিল এবং এদেরকেই আরবরা 'আলেমুল গায়েব' তথা অদৃশ্যও বলে মনে করতো। এই জ্বিনদেরই একটি দল পরবর্তী সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআন পাঠ শুনে অন্যান্য জ্বিনগোত্রকে বললো যে, এখন আমাদের অদৃশ্য তত্ত্ব জানার সব উপকরণ হরণ করা হয়েছে এবং তার কারণ তারা এভাবে ব্যাখ্যা করলো যে-

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا (الجن-٩-٨)

"আমরা আকাশ মন্ডল তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। ফলে দেখেছি যে, তা পাহারাদারদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে রয়েছে এবং জ্যোতিষ্কমন্ডলী বর্ষিত হচ্ছে। ইতিপূর্বে আমরা কোনো কিছু শুনতে পাওয়ার আশায় আকাশ মন্ডলে আসন লাভ করতাম। কিন্তু এখন যে-ই আড়ি পেতে কিছু শুনতে চেষ্টা করে, সে শুধু একটা ওৎ পেতে থাকা জ্যোতিষ্কেরই সন্ধান পায়" (সূরা জ্বিন। ৮, ৯)-এ আয়াতে গায়েবের তথ্য লাভ করার যে উপায় বর্ণিত হয়েছে, তা মানুষের বুঝাই দুষ্কর, কাজে লাগাতে সক্ষম হওয়া তো দূরের কথা।

বুঝানো হয়েছে। তবে যেখানে মানুষের কোনো গোষ্ঠীকে বুঝাতে গুণবাচক পদ হিসেবে 'শায়াতন' (শয়তানের বহুবচন) শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে ইংগীতে অথবা খোলাখুলিভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, ওখানে শায়াতীন অর্থ মানুষ। যেমনঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ (انعام : ١١٣)

"এ ভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তান থেকে শত্রু সৃষ্টি করেছি" (আনয়াম–১১৩)।

وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ (بقره : ١٤)

"আর যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে নিভৃতে মিলিত হয় তখন বলেঃ আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি"

(সূরা বাকারা–১৪)।

কুরআনের প্রতি ঈমান থাকলে যা করণীয়

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে,জ্বিন শব্দের যে অর্থ স্বয়ং কুরআন কর্তৃক একাধিকবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, তা বাদ দিয়ে অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করার সপক্ষে কোন মজবুত যুক্তিপ্রমাণ নেই, তা যে হযরত সোলায়মানের (আঃ) কিসসাতেই হোক বা অন্য কোথাও হোক। আর কোন প্রমাণ যখন নেই,তখন যে ব্যক্তি কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করে তার পক্ষে আল্লাহ যাকে মানুষ না বলে জ্বিন বলেছেন তাকে মানুষ বলা বৈধ হতে পারে না। প্রচলিত যে সব রীতি আমরা দেখতে ও বুঝতে অভ্যস্ত, তা যদি কুরআনে ও বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত জ্বিন সংক্রান্ত ঘটনাবলীর বিপরীত হতো, কেবল তাহলেই এ ধরনের আন্দাজ–অনুমানের অবকাশ থাকতো। কিন্তু এভাবে একজন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে আগুনের দাহিকা শক্তি রহিত হওয়া, একটা বিশেষ ক্ষেত্রে লাঠির সাপে পরিণত হওয়া, একটি বিশেষ মুহূর্তে সমুদ্রের বিদীর্ন হয়ে রাস্তা বের করে দেওয়া, এক ব্যক্তি কর্তৃক মাটি দিয়ে পাখী বানিয়ে তাকে জ্যান্ত করে দেয়া ও মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা, একটি গুহার মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির

তিনশ' বছর অবধি ঘুমিয়ে থাকা এবং জীবিত থাকা, এক ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ার একশো বছর পর পুনরায় জীবিত হওয়া এবং নিজের খাদ্য পানীয় সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া, এক ব্যক্তির সাড়ে নয় শ' বছর পর্যন্ত জীবিত থাকা এবং তাও যোগ সাধনার মাধ্যমে নয় বরং একটি অবিশ্বাসী জাতির মোকাবিলায় ইসলাম প্রচারের প্রাণান্তকর সাধনার মাধ্যমে ইত্যাকার বহু ঘটনা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং সবই আমাদের নিত্যকার দেখতে অভ্যস্ত থাকা প্রচলিত রীতির বিপরীত। আমরা যদি কুরআনকে মহাজ্ঞানী, নিপুণ কুশলী ও অসীম শক্তিধর আল্লাহর রচিত গ্রন্থ বলে বিশ্বাস না করি, তা হলে এসব ঘটনার ব্যাখ্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর আদৌ কোন প্রয়োজন পড়ে না। এমন ঘটনা আমরা কখনো দেখিনি এবং শুনিনি বলেই এগুলোকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারি। আর যদি স্বীকার করি যে,কুরআন সেই আল্লাহর কিতাব,যিনি অনাদি অনন্তকাল ধরে বিশ্ব জগতের প্রতিটি ছোট বড় ঘটনা সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান রাখেন এবং তিনি এমন আল্লাহ যে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পৃথিবী এবং আমাদের নিজ সত্তায় তার অসংখ্য অলৌকিক কর্মকান্ড আমরা প্রতি মুহূর্তে অবলোকন করে চলেছি, তাহলে আমাদের যে কোন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাকে যেভাবে তা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে অবিকল সেইভাবে বিশ্বাস করতে আমাদের বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃকরার কথা নয়। এ সব ঘটনাতো দূরের কথা, কুরআনে যদি বলা হতো যে, এক সময় চাঁদকে হিমালয় পর্বতের চূড়ায় রাখা হয়েছিল এবং এক সময় আল্লাহ সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করেছিলেন, তাহলেও একজন প্রকৃত মুমিন এ কথার সত্যতায় এক মুহূর্তের জন্যও সংশয়ে পতিত হতে পারতো না এবং ইনিয়ে-বিনিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে প্রচলিত রীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল প্রমাণ করার প্রয়োজন বোধ করতো না। কেননা এই যে মহাবিশ্ব, যার বিশালতা কল্পনা করতেও আমাদের মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এর প্রতিটি জিনিস, এমন কি ঘাসের একটি পাতা এবং কোন প্রাণীর শরীরের এক গাছি লোমের জন্যও প্রকৃত পক্ষে হিমালয়ের চূড়ায় চাঁদের অবতরণ এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার মতই বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা। পার্থক্য শুধু এই যে, এক

ধরনের ঘটনাবলীকে আমরা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তাই সেগুলোকে আলৌকিক ঘটনা বলে আমাদের মনে হয় না। আর অন্য ধরনের ঘটনাবলী খুবই বিরল। তাই সে সব ঘটনার কথা যখন আমাদেরকে জানানো হয়, তখন আমরা বিস্মিত হয়ে যাই। আমাদের বিবেক যেহেতু নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাই সেইসব বিরল ঘটনাকে বিশ্বাস করতে ইতস্ততঃকরে। এ কথা সত্য যে, এ ধরনের অসাধারণ ঘটনাবলীর খবর পেলে সে সম্পর্কে প্রামাণ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ চাওয়ার অধিকার আমাদের রয়েছে। কিন্তু একজন মুমিনের জন্যে কুরআনের চেয়ে প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য আর কিছু হতে পারে না। কেননা সে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, এটা স্বয়ং আল্লাহর কথা এবং আল্লাহর কার্যকলাপ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহর সাক্ষ্যই সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। অবশ্য যে ব্যক্তি কুরআনকে আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, সে ইচ্ছা করলে কুরআনের প্রত্যেক কথায় সন্দেহ পোষণ করতে পারে, তা সে প্রচলিত রীতির অনুকূল হোক বা প্রতিকূল হোক।

(তরজমানুল কুরআন, শাওয়াল ১৩৫৩হিঃ জানুয়ারী, ১৯৩৫)।

খেলাফতের তাৎপর্য

(যে বিতর্কের সূত্র ধরে পূর্ববর্তী নিবন্ধ "জ্বিনের বাস্তবতা" লেখা হয়েছিল বর্তমান নিবন্ধটিও সেই সূত্র ধরেই লিখিত। বই-এর লেখকের বক্তব্য ছিল এই যে, আল্লাহ্ আদম আলাইহিস সালামকে যে খেলাফত দান করেছিলেন, সেটা এই অর্থে দান করেননি যে, আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন, বরং সেটা ছিল এই অর্থে যে, তাঁকে তাঁর পূর্ববর্তী পৃথিবীবাসীর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছিল। লেখক এও দাবী করেন যে, খেলাফতের অর্থ কেবল স্থলাভিষিক্ত হওয়া-অন্য কিছু নয়। তাই আল্লাহর খলীফা হওয়ার ধারণাটাই অর্থহীন। তরজুমানুল কুরআনে আমরা এ বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করি। কিন্তু পূর্ববর্তী নিবন্ধে অন্য যে লেখক মহোদয়ের উল্লেখ রয়েছে, তিনি আমাদের এই সমালোচনা প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য প্রকাশ করেন। তার জবাবেই আলোচ্য নিবন্ধটি লেখা হয়েছে।)

খেলাফত সংক্রান্ত আলোচনায় আমাদেরকে সর্ব প্রথম আরবী অভিধান পার্যালোচনা করে দেখতে হবে যে, আরবী ভাষায় এ শব্দের অর্থ কি শুধু "স্থলাভিষিক্ত হওয়া না এটা প্রতিনিধিত্ব অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইমাম রাগেব ইসপাহানী স্বীয় গ্রন্থ "মুফরাদাতে" লিখেছেনঃ

وَالْخِلَافَةُ نِيَابَةٌ عَنِ الْغَيْرِ إِمَّا لِغَيْبَةِ الْمَنُوبِ عَنْهُ وَإِمَّا لِمَوْتِهِ
وَإِمَّا لِعَجْزِهِ وَإِمَّا لِتَشْرِيفِ الْمُسْتَخْلَفِ-

"খেলাফত হলো অন্য এক ব্যাক্তির প্রতিনিধিত্ব করা-চাই তা সেই ব্যক্তির অনুপস্থিতির কারণে হোক, তাঁর মৃত্যুর কারণে হোক, তাঁর অপারগতার কারণে হোক অথবা যাকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছে তাকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে হোক।"

লেন (Lane) স্বীয় প্রসিদ্ধ Arabik English Lexieon নামক অভিধান গ্রন্থে খলীফা অর্থ Successor (স্থলাভিষিক্ত) ছাড়াও Vicegerent (প্রতিনিধি) লিখেছেন।

খেলাফতের জন্য এটা জরুরী নয় যে, যার প্রতিনিধিত্ব করা হবে তাকে মৃত অথবা অন্তর্হিত হতে হবে। ইমাম রাগেব বলেন,

خَلَفَ فُلَانٌ فُلَانًا قَامَ بِالْأَمْرِ عَنْهُ إِمَّا مَعَهُ وَإِمَّا بَعْدَهُ

"অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির খলীফা হয়েছেঐ এ কথার অর্থ হলো, অমুক অমুকের পক্ষ হতে কার্য সম্পাদনের ভারপ্রাপ্ত হয়েছে, চাই সেটা তার সাথেই হোক অথবা তার পরবর্তীতে হোক।"

এই মূল ধাতুরূপ থেকে যে সব শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, ধাতুগত রূপান্তরজনিত বৈশিষ্ট্যের কারণে সেগুলোর অর্থেও নানা রকম পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে।

خَلَفَ خِلَافَةً অর্থ খলিফা হওয়া, পরে আসা অথবপেছনে থেকে যাওয়া। خَلَفَهُ خِلَافَةً كَانَ خَلِيفَتَهُ وَبَقِيَ بَعْدَهُ وَجَاءَ بَعْدَهُ (تاج العروس) (তাজুল আরুস) পবিত্র কুরআনে আছে।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ তাঁদের (নবীদের) পরে যারা স্থলাভিষিক্ত হয়েছে তারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে" (সূরা আরাফ ১৬৯)।

وَقَالَ مُوسٰى لِأَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ (اعراف: ١٤٢)

"মূসা (আঃ) তাঁর ভাই হারুনকে বললেন ; তুমি আমার জাতির মধ্যে আমার পরে আমার স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি হও" (আরাফ–১৪২)।

قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ - (اعراف: ١٥٠)

"মূসা (আঃ) বললেন, আমার পরে তোমরা আমার খুব খারাপ প্রতিনিধিত্ব করেছ" (আরাফ–১৫০)।

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُوْنَ (الزخرف: ٦٠)

"আমি ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে তোমাদের মধ্য থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করবো, যারা তোমাদের জায়গায় বসবাস করবে" (যুখরুফ–৬০)।

تَخَلَّفَ শব্দের অর্থ পিছনে পড়ে থাকা।

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (التوبة: ١٢٠)

"মদীনাবাসী ও তাদের প্রতিবেশী বেদুইনদের পক্ষে আল্লাহর রসূল থেকে পিছিয়ে থাকা সমিচীন ছিল না। (তওবা–১২০)।

خَلَفَ خِلَافَةً অর্থ হারানো জিনিস ফেরত দেয়া, দেওয়ানো অথবা তার বদলা দেয়া।

أَخْلَفَ اللَّهُ لَكَ وَعَلَيْكَ خَيْرًا أَيْ أَبْدَلَكَ بِمَا ذَهَبَ عَنْكَ وَعَوَّضَكَ عَنْهُ (نهايه ابن اثير)

আল্লাহ বলেন ;

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (سبا: ٣٩)

"তোমরা যা–ই ব্যয় করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে তার উত্তম বদলা দেবেন। বস্তুত তিনি উত্তম রিজিক দাতা" (সাবা–৩৯)

হাদীসে আছে تَكَفَّلَ اللَّهُ لِلْغَازِي أَنْ يُخْلِفَ نَفَقَتَهُ

"আল্লাহ জেহাদকারীর জন্য দায়িত্ব নিয়েছেন যে, সে যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তাকে তার বদলা দেবেন।"

خَلَّفَهُ ও اِسْتَخْلَفَ অর্থ হলো নিজের খলিফা নিযুক্ত করা।

يُقَالُ خَلَفَ فُلَانًا إِذَا جَعَلَهُ خَلِيفَةً كَاسْتَخْلَفَهُ (تاج العروس)

اِسْتَخْلَفَ বলে যদি যার খলীফা বানানো হলো তার উল্লেখ না থাকে তা হলে অর্থ হবে এই যে, সে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছে।

اِسْتَخْلَفَ فُلَانًا اَىْ جَعَلَهٗ خَلِيْفَةً لَّهٗ

আর যদি যার খলিফা করা হয়েছে, তার উল্লেখ থাকে, তা হলে তার অর্থ হবে এই যে, সে অমুককে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানালো।

اِسْتَخْلَفَ فُلَانًا مِنْ فُلَانٍ اَىْ جَعَلَهٗ مَكَانَهٗ (اقرب الموارد)

সুতরাং যে জায়গায় কুরআন শুধু খলীফা বানানোর উল্লেখ করেছে এবং কার খলীফা, সেটা উল্লেখ করেনি, যেমন (لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) (অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা বানাবেন যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে খলীফা বানিয়েছেন। (সূরা নূর–৫৫) এ ধরনের জায়গায় খলীফা বানানোর অর্থ এটাই হবে যে, আল্লাহ্ নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। আর যেখানকার খালীফা সেটা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে অর্থ হবে, অন্যের স্থলাভিষিক্ত করা বা তার পরে দায়িত্বশীল করা। তবে উল্লেখ্য যে, যখনই প্রাক্তন প্রতিনিধিকে অপসারণ করে তার স্থলে অন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করার উল্লেখ থাকবে, সেখানে এই দুটো অর্থই গ্রহণ করা যাবে। অর্থাৎ প্রধান কর্মকর্তা অমুককে অমুকের স্থলাভিষিক্ত করেছে এই অর্থও গ্রহণ করা যাবে, আবার এই অর্থও গ্রহণ করা যাবে যে, তিনি অমুকের পরে অমুককে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। উদাহরণ সরূপ, যদি বলা হয় যে,

استخلف الملك اللورد ارون بعد اللورد ريدنك فى ولاية الهند

তবে এর দু'রকম অর্থই হতে পারেঃ একটি এই যে, রাজা লর্ড অরউিনকে লর্ড রেডিং–এর পরে তদস্থলে ভারতের বড় লাট নিয়োগ করেছেন। দ্বিতীয়টি এই যে, তিনি অরউিনকে রেডিং–এর পরে ভারতের শাসন কার্যে আপন প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। এই দুটো অর্থের মধ্যে কোন পারস্পরিক বিরোধ বা বৈপরিত্য নেই যে, এক সাথে দুটোই প্রবোজ্য হতে পারবে না। সুতরাং সূরা আনয়ামের ১২৪নং আয়াত

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ (انعام)

এর অর্থও দু'রকমঃ একটি এই যে, আল্লাহ্ তোমাদের জায়গায়–অন্যদেরকে দিয়ে দেবেন। দ্বিতীয়টি এই যে, আল্লাহ তোমাদের স্থলে অন্য দেরকে আপন খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। আভিধানিক দিক দিয়ে এই দু'টো অর্থের যে কোন একটি অথবা এক সাথে উভয়টি গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই।

جَعَلَهُ خَلِيْفَةً এর অর্থ শুধু খলীফা নিযুক্ত করা। খলীফা অর্থ চাই স্থলাভিষিক্ত অথবা প্রতিনিধি যাই হোক না কেন, উভয় অবস্থায় এর অর্থ আপেক্ষিক। অর্থাৎ এমন একজন এ ব্যাপারটার সাথে জড়িত রয়েছে, যার প্রতিনিধি অথবা স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করা হয়। চাই তার নাম উল্লেখ করা হোক বা উহ্য থাকুক। অতএব, যেখানে সেখানে খলীফা নিয়োগের কথা বলার সাথে সাথে কুরআন যার খলীফা নিয়োগ করা হলো তার নামও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে, সেখানে তো বক্তব্য স্পষ্ট। যেমনঃ

وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ (اعراف: ٦٩)

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ নূহের জাতির পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করলেন" (আরাফ–৬৯)।

وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ عَادٍ (اعراف: ٧٤)

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ আদ জাতির পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করলেন" (আরাফ–৭৪)

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ (يونس: ١٤)

অতপর আমি তাদের পরে তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিয়োগ করেছি, যাতে তোমরা কেমন কাজ কর দেখে নিতে পারি" (সূরা ইউনুস–১৪)।

কিন্তু যার প্রতিনিধি কিংবা স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করা হয়েছে তার কথা যেখানে মোটেই উল্লেখ করা হবে না, সেখানেও এটা ধরে নিতে হবে যে, এমন একজন এখানে অনুচ্চারিত রয়েছে যার প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করা হয়েছে। যেমনঃ

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ (ص:٢٦)

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করেছি। (সোয়াদ–২৬)" এবং

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ (النمل:٦٢)

"এবং তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর খলীফা নিযুক্ত করবে ।" (নামল– ৬২) এবং

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ (انعام:١٦٦)

তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদেরকে পৃতিবীর খলীফা নিযুক্ত করেছেন। (আনয়াম–১৬৬) এবং

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (بقره:٣٠)

"আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা নিয়োগ করবো। (বাকারা ৩০)।

এ ধরনের সকল আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে যে, এগুলোতে মানুষকে বা মানব গোষ্ঠীকে কার খালিফা নিয়োগের কথা বলা হয়েছে? আপনি যদি বলেন যে, পূর্ববর্তী সৃষ্টিসমূহের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অথবা পূর্ববর্তী রাজাদের খলীফা, তা হলে একেতো এটা একটা কৃত্রিমতা, তদুপরি কোন কোন আয়াতে এ অর্থ একেবারেই খাপ ছাড়া হয়ে যায়। উদাহরণ সরূপ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ। (তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর খলীফা নিযুক্ত করবেন) এ আয়াতটিতে خلفاء কে পৃথিবীর সাথে সম্বন্ধ যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর খলীফা। এখান থেকে এরূপ অর্থ গ্রহণের অবকাশ কোথায় যে, পৃথিবীর সাবেক অধিবাসীদের খলীফা? তাছাড়া إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً এর শাব্দিক অর্থ যেখানে এইঃ "আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা নিয়োগ করবো" সেখানে যদি এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, "আমি সাবেক পৃথিবীবাসীর খলীফা নিয়োগ করবো" তা হলে প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ কি কুরআনের কোথাও পৃথিবীর সেই অধিবাসীদের উল্লেখ করেছেন, যাদের খলীফা মানুষকে করা হয়েছে? যদি উল্লেখ করে থাকেন তবে উদ্ধৃতি দিন । আর যদি না

করে থাকেন তা হলে বলুন, নিছক ভাষা ও সাহিত্যের আলোকে এ কথাটার এই অর্থ বেশী বোধগম্য যে, "আমি অজানা সাবেক পৃথিবীবাসীর খলীফা নিয়োগ করবো" না এই অর্থ বেশী সহজবোধ্য যে, "আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করবো"? শ্রোতা যদি শুধু আরবী ভাষা জানে এবং মওলানা ....সাহেব যে সব তাত্ত্বিক যুক্তির অবতারণা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সে সম্পর্কে মোটেই অবগত না হয়, তা হলে সে উক্ত দুটো অর্থের কোনটা গ্রহণ করবে?

শাসন কার্যের ধারণা খেলাফতের আওতায় পড়ে কি না

উপরোক্ত আভিধানিক বিচার বিশ্লেষণের পর আমি আপনাকে আহ্বান জানাই যে, আপনি এবং মাওলানা.....সাহেব খেলাফতের যে অর্থ গ্রহণ করেছেন, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন। আপনার বক্তব্য এই যে "পৃথিবীর খেলাফত অর্থ হলো পৃথিবীর শাসন কার্য্য পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হওয়া।"

মওলানা .....সাহেব (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (بقره: ٣٠)) এর অনুবাদ করেনঃ "আমি পৃথিবীতে একজন রাজা নিযুক্ত করবো।" অতপর এই বলে এর ব্যাখ্যা দেন যে-

> "হযরত আদম তাঁর পূর্ববর্তী পৃথিবীবাসীর স্থলে পৃথিবীর রাজা নিযুক্ত হয়েছিলেন।"

এখন ভাবুন তো দেখি, খেলাফতের অর্থ যখন কেবল মাত্র স্থলাভিসিক্ত হওয়া, তখন এই রাজত্ব ও শাসনের ধারণাটা কোথা থেকে এল? স্বয়ং খেলাফত শব্দটিতে যখন এ ধারণা বর্তমান নেই এবং নিশ্চয়ই নেই, তখন তার মধ্যে এ ধারণাটা কেবল এ ভাবেই আসতে পারে যে খলীফা উক্ত খেলাফত কোন শাসক বা রাজার কাছ থেকেই পেয়ে থাকবেন। অতপর আপনার মতে মানুষ যখন এমন খেলাফতই পেয়েছে যাতে রাজত্ব ও শাসক সুলভ কর্মকাণ্ডের অস্তিত্ব রয়েছে, তখন এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে

যে, মানুষ যার খলীফা হয়েছে সে কোন না কোন শাসক ছিল। এবার বলুন, কুরআনের তত্ত্বানুসন্ধান থেকে কি এটা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের পূর্বে পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী কোন প্রাণী বাস করতো? শাসন কার্য পরিচালনার জন্য জ্ঞান, কুশলতা ও প্রজ্ঞা, স্বাধীনতা, ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রবৃতি গুণাবলী থাকা আবশ্যক। কেননা এগুলো ছাড়া পৃথিবী ও তার অভ্যন্তরে অবস্থিত বস্তু ও প্রাণীসমূহের ওপর শাসন চালানো অসম্ভব। তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ভূমণ্ডলে মানুষের পূর্বে এমন কোন সৃষ্টি বিদ্যমান ছিল না যারা এ সব গুণে ভূষিত ছিল। কুরআনও এ কথা সমর্থন করে। কুরআনের বক্তব্য এই যে, মানুষের পূর্বে আল্লাহর যে সর্বোত্তম সৃষ্টি এখানে বিরাজ করতো তা ছিল ফেরেশতা, যাদেরকে عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ "সম্মানিত বান্দা," বলে অভিহিত করা হয়েছে। অথচ তাঁদেরও অবস্থা ছিল এই যে, তারা বস্তু নিচয়ের নাম পর্যন্ত জানতো না।

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِيْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ - قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا (البقرة:٣١،٣٢)

"অতপর আল্লাহ সেই বস্তুসমূহকে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন! "তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে এগুলোর নাম আমাকে জানাও। তারা বললোঃ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তুমি আমাদেরকে যা কিছু শিখিয়েছ, তাছাড়া আর কিছু আমাদের জানা নেই।" (বাকারা—৩১, ৩২)

আর নিম্নের আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, তারা যাচাই—বাছাই ও ইচ্ছার স্বাধীনতা থেকে একেবারেই বঞ্চিত ছিল।

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ - (التحريم:٦)

"আল্লাহ তাদেরকে যে আদেশ করেন তা তারা অমান্য করে না এবং কেবলমাত্র নির্দেশিত কাজই তারা করে।" (আততাহরীম —৬)।

দ্বিতীয় সৃষ্টি ছিল জ্বিন। তবে পৃথিবীর শাসন কর্তৃত্ব তাদের হাতে ছিল বলে ধারনা জন্মে এমন কোন কথা কুরআনে নেই। বাদ বাকী জীব-জন্তু , জড় পদার্থ ও গাছপালার অবস্থা কি সে তো আপনাদের জানাই আছে। তাহলে আর কোন সৃষ্টি এমন ছিল, যার খেলাফত ও সেই সাথে সম্মানজনক শাসন ক্ষমতা মানুষ লাভ করেছে? তবুও যদি মেনে নেই যে, এটা পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদেরই খেলাফত এবং সেই আদিম অধিবাসীরা মানুষের পূর্বে পৃথিবীর শাসক ছিল, তা হলেও প্রশ্ন উঠে যে, তারা কি আসল শাসক ছিল না তাদের শাসন ক্ষমতাও প্রতিনিধিত্ব মূলক ছিল? প্রথমটা তো আপনি গ্রহণ করতে পারেন না। কেননা ইসলামী আকীদা অনুসারে আসল ও মূল শাসক একমাত্র আল্লাহ্। তিনি ছাড়া আর সকলের শাসন কেবল অর্পিত ক্ষমতা ভিত্তিক। আর দ্বিতীয়টা যদি স্বীকার করেন তাহলে হয় আপনাকে খেলাফতের অধীন খেলাফতের এক সীমাহীন ধারাবাহিকতা মেনে নিতে হবে, নচেৎ আপনাকে এ কথাই মেনে নিতে হবে যে, এই শাসন ক্ষমতা একের পর এক যত খলীফাই লাভ করুক, তার উৎস একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। আর খেলাফতের আওতায় রাজক্ষমতা ও শাসন ক্ষমতা থাকতে পারে কেবল তখনই , যখন তা আল্লাহর খেলাফত হবে।

কুরআনের দিক নির্দেশনা

এবার আমি কুরআনের কতিপয় দিক নির্দেশনার দিকে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করবো, যা থেকে জানা যায় যে, মানুষকে যে খেলাফত দান করা হয়েছে তা আসলে আল্লাহরই খেলাফত।

কুরআন বলছে যে, আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামো দিয়ে সৃষ্টি করেছেনঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التين:٤)

তাকে তিনি নিজ হাতে তৈরী করেছেনঃ

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ (ص: ٧٥)

তিনি নিজের পক্ষ থেকে তার মধ্যে রূহ সঞ্চারিত করেছেন

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ (السجدة: ٩)

তাকে জ্ঞানের মত সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন ঃ

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرة: ٣١)

আকাশ ও পৃথিবীর সকল জিনিসকে তার অনুগত ও অধীনস্থ করে দিয়েছেন ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ (الجاثية: ١٣)

এই সমস্ত গুণ বৈশিষ্ট্য সহকারে মানুষকে যখন সৃষ্টি করা হলো, তখন আল্লাহ্ ফেরেশতাদেররকে তার সামনে সিজদা করার নির্দেশ দিলেন। এ নির্দেশটা সূরা সোয়াদের শেষাংশে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা বিশেষভাবে বিবেচনার দাবী রাখে।

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ - فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ - قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ - (ص: ٧١-٧٧)

"যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদেরকে বললেন যে, আমি মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। সেটা যখন সম্পূর্ণরূপে বানানো হয়ে যাবে এবং তাতে আমি নিজের আত্মা সঞ্চারিত করবো, যখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পতিত হয়ো। অতপর সকল ফেরেশতা সিজদা করলো। কিন্তু ইবলিস

সিজদা করলো না। সে দাম্ভিকতায় লিপ্ত হলো এবং আদেশ লংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস, আমি যাকে নিজ হাতে গড়লাম, তাকে সিজদা করতে তোমাকে বাধা দিল কিসে? তুমি কি নিজেকে খুব বড় কিছু মনে করে বসেছ, না সত্যই বড় কিছু হয়ে গেছ? সে বললো, অমি ওর চেয়ে ভাল। তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ অর ওকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে। তখন আল্লাহ বললেনঃ "তুই এখান থেকে বেরিয়ে যা। কেননা তুই ধিকৃত।"

(সোয়াদ–৭১–৭৭)

এ আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় যে, মানুষকে সিজদা করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তার কারণ ছিল এই যে, আল্লাহ তাকে স্বহস্তে নির্মাণ করেছিলেন, অর্থাৎ সে ছিল আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও শিল্প নৈপুণ্যের চূড়ান্ত প্রতীক। আর তার ভেতরে তিনি নিজের পক্ষ থেকে একটা অসাধারণ রূহ সঞ্চারিত করেছিলেন এবং যে গুণাবলী সর্বোচ্চ মাত্রায় স্বয়ং আল্লাহর মধ্যেই পাওয়া যায়, সেই গুনাবলীই সীমিত মাত্রায় তার মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। এরূপ মর্যাদা ও গুণবৈশিষ্ট্য সহকারে মানুষকে সৃষ্টি করার পর ঘোষণা করা হলো যে, আমি তাকে পৃথিবীতে খলীফা নিয়োগ করতে যাচ্ছি। সূরা বাকারার চতুর্থ রুকুতে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। ফেরেশতারা এ ব্যাপারে নিজেদের কিছু সন্দেহ–সংশয় প্রকাশ করলে আল্লাহ তাদের সামনে মানুষের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য জ্ঞানের প্রদর্শনী করলেন। এভাবে খেলাফতের জন্য মানুষের যোগ্যতা প্রমাণিত করার পর ফেরেশতাদেরকে হুকুম দেয়া হলো যে, তার খেলাফত মেনে নাও এবং মেনে নেয়ার আলামত হিসাবে তাকে সিজদা কর। সকল ফেরেশতা মেনে নিলেন এবং সিজদা করলেন। কিন্তু শয়তান তার খেলাফত প্রত্যাখ্যান করলো এবং দরবার থেকে বিতাড়িত হলো।

এ থেকে কি বুঝা গেল? এ দ্বারা সকল সৃষ্টির ওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হলো। আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হলো। বলা হলো যে, মানুষ আমার গুণাবলীর

পূর্ণতম ও উৎকৃষ্টতম বাহক এবং তার মধ্যে আমি নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ রূহ সঞ্চারিত করেছি। তাকে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হলো, তাও আর কাউকে নয় ফেরেশতাদেরকে। এ সব করার সাথে সাথে তাকে খলীফা বনানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলো। এত প্রস্তুতি ও আড়ম্বর সহকারে যে খলীফার খেলাফত ঘোষিত হলো, সে কি কেবল পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদেরই খলীফা ছিল? ব্যাপার যদি কেবল এতটুকুই হয়ে থাকে যে, প্রাচীন অধিবাসীর জায়গায় অন্য এক অধিবাসীকে অধিষ্ঠিত করা হচ্ছে। তাহলে ফেরেশতাদের সামনে তার খেলাফতের ঘোষণা দেয়া এবং এভাবে তার শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার কি দরকার ছিল? আর ফেরেশতাদেরকে এ নির্দেশই বা দেয়া হলো কেন যে, ভূমন্ডলের এই নতুন অধিবাসীকে–যে কিনা কেবল অন্যদের পরিত্যক্ত জায়গায় বসতি স্থাপন করতে যাচ্ছিল–সিজদা কর?

আল্লাহর খেলাফতের মর্ম কি?

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র অন্য যে উক্তিটি করা হয়েছে,তা আল্লাহর খেলাফতের মর্ম কি সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট আলোকপাত করে। আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا - (احزاب: ٧٢)

"আমি আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড় পর্বতের কাছে এ আমানত পেশ করেছিলাম কিন্তু তারা কেউ এর ভার গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি এবং তারা ভয় পেয়ে যায়। এর ভার মানুষ গ্রহণ করলো। বস্তুত সে জালেম ও অপরিণাম দর্শী সাব্যস্ত হয়েছে" (আহযাব–৭৩)।

এ আয়াতে আমানতের অর্থ নির্বাচনের স্বাধীনতা (Freedom of choice) এবং দায়িত্ব ও জবাবদিহী (Responsibility)। আল্লাহর এ উক্তির মর্মার্থ এই যে, আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড়

পর্বতের এ দায়িত্বের গুরুভার গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল না। মানুষের পূর্বে এ দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতাসম্পন্ন কোন সৃষ্টিরই অস্তিত্ব ছিলনা। অবশেষে মানুষের আবির্ভাব ঘটলো এবং সে এ দায়িত্ব গ্রহণ করলো। এ বক্তব্য থেকে কয়েকটি তথ্য জানা যায়ঃ

১. মানুষের পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীতে কোন সৃষ্টি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। মানুষেই এ দায়িত্ব গ্রহণকারী প্রথম সৃষ্টি। সুতরাং আমানত গ্রহণের ক্ষেত্রে সে কারো স্থলাভিষিক্ত (successor) নয়।

২. সূরা বাকারায় যে জিনিসকে খেলাফত বলা হয়েছে এখানে 'আমানত' শব্দ দ্বারা সেটাই বুঝানো হয়েছে। কেননা সেখানে ফেরেশতাদের সামনে প্রমাণ করে দেয়া হয়েছিল যে, তারা খেলাফতের উপযুক্ত নয়, মানুষই তার উপযুক্ত। আর এখানে বলা হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর কোন সৃষ্টি আমার আমানতের ভার কাঁধে নেয়ার যোগ্য ছিল না, শুধু মানুষই তা বহন করতে পেরেছে।

৩. খেলাফতের তাৎপর্য আমানত শব্দ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর এই দু'টো শব্দ একত্রে বিশ্ব প্রকৃতির অবকাঠামোতে মানুষের প্রকৃত অবস্থান নির্দেশ করে। মানুষ হলো পৃথিবীর শাসক ও পরিচালক। তবে তার এই শাসনকর্তৃত্ব মৌলিক নয় বরং অর্পিত (delegated)। সুতরাং আল্লাহ তার ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বকে (delegated power) আমানত বলে অভিহিত করেছেন। মানুষ এই অর্পিত ক্ষমতাকে আল্লাহর পক্ষ থেকেই ব্যবহার করে বলে তাকে খলীফা (Vicegerent) বলা হয়েছে। এ হিসাবে খলীফা শব্দের অর্থ দাড়ালোঃ যে ব্যক্তি কারো অর্পিত বা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে। (person exercising delegated power)

তরজুমানুল কোরআন, জ্বিলকদ ১৩৫৩ হিঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫

উদারতা ও পরমত সহিষ্ণুতার অনৈসলামিক ধারণা

সূরা বাকারার ১৯৩ নং আয়াত হলোঃ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۖ فَاِنِ
انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ (بقرة: ١٩٣)

তাফহীমুল কুরআনে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল যে, "ক্ষ্যান্ত হওয়ার অর্থ কাফিরদের শিরক ও কুফরী পরিত্যাগ করা নয়, বরং ফিতনা থেকে ক্ষ্যান্ত হওয়া।" কাফির, মোশারিক, নাস্তিক--প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে, যা আকীদা পোষণ করে করুক, যার খুশী পূজা-উপাসনা করুক অথবা একেবারেই কারো পূজা-উপাসনা না করুক। এ অজ্ঞতা থেকে তাকে বের করে আনার জন্য আমরা তাকে বুঝাবো এবং উপদেশ দিব ঠিকই, কিন্তু তার সাথে লড়াইতে লিপ্ত হব না। তবে এ অধিকার তার কখনো নেই যে, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজের বাতিল আইন চালু করবে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করবে।

"তরবারী দিয়েই এ ফিতনার উচ্ছেদ ঘটাতে হবে এবং কাফিররা যতক্ষণ তাদের বর্তমান আচরণ থেকে বিরত না হবে, ততক্ষণ মুমিনরা অস্ত্র সংবরণ করবে না।" এ তফসীরের রেখাচিহ্নিত অংশটুকু সম্পর্কে তরজুমানুল কুরআনের পাঠকবর্গের মধ্য থেকে জনৈক বিদ্বান ব্যক্তি নিম্নরূপ আপত্তি তুলেছেনঃ

---

১. আয়াতটির শাব্দিক অর্থ এইঃ "যতক্ষণ ফিতনার অবসান না ঘটে এবং দীন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে না যায় ততক্ষণ তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাও। এর পর যদি তারা ক্ষ্যান্ত হয় তাহলে জালেমদের ওপর ছাড়া আর কারো ওপর বাড়াবাড়ি করা বৈধ নয়।"

(ক) এর মানে হলো, ইসলাম যা কিনা শান্তি ও নিরাপত্তার সমর্থক, সে অন্যদের ধর্মে হস্তক্ষেপ এবং সে জন্য লড়াই-এর অনুমতি দেয়। অথচ এ কাজটা সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াত لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই)-এর বিপরীত।

(খ) ইসলামের বিরোধীদের নিজ নিজ ধর্ম ও আকীদা বিশ্বাসের ওপর অবিচল থাকার-স্বাধীনতা সূরা কাফিরূনের শেষ আয়াত لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্য আমার ধর্ম) থেকেও সুস্পষ্ট। যে ব্যক্তি আকীদা ও বিশ্বাসে স্বাধীন, তার সে আকীদা বিশ্বাস প্রচার করারও স্বাধীনতা থাকা উচিত, কেননা সে ঐসব আকীদাকেই সঠিক মনে করে। কুরআনের বক্তব্য থেকে এ স্বাধীনতার সমর্থন পাওয়া যায় এবং পারস্পরিক বিতর্কেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমনঃ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ("সর্বোত্তম পন্থায় ব্যতীত আহলে কিতাবের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না") (আনকাবুত-৪৫)। তাদের উপাসনালয় এবং উপসানা পদ্ধতি ইসলামের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থেকেছে। এমনকি মসজিদে নববীতে পর্যন্ত আহলে কিতাবকে নিজস্ব পদ্ধতিতে উপসনা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। মিসরের শাসক আযীয যার আকীদা ও কার্য্যকলাপ মুশরিকদের মত ছিল--হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার চাকরি করেছিলেন।

অবশ্য তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে ইসলামের প্রচার চালিয়ে গেছেন। যেমন সূরা ইউসুফের ৩৯ নং আয়াত يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (হে আমার কারাগারের সাথীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন প্রভু থাকা ভাল, না এক, অদ্বিতীয় ও মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ ভাল?") থেকে বুঝা যায়। এভাবে অন্যদেরও নিজ নিজ ধ্যান ধারণা প্রচার করার অধিকার রয়েছে।

(গ) রেখাচিহ্নিত কথা কয়টির আলোকে মুসলমানরা কোথাও মিশ্র জনবসতিতে নিরুপদ্রব জীবন যাপন করতে পারে না। অমুসলিমরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়েও মুসলমানদের সাথে

পারস্পরিক সহযোগিতা ও উদার নীতির ভিত্তিতে আচরণ করবে কোন কারণে, যখন তাদের রাজনৈতিক ও মৌলিক আকীদাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়? এ ধরনের মুসলমানরা ইরান ও তুরস্কে বসবাস করলেও আপনার কথা মত তাদেরকে সেখানেও জিহাদের পতাকা উত্তোলন করতে হবে। কেননা সে সব দেশে ইসলামের আইন ও ফৌজদারী বিধি চালু নেই। এ যুগে বিশ্ব রাজনীতি এমন ধারায় প্রবাহিত যে, কোন দল অস্বাভাবিক ও অপ্রচলিত পন্থায় অমুসলিমদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও লেনদেন চালাতে পারে না। কেননা আপনার কথিত যুক্তি যে কোন ধরণের যৌথ কর্মকান্ডের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। মুসলিম জনগোষ্ঠী যদি স্বীয় আকীদা-বিশ্বাস প্রচার করার অধিকারী হয়, তা হলে অমুসলিমদেরকেও সে অধিকার দিতে হবে, বিশেষত তারা যদি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে।। যে জিনিস নিজের জন্য পছন্দ নয়, তা অন্যের জন্য পছন্দ করো না। রসূল (সাঃ) মদীনার ইহুদী জনগোষ্ঠীর সাথে পারস্পরিক আচরণ বিধি স্থির পূর্বক যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, সে চুক্তি এ ধরনের শর্তের ভিত্তিতেই সম্পাদিত হয়েছিল? মক্কী জীবনের প্রাথমিক স্তরটা আপনার যুক্তির পক্ষে নয়। অন্য কথায়, একটি অমুসলিম সরকারের জন্য এ ধরনের জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বই একটা প্রকাশ্য হুমকি, যে জনগোষ্ঠী সুযোগ পেলেই ঐ সরকারের আইন ও শাসন ব্যবস্থা উৎখাত করার জন্য অস্ত্র ধারণ করবে। তাদেরকে কে বরদাশত করবে?

এ আপত্তির সংক্ষিপ্ত জবাব কয়েকটি মাত্র বাক্য দিয়েও দেয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ আপত্তিটার মূলে রয়েছে ভুল বুঝাবুঝির এক বিরাট স্তূপ। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণাসমূহ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি এর ফলে মুসলিম জনগণ সামগ্রিকভাবে নিজেদের ধর্মের মৌলিক দাবী বুঝতেও অক্ষম হচ্ছে। এ জন্য এখানে ব্যাপারটা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

ইসলাম শান্তির ধর্ম কোন অর্থে, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ এবং لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ এর প্রকৃত মর্ম কি এবং

হযরত ইউসুফের (আঃ) লক্ষ্য নবুয়তের দায়িত্ব পালন করা ছিল, না জীবীকার অন্বেষণ করা-সে আলোচনা পরে করা যাবে। এ সব বিষয়ের আগে যে প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন তা হলো, পৃথিবীতে ইসলামের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? স্বৈরাচারী লোকেরা যাতে মানুষের ঘাড়ে চড়াও হতে পারে তার সুবিধা করে দেয়ার জন্য মানুষকে তৈরী করতেই কি ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিল? এক একজন স্বৈরাচারী একনায়ক যখনই পৃথিবীতে আপন প্রভুত্ব কায়েম করতে আসবে, তখন ইসলামের অনুসারীদেরকে যাতে নিজের অনুগত ভৃত্য হিসেবে পেতে পারে। সে জন্যই কি ইসলাম এসেছিল? সে কি সারা পৃথিবীর সরকারসমূহের ও সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য শান্তিপ্রিয় প্রজা সংগ্রহ করে দেয়ার ইজারা নিয়েছিল যে, যে কোন ধরনের মতাদর্শের অনুসারী শাসকরা নিজেদের রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার জন্য ইসলামের কারখানা থেকে তৈরী যন্ত্রাংশ পেয়ে কৃতার্থ হবে? ইসলামের কাজ কি শুধু এই যে, কিছু মৌলিক আকীদা ও নৈতিক আদর্শ শিক্ষা দিয়ে মানুষকে এতটা বিনয়াবনত ও নমনীয় করে গড়ে তুলবে যাতে সে সকল ধরনের সমাজ ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে? ব্যাপার যদি সত্যি তাই হয়, তাহলে ইসলাম বৌদ্ধ ধর্ম ও সেন্ট পলের গড়া খৃষ্ট ধর্ম থেকে পৃথক কিছু নয়। আর তেমনটি হলে এটা আমাদের জন্য দুর্বোধ্য যে, এমন ধর্মের গ্রন্থে قَاتِلُوهُمْ ("তাদের সাথে লড়াই কর") এর মত ভয়ংকর শব্দ উচ্চারণই বা হলো কেমন করে? এর তো নিজের অনুসারীদেরকে যিহাদ ও যুদ্ধের নির্দেশ দেয়ার পরিবর্তে শত্রুদেরকে বলা উচিত ছিল যে-

"আমরা হতভাগাদেরকে তোমরা কেন মারছ? আমরা শাসন ব্যবস্থায় কোন বিপ্লবও আনতে চাইছি না, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায়ও কোন রদবদল ঘটাতে চাইছি না। ক্ষমতা যার হাতেই থাক, তার অধীনে শান্তশিষ্ট নাগরিক হিসেবে বাস করাই আমাদের নীতি এবং ক্ষমতাশীন সরকারের আনুগত্যই আমাদের ঈমান ও ধর্ম। এমতাবস্থায় আমাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা পোষণের কি কারণ থাকতে পারে? আমাদের ধর্ম বিশ্বাস ও পূজা-উপাসনার রীতি-প্রথা

নিয়ে আপত্তি? কিন্তু এতে তোমাদের অসুবিধা কি? তোমাদের কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং কোন্ স্বার্থ আমাদের পূজা-উপসনায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

এ জবাব যদি যথার্থ লাগসইভাবে দেয়া হতো এবং কার্যত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীগণ আনুগত্য সহকারে সমাজ সেবার কাজ চালিয়ে যেতেন, তাহলে মক্কার মুশরিকরা আমাদের ইংরেজ প্রভুদের তুলনায় এত বেশী গোঁয়ার ও কান্ডজ্ঞানহীন ছিল না যে, মসজিদে আযান ও নামাযের স্বাধীনতা এবং ধর্ম প্রচারণামূলক সমিতি ইত্যাদি করার স্বাধীনতাও দিত না।[১]

কিন্তু বাস্তব ব্যাপার যদি সে রকম না হয়ে থাকে, বরং ইসলামের যদি নিজস্ব জীবন ব্যবস্থা থেকে থাকে–যাতে আকীদা-বিশ্বাস এবং আখলাক ও ইবাদাতের পাশাপাশি ব্যক্তিগত কর্মকান্ড ও সামষ্টিক জীবনের যাবতীয় তাৎপরতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধি-নির্দেশ রয়েছে, যদি ইসলামের আহ্বান তার সমগ্র জীবন ব্যবস্থার দিকে হয়ে থাকে এবং যদি তার দাবী এই হয়ে থাকে যে, একমাত্র তার জীবন ব্যবস্থাই সত্য ও নির্ভুল এবং একমাত্র তাতেই মানুষের সঠিক কল্যাণ নিহিত, আর এছাড়া অন্য প্রত্যেকটি জীবন ব্যবস্থাই বাতিল ও ভ্রান্ত, তা হলে এ সবের সাথে সাথে এটাও অনিবার্য হয়ে উঠে যে, ইসলাম পৃথিবীতে নিজের জীবন ব্যবস্থাকে বিজয়ী এবং অন্য সকল ব্যবস্থাকে পরাভূত করার দাবী জানাবে। একটি জীবন ব্যবস্থাকে সত্য ও সঠিক বলে দাবী করার পর কার্যত তা প্রতিষ্ঠিত করার দাওয়াত না দেয়া একটা সম্পূর্ণ অর্থহীন ব্যাপার। আর এর চেয়েও অর্থহীন ব্যাপার এই যে, অন্যান্য জীবন ব্যবস্থাকে বাতিলও বলা হবে আবার তার বিজয়কেও বরদাশত করা হবে। তাছাড়া একটা জীবন ব্যবস্থার অধীন বসবাস করে আর একটা জীবন ব্যবস্থার অনুকরণ ও অসুনসর করা একেবারেই অসম্ভব। তাই একই সময় নিজের উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থার

---

১. উল্লেখ্য যে এ নিবন্ধ ১৯৪২ সালে লেখা হয়েছিল।

অনুকরণেরও দাবী জানানো আবার সেই সাথে অন্যান্য ব্যবস্থার অধীন শান্তিপূর্ণ ও আনুগত্যপূর্ণ জীবন যাপনের শিক্ষা দেয়া একজন উম্মাদের পক্ষেই সম্ভব।

সুতরাং ইসলাম যদি নিজের বিশেষ ধাচের জীবন ব্যবস্থার দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকে, তবে সেই দাওয়াতের স্বাভাবিক তাগিদেই তার এ দাবী জানানোও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় যে, অন্যান্য ব্যবস্থাকে উৎখাত করে তার স্থলে তার নিজস্ব ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা হোক। আর যত উপায়ে চেষ্টা তদবীর ও সংগ্রাম করলে এ উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে থাকে, তার সব ক'টি উপায় অবলম্বনের দাবী জানানোও তার জন্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। এমনকি যারা তার অনুসারী হবার দাবীদার, তারা জান মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে এই চেষ্টা ও সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, না বাতিল ব্যবস্থার অধীন জীবন যাপন করতে রাজী থাকে-এ প্রশ্নকেই সে উক্ত দাবীদারদের ঈমান যাচাই-এর মানদন্ড নির্ধারণ করা জরুরী মনে করে। কুরআন ও হাদীস-দুটোই খুলে দেখুন। সুস্থ মন নিয়ে অধ্যায়ন করলে আপনি দেখতে পাবেন যে, ইসলামের আসল নীতি এটাই-আপনি যেটা বলছেন সেটা নয়।

এই যখন ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ এবং স্বরূপ জেনেই যখন আমরা ইসলামের ওপর ঈমান এনেছি, তখন যে কোন ইসলাম বিরোধী সরকারের জন্য আমাদের অস্তিত্বই যে হুমকি বলে বিবেচিত হবে, সেটা অবধারিত। কেউ সহ্য করুক বা না করুক এবং অমুসলিমদের সাথে আমাদের সহযোগিতা ও পারস্পরিক সদ্ভাব সম্ভব হোক বা না হোক, আমরা আমাদের ঈমানে নিষ্ঠাবান ও নিষ্ঠাবান ও সত্যবাদী হলে যেখানেই আল্লাহর শরীয়তি আইন-কানুন চালু নেই সেখানে তা চালু করার যথাসাধ্য চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। আমাদের মুসলমান হওয়া এরূপ শর্ত যুক্ত নয় যে, যারা আল্লাহর অবাধ্য তারা আমাদের এই চেষ্টাসাধনাকে বরদাশত করলেই আমরা মুসলমান থাকবো এবং আল্লাহর আইন চালু করার চেষ্টা করবো অন্যথায় করবো না। অমুসলিমদের সাথে সহযোগিতা ও সদ্ভাবও আমাদের জন্য এমন ব্যাপার নয় যে, যে জীবন ব্যবস্থায়

আমরা ঈমান এনেছি, তার বাস্তবায়নের চেষ্টা করলে অমুসলিমদের সাথে সহযোগিতা ও সদ্ভাব সম্ভব হবে না বলে আমরা সে চেষ্টা পরিত্যাগ করবো। নিঃসন্দেহে ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষক ও সমর্থক। তবে তার দৃষ্টিতে যে শান্তি ও নিরাপত্তা আল্লাহর বিধান কার্যকর করার মাধ্যমে অর্জিত হয়, সেটাই প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা। শয়তানী শাসন ব্যবস্থার অধীন যাবতীয় কাজকারবার নিরুপদ্রবে চলতে থাকবে আর মুসলমানরা তাতে কিছুমাত্র বিব্রত বোধ করবে না,-এই যারা শান্তি ও নিরাপত্তার অর্থ মনে করছেন তারা ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে মোটেই বোঝেননি। তাদের জানা উচিত যে, ইসলাম কখনো এ ধরনের শান্তি ও নিরাপত্তার সমর্থক ও পক্ষপাতী নয়। বাতিল শক্তির প্রতিষ্ঠিত শান্তি নয়, বরং নিজের প্রতিষ্ঠিত শান্তিই তার কাম্য এবং এতেই সে মানুষের সার্বিক কল্যাণ দেখতে পায়।

এখন প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (ইসলামে জোরজবরদস্তি নেই) কথাটার মর্ম কি? এর মর্ম শুধু এই যে, ইসলাম তার আকীদা-বিশ্বাসকে মেনে নিতে কাউকে বাধ্য করে না। কেননা এটা জোরপূর্বে চাপিয়ে দেয়ার জিনিস নয়। অনুরূপভাবে, তার আকীদা-বিশ্বাসের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত ইবাদাতকেও সে কারোর ওপর বল প্রয়োগে চাপিয়ে দেয় না। কেননা সুষ্ঠু ঈমান ছাড়া এসব ইবাদাত একেবারেই অর্থহীন। এই দুটো ব্যাপারেই সে প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু ইসলাম এটা সহ্য করতে প্রস্তুত নয় যে, সমাজ ও সভ্যতাকে পরিচালনাকারী যে আইন ও বিধানের ওপর রাষ্ট্রের কাঠামো ও বিধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ রচনা করে দিক, আল্লাহর বিদ্রোহী ও অবাধ্য লোকেরা আল্লাহর যমীনে তার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করুক এবং মুসলমানরা তাদের তাবেদার হয়ে থাকুক। এ ব্যাপারে একটি জনগোষ্ঠীকে অন্য জনগোষ্ঠীর "ধর্মে" অবশ্যই হস্তক্ষেপ করতে হবে। মুসলমানরা যদি "কুফরী ধর্মে" হস্তক্ষেপ না করে তা হলে কুফরী আদর্শের অনুসারীরা "ইসলাম ধর্মে" হস্তক্ষেপ করেই ছাড়বে। আর এর ফল দাঁড়াবে এই যে,

মুসলমানদের জীবনের একটা বিরাট অংশে কুফরী ব্যবস্থা প্রচলিত হয়ে পড়বে। সুতরাং হস্তক্ষেপটা খোদাদ্রোহীদের পক্ষ থেকে না হয়ে মুসলমানদের পক্ষ থেকে হোক এবং মুসলমানরা সামনে অগ্রসর হয়ে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রকে দখল করে নিক এটাই ইসলামের দাবী ও তাগিদ। এ কাজটা সম্পন্ন হওয়ার পর কেবলমাত্র আকীদা–বিশ্বাস ও ইবাদত–উপাসনার প্রশ্নে অমুসলি–মদের সাথে لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (ইসলামে জোরজবরদস্তি নেই) এই নীতি অনুসরণ করতে হবে।

আলোচ্য আপত্তি উত্থাপক ভদ্রলোক যে সব যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন এবং যার ওপর তার সমমনা লোকেরা সাধারণত আস্থাশীল হয়ে থাকেন, এবার সেই যুক্তিগুলোর ওপর একটা নজর বুলানো যাক।

তার পয়লা যুক্তি এই যে, আপনি যখন "ফিতনা" শব্দটি কুফরী ব্যবস্থার বিজয় এবং কুফরী ব্যবস্থার ধারকবাহক ও অনুসারীদের পরাক্রম ও প্রভুত্ব অর্থে গ্রহণ করেন, আর আপনার এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী যে জিনিস 'ফিতনা' পদবাচ্য তাকে উৎখাত করে তদস্থলে "আল্লাহর দীন" কায়েম করাকেই যখন যিহাদের লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করেন, তখন এটা স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে, ইসলাম একটা দুমুখো ও পরস্পর বিরোধী ভূমিকা অবলম্বন করবে। একদিকে সে ঘোষণা করছে যে, ইসলামে কোন জবরদস্তি ও বল প্রয়োগের স্থান নেই। অপরদিকে সে অমুসলিমদের নিজস্ব আদর্শ ও মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার দিতে অস্বীকার করছে এবং তাদের আইন প্রচলন বন্ধ করে জোর পূর্বক তাদের ওপর "আল্লাহর দীন" চাপিয়ে দিতে চাইবে। এক দিকে সে "তোমার জন্য তোমার ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম" বলে সকল ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে নিজ নিজ ধর্মমতের ওপর অবিচল থাকার স্বাধীনতা দেয়। অপর দিকে, তারা নিজেদের নীতি আদর্শ অনুসারে দুনিয়ার কর্মকান্ড পরিচালনা কেন করে এ প্রশ্ন তুলেই তাদের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। ইসলামে এত বড় সবিরোধিতা যে থাকতে পারে না, তা সর্বজন বিদিত। অতএব, আপনার ব্যাখ্যাটিই আসলে ভুল।

দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, ইসলাম বিরোধী সরকারের অস্তিত্বই যদি ইসলামের দৃষ্টিতে ফিতনা হতো এবং তার উচ্ছেদ ঘটানোর জন্য যদি মুসলমানরা আদিষ্ট হতো, তাহলে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কর্তৃক মিসরের অনৈসলামিক সরকারে মন্ত্রীত্ব চাওয়া কিভাবে সম্ভব হয়েছিল এবং স্বীয় মন্ত্রীত্বের আমলে মিসরের রাজকীয় আইনের অনুগত থেকে কাজ করাইবা তার পক্ষে কিভাবে সঙ্গত হয়েছিল। সূরা ইউসুফের ৭৬ নং আয়াত

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ রাজকীয় আইনে আপন ভাইকে গ্রেফতার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না) থেকে বুঝা যায় যে, তিনি রাজকীয় আইনের উর্ধে ছিলেন না।

তৃতীয় যুক্তি এই যে, আয়াতের যে ব্যাখ্যা আপনি দিয়েছেন তা সঠিক বলে মেনে নিলে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ইসলাম পৃথিবীতে একটা চিরস্থায়ী যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে সচেষ্ট এবং তার অনুসারীদেরকে আগ্রাসী যুদ্ধ চালানোর এমন দায়িত্ব অর্পণ করে যার দরুন মুসলমানরা দুনিয়ার কোথাও শান্তিতে থাকতে পারে না। সত্যি বলতে কি, এ তফসীর অনুসারে, শুধু দুনিয়ার সকল অমুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই নয়, বরং যে সব মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী আইন চালু নেই তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। আর এটাই যখন আমাদের আদর্শ এবং ধর্মীয় কর্তব্য, তখন অমুসলিমরা আমাদেরকে তাদের শান্তি প্রিয় প্রতিবেশী ভেবে আমাদের সাথে নিশ্চিন্তে ও নির্ভাবনায় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে এবং অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহ তাদের আওতাভুক্ত এলাকায় আমাদের অস্তিত্ব বরদাশত করবে—এটা কিভাবে সম্ভব?

(১) উল্লিখিত যুক্তিগুলোর মধ্যে প্রথমটা একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে উত্থাপন করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে একটা মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনে একটা বিশেষ নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা এক কথা, আর তার নিজ মতাদর্শ অনুসারে সামষ্টিক জীবনের জন্য একটা পদ্ধতি

গড়ে তোলা এবং সেই পদ্ধতিটা জোরপূর্বক একটি দেশের জন-জীবনে চালু করে দেয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।(১) আপত্তি উত্থাপনকারীরা এই দু'টো বিষয়কে এক মনে করে বসেছেন এবং দুটোর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা উপেক্ষা করে

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (ইসলামে জোর জবরদস্তি নেই) এবং لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ।(তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম) এ দুটো আয়াতকে উক্ত দুটো বিষয়ের ওপর সামষ্টিকভাবে প্রয়োগ করেছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ আয়াত দুটোর সম্পর্ক প্রথম ব্যাপারটার সাথে। এ কথা সত্য যে, আমরা কোনো অমুসলিমকে তার আকীদা-বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ ও নিজস্ব ধর্মীয় পূজা-অর্চনা পরিত্যাগ করে নামায, রোযা পালন করতে বাধ্য করবো না। তবে আমরা তার এ অধিকার স্বীকার করতে পারি না যে, সে নৈতিকতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও আইন ইত্যাদি সামষ্টিক ব্যাপারে আপন মতবাদগুলোকে শাসক সূলভ ক্ষমতার বলে জোরপূর্বক আমাদের ওপর চাপিয়ে দিক। অন্যদেরকে নিজস্ব নিয়মনীতি অনুসারে চলতে দেয়া নিঃসন্দেহে পরমত সহিষ্ণুতা। কিন্তু আমাদের নিজস্ব নিয়মনীতির বিরুদ্ধে আমাদের ওপর অন্যদের মতাদর্শ ও রীতিনীতি চাপিয়ে দেয়াকে বরদাশত করা কোনো পরমত সহিষ্ণুতা নয়। দেশের শাসন ব্যবস্থা যে জীবন দর্শনের ভিত্তিতে গঠিত হবে ঐ দেশের সমস্ত আইন কানুন, সমগ্র প্রশাসনিক নীতি এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম সেই দর্শনের ভিত্তিতে চলতে বাধ্য। আর এ ধরনের শাসনব্যবস্থার অধীনে বাস করে আমাদের জীবনধারাকে আমাদের নিজস্ব ধর্ম ও মতাদর্শ অনুসারে পরিচালিত করা আমাদের পক্ষে কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। আমরা রাজী হই বা না হই, বিরুদ্ধবাদী ধর্মের অনুসারীরা

---

১. উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্র মূলত বল প্রয়োগ ও জবরদস্তিরই (Coercive) আর এক নাম। যে মতবাদ, মূলনীতি ও আইন কোন্ রাষ্ট্রের ভিত্তিরূপে বিবেচিত হবে, সেটা যে ঐ রাষ্ট্রের আওতায় বসবাসকারী সকল মানুষের ওপর বল প্রয়োগেই চালু করা হবে, সেটা সর্বজনবিদিত।

নিজেদের রাজনৈতিক পরাক্রম ও আধিপত্যের দাপটে আপন মতাদর্শকে জোরপূর্বক আমাদের সমগ্র জীবনে প্রয়োগ ও বাস্তবায়িত করে ছাড়বে। এ ব্যাপারে নমনীয়তা, উদারতা বা পরমত সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের অর্থ হলো, তারা যদি ব্যভিচারকে বৈধ মনে করে এবং জনগণকে এ ব্যাপারে অবাধ অনুমতি দিয়ে দেয়, তা হলে তাদের সরকারের নিরুপায় প্রজা হিসেবে স্বয়ং আমাদের সমাজে ব্যভিচারের বিস্তার ঘটতে থাকবে আর আমরা তা নীরবে বরদাশত না করে পারবো না। তারা যদি সুদকে বৈধ মনে করে এবং তাদের সরকার স্বয়ং সুদভিত্তিক লেন-দেন করতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে, তাহলে দেশের প্রশাসন তাদের হাতে থাকার কারণে আমাদের একজন অতি বড় পরহেজগার লোকও সুদের কলুষতা থেকে রেহাই পাবে না। এমনকি একটা দিয়াশলাই এবং এক টুকরো রুটিও আমরা কিনতে পারবো না যতক্ষণ না তার মূল্য থেকে সুদের একটা অংশ পরোক্ষ করের আকারে আমাদের পকেট থেকে বেরিয়ে যায়। তারা যদি নাস্তিক্যবাদী মতবাদে বিশ্বাসী হয় তা হলে দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা কাঠামো এই নাস্তিক্যবাদী চরিত্রের আলোকেই গড়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, এহেন নরকের দরজা ছাড়া দেশবাসীর জন্য উন্নতি ও সমৃদ্ধির অন্য সকল দরজা রুদ্ধ হয়ে যাবে। আর আমাদের অতি বড় কোনো খোদাভীরু লোকও আপন বংশধরকে সেই নাস্তিক্যবাদী মতাদর্শ ও নৈতিকতার প্রভাব থেকে বাঁচাতে সক্ষম হবে না। তারা যদি আল্লাহর আইনকে বাতিল করে নিজস্ব আইন রচনা করে এবং দেশের সমাজ ব্যবস্থাকে নিজেদের রচিত আইনের ভিত্তিতে গড়ে তোলে, তাহলে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটা বিরাট অংশ আমরা যে আইন-বিধির ওপর ঈমান এনেছি, তার আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে যেতে বাধ্য হবে এবং যে আইন-বিধিতে আমাদের ঈমান ও আস্থা নেই তার অনুসরণ করতে আরম্ভ করবে। এটা কি ধরনের পরমত সহিষ্ণুতা এবং কি ধরনের উদার নীতি? "ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই" আয়াতটার এ অর্থ কোন্ যুক্তিতে এবং কোন্ বিবেকের রায় অনুসারে শুদ্ধ হতে পারে যে, অন্যদের পক্ষ থেকে

আমাদের ধর্মের ওপর যে বল প্রয়োগ করা হবে তা আমরা বরদাশত করবো?

এ কথা অনস্বীকার্য যে, সামষ্টিক জীবনের শৃংখলা বহাল রাখার জন্য সর্বাবস্থায়ই একটা বলপ্রয়োগকারী শক্তি (Coercive Power) থাকা প্রয়োজন এবং তাকেই রাষ্ট্র বলা হয়। নৈরাজ্যবাদীরা ছাড়া কেউ এর প্রয়োজনীতা আজ পর্যন্ত অস্বীকার করেনি। সমাজতান্ত্রিক দর্শনেও এমন একটা স্তর কল্পনা করা হয়েছে, যেখানে পৌছে মানুষের সামষ্টিক জীবন রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা আর অনুভব করে না। কিন্তু এসব কথাবার্তা আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। এসব কথার স্বপক্ষে কোন অভিজ্ঞতা বা চাক্ষুস সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা সম্ভব নয়। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা এবং মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতি সংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞান থেকে এ কথাই জানা যায় যে, সুসভ্য ও সমাজবদ্ধ মানব জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য একটা "দমনমূলক শক্তি"র প্রয়োজনীয়তা সন্দেহাতীত। তথাপি এ কথাও অনস্বীকার্য যে, আপন অজেয় ক্ষমতা ও পরাক্রমশীলতার জোরে সমাজ ও সভ্যতার অবকাঠামোকে সংরক্ষণকারী এই দমনমূলক শক্তি তথা রাষ্ট্র শক্তি নিজেও কোনো না কোনো মতবাদ এবং কোনো না কোনো সামষ্টিক নীতির প্রবক্তা ও পতাকাবাহী হয়ে থাকে। সেই মতবাদ ও নীতির আলোকে সে নিজের জন্য একটা কর্মসূচী রচনা করে। এই কর্মসূচীকেই সে আপন দোর্দন্ড ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমাজ জীবনে বাস্তবায়িত করে। আর এই দোর্দন্ড ক্ষমতার ধরন এবং এই কর্মসূচীর নীতিগত ও বিস্তারিত রূপটির ভূমিকা সভ্য সমাজ জীবনের ভাঙ্গাগড়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেবল সামষ্টিক জীবন নয়, ব্যক্তিগত জীবনও অনেকাংশে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, রাষ্ট্রীয় আধিপত্য ও পরাক্রমের প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়ে যেতে বাধ্য হয়। একটি রাষ্ট্রের অধিবাসীরা ঐ রাষ্ট্রের মতাবদ ও বিস্তারিত কর্মসূচীতে বিশ্বাসী ও সম্মত না হলেও তাদেরকে বাধ্য হয়ে নিজেদের আকীদা ও আদর্শের শতকরা ৯০ ভাগকে পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রীয় আকীদা ও আদর্শ অনুসারে চলতে হয়। আর বাদবাকী

১০ ভাগেও তাদের আকীদা ও আদর্শের নিয়ন্ত্রণ ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে যেতে থাকে।

রাষ্ট্রের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি দান এবং সামষ্টিক জীবনে রাষ্ট্রের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করার পর একজন চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে এ কথা বুঝা মোটেই কঠিন নয় যে, কোনো মানবগোষ্ঠী যদি প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে কেবল "ধর্মের" অনুসারী না হয়ে একটা সর্বব্যাপী জীবন ব্যবস্থা অর্থাৎ "দীনের" প্রতি বিশ্বাসী হয়, তারা আপন বিশ্বাসে নিষ্ঠাবান ও সত্যবাদী হয় এবং আপন বিশ্বাসের বিপরীত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক না হয়, তাহলে যে রাষ্ট্র সমাজ জীবনকে সর্বাত্মকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও গঠন এবং আপন শক্তি দ্বারা তাকে বহাল রাখার কাজে নিয়োজিত রয়েছে, সেই রাষ্ট্রকে করায়ত্ত্ব করার চেষ্টা করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। তারা যদি রাষ্ট্রকে করায়ত্ত্ব না করে , তবে অন্যরা করবে এবং তখন এই গোষ্ঠী নিজেদের জীবনের অন্তত শতকরা ৯০ ভাগ ব্যাপারে নিজেদের পছন্দসই 'দ্বীন' বা জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্যদের জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে বাধ্য হবে। সুসভ্য মানব জীবনে 'ইকরাহ' বা বল প্রয়োগের এ কাজটা আমাদের কোনো না কোনো পক্ষকে করতেই হবে। আমরা না করলে খোদাদ্রোহীরা করবে। সুতরাং ইসলাম বিরোধীরা এ পরিমন্ডলে আমাদের ওপর বলপ্রয়োগ করবে এবং আমাদেরকে টেনে-হিচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে--তার চেয়ে ভালো আমরাই তাদের ওপর বল প্রয়োগ করে তাদেরকে এমন অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য করি, যেখান থেকে তারা ইচ্ছা করলে সহজেই বেহেশতের পথের সন্ধান লাভ করতে পারে।

এ হলো ব্যাপারটার একটা দিক। এর আর একটা দিক এই যে, পৃথিবীর মালিক আল্লাহ তায়ালা। তাঁর পৃথিবীতে বাস করে তাঁর নেয়ামতরাজি ভোগ করা এবং তাঁর মালিকানাধীন সম্পদ ব্যবহার করার অধিকার কেবল তার অনুগত বান্দাদেরই থাকতে পারে, যারা তাঁর প্রাকৃতিক ও শরীয়তী আইন-কানুন অনুসরণ করে। যারা তা করে না তারা জালেম, অনধিকার চর্চাকারী ও বিদ্রোহী। তাদের

এই অনধিকার চর্চা কেবল অন্যায়ই নয়, বরং পৃথিবীর প্রশাসনে অরাজকতা সৃষ্টি এবং পৃথিবীবাসীর জীবন বিপর্যস্ত ও অতিষ্ঠ করে তোলার নামান্তর। সুতরাং প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, যারা খোদাদ্রোহী এবং খোদার প্রাকৃতিক ও শরীয়তী বিধানের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত, তাদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকারও থাকা উচিত নয়। কিন্তু আল্লাহর অতিশয় দয়া ও মহানুভবতা এবং তাঁর চরম সহনশীলতার গুণে তিনি তাদেরকে শুধু যে জীবন ধারনের সুযোগ দিয়েছেন তা নয় বরং তাদেরকে তাদের কুফরী, শিরক ও নাস্তিকতার ওপর টিকে থাকারও এতখানি সুযোগ দিয়েছেন, যাতে তাদের খোদাদ্রোহিতা আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদের জীবনে অরাজকতা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে না পারে। তাদেরকে এ অধিকার তিনি কখনো দেননি যে, আল্লাহর শরীয়তী বিধান বাতিল করে তারা নিজেদের মনগড়া আইন–কানুন দ্বারা তার পৃথিবীর প্রশাসন চালাবে এবং এভাবে তার যমীনে অরাজকতার তান্ডব সৃষ্টি করবে। তাই ইসলাম তার শরীয়তী বিধানকে যারা মেনে নিয়েছে তাদেরকে নির্দেশ দেয় যে, অমুসলিমদেরকে আল্লাহর সত্য দীন গ্রহণ করতে বাধ্য করো না। কিন্তু কুফরী ব্যবস্থার আধিপত্য ও প্রাধান্য এবং কাফিরদের কর্তৃত্ব–প্রভুত্ব যা কিনা সাধারণ মানুষ ও মুমিনদের জন্য আল্লাহর সত্য দীনের আনুগত্য করার পথে প্রতিবন্ধক তাকে সর্বশক্তি দিয়ে উৎখাত কর, যেন পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন কার্যত আল্লাহর দীনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে যারা আল্লাহর দীনকে মানে না, তারা "কতৃত্বশীল" নয়। বরং "অধিনস্ত" এবং প্রতাপান্বিত নয় বরং বিনীত হয়ে থাকবে। সূরা তওবার ২৯ নং আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে যে: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ "যতক্ষণ না তারা বিনীতভাবে স্বহস্তে জিজিয়া দেবে" (ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও।)

(২) উল্লিখিত তথ্যসমূহ হৃদয়ঙ্গম করার পর দ্বিতীয় যুক্তির প্রখরতা আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যদি যথার্থই আল্লাহর প্রেরিত নবী থেকে থাকেন তাহলে অন্যান্য নবীগণের পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যা ছিল, তাঁর

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও নিশ্চিতভাবে তাই ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না। অর্থাৎ অন্য সকল জীবন ব্যবস্থার ওপর আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা। এটা একটা মৌলিক তত্ত্ব। সকল নবীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এ তত্ত্বটাকে একটা সাধারণ মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আমরা যদি এ কথা স্বীকার করি যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর শাসনামলে মিসরে আল্লাহর দীনের পরিবর্তে রাজকীয় বিধি বিধান চালু করতেন, তাহলে তো তাঁর মধ্যে ও স্যার সিকান্দার ও এ, কে, ফজলুল হকের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য থাকে না।[১] দুঃখের বিষয় যে, অনেকে এ ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তারা আসলে ইউসুফ (আঃ)-এর কিস্‌সাটা বুঝতেই পারেননি। তাদের ধারণা, ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে সমসাময়িক বাদশাহকে বলেছিলেন-

اِجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ (يوسف:٥٥)

("আমাকে এই ভূখণ্ডের সহায় সম্পদের তদরকীর দায়িত্ব দিন" (সূরা ইউসুফ-৫৫)।

সেটা ছিল নেহাতই তাঁর পক্ষ থেকে একটা চাকরির আবেদন। আর এর ফলে তিনি সম্রাট আকবরের দরবারে টোডর মল্লের পদের মত একটা পদ সেখানে লাভ করেছিলেন। অথচ সেখানকার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ছিল।

মহান নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম শুরুতে আল্লাহর সত্য দীন কায়েমের জন্য সকল নবীদের চিরাচরিত পন্থাই অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ প্রথমে সাধারণ দাওয়াত ও অতপর যারা ঐ দাওয়াত গ্রহণ করে তাদেরকে সংগঠিত ও সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা, অতপর তাদেরকে সাথে নিয়ে দীন কায়েমের জন্য

---

১. এ নিবন্ধ লেখার সময়ে পাঞ্জাবে স্যার সিকান্দার হায়াত ও বাংলায় এ, কে, ফজলুল হক প্রথম মন্ত্রী ছিলো। তখন তাদের যে কোন অনৈসলাম সরকারের মুসলমান মন্ত্রীকে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

চেষ্টা সাধনা। দাওয়াতের কাজটা তিনি কারাগার থেকেই শুরু করে দিয়েছিলেন। সূরা ইউসূফের ৫ম রুকুতে তাঁর দাওয়াতী স্তরের একটা অতুলনীয় ভাষণ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আকস্মিকভাবে তিনি এমন একটা মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেলেন, যার মাধ্যমে তিনি সংক্ষিপ্ত পথ ধরে আপন লক্ষ্যস্থলে পৌছুতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, মিসর সরকারের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব 'আযীযে'র স্ত্রী ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে তিনি যে পবিত্র ও অনমনীয় চরিত্রের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তার পরে স্বপ্নের তাবীর করার মধ্য দিয়ে তিনি যে প্রজ্ঞার প্রমাণ দিয়েছিলেন, তার কারণে মিসরের বাদশাহ তার প্রতি এত অনুরক্ত হয়ে গেছেন যে, তিনি যদি তখন দেশ শাসনের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা তার কাছে চেয়ে বসেন তবে বাদশাহ নির্দিধায় তা দিয়ে দেবেন। এ জন্য গণ আন্দোলনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চাইতে সরকারী ক্ষমতা অবিলম্বে দখল করে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর কাছে নিকটতর ও সহজতর পথ মনে হলো। তাই তিনি বাদশাহর কাছে- اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ "দেশের যাবতীয় উপায়-উপকরণ আমার কর্তৃত্বে দিয়ে দিন" এই দাবী করে বসলেন। এটা কেবল অর্থ মন্ত্রীর গদী লাভের দাবী ছিল না, যদিও কেউ কেউ এটাই মনে করে থাকেন বরঞ্চ এটা ছিল সর্বাধিনায়ক ও সার্বভৌম শাসকের পদের দাবী। এর ফলে হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম যে পদমর্যাদা ও ক্ষমতা লাভ করলেন, তা বর্তমানে ইতালীতে মুসোলিনী যে পদমর্যাদায় আসীন, তার প্রায় অনুরূপ।[১] পার্থক্য শুধু এই যে, ইতালীর রাজা মুসোলিনীর ভক্ত নয়, কেবল তার দলের প্রভাব-প্রতিপত্তির দাপটে নতি স্বীকার করেছে। আর মিসরের বাদশাহ স্বয়ং হযরত ইউসুফের (আঃ) মুরীদ হয়ে গিয়েছিল।[২]

---

১. এ প্রবন্ধ লেখার সময় মুসোলিনী জীবিত ছিল এবং ইতালীর একনায়ক ছিল।

২. প্রখ্যাত তাফসীরকার ইমাম মুজাহিদ বলেন যে, বাদশাহ হযরত ইউসুফের (আঃ) হাতে ইসলামও গ্রহণ করেছিলেন (ইবনে জারীর)।

হযরত ইউসুফের (আঃ) ক্ষমতা কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ স্বয়ং সাক্ষ্য দেন যে.

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ (يوسف: ٥٦)

"এভাবে আমি ইউসুফকে সেই ভূখণ্ডে ক্ষমতাসীন করলাম। সে ঐ ভূখণ্ডের যে অংশে ইচ্ছা নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম ছিল" (সূরা ইউসুফ–৫৬)। অর্থাৎ গোটা দেশে তার একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজ করতো।

সূরা মায়েদাতে আমরা এ সম্পর্কে আরো সাক্ষ্য পাই। সেখানে হযরত মূসা (আঃ) স্বীয় জনগণকে বলেন যে –

يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (المائدة: ٢٠)

"হে আমার জাতি! আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ কর। তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবীর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, তোমাদেরকে শাসক জাতি বানিয়েছেন এবং পৃথিবীতে কাউকে যা দেননি, তা তোমাদেরকে দিয়েছেন" (মায়েদা–২০)।

এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিসরে যে ক্ষমতা লাভ করেছিলেন, তাঁর কল্যাণে সেখানে পরিপূর্ণ বিপ্লব সংঘটিত হয়, ফিরাউনদের পরিবর্তে বনী ইসরাঈলের শাসন চালু হয় এবং তারা উন্নতির এত উচ্চ শিখরে আরোহণ করে, যা তাদের সমকালীন জাতিগুলোর মধ্যে আর কারো ভাগ্যে ঘটেনি।

তাছাড়া হযরত ইউসুফ মিসরে যে ধর্মীয় প্রভাব প্রতিপত্তি রেখে যান, তার বিবরণ আমরা সূরা মুমিনে পাই। সেখানে হযরত মূসার (আঃ) সমসাময়িক ফিরাউনকে সম্বোধন করে জনৈক ঈমানদার কিবতী বলেনঃ–

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهٖ حَتّٰى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا (مؤمن-٣٤)

"ইতিপূর্বে ইউসুফ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু প্রথমে তো তোমরা তাঁর নিয়ে আসা নিদর্শনের ব্যাপারে সন্দেহে লিপ্ত ছিলে। আর যখন সে মারা গেল তখন তোমরা বললেঃ এখন আল্লাহ আর কোনো রসূল পাঠাবেন না" (মুমিন–৩৪)। অর্থাৎ তোমরা বললে যে, অমন উচুঁ দরের মানুষ এখন আর আসতে পারে না।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে এই নিগূঢ় তত্ত্ব জানার পর এরূপ যুক্তি প্রদর্শনের সাহস কে করতে পারে যে, অনৈসলামী শাসন ব্যবস্থার সহায়ক হওয়া জায়েয, কেননা একজন নবী এ রকম কাজ করেছেন? অবশ্য সূরা ইউসূফের ৭৬নং আয়াত–

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ (يوسف:٧٦)

("তার পক্ষে রাজকীয় আইনের অধীন আপন ভাইকে আটক করা সম্ভব ছিল না।") এর আলোকে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) ফিরাউনী আইন মেনে চলতেন। এ আয়াতের মর্ম ও তাৎপর্য সম্পর্কে অনেক কিছু বলার অবকাশ রয়েছে। তথাপি এর যে অর্থ সচরাচর বর্ণনা করা হয় তা যদি সঠিক মেনে নেয়াও হয়, তবু তা থেকে বড় জোর এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইউসুফের (আঃ) শাসন আমলের যে পর্যায়ে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে (পূর্বপর বর্ণনা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, এটা প্রাথমিক যুগেরই ঘটনা। কেননা তাঁর মিসরের শাসক হওয়ার কয়েক বছর পরই সাত বছরব্যাপী ইতিহাসখ্যাত সেই দুর্ভিক্ষ শুরু হয়, যার করাল গ্রাসে পতিত হয়ে তার ভাইদেরকে খাদ্যশস্য নেয়ার জন্য মিসর আসতে হয়েছিল।) তখন পর্যন্ত মিসরে পূর্বতন ফৌজদারী আইনই চালু ছিল। একটা দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাকে যে রাতারাতি পাল্টানো যায় না, সে কথা সবার জানা। এ কাজ পর্যায়ক্রমেই সমাধা করা সম্ভব। স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলেও আরবের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা পাল্টাতে দশ বছর লেগে গিয়েছিল। উত্তরাধিকার আইন বদলানো হয়েছিল ৩য় অথবা ৪র্থ হিজরীতে। বিয়ে ও তালাকের বিধি হিজরতের পর পাঁচ-ছয় বছরে সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করা হয়েছিল। ফৌজদারী বিধি সম্পূর্ণ করতে পুরো আট বছর লাগে। দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো পর্যায়ক্রমে ৯ বছরে পাল্টানো হয়। মদ চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ হয় ৮ম হিজরীতে এবং সুদ পুরোপুরিভাবে রহিত করা হয় ৯ম হিজরীতে। এভাবে হযরত ইউসুফও (আঃ) যদি দেশের আইন সংস্কারের কাজ পর্যায়ক্রমে করে থাকেন এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাঁর শাসনামলে সাবেক আইন চালু থেকে থাকে, তাহলে তার ভিত্তিতে এ কথা কিছুতেই বলা চলে না যে, একজন নবী আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত অনৈসলামিক আইনকে বৈধ মনে করে তা মেনে চলতেন।

(৩) এবার আসুন তৃতীয় যুক্তির প্রসঙ্গে। এটাকে আসলে যুক্তি না বলে অজুহাত বলাই সমীচীন। এ অজুহাতের জবাব আমি পূর্বেই দিয়েছি। এখানে শুধু আবু দাউদ বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট মনে করছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُذْ بَعَثَنِي اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُّقَاتِلَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ
الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ ـ

"আমি যখন নবুয়ত লাভ করেছি তখন থেকেই যিহাদের সূচনা এবং এই উম্মাতের শেষ জনগোষ্ঠীর দাজ্জালের সাথে যিহাদে লিপ্ত হওয়ার সময় পর্যন্ত তা চালিয়ে যাওয়া উচিত। কোনো অত্যাচারীর অত্যাচার এবং কোনো ন্যায়বিচারকের ন্যায়বিচার যিহাদকে রহিত করতে পারে না।"

অর্থাৎ আজ আমাদের ওপর চরম স্বৈরাচারী শাসকরা চেপে বসেছে, এই অজুহাতে যেমন যিহাদ বন্ধ করা চলবে না, তেমনি কাফির শাসক হলেও মুসলমানদের প্রতি সুবিচার হচ্ছে এবং তারা শান্তিতে আছে এই বাহানা দিয়েও তা থেকে বিরত হওয়া চলবে না। এমনকি মুসলমানদের নিজ দেশে সুবিচার ও ইনসাফের রাজত্ব

থাকলেও তাদের নিশ্চিন্ত হওয়া এবং বাইরের জগতে যে জুলুম, নির্যাতন ও অশান্তির আগুন জ্বলছে, তার দিক থেকে চোখ বুজে থাকা বৈধ নয়।

(তর্জুমানুল কুরআন, শাবান-শাওয়াল, ১৩৬১ হিজরী, সেপ্টেম্বর-নবেম্বর, ১৯৪২)

সূরা ইউসুফ সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্ন

তরজমানুল কুরআনের জনৈক পাঠক লিখেছেনঃ

সূরা ইউসুফের দুটো জায়গা সম্পর্কে আপনার কুরআন বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান থেকে উপকৃত হতে চাই।

(১) কুরআন থেকে জানা যায় যে, হযরত ইউসুফকে (আঃ) পৃথিবীতে ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা দান করা হয়েছিল এবং তিনি বিশিষ্ট পদমর্যাদা নিয়ে সরকারে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে একজন রসূল ছিলেন এবং সে জন্য নবুয়তের দায়িত্ব পালনও তাঁর জন্য জরুরী ছিল, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফিরাউনের দরবারের একজন অকুতোভয় মুমিন তার ভাষণে এ আভাস দিয়েছেন যে, ফিরাউনের লোকেরা হযরত ইউসুফের (আঃ) নবুয়তের প্রতি ঈমান আনেনি। তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) নিজের ইন্তিকালের সময় পর্যন্ত নমনীয় ভাব বজায় রেখেছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি নিজের নবুয়তের প্রতি ঈমান আনার আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু ফিরাউন ও তার লোকজন ঈমান আনেনি। এতদসত্ত্বেও হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদের সরকারে অন্তর্ভুক্ত থাকেন। এখন প্রশ্ন উঠে যে, আল্লাহর একজন প্রিয় নবী একটি অনৈসলামিক সরকারে কিভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারলেন? অথচ তিনি সেই জাতির কাছে নিজের নবী হওয়ার কথা ব্যক্তও করেছিলেন এবং সেই জাতি তাঁর নবুয়ত মেনে নিয়নি। ইসলামের দাওয়াতকে এভাবে যারা প্রত্যাখ্যান করলো, তাদের সাথে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের যিহাদ করা উচিত ছিল। নতুবা নিদেন পক্ষে তাঁর সেখান থেকে হিজরত করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি না করলেন হিজরত আর না করলেন তাদের বিরুদ্ধে যিহাদ, এমনকি তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ কিংবা অসন্তোষ ব্যক্ত করতেও তাঁকে দেখা যায় না। এ জটিল রহস্যের কোন সমাধান কি আপনি দিতে পারেন?

(২) ভক্তি প্রদর্শনমূলক সিজদা নিয়েও আমার প্রশ্ন রয়েছে। এ ব্যাপারেও আপনি আলোকপাত করুন।

জবাব

বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের যে যুগটি হযরত মুসা (আঃ)-এর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। বলতে গেলে সেটা একেবারেই অন্ধকারাচ্ছন্ন। ১ এ জন্য কুরআনে সংক্ষিপ্ত ইংগীতসমূহের বিস্তারিত তথ্য অবগত হওয়া খুবই কঠিন। তবুও কুরআনের এই সব সংক্ষিপ্ত ইংগিত থেকেও এ কথা সন্দেহাতীত ভাবে জানা যায় যে, মিসরে হযরত ইউসুফ (আঃ) সরকারের একজন সাধারণ অংশীদার ছিলেন না। বরং একচ্ছত্র ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক ছিলেন। তিনি শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়েছিলেনই এই শর্তে যে, তাঁর হাতে সার্বিক ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। নিম্নের আয়াত দু'টি মনোনিবেশ সহকারে পড়ে দেখুনঃ

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَٰلِكَ
مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ
يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ

"ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, আমাকে দেশের যাবতীয় সহায়-সম্পদের কর্তৃত্ব দান করুন। নিশ্চয়ই আমি যথাযথভাবে সংরক্ষক এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী। এভাবে আমি ইউসুফকে ঐ ভূখন্ডের কর্তৃত্ব দান করেছিলাম। সেখানে তিনি যেখানে খুশী স্বীয় আবাস প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন" (সূরা ইউসুফ-৫৫, ৫৬)।

উপরোক্ত রেখা চিহ্নিত বাক্যগুলো থেকে সুষ্ঠুভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি সঠিক ক্ষমতাই চেয়েছিলেন আর পেয়েছিলেনও

১। বাইবেল এবং তালমুদ থেকেও এ সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য জানা যায় না। আর মিসরের প্রাচীন ইতিহাস এবং প্রাচীন নিদর্শনাবলী থেকেও এ ব্যাপারে কিছু জানা যায় না।

সার্বিক ক্ষমতাই। خَزَائِنُ الْأَرْضِ "দেশের সম্পদ-সম্পদ" কথাটা দেখে কেউ কেউ ভুল ধারণায় লিপ্ত হয়েছেন যে, এ শব্দটা বোধ হয় অর্থ মন্ত্রীর অথবা রাজস্ব কর্মকর্তার সমপর্যায়ের। অথচ প্রকৃত পক্ষে এর অর্থ হলো দেশের সমগ্র উপায়-উপকরণ (Resources)। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের দাবী ছিল এই যে, মিসর সাম্রাজ্যের সমস্ত উপায়-উপকরণ তাঁর কর্তৃত্বে সমর্পণ করা হোক। আর এ দাবীর ফলে তিনি এমন ক্ষমতা লাভ করেছিলেন যে, গোটা মিসর ভূখণ্ডে তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ কথাটারও অনেকে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাদের দৃষ্টিতে এর মর্ম শুধু এতটুকুই যে, হযরত ইউসুফ সর্বত্র বসবাস করার বা বাড়ী তৈরী করার অবাধ অনুমতি পেয়েছিলেন। অথচ প্রকৃত পক্ষে এ কথাটা দ্বারা এটাই বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, এক ভূস্বামীর তার সভূমিতে যেরূপ অবাধ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকে, সমগ্র মিসর ভূখণ্ডে হযরত ইউসুফের (আঃ) ঠিক তদরূপ একচ্ছত্র আধিপত্য ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব ছিল।

এরপর যে প্রশ্নটি অবশিষ্ট থাকে তা এই যে, হযরত ইউসুফের (আঃ) করায়ত্ত এই নিরংকুশ ক্ষমতা দ্বারা তিনি দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শ অনুসারে পরিবর্তিত করতে কতখানি চেষ্টা করেছিলেন এবং তাতে তিনি কতদূর সাফল্য লাভ করেছিলেন? ইতিহাসে আমরা এ প্রশ্নের কোন বিস্তারিত জবাব পাই না। তবে সূরা মায়েদার একটি উক্তি থেকে পরোক্ষভাবে আমরা এতটুকু নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে, মিসরে হযরত ইউসুফের (আঃ) শাসন কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষণস্থায়ী শাসন ছিল না। বরং তার পরেও দীর্ঘকাল ব্যাপী তাঁর উত্তরসূরীরা মিশরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁরা নিঃসন্দেহে মুসলমান ছিলেন। শুধু তাই নয়, এই শাসকবর্গ সমসাময়িক পৃথিবীতে নজিরবিহীন প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আয়াতটি নিম্নরূপঃ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ - (المائدة: ٢٠)

"স্মরণ কর, যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিলঃ হে আমার জাতি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের ভিতরে নবীদেরকে আবির্ভূত করেছেন। তোমাদেরকে শাসক বানিয়েছেন এবং পৃথিবীর কাউকে যা দেননি, তা তোমাদেরকে দিয়েছেন" (সূরা মায়েদা–২০)।

এ থেকে আন্দাজ করা চলে যে, এই সর্বাত্মক ইসলামী আধিপত্য ও বিজয় অনিবার্যভাবে দেশের সমগ্র কর্মকাণ্ডে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সূরা মুমিনের যে আয়াত থেকে আপনি এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কিবতী সম্প্রদায় হযরত ইউসুফকে (আঃ) মেনে নেয়নি, আসলে সে আয়াতটি থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত নয়। আমার উপলব্ধি এই যে, সেখানে ভারতের মত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। দেশের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ মুশরিক থেকে গিয়েছিল। [১] যে অংশ ইসলাম গ্রহণ করে সে অংশটিই দীর্ঘকালব্যাপী ক্ষমতাসীন ছিল। কিন্তু ক্রমাগত নৈতিক ও আকীদাগত অধপতন তাকে গোলামী ও গোমরাহীর গভীর আবর্তে নিক্ষেপ করে। শেষ পর্যন্ত এই জনগোষ্ঠীটি ব্যক্তিপূজা ও ধর্মীয় বাড়াবাড়ীর বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে এমন অবস্থার শিকার হয় যে, অন্যান্য পৌত্তলিকদের সাথে তাদের কার্যত কোন উল্লেখযোগ্য প্রভেদ ছিল না। ফিরাউনের দরবারের ঈমানদার লোকটি এ বিষয়ের দিকে ইংগীত করেই নিম্নোক্ত কথাটা বলেছেনঃ

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا - (المؤمن: ٣٤)

"ইতিপূর্বে ইউসুফ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি যা নিয়ে এসেছিলেন, তা নিয়ে তোমরা অনবরত সন্দেহে লিপ্ত রইলে। অতপর তিনি যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন তোমরা বললে যে, এখন ওর আল্লাহ আর কোন রসূল পাঠাবেন না" মুমিন-৩৪)।

রেখা চিহ্নিত কথাগুলোর মধ্যে প্রথমটি থেকে বুঝা যায় যে, হযরত ইউসুফের (আঃ) জীবদ্দশায় দেশের অধিকাংশ মানুষ তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে সন্দিহান ছিল, যেমন-অধিকাংশ নবীদের ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে। দ্বিতীয় কথাটি থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর ভক্তরা তাঁর ব্যক্তিত্বের পূজারী হয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করে দেয় এবং বলতে থাকে যে, এখন আর কোন রসূল আসতে পারে না। এরই ভিত্তিতে তারা পরবর্তী নবীদেরকে অগ্রাহ্য করে। পরবর্তী সময়ে ইহুদী ও খৃষ্টানরা এ কাজই করেছিল। অথচ হযরত ইউসুফ (আঃ) হযরত মূসা (আঃ) কিংবা হযরত ঈসার কারো পরেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়ত সমাপ্তির ঘোষণা দেয়া হয়নি।

তবে কোন অবস্থাতেই আয়াতটির এরূপ মর্মোদ্ধারের অবকাশ নেই যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ওপর দেশের কেউ ঈমান আনেনি। বরং অন্যান্য আভাস-ইংগীত থেকে এটাই অনুমিত হয় যে, দেশের মুমিনদের একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তারা বনী ইসরাঈলের সাথে মিলিত হয়ে দীর্ঘদিন ইসলামী শাসন চালু রেখেছিল। তবে পরবর্তী সময়ে তারা ক্রমান্বয়ে অধোপতনের (Degenerate) শিকার হয়ে পড়ে।

হযরত ইউসুফের (আঃ) মা-বাপ ও ভাইরা তাঁকে যে সিজদা করেছিলেন, সে সম্পর্কে আমি যতটা অনুসন্ধান চালিয়েছি, তাতে তার তাৎপর্য এই যে, কুরআনের এই জায়গাটিতে 'সিজদা' শব্দটি ইসলামী পরিভাষায় সিজদার যে অর্থ, সে অর্থে অর্থাৎ মাটিতে হাত, হাঁটু ও কপাল ঠেকিয়ে অবনত হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। পরিভাষাগত এই সিজদা হলো প্রকৃত পক্ষে সিজদার পূর্ণতম রূপ-যা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের সাথে নির্দিষ্ট। অভিধানে এর অর্থ

হলো বিনীত হওয়া ও কৃপা প্রার্থী হওয়া। যে কোন ধরনের কাজ বা হাবভাব দ্বারা এ অবস্থা ব্যক্ত করা যেতে পারে। কারো উপকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কিংবা কারো সামনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করার জন্য তার সামনে দাঁড়িয়ে ঈষৎ মাথা নোয়ানো বনী ইসরাঈলী সমাজে ভদ্র আচরণের রীতি বলে গণ্য হতো এবং এটাকে তাদের ভাষায় সিজদা বলা হতো। তাওরাতের আরবী অনুবাদে বলা হয়েছে যে, হযরত লূতের (আঃ) জাতির ওপর আজাব নাজিল করার কাজে নিয়োজিত ফেরেশতারা যখন হযরত ইবরাহীমের (আঃ) কাছে মানুষের বেশে উপনীত হলেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে বাইরে এলেন এবং খানিকটা মাটির দিকে ঝুঁকে অভিবাদন জানালেন।

فَلَمَّا نَظَرَ رَكَضَ لِاسْتِقْبَالِهِمْ مِنْ بَابِ الْخَيْمَةِ وَسَجَدَ إِلَى الْأَرْضِ

অনুরূপভাবে, যখন হযরত সারার ইন্তিকাল হলো এবং বনুহিত্ তার কবরের জন্য বিনা মূল্যে যমী দিল, তখন সেখানেও হযরত ইবরাহীম বনুহীত-এর উপাকারের কৃতজ্ঞতায় সিজদা করলো।

فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ وَسَجَدَ لِشَعْبِ الْأَرْضِ لِبَنِي حِتٍّ-

(فَسَجَدَ إِبْرَاهِيمُ أَمَامَ شَعْبِ الأرض)

ইংরাজীতে (Bow) করা যাকে বলা হয় এটা ঠিক তাই। ইউরোপে এটা আজও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের স্বীকৃত রীতি। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্বীয় ভাইদের জুলুমের প্রতিদানে যে ক্ষমা, অনুগ্রহ ও কৃপাপূর্ণ আচরণ করেছিলেন এবং কিনানের যাযাবর জীবনের পরিবর্তে মিসরে সম্মান ও মর্যাদার যে উচ্চ আসনে তাদেরকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন, তার কৃতজ্ঞাতায় তার ভাইরা ও তাঁর পিতা-মাতা নিজেদের সমাজে প্রচলিত রীতি অনুসারে মাথা নোয়ান। এটাই ছিল সেই স্বতস্পূর্ত মাথা নোয়ানো যাকে কুরআনে خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا (তারা সকলে তার সামনে সিজদা করলেন।) কথাটা দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

(তরজমানুল কুরআন রবিউস সানী ১৩৬৩ হিঃ এপ্রিল ১৯৪৪)

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এবং অনৈসলামিক সরকারের সদস্য পদ

(বিগত "সূরা ইউসুফ সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্ন" শীর্ষক নিবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পর একজন খ্যাতনামা মনীষী–যিনি এখন জীবিত নেই, যিনি খান বাহাদুর উপাদিতে ভূষিত ছিলেন এবং ইউপিতে কালেক্টর ও ভারতের একটি দেশীয় রাজ্যে দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমার উক্ত নিবন্ধের দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। উক্ত মনিষীর সমালোচনা না পড়ে আমার জবাব বুঝা সম্ভব নয় বিধায় আমরা এখানে প্রথমে তার সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করছি। এর পর আমাদের জবাব উদ্ধৃত করবো।)

প্রশ্নকর্তা যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং যে কথা প্রকৃতপক্ষে বিবেচ্য বিষয়, তা শুধু এতটুকুই যে, হযরত ইউসূফের (আঃ) এ কাজটি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে যায়েজ কি না? মওলানা মওদূদী সাহেব বলেন যে,"হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের পদমর্যাদা মিসরে অনৈসলামিক সরকারের একজন অংশীদারের অনুরূপ ছিল না।" আশ্চার্য্যের বিষয় যে, তিনি তাঁর এই মতের সমর্থনে কুরআনের সেই আয়াতই অর্থাৎ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ (সূরা ইউসুফ (৯৫৫) পেশ করেন, যা প্রকৃত পক্ষে এর বিপরীতটাই প্রমাণ করে।

উক্ত আয়াতের শাব্দিক অনুবাদ শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসানের ভাষায় নিম্নরূপঃ

"ইউসুফ বললেন, আমাকে নিযুক্ত করুন দেশের ধন-সম্পদের দায়িত্বে। আমি প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী এবং রক্ষক। এভাবে আমি ইউসুফকে ক্ষমতা দিলাম সেই ভূখন্ডে। তিনি স্থান গ্রহণ করতেন সেই ভূখন্ডে যেখানে চাইতেন।"

লক্ষ্য করুন যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম মিসরের ফেরাউনের কাছে আবেদন জানালেন যে, আপনি আমাকে দেশের ধনসম্পদের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন। ফিরাউন তার আবেদন মঞ্জুর করে এবং তিনি অর্থ বিভাগের কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। স্পষ্টতই এর ফল দাঁড়ালো এই যে, তিনি ফিরাউনের সরকারের একজন সদস্য বা অংশীদার হয়ে গেলেন। এই স্বাভাবিক ফলশ্রুতিকে পাশ কাটানোর ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে গিয়ে মওলানা মওদূদী বলেন, "দাবী ছিল নিরংকুশ ক্ষমতার এবং পেয়েছিলেনও নিরংকুশ ক্ষমতা।"....

প্রথমত নিরংকুশ বা সার্বিক ক্ষমতা বোধক শব্দ কুরআনে নেই। এ শব্দটা মওলানা সাহেব নিজের তরফ থেকে কুরআনে সংযোজন করতে চান, যাতে কুরআন মওলানার ব্যক্তিগত মতাদর্শের বাহক হয়ে যায়, এ জন্য নয় যে, মওলানা নিজের ব্যক্তিগত মতবাদকে কুরআন মোতাবেক শুধরে নেবেন। এ ধরনের মনোবৃত্তি সম্পর্কে সম্ভবত মরহুম কবি ইকবাল বলেছিলেনঃ " তারা নিজেরা শুধরায় না। বরং কুরআনকে বদলায়।" কিন্তু এই সার্বিক বা নিরংকুশ শব্দটার অবৈধ সংযোজন সত্ত্বেও মওলানার গবেষণা বা মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায় না। ধরে নিলাম যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) অর্থ সম্পদ সংক্রান্ত সার্বিক ক্ষমতা চেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেনও সার্বিক ক্ষমতাই। কিন্তু এই ক্ষমতা তিনি মিসরের ফিরাউনের কাছেই তো চেয়েছিলেন এবং মিসরের ফিরাউনই তো সেটা দিয়েছিল। সুতরাং নিরংকুশ ও সার্বিক ক্ষমতা লাভ করা সত্ত্বেও তখনকার শাসন ব্যবস্থায় তাঁর অবস্থান একজন সদস্য বা অংশীদারের উর্ধের কিছু হতে পারে না।

মওলানা মওদূদী সাহেবের এ উক্তিও বাস্তবতার বিপরীত যে, "হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের দাবী ছিল এই যে, মিসর সাম্রাজ্যের সকল উপায়-উপকরণ আমার দায়িত্বে সমর্পণ করা হোক এবং দাবীর পরিণতিতে তিনি যে ক্ষমতা লাভ করলেন তাতে সমগ্র মিসরের ভূমি তাঁর নিজস্ব ভূমিতে পরিণত হলো।" এ কথা যদি মেনে নেওয়াও হয় যে, ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম অর্থ সংক্রান্ত সার্বিক ক্ষমতা দাবী করেছিলেন এবং অর্থ সংক্রান্ত

একচ্ছত্র কর্তৃত্ব তার হাতে অর্পণ করা হয়েছিল। তথাপি এ কথা সবার জানা যে, একটি রাষ্ট্রে অর্থ ছাড়া আরো বহু বিভাগ থাকে। যেমন–পুলিশ, সশস্ত্রবাহিনী, বিচার বিভাগ। এসবের কোনটির দায়িত্ব ইউসুফ আলাইহিস সালাম চানওনি, ওগুলো তাঁর দায়িত্বে অর্পিতও হয়নি। তা যখন হয়নি, তখন মওলানার এ কথা বলা যে, "তিনি যে ক্ষমতা লাভ করেছিলেন তাতে সমগ্র মিসরের ভূমি তাঁর নিজের ভূমিতে পরিণত হয়েছিল" সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

অতএব ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিসরের সমস্ত অর্থ সম্পদের দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেও তাঁর মর্যাদা সাম্রাজ্যের ক্ষমতার একজন অংশীদার বা সরকারের সদস্যের পর্যায়েই থাকে যতক্ষণ কোন উপায়ে প্রমাণিত না হয় যে, মিশসরের ফিরাউন সাম্রাজ্যের শাসন থেকে অবসর নিয়েছিল এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর স্থলে মিসরের সম্রাট হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ তার সম্রাট হওয়ার কথা ইতিহাস থেকেও প্রমাণিত হয় না, কুরআন থেকেও নয়। বরং কুরআন থেকে এ ধারনা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যাত। আলোচ্য আয়াতের অব্যবহিত পূর্বের আয়াতটি লক্ষ্যণীয়ঃ

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ
إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۔ (يوسف ۵۴)

"সম্রাট বললো, তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের জন্য মনোনীত করবো। অতপর সে যখন ইউসুফের সাথে কথা বললো, বললো যে, নিশ্চয়ই আপনি আজ আমাদের কাছে সম্মানিত ও বিশ্বস্ত।" (ইউসুফ–৫৪)

উভয় আয়াত থেকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, মিশরের ফিরাউন হযরত ইউসুফকে (আঃ) স্বীয় সাম্রাজ্যের সম্মানিত ও বিশ্বস্ত সদস্য এবং নিজের বিশেষ উপদেষ্টা নিযুক্ত করে। এ আয়াত দু'টিতে এমন কোন আভাসও নেই যে, মিসরের ফিরাউন স্বীয় সাম্রাজ্য অথবা ক্ষমতা পরিত্যাগ করেছিল। এছাড়া পরবর্তী একটি আয়াত থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) কর্তৃক মিসরের সকল অর্থসম্পদের দায়িত্ব গ্রহণেরও অনেক পর পর্যন্ত

মিসরে ফিরাউনের রাজত্ব বহাল ছিল এবং তার ধর্মই দেশে চালু ছিল। কেননা ইউসুফের (আঃ) ভাইরা যখন দ্বিতীয়বার খাদ্যশস্য আনার জন্য মিসরে আসে, তখন হযরত ইউসুফের (আঃ) ইচ্ছা মোতাবেক তাঁর আপন ভাই বিন ইয়ামিনকেও নিয়ে আসে। হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাই বিন ইয়ামীনকে নিজের কাছে রেখে দেন এবং তাকে জানিয়েও দেন যে, তিনি তাঁর আপন ভাই, কিন্তু তাঁর অন্যান্য ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করেনি। এই সময় যেহেতু ইউসুফ (আঃ) ভাইদের কাছে বিন ইয়ামিন তার আপন ভাই একথা প্রকাশ না করেই বিন ইয়ামিনকে নিজের কাছে রেখে দিতে চেয়েছিলেন, তাই এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। ইউসুফের (আঃ) ভাইদের জন্য যখন তাদের আসবাবপত্র প্রস্তুত করা হলো, তখন বিন ইয়ামীনের আসবাবপত্রের ভিতর একটা পানপাত্র লুকিয়ে রাখা হলো। অতপর কাফেলা রওনা দিতে আরম্ভ করলে এক ঘোষক চিৎকার করে বললো যে, ওহে কাফেলার লোকেরা! তোমরা নিশ্চয়ই চোর। ইউসুফের ভাইরা এ কথা অস্বীকার করলে ঘোষক বললো যে, তোমরা যদি মিথ্যাবাদী প্রমানিত হও, তা হলে এর কি শাস্তি গ্রহণ করবে? ইউসুফের ভাইরা বললো, যার আসবাবপত্রে এটা পাওয়া যাবে, সেই তার বদলায় যাবে। আমরা অপরাধীদের এরকম শাস্তিই দিয়ে থাকি। এরপর তল্লাশি চালানো হলে পানপাত্রটি বিন ইয়ামীনের আসবাবপত্র থেকে বের হলো। এভাবে পান পাত্রের বদলায় বিন ইয়ামীনকে আটক করা হলো। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (يوسف : ٧٦)

"আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ইউসুফের পক্ষে বাদশাহর ধর্ম অনুসারে আপন ভাইকে আটক করা সম্ভব ছিল না" (ইউসুফ-৭৬)।

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মিসরের রাজকীয় আইন তখনো দেশে প্রচলিত ছিল এবং সে আইন অনুসারে হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বীয় ভাই বিন ইয়ামীনকে চুরির দায়ে ভাইদের কাছ থেকে ধরে রাখতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ স্বয়ং তাঁর ভাইদের

মুখ দিয়ে এ কথা বলিয়ে নিলেন যে, যার আসবাবপত্র থেকে পানপাত্র পাওয়া যাবে তাকেই তার বিনিময়ে থেকে যেতে হবে। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে মওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী বলেন যে, "অর্থাৎ ভাইদের মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরুলো যে, যার কাছে জিনিসটা পাওয়া যাবে তাকে গোলাম বানিয়ে নাও। এ জন্যই তাকে গ্রেফতার করা হলো। নচেৎ মিসরের আইন এ রকম ছিল না। তারা নিজেদের স্বীকারোক্তিতেই ফেঁসে যায়। এমন ফন্দি যদি না করা হতো তা হলে রাজকীয় আইন অনুসারে বিন ইয়ামীনকে আটক করার কোন উপায় ছিল না।"

তাই বলে এ কথা বলা চলে না যে, মিসরের মন্ত্রীত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ইসলাম প্রচারের কাজ করেননি কিংবা নিজের নবুয়তের কথা ব্যক্ত করা থেকে বিরত থেকেছেন। বরঞ্চ তিনি জেলে থাকাকালেই তাওহীদের মর্মবাণী প্রচার করা শুরু করে দিয়েছিলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) নিজের সহবন্দী দ্বয়কে সম্বোধন করে বলেনঃ

يَٰصَٰحِبَيِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ
مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم
مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟
إِلَّآ إِيَّاهُ - (يوسف: ٣٩-٤٠)

"হে আমার কারা বন্দীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন প্রভু ভাল, না একমাত্র মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ? তোমরা যে সব সত্ত্বার পূজা কর সেগুলো তো কেবল তোমাদেরই নির্ধারিত কতকগুলো নাম ছাড়া আর কিছু নয়। যার সমর্থনে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। বিচার ফায়সালা ও শাসন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁর ব্যতীত আর কারোর ইবাদত করো না। " (ইউসুফ ৩৯–৪০) এমনিভাবে এটাও ধরে নৈয়া যায় যে, মন্ত্রী হওয়ার পরও হযরত ইউসুফ (আঃ) ইসলাম প্রচারের কাজ অবশ্যই অব্যহত রেখেছিলেন।

তবে এ আয়াতগুলো থেকে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) একটা অনৈসলামিক সরকারের সদস্য হয়েছিলেন নিজেরই আগ্রহ ও আবেদনক্রমে। আর তাঁর সরকারের সদস্য হওয়ার পরও দেশে অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থা এবং অনৈসলামিক আইনই চালু ছিল। তাঁর এ কাজে আল্লাহর তরফ থেকে কোন তিরস্কার তো করাই হয়নি, অধিকন্তু তাঁর এক রকম প্রশংসাই করা হয়েছে। কেননা ইউসুফ আলাইহিস সালামের মিসরের ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠা লাভ করাকে আল্লাহর পুরস্কার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ
نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

"এভাবেই আমি ইউসুফকে সেই ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে সে তার যেখানেই ইচ্ছা নিজের স্থান করে নিতে পারে। আমি যাকে চাই, আমার অনুগ্রহে সিক্ত করি আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কার আমি কখনো নষ্ঠ করি না।"

এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সাধারণ মুসলমান তো দূরের কথা নবীদের পক্ষেও অনৈসলামিক সরকারের সদস্য হওয়া বৈধ। শুধু বৈধই নয়, ক্ষেত্র বিশেষে ফরযে কিফায়ার মত অপরিহার্য কর্তব্যও বটে। কেননা হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের নিজ আগ্রহে মিসরের অর্থ ভান্ডারের দায়িত্বশীল হওয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ কাজকে হযরত ইউসুফ (আঃ) নিজের জন্য শুধু বৈধ নয়, কর্তব্যও মনে করতেন। তা না হলে ফিরাউনের কাছে তিনি কখনো এ ব্যাপারে নিজের অভিলাস প্রকাশ করতেন না এবং এরূপ অভিলাস প্রকাশ করার সময় নিজের অভিজ্ঞ ও রক্ষক হওয়ার কথাও ব্যক্ত করতেন না। কেননা তাঁর মতে যদি মিসরের ওজারতীর দায়িত্ব গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য না হতো, তা হলে তাঁর পক্ষে নিজেকে অভিজ্ঞ ও রক্ষক বলা অবান্তর আত্মপ্রশংসার পর্যায়ে পড়ে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মওলানা শাব্বীর

আহমদ উসলামনী যে টিকা লিখেছেন, তা অনেকাংশে আমার মতের সমর্থক। তিনি বলেনঃ

"অর্থাৎ আমি সম্পদের সংরক্ষণও করবো এবং তার আয়-ব্যয়ের খাতসমূহ ও তার হিসাব-নিকাশ সম্পর্কেও আমি যথেষ্ট অভিজ্ঞ। ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্বয়ং আবেদন করে অর্থ দফতরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যাতে এ পন্থায় জনগণের সেবা ও উপকার করতে পারেন। বিশেষত আসন্ন ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের সময় যাতে অত্যন্ত সুচারু রূপে জনগণের অবস্থা তদারকী ও সরকারের আর্থিক অবস্থা মজবুত রাখতে পারেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, জনগণের প্রতি সহানুভূতির টানে আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করা নবুয়তের মর্যাদার পরিপন্থী নয়। তাছাড়া কোন মানুষ যদি সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মনে করে যে, আমি অমুক পদের উপযুক্ত এবং অন্য কারো পক্ষে এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব নয়, তা হলে সে মুসলমানদের হিত কামনা ও সেবার লক্ষ্যে সেই পদ প্রার্থনা করতে পারে। আর এ জন্য নিজের কিছু সৎ গুণাবলীর উল্লেখ করার যদি প্রয়োজন পড়ে তবে সেটা অবৈধ আত্মপ্রশংসায় গণ্য হবে না।"

মওলানা উসমানী সাহেবের উল্লিখিত তাফসীর থেকে হয়তো পাঠক মহোদয়ের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বতপ্রবৃত্ত হয়েই অর্থ বিভাগের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি সার্বভৌম ও একচ্ছত্র শাসক হয়ে যাননি। লাহোরের পত্রিকা 'মুসলমানের' ১৩ই জানুয়ারী ১৯৪২ সংখ্যায় জনাব আব্দুল গাফফার চান্দুয়াড়ীর একটা চিঠি ছাপা হয়েছে। ঐ চিঠিতে তিনি বলেন, "হযরত মওলানা শাহ আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে ইংরেজদের বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগে চাকরি করা জায়েজ আছে। তাছাড়া মওলানা আব্দুল হাই ফিরিঙ্গী মহল্লীর মতেও এটা জুলুম ও গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকলে জায়েজ বরং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইসলামী স্বার্থের সহায়ক।"

বর্তমান যুগের আলিমদের মধ্যে হাকীমুল উম্মত. মওলানা আশরাফ আলী থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সমকালীন ভারতের

শ্রেষ্ঠতম ফেকাহ বিশারদ রূপে স্বীকৃত ছিলেন। তাঁর মতেও বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় চাকরি করা অবৈধ নয়। মওলানা থানবীর কতিপয় বিশিষ্ট খলিফা সরকারী চকুরে ছিলেন, মওলানা খাজা আযীযুল হাসান গোরী তাদের অন্যতম।

ভারতের নির্ভরযোগ্য আলিমদের সবচেয়ে বড় সংগঠন জমিয়াতুল ওলামায়ে হিন্দের মতেও বর্তমান সরকারের সদস্য হওয়া নাজায়েয নয়। কেননা এই সম্মানিত সংগঠনের শরীয়ত বিষয়ক জ্ঞান ও অনুমতির কল্যাণে অতীতের কংগ্রেসী সরকারগুলোর আমলে বহুসংখ্যক মুসলমান কংগ্রেস সরকারের সদস্য হয়েছিলেন। এ জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমদের অভিমত বোধ হয় এই যে, একটি অনৈসলামিক সরকারের সদস্য হওয়া এবং সেই সরকারের কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ অবৈধ নয়। তাই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ফিরাউনের অনৈসলামিক সরকারের– যার কুফরী চরিত্র পরবর্তী সময়েও অব্যাহত ছিল–সদস্য বা অংশীদার হওয়া যদি আমাদের জন্য সনদ বা দৃষ্টান্ত হতে পারে অথবা মওলানা শাহ আব্দুল আযীয সাহেব (রহঃ), মওলানা আবদুল হাই ফিরিঙ্গী মহল্লী এবং ভারতে অধিকাংশ আলিমের চিন্তা গবেষণা প্রসূত সিদ্ধান্ত যদি আমাদের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে, তাহলে মাওলানা মওদূদী সাহেব ও জামায়াতে ইসলামীর যে সব ফতোয়া মুসলমানদেরকে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার অধীনে যে কোন পর্যায়েই চাকরি করতে বাধা দেয় এবং এরূপ চাকরির মাধ্যমে ঐ সব মুসলমানের উপার্জিত সকল অর্থ সম্পদকে হারাম বলে রায় দেয় সেই সব ফতোয়া সম্পূর্ণরূপে বাতিল ও অচল ঘোষিত হওয়ার যোগ্য। এর বিপরীত হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের দৃষ্টান্ত ও কর্ম দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আমরা মুসলমানদের জন্য প্রচলিত শাসন ব্যবস্থায় যোগদান করা শুধু বৈধই নয় বরং ফরযে কিফায়া হিসাবে তা অবশ্য কর্তব্যও বটে। (এরপর খান বাহাদুর সাহেব কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিও প্রদর্শন করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে আবিসিনিয়ায় হিযরতের ঘটনা থেকেও প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আমরা সে সব বক্তব্যের উদ্ধৃতি দানে বিরত থাকছি।

জবাব

আমি জনাব খান বাহাদুর সাহেবের নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞ যে, তিনি প্রশ্নটার অবতারণা করে আমাকে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি শুধু এই আশায় এ আলোচনায় সময় ব্যয় করছি যে, এতে করে বহু সংখ্যক সত্যানুসন্ধানী মানুষ সেই সব বিভ্রান্তিকর যুক্তির জবাব পেয়ে যাবেন, যা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য শক্তি বা কর্তৃপক্ষের আনুগত্য করা অথবা অন্য কথায় আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য শক্তি বা কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করাকে বৈধ এবং কুফরী শাসন ব্যবস্থার গোলামী করাকে মুবাহ এমনকি ফরজে কিফায়া সাব্যস্ত করার জন্য পেশ করা হয়ে থাকে।

ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনার আলোচ্য দিকটি নিয়ে ইতিপূর্বে আমি দুবার আলোচনা করেছি। তন্মধ্যে প্রথম আলোচনাটা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে ও যুক্তিপূর্ণভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। আর দ্বিতীয়টা ছিল সংক্ষিপ্ত। কিন্তু খান বাহাদুর সাহেব বিস্তারিত আলোচনাটা বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তুলেছেন। এটা কোন কারণে করলেন জানি না। অথচ তিনি স্বীয় নিবন্ধে যে সব আপত্তি তুলেছেন, তার অধিকাংশ বরং সম্ভবত সব কটারই জবাব আমার প্রথম আলোচনায় পাওয়া যেতে পারতো।[১] সে যা হোক, এ পাশ কাটানোর কারণ যেটাই হোক না কেন, আমাদের সামনে এর কল্যাণকর দিকটাই প্রধান হয়ে ফুটে উঠেছে। যে কথাগুলো আমরা নিজেরা বারংবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিষ্কার করে বলতে পারতাম না, অন্যদের খোঁচানোতে তা স্পষ্ট করে বলার সুযোগ আমাদের হস্তগত হয়েছে। দুনিয়াতে একজন কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন ও সুস্থ বিবেকধারী মানুষের কাছ থেকে যে সব জিনিস আশা করা হয়, তার মধ্যে সম্ভবত পয়লা জিনিস এটাই যে, তার কথা–বার্তা যেন পরস্পর বিরোধী না হয়। একজন স্বল্প

১. এই বইয়ের "উদারতা ও পরমত সহিষ্ণুতার অনৈসলামিক ধারণা" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধির মূর্খ গোঁয়ার লোকও যখন কাউকে এধরনের পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা বলতে দেখে, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাতে আপত্তি তোলে। কেননা তার অমন স্থূল বুদ্ধিও স্ববিরোধী কথা বার্তার বোকামী সহ্য করতে পারেনা। কিন্তু এটা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, অত্যন্ত নিন্মমানের বুদ্ধিমান লোকের কাছ থেকেও যা আশা করা যায়না, সেটাই সেই আল্লাহর কাছ থেকে আশা করা হচ্ছে, যিনি নিজেই বিবেকবুদ্ধির সৃষ্টিকর্তা এবং সমস্ত প্রজ্ঞা ও সুক্ষ্মজ্ঞানের অধিকারী। আরো আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, আল্লাহর কাছ থেকে এহেন চরম নির্বুদ্ধিতা যারা আশা করছে, তারা কোন অজ্ঞ ও নির্বোধ লোক নয়, বরং সারা দুনিয়ার মানুষকে জ্ঞান ও বুদ্ধির সবক শেখানোর কাজে নিয়োজিত বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করতে এই পন্ডিতদের–এর ক্ষুরধার বুদ্ধি নিরন্তর যুদ্ধে লিপ্ত। এমন সচেতন ও জাগ্রত বিবেকের অধিকারী হয়েও তারা চান এবং আশা করেন যে, আল্লাহর কথার স্ববিরোধীতা থাকুক। অর্থাৎ তিনি একদিকে বলবেন যে, আমি আকাশ ও পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট। আবার আপর দিকে তিনি পৃথিবীর কোন কোন অংশে অণ্যের রাজত্ব ও আধিপত্য বহাল থাকাকেও স্বীকার করে নেবেন। একদিকে তিনি বলবেন, তোমরা সকলে একমাত্র আমার হুকুমের আনুগত্য কর। পরক্ষণে তিনিই আবার মানুষকে সেই সব শাসকের আনুগত্য করার অনুমতি দেবেন, এমনকি আনুগত্য করাকে ফরয পর্যন্ত ঘোষণা করবেন, যে সব শাসক আল্লাহর আদেশের সনদ ছাড়াই বরঞ্চ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ দান করে থাকে। তিনি মানুষের জন্য একটা আইন রচনাও করবেন এবং এ কথাও ঘোষণা করবেন যে, এটাই আমার আইন, এ আইন ছাড়া আর সব কিছুই বাতিল। আবার সেই সাথে অন্যান্য আইন প্রবর্তন ও প্রচলনকেও বৈধ করে দেবেন এবং যে মানুষের জন্য তিনি নিজে আইন রচনা করেছেন, সেই মানুষকেই এ ''অধিকার'' দেবেন যে, ইচ্ছা হয় তারা নিজেরা নিজেদের জন্য কোন আইন রচনা করে নিক, আর না হয় অন্য কারো আইন অনুসরণ করতে থাকুক। পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে আল্লাহর দীন গ্রহণের দাওয়াত দেয়ার

একমাত্র উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর নবীদেরকেও পাঠাবেন, আবার সেই নবীদেরকেই বা তাদের কাউকে এ অনুমতিও দেবেন (এমনকি খান বাহাদুর সাহেবের বক্তব্য অনুসারে এ জন্য তাদেরকে অভিনন্দিতও করবেন) যে, আল্লাহর এ দীন ছাড়া অন্য কোন দীনের আওতাধীন রাষ্ট ব্যবস্থায় কর্মচারী ও ভৃত্য হয়ে যাক এবং তাকে সফলতার সাথে পরিচালনা করতে নিজেদের যোগ্যতা ও প্রতিভাকে কাজে লাগাক। তিনি সারা দুনিয়ার অধিবাসীদের মধ্য থেকে বাছাই করে একটি বিশেষ উম্মত এ উদ্দেশ্যে তৈরী করবেন যে, তারা আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত সৎ কাজগুলোর আদেশ দেবে এবং আল্লাহ কর্তৃক ধিকৃত অসৎ কাজগুলোকে সমাজ থেকে উচ্ছেদ করবে। আবার খোদাদ্রোহীদের দৃষ্টিতে ভালোলাগা অসৎ কাজগুলোকে কায়েম করা ও চালু রাখার কাজে অংশ গ্রহণ এবং তাদের দৃষ্টিতে খারাপ বলে বিবেচিত সৎ কাজগুলোকে উৎখাত করা ও দমিয়ে দেয়ার কাজে ব্যবহৃত ও নিয়োজিত হওয়াকে সেই উম্মাতের জন্যই বৈধও করে দেবেন, এমনকি তার কোন কোন "মনোনীত" বান্দার জন্য এ কাজকে ফরযে কিফায়াও ঘোষণা করবেন। এগুলো এমন সুস্পষ্ট স্ববিরোধী ব্যাপার যে, এর স্ববিরোধিতা বুঝতে কোন গভীর চিন্তা গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যারা কুরআনের তাফসীর লেখা এবং ফিকহ ও অন্যান্য যুক্তিনির্ভর বিদ্যায় অধ্যাপনা করার মত পারদর্শিতা রাখেন, যারা কালেক্টরী ও দেওয়ানীর মত বড় বড় পদের গুরুদায়িত্ব বহনের ক্ষমতা ও দক্ষতার অধিকারী, তারা এ সব দু'মুখো কার্য্যকলাপে যেন কোন স্ববিরোধীতাই দেখতে পান না অথবা স্বয়ং বিশ্বপ্রতিপালক সম্পর্কে তাদের ধ্যান ধারণা এত খারাপ যে, একজন নিরেট মূর্খ ও গোঁয়ার লোকও তার আশপাশের কোন বন্ধুর মধ্যে যে সব বেকুফী ও গোয়ার্তুমী দেখে তা সহ্য করতে পারেনা। তা স্বয়ং আল্লাহর মধ্যেও থাকা সম্ভব বলে তারা মনে করেন। খান বাহাদুর সাহেব তাঁর উক্ত নিবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেনঃ

"পরবর্তী একটি আয়াত থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইউসুফের (আঃ) মিসরীয় অর্থ ভান্ডারের ক্ষমতা ও

কর্তৃত্ব লাভের পরও ফিরাউনের রাজত্ব বহাল ছিল এবং ফিরাউনের বিধি-বিধানই মিসরে প্রচলিত ছিল।

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (يوسف ৭৬)

("বাদশাহর অনুসৃত বিধানে তিনি কখনো আপন ভাইকে রাখতে পারতেন না, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত" সূরা ইউসুফ-৭৬)। এ বাক্যটি সুস্পষ্টরূপে বলে দিচ্ছে যে, ফিরাউনের রাজকীয় আইনই তখন পর্যন্ত মিসরে চালু ছিল।

এ কথাগুলো লেখার সময় খান বাহাদুর সাহেবকে একটা নির্দিষ্ট তত্ত্ব প্রমাণ করার নেশায় এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, তাঁর এই মনগড়া তাফসীরের দরুন এখানে কুরআনের বর্ণনায় যে সুস্পষ্ট স্ববিবোধিতার উদ্ভব হয়, তা নিয়ে ক্ষণিকের জন্যও একটু ভেবে দেখার ফুরসত তিনি পাননি। এখন অনুরোধ করি, তিনি যেন আমার দৃষ্টি আকর্ষণে সাড়া দিয়ে এখন অন্তত একটু ভেবে দেখেন। তার উদ্ধৃত আয়াতে এখানে আল্লাহ ফিরাউনের সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধানকে "দীনুল মালিক" অর্থাৎ " রাজকীয় দীন" শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।এ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, 'দীন' শুধু উপাসনালয়ে যে পূজা-অর্চনা করা হয় তার নাম নয়, বরং যার বলে পুলিশ অপরাধীদেরকে পাকড়াও করে, যার অধীনে আদালত-দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার ফায়সালা করে। যার অনুসরণে দেশের শাসনকার্য্য পরিচালিত হয় এবং যার ওপর সমাজ ও সভ্যতার গোটা কাঠামো প্রতিষ্ঠিত, সেই আইন-কানুনও বিধি-বিধানের নাম 'দ্বীন'। মানব জীবনের এই সকল দিক ও বিভাগ সামগ্রিকভাবে যে নিয়ম-নীতি, রীতি-প্রথা ও পদ্ধতি অনুসারে চলে, কুরআনী পরিভাষায় তাকেই 'দীন' বলা হয়। যেহেতু মিসরে প্রচলিত তৎকালীন নিয়ম-নীতি, রীতি-প্রথা ও পদ্ধতি প্রণালী ফিরাউনের ইচ্ছা থেকেই উদগত ও উৎপন্ন হতো এবং তার সার্বভৌম ও নিরংকুশ ক্ষমতাই ছিল তার উৎপত্তির উৎস ও ভিত্তি, সেহেতু কুরআন তাকে "দীনুল মালিক" (রাজার দ্বীন) বলে আখ্যায়িত করেছে। এথেকে একথা বুঝা গেল যে, "দীনুল্লাহ" বা "আল্লাহর দ্বীন" শুধু মসজিদের চার দেয়ালে এবং নামাজ রোজার

মধ্যেই সীমিত, আবার অনুষ্ঠানের নাম নয় বরং এটাও আল্লাহর গোটা শরীয়ত ব্যবস্থার আনুগত্যের নাম, যার উদ্ভব ঘটে আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি থেকে, যার উৎপত্তি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব থেকে এবং যা মানুষের সামাজিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগ নিয়ে ব্যপ্ত ও বিস্তৃত। এখন প্রশ্ন এই যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কোন্ কাজের জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন? "আল্লাহর দীনএর দাওয়াত দিতে, না,"রাজার দীন" কে চালু করতে ও উৎকর্ষ দিতে? খান বাহাদুর সাহেবের ব্যাখ্যা এবং তিনি যে মনীষীদের নামোচ্চারণ করে আমাদেরকে ভড়কিয়ে দিতে চান তাদের তাফসীর যদি মেনে নেয়া হয়, তা হলে এ কথাও মেনে নিতে হয় যে, আল্লাহতায়ালা একদিকে তাঁর নবীকে এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন তাঁর বান্দাদেরকে– বিশেষত মিসরবাসী বান্দাদেরকে 'আল্লাহর দীন' গ্রহণের দাওয়াত দেন, আর অপরদিকে সেই নবী স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে "রাজার দীন" কায়েম করা ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োজিত হয়ে গেলেন। আরো মজার ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ এমন সুস্পষ্ট পরস্পর বিরোধী কার্য্য কলাপে কোন বৈপরিত্য ও বৈসাদৃশ্য আছে কিনা তা টেরই পেলেন না। বরং ঐ নবীর ঐ কার্য্যকলাপকে খানবাহাদুর সাহেবের ভাষায় অভিনন্দন জানাতে ও প্রশংসা করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, কুফরী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাঁর নবীর ওজারতী লাভকে "খোদায়ী পুরস্কার" বলে আখ্যায়িত করতে লাগলেন। অর্থাৎ কিনা আল্লাহ মিয়া, নাউজুবিল্লাহ, আমাদের জামানার সেই সব ধর্মপ্রাণ মুরব্বীর মত, যারা নিজেরা তো কপালে কালো দাগ নিয়ে জায়নামাজে সিজদার ওপর সিজদা দিয়ে যান, কিন্তু স্বীয় পুত্ররত্ন যখন এম,এ পাস করে আধা ইংরেজ হয়ে কাস্টম ইনসপেক্টরের চাকরি পায়, তখন সেই আপাদমস্তক ধর্মের সাজে সজ্জিত মুরব্বী আল্লাহর শোকর আদায় করেন যে, তিনি তার বংশধরকে স্বীয় অনুগ্রহে সিক্ত করেছেন!

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে খান বাহাদুর সহেব আবার বলেনঃ

"তাই বলে এ কথা বলা যায় না যে, মিসরের ওজারতীতে অভিষিক্ত হবার পর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ইসলাম প্রচারের কাজ করেননি, কিংবা নিজের নুবয়তের ঘোষণা দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন। বরঞ্চ তিনি জেলে থাকাকালেই তাওহীদের মর্মবাণীর প্রচার শুরু করে দিয়েছিলেন।............তবে যে কথা এ আয়াত থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় তা এই যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) একটি অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থায় নিজ আগ্রহে এবং আবেদন ক্রমেই সদস্য হয়েছিলেন এবং হযরত ইউসুফের (আঃ) সে সরকারের সদস্য হওয়ার পরও দেশে অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থা এবং অনৈসলামিক আইনই কার্য্য কর ছিল।"

এখানেও আবার সেই একই স্ববিরোধিতা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। অথচ খান বাহাদুর সাহেব নিজ মতের চিন্তায় বিভোর থাকার দরুন সে দিকে মনোযোগ দিতে পারেননি। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রচার করেছিলেন সেটা কি ধরনের একত্ববাদ ছিল? এই একত্ববাদের অর্থ যদি এই হয় যে, উপাসনালয়ে যে উপাসনা করা হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রশাসন ও নিয়ম-শৃংখলা যে আইনানুগত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তার সবই হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য, অন্য কথায় যার অর্থ হলো, সমগ্র জীবন আল্লাহর আনুগত্যের আওতাধীন হয়ে যাওয়া, তাহলে দেখা যায়, খান বাহাদুর সাহেবের ব্যাখ্যা অনুসারে হযরত ইউসুফ (আঃ) চাকরি করে নিজেই নিজের প্রচারিত সত্যের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। আর যদি তাঁর প্রচারিত তত্ত্ব এই হয়ে থাকে যে, উপাসনালয়ে আল্লাহর বিধান চালু হবে আর দেশ ও সমাজের গোটা ব্যবস্থা চলতে থাকবে রাজার বিধান অনুসারে, তা হলে এটা যে একত্ববাদের নয় বরং দ্বিত্ববাদের তথা দু'মুখো নীতির প্রচার ছিল, সেটা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখানে এ প্রশ্নও না উঠে পারে না যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) তা হলে কোন্ অর্থে নিজের নবূয়তের ঘোষণা দিয়েছিলেন? তিনি যদি বাদশাহ সহ সকল মানুষকে বলে থাকেন যে, আমি আসমান

ও যমীনের মালিকের প্রতিনিধি! সুতরাং তোমরা আমার আনুগত্য কর। যেমন সকল নবী বলতেন যে, فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونِ (شعراء:١٠٨) (আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর (শুয়ারা–১০৮)। তা হলে এরূপ ঘোষণার সাথে তাঁর একজন অমুসলিম রাজার প্রভুত্ব মেনে নেয়া এবং তাঁর আনুগত্যের আওতায় ইসলামী রাষ্ট্রের পরিবর্তে ইসলাম বিরোধী রাষ্ট্রের খিদমত করা কিছুতেই সামঞ্জস্যশীল হতে পারে না। আর যদি তিনি এ কথা বলে থাকেন যে, ওহে জনগণ! আমি যদিও আকাশ ও পৃথিবীর রাজাধিরাজের প্রতিনিধি, তথাপি আমার নীতি এই যে, মিসরের বাদশাহর আনুগত্য করবো আর তোমাদেরকেও দাওয়াত দিচ্ছি যে, আমার নয় বরং বাদশারই আনুগত্য কর, তাহলে এটা একটা সুস্পষ্ট স্ববিরোধী বক্তব্য ছিল, যাকে স্বাভাবিক ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে গ্রহণ করার তো প্রশ্নই উঠে না, বরং তা অট্টহাসি দিয়ে উড়িয়ে দেয়ারই যোগ্য ছিল। আর এ ধরণের ঘোষণাকারীদের মন্ত্রণালয়ে নয় বরং পাগলা গারদেই স্থান পাওয়ার কথা ছিল। শুধু তাই নয়, কোন আসমানী কিতাব যদি একদিকে এরূপ মূলনীতি বর্ণনা করে যে, আল্লাহ যাকেই রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন তাকে আল্লাহর অনুমতির আওতাধীন আনুগত্য করতে হবে এ জন্যই পাঠিয়েছেন, (সূরা নিসা–৬১)।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ (نساء:٦٤)

অপরদিকে সেই কিতাব যদি এমন এক ব্যক্তিকে আল্লাহর রসূল বলেও ঘোষণা করে যিনি আনুগত্য লাভ করা দূরে থাক, নিজেই আল্লাহ ছাড়া অন্যের আনুগত্য করেছেন এবং জনগণকেও গায়রুল্লাহর আনুগত্য করতে বলেছেন, তা হলে এ ধরনের কিতাবের ওপর আদৌ ঈমান আনা সমিচীন হতে পারে না। কুরআন যে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রেরিত গ্রন্থ, সে কথা প্রমাণ করার জন্য সে যে মাপকাঠি দিয়েছে সেটি হচ্ছেঃ

لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (نساء:٨٢)

"এ কিতাব যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর পাঠানো কিতাব হতো তা হলে মানুষ এতে অনেক স্ববিরোধী ও পরস্পর বিরোধী কথাবর্তা দেখতে পেত" (নিসা-৮২)।

কিন্তু আমরা যদি জনাব খান বাহাদুর সাহেব ও তার সমমনা লোকদের ধ্যান-ধারণা মেনে নেই, তাহলে দেখা যাবে, হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনায় এমন প্রকাশ্য স্ববিরোধিতা বিদ্যমান, যার দরুন কুরআন তার নিজেরই প্রতিষ্ঠিত মাপকাঠি অনুসারে আল্লাহর নয় বরং অন্য কারো গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। আর তাও কোন সুস্থ মস্তিষ্ক বিশিষ্ট মানুষের গ্রন্থ বলে বিবেচিত হতে পারে না।

আসল ব্যাপার এই যে, খান বাহাদুর সাহেব যে চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি করছেন, তার পশ্চাতে নৈতিক অধোপতনের এক দীর্ঘ ও মর্মন্তুদ ইতিহাস রয়েছে।

মুসলমানরা যখন তাদের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে এবং তাদের সত্যিকার করণীয় কাজ পরিত্যাগ করে দুনিয়ার পূজায় লিপ্ত হয়েছে, যখন দীনদারীর অর্থ তাদের কাছে এটাই রয়ে গেছে যে ইবাদাত ও আচার-আচরণে কিছু শরীয়ত সম্মত রীতি-নীতি মেনে চলা দরকার,তা সে জীবনের উদ্দেশ্য দুনিয়া পূজারীদের মতই হোক না কেন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কর্তৃত্ব নেককার কিংবা পাপিষ্ঠ যাদের হাতেই থাকুক না কেন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব নীতিগত ও আদর্শগতভাবে ইসলাম হোক কিংবা ইসলামী বিরোধী তখন এই উদাসীনতা ও শৈথিল্যের শাস্তি আল্লাহর তরফ থেকে এভাবেই দেয়া হয়েছে যে, তাদের বিরাট বিরাট অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী একে একে কাফেরদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তারা ও তাদের আলেম সমাজ তাকে শাস্তি মনে না করে এবং যে পাপের জন্য তাদের এ শাস্তি হয়েছে তার প্রতিকার না করে উল্টো এটাই ভাবতে শুরু করেছে যে,কাফের শাসিত ঐ রাষ্ট্র ও সমাজে কিভাবে "মুসলমানী জীবন" যাপন করা যায়। এ জন্য "ইজতিরার" তথা "অনন্যোপায়

অবস্থা"র ওজুহাত তুলে শরীয়ত সমস্ত মুসলমানী জীবনের এমন এক চিত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা অনৈসলামিক ও শরীয়ত বিরোধী সমাজ ও রাষ্ট্রে চালু রাখা যায়।

এর ফলে আল্লাহর তরফ থেকে আরো শাস্তির পালা শুরু হলো। তারা সংযত হয়ে ফিরে আসে, না গোমরাহীতে আরো দূরে সরে যায়, সেটা পরীক্ষা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। যে অবস্থাটাকে প্রথমে একটা অনন্যোপায় অবস্থা ভাবা হয়েছিল, আল্লাহর চিরন্তন রীতি অনুসারে তা আরো বেড়ে গেল এবং স্থায়ী ক্রমবর্ধমান ও অফুরন্ত আযাবের রূপ ধারণ করলো। প্রত্যেক গোলামী মুসলমানদেরকে প্ররোচিত করতে লাগলো যে, একটা কুফরী ব্যবস্থার অধীন এবং তার অভ্যন্তরে ইসলামী জীবন যাপনের জন্য তোমরা যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছ, তা সংশোধিত কর এবং ক্রমান্বয়ে সংকুচিত করতে থাক। কিন্তু আল্লাহর তরফ থেকে আগত এত আযাব মুসলমানদের শক্তিতে ফেরাতে পারলো না। তারা স্থায়ীভাবে এই নীতি অবলম্বন করলো যে, অনন্যোপায় অবস্থায় যখন পড়েছি, তখন ইসলামী জীবনের পরিধি সংকুচিত করাই দরকার এবং কুফরীর আধিপত্য সম্প্রসারিত হতে থাকুক।

কিছুদিন যেতে না যেতে এই অনন্যোপায় গোলামী দশা তাদের বিবেককে দংশন করতে আরম্ভ করলো। কেননা অনন্যোপায় অবস্থার পশ্চাতে নিষিদ্ধতার ধারণা অবশ্যম্ভাবীভাবে বিদ্যমান থাকে। কোন বিবেকবান মানুষ এ সুস্পষ্ট ব্যাপারটা অনুভব না করে পারে না যে, আপনি যখন নিছক অনন্যোপায় হওয়ার কারণে শূকরের গোশত খাচ্ছেন, তখন শূকরের গোশত যে হারাম, সে কথাটাতো আপনার ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব যখন ওটা মূলত হারাম জেনেও বাধ্য হয়ে খান, তখন আপনার মনে তার প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা না থেকে পারে না। এটা একেবারেই অসম্ভব যে, আপনি মজা করে করে পেট ভরে খাবেন এবং ওটার কাবাব কোর্মা ও পোলাও বানানোর চিন্তা করবেন। এ ধরনের ঘৃণা ও অবস্থার মানসিকতা সেই ক্ষেত্রেও অনিবার্যভাবে সৃষ্টি হয়, যেখানে আপনি সামগ্রিক জীবন ধারাকে মৌলিকভাবে হারাম বলে

জানা সত্ত্বেও কেবলমাত্র অপারগতা ও বিকল্প ব্যবস্থা না থাকার কারণে সাময়িকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। কিন্তু গোটা একটা জাতির পক্ষে এ ধরনের দোটানা জীবন যাপন সম্ভব নয়। একটি জাতির পক্ষে সকল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে সার্বক্ষণিকভাবে এরূপ জীবন ধারণ করা কার্যত সম্ভব নয় যে, নিজেকে শরীয়তের দিক দিয়ে ও মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে অনন্যোপায় ও অক্ষমও ভাবতে থাকবে, আবার সে সমসাময়িক জীবনধারা থেকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের সাথে পাশ কাটিয়েও চলতে থাকবে এবং শুধুমাত্র যতটুকু না হলেই চলে না ততটুকু সম্পর্ক বজায় রাখবে। এ ধরনের পরিস্থিতি অল্প সময়ের জন্য ছাড়া বরদাশত করা সম্ভব নয়। অচিরেই মানুষ এর আঘাতে জর্জরিত হয়ে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। মুসলমানদের মধ্যে এই ক্লান্তি ও অবসাদ যথাসময়েই এসেছে। কিন্তু আগে থেকে বলে আসা ধর্মীয় পশ্চাদপদতা এই অবসন্ন মস্তিষ্কগুলোকে নিজেদের ত্রুটি খতিয়ে দেখার দিকে মনোনিবেশ করতে দেয়নি। "কুফরী ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলামী জীবন যাপন সম্ভব" এই মর্মে তারা ইতিপূর্বে যে মত স্থির করেছিল, তা যে কতখানি ভ্রান্ত, সে কথা পুনরায় ভেবে দেখতে তাদের উদ্বুদ্ধ করেনি। যে অনন্যোপায় অবস্থার কারণে তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ জিনিসের মধ্যে আটকা পড়ে গিয়েছিল এবং নোংরা অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই অনন্যোপায় অবস্থার অবসান কিভাবে ঘটানো যায়, তা চিন্তা করার সুযোগ দেয়নি। বরং ক্রমাগত ধর্মীয় অধঃপতনের দরুন তারা এ কথাই ভাবতে প্ররোচিত হয়েছে যে, এই "অনন্যোপায় অবস্থার" অজুহাতটাকেই শেষ করে দেয়া দরকার, যাতে যেসব নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তুর অপবিত্রতিতে কুফরী সমাজ ব্যবস্থায় তাদের উন্নতি ও বিলাসিতা ব্যাহত হয়ে চলেছে, তার অবসান ঘটে এবং তা হালাল ও বৈধ হয়ে যায়।

এই উদ্দেশ্যে ধর্ম সম্পর্কে এক নতুন মতবাদ সৃষ্টি করা হয়েছে। মতবাদটা এই যে, ধর্মের সম্পর্ক শুধু আকীদা বিশ্বাস, ইবাদাত, উপাসনা ও বিয়ে তালাকের মত কয়েকটা সামাজিক

ব্যাপারের সাথে। কোন শাসন ব্যবস্থা যদি এ সব ব্যাপারে মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তা হলেই ইসলামী জীবনের আসল উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায়। এটুকু হলেই কুফরী রাষ্ট্র মুসলমানদের জন্য শান্তির আবাস ভূমিতে পরিণত হয়। তার আনুগত্য করা ও আইন মান্য করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সেই রাষ্ট্রের অধীন যাবতীয় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড (যা কিনা উক্ত নয়া মতবাদ অনুসারে ধর্মের বিপরীত দুনিয়াবী বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়) উক্ত কুফরী ভিত্তিক আইন কানুন অনুসারেই সম্পন্ন হওয়া উচিত। আর এ রাষ্ট্রের আইনগত ও প্রশাসনিক অবকাঠামোকে পরিচালনা, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করাতে কোন আপত্তি নেই।

কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র "আপত্তি না থাকা" এবং হালাল ও বৈধ হয়ে যাওয়া পর্যন্তই থেমে থাকলো না। অচিরেই অনৈসলামিক রাষ্ট্রে মুসলমানরা জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদে তাদের নব্য বংশধরকে কুফরী ব্যবস্থার সেবায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টায় নিয়োজিত হতে বাধ্য হলো, যাতে করে প্রথম দিকের কিছুকাল "আপত্তি" থাকার কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ হয়। এ জন্য সর্বশেষ যে যুক্তিটি তুলে ধরা হয় তা এই জন্য যে, মুসলমানদের উন্নতি–সমৃদ্ধি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের বেঁচে থাকাটাই সম্ভব নয়–যদি না তারা অনৈসলামী রাষ্ট্রের বিচার বিভাগে, আইন সভায়, প্রশাসনে, সামরিক বাহিনীতে, শি–কারখানায়–এক কথায়, সকল বিভাগে বেশী বেশী করে অংশ গ্রহণ না করে। নচেৎ মুসলিম উম্মাতের সার্বিক ধ্বংস অথবা কমপক্ষে উন্নতি ও অগ্রসরতার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। এ যুক্তির ফলে সহসাই যে জিনিস একদিন আগে বৈধ বা মোবাহের পর্যায়ে ছিল তা ফরযের পর্যায়ে উন্নীত হলো। আর সবাই যদি না-ও পারে, তবু অন্তত মুসলমানদের মধ্য থেকে একটা গোষ্ঠী যেন এ ফরয পালন করতে এগিয়ে আসা অব্যাহত রাখে। অর্থাৎ কিনা, আল্লাহর হুকুম যেখানে এরূপ ছিলঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"মুসলমানদের প্রত্যেক শ্রেণী থেকে অন্তত একটি গোষ্ঠীর ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য বেরিয়ে পড়া উচিত ছিল, যাতে তারা ফিরে এসে নিজ জাতিকে সতর্ক করতে পারে। এভাবে আশা করা যায় যে, তারা সংযত হবে।"

সেখানে আল্লাহর হুকুম তাদের দাবীতে এরূপ দাঁড়ালোঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الْكُفْرِ وَلِيُضِلُّوا
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَضِلُّونَ

"মুসলমানদের প্রত্যেক শ্রেণী থেকে অন্তত একটি গোষ্ঠীর কুফর সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য বেরিয়ে পড়া উচিত ছিল, যাতে তারা ফিরে এসে নিজ জাতিকে গোমরাহ করতে পারে। এভাবে আশা করা যায়, তারা গোমরাহ হয়ে যাবে।"

আর যেখানে আল্লাহর হুকুম ছিলঃ

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنكَرِ

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি গোষ্ঠী অবশ্যই গড়ে ওঠা চাই যারা মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।"

সেখানে এই নব্য মতবাদের ধারক-বাহকদের দাবীতে আল্লাহর হুকুম দাড়ালো এরূপঃ

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الشَّرِّ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمَعْرُوفِ!

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি গোষ্ঠী অবশ্যই গড়ে ওঠা চাই যারা মানুষকে অকল্যাণের দিকে ডাকবে, মন্দ কাজের আদেশ দেবে ও ভালো কাজ থেকে বিরত রাখবে।"

ইসলামকে বিকৃত করার এই সর্বনাশা অপকীর্তির বদৌলতেই বড় বড় পরহেজগার ও ধর্মপ্রাণ লোক তসবীহ টিপতে টিপতে ওকালতি ও মুনসেফীর পেশায় প্রবেশ করলেন। এভাবে তারা যে আইনের প্রতি তাদের ঈমান নেই, সেই আইন অনুসারে মানুষের বিরোধের মীমাংসা ও ফয়সালা করতে লাগলেন, আর যে আইনের প্রতি তাদের ঈমান ছিল, তা কেবল ঘরে বসে তেলাওয়াত করতে লাগলেন। এ বিকৃতির দরুনই বড় বড় মুত্তাকী ও নেকার লোকদের সন্তানরা আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হলো এবং সেখান থেকে ধর্মহীনতা, বস্তুবাদ ও চরিত্রহীনতার সবক নিয়ে নিয়ে বেরুলো। অতপর তারা সেই অনৈসলামীক রাষ্ট্র ও সমাজের শুধু কর্মের মাধ্যমে নয় বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে চরিত্র ও আকীদা বিসর্জন দিয়েও খিদমত করতে লাগলো- যদিও সেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা শুরুতে তাদের পূর্বপুরুষদের দুর্বলতা ও শৈথিল্যের কারণে তাদের ওপর কেবল ওপর থেকেই চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। এই বিকৃতি শেষ পর্যন্ত এমন সর্বাত্মক রূপ ধারণ করলো যে, পুরুষদেরকে অতিক্রম করে নারীদেরকেও তার সর্বব্যাপী জাহেলিয়াত, গোমরাহী ও চরিত্র ভ্রষ্টতার সয়লাবে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তথাকথিত সেই "ফরযে কিফায়া" যা পালন করার জন্য প্রথমে পুরুষরা এগিয়ে গিয়েছিল, এখন নারীদের ওপরও আরোপিত হলো। আর এই বেচারীরাও শেষ পর্যন্ত এই "ধর্মীয় খিদমত" আঞ্জাম দিতে এগিয়ে আসতে বাধ্য হলো। এগিয়ে না এলে অমুসলিমরা তাদেরকে পেছনে ফেলে যাবে এই আশংকা ছিল।[১]

এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই যে, ইসলামের এই বিকৃত উপলব্ধি ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দানের পালা আজকেই নতুন শুরু

---

১. পাকিস্তান হওয়ার পর এ ব্যাপারে আরো অগ্রগতি হয়েছে। এখন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা যদি উন্মুক্ত ময়দানে সামরিক কুচকাওয়াজ না করে, মুসলিম মেয়েরা যদি নার্সিং-এর ট্রেনিং নিতে পাশ্চাত্য দেশে না যায় এবং বিদেশে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পুরুষরা ছাড়া মেয়েরাও পালন না করে তাহলে তা মুসলিম উম্মাতের টিকে থাকার আর কোন উপায়ই নেই।

হলো। আজ থেকে কয়েক শ' বছর আগে যখন তাতারী কাফিররা মুসলমানদের ওপর চড়াও হয়, তখন থেকেই এর সূচনা। "কুফরী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীন কিভাবে ইসলামী জীবন যাপন করা যায়" সে ফর্মুলা যে সে যুগের আলেমরাই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন তাই নয় বরং বড় বড় আলেম ও নেকার লোকেরা স্বয়ং সে আমলেই অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সেবা করতে আরম্ভ করেন। তাদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যাও প্রচুর, যাদের লেখা কিতাব পড়ে পড়ে আজকাল আমাদের আরবী মাদ্রাসাগুলোতে আলেম ও মুফতী তৈরী হয়ে থাকে। এই প্রাচীনত্বের কারণেই এ ভুল এখন একটা 'পবিত্র ভুলে' পরিণত হয়েছে। এ যুগের প্রায় সকল মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফেকাহ্ বিদগণকে যদি একই বিভ্রান্তিতে লিপ্ত দেখা যায়, তাহলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তবে এ কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, একটা ভুল অনেক দিন ধরে চলে আসছে বলেই তা বিশুদ্ধ ও নির্ভুল হয়ে যেতে পারে না। আর বহু নামজাদা ব্যক্তি এতে আক্রান্ত এই যুক্তিতেও তা সঠিক হয়ে যেতে পারে না। সত্যকে প্রমাণিত করতে হলে একমাত্র আল্লাহর কিতাব ও রসূলের (সঃ) সুন্নাহ দ্বারাই করা সম্ভব।

অধপতনের এই যুগটা শুরু হয়েছে প্রাথমিক অনন্যোপায় অবস্থা থেকে উদ্ভূত "কুফরীর অধীনে ইসলাম" এই মতবাদ দিয়ে। অতপর ক্রমান্বয়ে কুফরী ব্যবস্থার খেদমত করা জায়েয হলো, তারপর মুস্তাহাব হলো, অতপর তা 'ফরযে কিফায়া' পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলো। এমনকি সর্বশেষে নামতে নামতে "ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানকারী শাসকদের আনুগত্যই ইসলামের যথার্থ দাবী" এহেন চরম অবমাননাকর ধারণা পোষণের মত সর্বনিম্ন গহ্বরে গিয়ে তা পতিত হলো। পতনোন্মুখ যুগের মুসলমানদের বরাবর এই চেষ্টায় নিয়োজিত থাকতে হয়েছে যে, পতনের প্রত্যেকটা স্তরে তাদের আরো নীচে নামার জন্য দলীল প্রমাণ যা কিছু প্রয়োজন, আল্লাহর দীন থেকেই সংগ্রহ করা চাই। এই তাগিদ অনুভব করার মূলে তো তাদের ধারণা মোতাবেক এই ফর্মুলাই কার্যকর ছিল যে, "যেহেতু আল্লাহর দীন আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট, তাই

এখন যে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তা পূরণের জন্যও এই দীন থেকেই আমাদের পথ নির্দেশ লাভ করতে হবে।" কিন্তু আসলে এই লোক দেখানো ফর্মুলার পেছনে যে প্রকৃত ফর্মুলা লুকিয়ে ছিল এবং যার ভিত্তিতে তারা বাস্তবে কর্মতৎপর ছিল তা ছিল এই যে, "আমরা যখন আল্লাহর দীনের প্রতি এত অনুগ্রহ করেছি যে,তার প্রতি ঈমান এনে তাকে ধন্য করেছি, তখন এর বিনিময়ে ইসলামের ওপর অন্ততপক্ষে এটুকু দায়িত্ব বর্তায় যে, সে আমাদের আগে আগে না চলে পেছনে চলতে আরম্ভ করবে।" অর্থাৎ এখন আর তার সাথে আমাদের এরূপ সম্পর্ক থাকবে না যে, আমরা তাকে নিজেদের ওপর ও আল্লাহর যমীনের ওপর কায়েম করার চেষ্টা চালাবো এবং এই চেষ্টার ক্ষেত্রে আমরা যে সব প্রয়োজনের সম্মুখীন হই, তা পূরণ করার দায়িত্ব সে গ্রহণ করবে। বরং এখন সম্পর্কের রূপরেখা হবে এ রকম যে, আমরা ইসলামকে কায়েমের চেষ্টা তো দূরের কথা, তার চিন্তাও করবো না। বরং নিজেদের প্রকৃতির অনুসরণের জন্য আমরা যেমন খুশী যেখানে খুশী, যাবো, ইসলাম আমাদের পেছনে পেছনে ঘুরতে থাকবে। আমরা যে কোন বাতিল ধর্মের অনুসারী হই, যে কোন বাতিল ব্যবস্থার গোলামী করি, ইসলামের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে ধরনের জীবন পদ্ধতিই অবলম্বন করি, ইসলাম সে ক্ষেত্রে আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার নিশ্চয়তা দেবে।" এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তারা কুরআন ও হাদীস মন্থন করে পথ নির্দেশের সন্ধানে ব্যাপৃত হলো। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, সমগ্র কুরআনের আর কোথাও তাদের দৃষ্টি পড়লো না–সূরা আনকাবুতেও না, বাকারাতেও না, আল ইমরানেও না, আনফালেও না, তওবাতেও না–বরং শুধুমাত্র সূরা ইউসূফের ওপর গিয়েই তাদের দৃষ্টি থমকে দাঁড়ালো। আর তাও শুধু খানবাহাদুর সাহেবের যুক্তি সংগ্রহের পছন্দ মাফিক জায়গাগুলোতে। অনুরূপভাবে রসূলের (সঃ) জীবনীরও আর কোথাও তাদের অনুকরণীয় আদর্শ মিললো না, মক্কার তপ্ত মরুতেও নয়, তায়েফের পাথর বর্ষণেও নয়, বদর ও ওহুদের ময়দানেও নয় বরং শুধু এই ঘটনায় যে, মুসলমানদের একটি দল হিজরত করে আবিসিনিয়ায় গিয়েছিল এবং সেখানে এক খৃস্টান রাজার অধীন কয়েক বছর প্রজা হিসাবে বসবাস করেছিল।

কিন্তু যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মানসিকতা নিয়ে নয় বরং সত্যসন্ধানী মনোভাব নিয়ে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে চায়, তার জন্য এ প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্ববহ যে, প্রকৃত পক্ষে হযরত ইউসুফের (আঃ) আলোচ্য ঘটনাবলী এবং আবিসিনিয়া হিজরতের বৃত্তান্ত থেকে এই বিশেষ মহলটি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান, সত্যই কি সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অবকাশ আছে? বেশ, আপাতত না হয় ধরে নিলাম যে, অবকাশ আছে, অর্থাৎ এ কথা মেনে নেয়ার অবকাশ আছে যে, জনৈক নবী আল্লাহর নির্দেশে একটি অনৈসলামিক রাষ্ট্রের খিদমত করা এবং অনৈসলামিক আইন (রাজকীয় আইন) চালু করা ও কার্যকরী করার দায়িত্ব এই জন্য গ্রহণ করেছিলেন যে, এটা মূলতই একটা অভিষ্ঠ ও করণীয় কাজ ছিল। এ কথাও না হয় মেনে নিলাম যে, একটি মুসলিম দলকে কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে কেবল মসজিদের ভেতরে ইচ্ছামত ইবাদাত উপাসনা করা, বুকের ভেতরে কিছু আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করা এবং মুখ দিয়ে সেই বিশ্বাসের স্বপক্ষে কিছু উচ্ছ্বাস প্রকাশের অনুমতি দিলেই সেই সমাজ ও রাষ্ট্রে মুসলমানদের সম্পূর্ণ উপযোগী আবাসভূমিতে পরিণত হয়- এ জন্যই মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। কিন্তু এর পর আরো কতকগুলো প্রশ্ন জন্ম নেয়। সে প্রশ্নগুলো উপরোক্ত প্রশ্নের তুলনায় অনেক বেশী মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী। কেননা উপরোক্ত কথা দুটো মেনে নেয়ার পর নিম্নের প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজে বের করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

১. আল্লাহ্ তায়ালা নবীদের মাধ্যমে মানব জাতির জন্য যে দীন বা জীবন বিধান পাঠিয়েছেন, তা কি শুধু উপাসনালয়ের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল, না সমগ্র মানব জীবনের জন্য?

২. যে সমস্ত নবী এই দীন নিয়ে এসেছেন, তাঁদের সকলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি একটাই ছিল, না এক এক জন এক এক রকমের কিংবা পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন?

৩. মানুষের কাছে আল্লাহর প্রকৃত দাবী কি? সমগ্র জীবনেই তার দাসত্ব করুক এবং তারই আইন ও বিধান অনুসারে কাজ

করুক, না কেবল পূজাটা তার করুক, আর বাদ-বাকী সমস্ত কর্মকান্ড যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করুক?

এ প্রশ্নগুলোর একটা জবাব এরূপ হতে পারে যে, আল্লাহ যে দীন পাঠিয়েছেন তার সম্পর্ক শুধু আজকাল "ধর্মীয় জীবন" বলতে যে সীমাবদ্ধ জীবন বুঝায় তার সাথে। কিন্তু এ কথা মেনে নিলে কুরআনে ও অন্যান্য আসমানী কিতাবে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধি, সাক্ষ্যদানের বিধি এবং যুদ্ধ ও সন্ধি ইত্যাদি সম্পর্কে যে সব নিয়ম-নীতি ও নির্দেশ দান করা হয়েছে, তা সব নিরর্থক হয়ে যায়। কিংবা, সেসব নির্দেশ নির্দেশ নয় বরং নিছক উপদেশ ও সুপারিশমালায় পরিণত হয়। অর্থাৎ ওগুলো কার্যকরী করতে পারলে ভালো। আর না করলেও তাতে আল্লাহর বিশেষ কোন আপত্তি থাকবে না।

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় প্রশ্নের একটা সম্ভাব্য জবাব-সম্ভাব্যই বা বলি কেন, আজকাল নবুয়ত সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণাই এই যে, বিভিন্ন নবী বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন। এমনকি এক নবী যদি কুফরী সমাজ ব্যবস্থাকে উৎখাত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম চালাতে এবং তার স্থলে ইসলামী বিধানকে পৃথিবীতে শাসন ব্যবস্থা হিসেবে কায়েম করতে এসে থাকেন, তবে অন্য আরেক নবী ঠিক তার বিপরীত কুফরী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীন সীমীত ধর্মীয় ও নৈতিক সংস্কার সাধন করেই ক্ষ্যান্ত থাকা, এমনকি সেই কুফরী ব্যবস্থার অনুগত থাকা মওকা পেলে তার পরিচালনার ও উৎকর্ষ সাধনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে ও প্রবৃত্ত থাকার লক্ষ্য নিয়ে এসেছেন। কিন্তু এ বক্তব্য কুরআনের বক্তব্যের সাথেও সামঞ্জস্যশীল নয়। বিবেকের কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করছে যে, সকল নবীকে একই উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। অপরদিকে বিবেকও এ কথা বিশ্বাস করতে রাজী নয় যে, আল্লাহ তায়ালা এমন স্ববিরোধী ও পরস্পর সংঘর্ষমুখর কাজ করতে পারেন যে আল্লাহ মানব জাতির কাছে এক সময় এক উদ্দেশ্যে এবং অন্য সময় ঠিক তার বিপরীত

উদ্দেশ্যে নবী পাঠান, তাকে কোন সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষও বিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী বিশ্ববিধাতা হিসেবে মেনে নিতে পারে না। এ কথা আলাদা যে, কোন নবী ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের সংগ্রামে সাফল্যের সর্বশেষ স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারেন, অপর নবী মধ্যবর্তী অথবা প্রাথমিক কোন স্তরেই সারা জীবন কাজ করে যেতে পারেন আর তৃতীয় আর এক নবী দাওয়াত, প্রচার অথবা যুদ্ধবিগ্রহের পরিবর্তে বিকল্প কোন কর্মপন্থাকে নিজের সময়কার বিশেষ ধরনের পরিস্থিতিতে কার্যোপযোগী পেয়ে সেটাই গ্রহণ করে নিতে পারেন। কিন্তু কর্মপদ্ধতির এতসব বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকলের উদ্দেশ্য একই থাকে। সকলেই আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে পরিপূর্ণভাবে দুনিয়ায় বাস্তবায়িত করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকাকেই নিজেদের অভিন্ন লক্ষ্য হিসাবে মেনে নিয়ে থাকেন। কিন্তু এই পদ্ধতিগত ও প্রক্রিয়াগত বিভিন্নতার অর্থ যদি কারো কাছে এই হয় যে, নবীদের প্রেরণের উদ্দেশ্যই বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী ছিল, তবে সেটা হবে আল্লাহর ওপর জঘন্যতম অপবাদ আরোপের শামিল।

অনুরূপভাবে তৃতীয় প্রশ্নেরও একটা সম্ভাব্য জবাব এই এবং আজকালকার মুসলমানদের কাছে সচরাচর সহজবোধ্য কথাও এই যে, মানুষ আল্লাহর কেবল পূজা-উপাসনা করবে এবং ওযূ-গোছল, পাক-নাপাকি ও কতিপয় নির্দিষ্ট হালাল-হারামের বিধি মেনে চলবে মানুষের কাছে এতটুকুই আল্লাহর দাবী। এর চেয়ে বেশী কিছু তিনি চানও না, আর মানুষ তার জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে নিজের প্রবৃত্তির আইন মেনে চলে, না আল্লাহর বিশাল পৃথিবীতে জেঁকে বসা মানুষ-শয়তান ও জিন-শয়তানদের কথামত চলে, তা নিয়েও আল্লাহর কোন মাথা ব্যথা নেই। তবে এই জবাব এ যুগের জড়বাদী মানুষের কাছে যত তৃপ্তিদায়কই হোক না কেন এবং اَلدِّيْنُ يُسْرٌ (সরল ও সহজ পন্থাই ইসলাম) এই হাদীস এবং

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

(আল্লাহ তোমার ওপর ইসলামে কোন কঠিন বিধি আরোপ করেননি) এই আয়াতের মর্ম স্বেচ্ছাচার ও লাগামহীন ভোগাধিকার নির্ধারণ করে নিজের জন্য যত আয়েসী জীবনের পথ সুগম করুক না

কেন, এটা যে আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামীর প্রকৃত তত্ত্বের পরিপন্থী, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

একজন বান্দা ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দু'ঘন্টার জন্য বান্দা হবে, আর বাদবাকী সময়ে স্বাধীন থাকবে অথবা মনিবকে শুধু সালাম ঠুকেই গোলামীর দায়িত্ব চুকিয়ে দেবে আর অন্য সব কাজ প্রভুর ইচ্ছার তোয়াক্কা না করে নিজের অথবা অন্যদের ইচ্ছামত করার অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করবে দাসত্বের এর চেয়ে হাস্যকর রূপ বোধ হয় আর কিছু হতে পারে না। তাছাড়া এমন খোদাকে তো খোদা মানার প্রশ্নই ওঠে না, যিনি নিজেকেএকদিকে মানুষের স্রষ্টা ও পালনকর্তাও বলেন, অপরদিকে মানুষের সমগ্র সত্তা, সকল শক্তি-সামর্থ্য এবং সময় ও উপকরণ বাদ দিয়ে তার একটা অতি ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন অংশে নিজের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব এবং তার গোলামী ও দাসত্বকে সীমিত রাখতে রাজী হয়ে যান। কোন পিতা স্বীয় পুত্রের ওপর নিজের পিতৃত্বকে এরূপ সংকীর্ণ গন্ডিতে সীমিত করতে রাজী হতে পারেন না যে, আনুগত্যের প্রতিক স্বরূপ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক কাজ করেই সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং তারপর যখন যাকে খুশী পিতার আসনে বসাবে। অনুরূপ কোন স্বামী স্বীয় স্ত্রীর ওপর নিজের স্বামীত্বের গন্ডি সীমাবদ্ধ করে বাদবাকী সময়ে সে সেচ্ছাচারীণী হয়ে যখন যার খুশী মনোরঞ্জন করে বেড়াবে এ অধিকার স্বীকার করতে পারে না। একজন শাসকও শাসকও পারে না আপন প্রজাদের ওপর নিজের কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতাকে এভাবে সংকুচিত করতে যে, প্রজারা কতিপয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা আনুগত্য প্রকাশ করেই দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং তারপর যার খুশী তার আইন মানবে, যাকে খুশী কর-খাজনা দেবে এবং যার ইচ্ছা তার হুকুমের আনুগত্য করবে। অথচ বিশ্ববিধাতা আল্লাহই এমন মনিব হয়ে গেলেন যে, যে মানুষ সম্পূর্ণরূপে তাঁরই সৃষ্টি, তাঁরই লালিতপালিত এবং তাঁরই সহায়তায় তার অস্তিত্ব টিকে আছে, তার ওপর কিনা তিনি নিজের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব সীমিত করে ফেলতে রাজী এবং তার কাছ থেকে গোলামীর স্বীকৃতি স্বরূপ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক কথা ও কাজ

পেয়েই তিনি আহলাদে আটখানা হয়ে গিয়ে তাকে স্বাধীন করে দিতে বা যে কোন মনিবের গোলামী করার অনুমতি দিতে প্রস্তুত।

দীন, নবূয়ত এবং দাসত্বের দাবী সম্পর্কে এসব ধ্যান-ধারণা যদি সঠিক না হয়ে থাকে, আল্লাহর প্রেরিত দীন যদি বাস্তবিক পক্ষে মানুষের সমগ্র ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে, বিশ্বপ্রভুর দাবী যদি তাঁর বান্দাদের কাছে এই হয়ে থাকে যে, জীবনের সর্বক্ষেত্র এবং সকল অবস্থায় তাকে তাঁর আইনেরই অনুগত এবং তাঁর হেদায়েতেরই অনুসারী ও আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে হবে এবং আল্লাহ যদি তাঁর নবীদেরকে এক খোদার আনুগত্যভিত্তিক একমাত্র সত্য ও নির্ভুল জীবন বিধানকে কায়েম করার জন্য মানুষকে দাওয়াত দেয়া ও সেই জীবন বিধান কায়েমের চেষ্টায় নিজেদেরকেও নিয়োজিত রাখার জন্য পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে একজন বিবেকসম্পন্ন মানুষের পক্ষে এ কথা মেনে নেয়া অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে যে, সমস্ত নবীদের মধ্যে একমাত্র হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামই এই সাধারণ নিয়মের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হবেন। কোন কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষই এ কথা স্বীকার করতে পারে না যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এমন ব্যতিক্রমধর্মী অভিনব ধরনের নবী হয়ে এসেছেন, যাকে কিনা আল্লাহর দীন কায়েমের চেষ্টা বাদ দিয়ে ফিরাউনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীন অর্থ মন্ত্রণালয়ের চাকরি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে কোন বিবেকবান মানুষ এ দু'টো বেখাপ্পা কথাকে খাপ খাওয়াতে অক্ষম যে, একদিকে তো তিনি আরবের অনৈসলামিক সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন, অপরদিকে তাঁর কাছে আবিসিনিয়ার অনৈসলামিক ব্যবস্থাও এতটা সঠিক ছিল যে, এক দল মুসলমানের জন্য তা একটা মানানসই স্থায়ী বাসস্থান হবার যোগ্য ছিল। যারা ইসলামকে একটা যুক্তিসঙ্গত ও সুসংবদ্ধ জীবন দর্শন হিসেবে বিবেচনা করে না বরং তাকে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর অসংবদ্ধ তত্ত্বের সমষ্টি মনে করে। তাদের পক্ষে তো নবীদের জীবনেতিহাস, কুরআনের শিক্ষা ও ইসলামের বিধিসমূহকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে

প্রত্যেকটির আলাদা আলাদাভাবে এমন ব্যাখ্যা করা খুবই সহজ যাতে করে তার একাংশ অপরাংশের এবং এক দিক অপরদিকের সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ ধারণ করে। কিন্তু যারা একে এক মহাবিজ্ঞানী সত্তার রচিত সুসংবদ্ধ, সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত বিধান হিসেবে বিবেচনা করে, তাদের পক্ষে এর প্রতিটা অংশ ও প্রতিটা দিকের এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অবলম্বন না করে উপায় থাকে না, যা সামগ্রিক বিধানের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা এর এমন কোন ব্যাখ্যা মেনে নিতেই পারে না, যাকে আল্লাহর এই সনাতন বিধানের মধ্যে বৈপরিত্য এবং এর শিক্ষার সাথে নবীদের কাজের সংঘাত অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়।

এবার আমরা সূরা ইউসুফের আলোচ্য আয়াতগুলো এবং আবিসিনিয়া হিজরতের ঘটনাবলী নিয়ে সরাসরি আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা সূরা ইউসুফে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তিনি নবুয়ত লাভের পূর্বে নিজের ভাইদের বিশ্বাসঘাতকতা ও একটি বণিক দলের অসততার কারণে মিশরের "আযীয" উপাধিধারী জনৈক প্রভাশালী মন্ত্রীর ক্রীতদাসে পরিণত হন। এই দাসত্বের সময়ে অথবা জেলখানায় আটক থাকাকালে আল্লাহ তাকে নবুয়তে অভিষিক্ত করেন। খুব সম্ভবত কারাবন্দী থাকাকালেই তিনি নবুয়ত লাভ করেন। কেননা বন্দী হবার আগে তার কথাবার্তা নবীসুলভ উচ্চ মার্গের না হয়ে একজন পূণ্যবান সদাচারী ব্যক্তিসুলভ মনে হয়। এ অবস্থায় নবুয়ত লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নবী হিসেবে দাওয়াতের কাজ শুরু করে দেন। নিজের সহবন্দী কয়েদীদেরকেই তিনি সর্বপ্রথম দাওয়াত দেন। সূরা ইউসুফের ৫ম রুকুতে এই দাওয়াতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এটি অধ্যয়ন করে যে কোন ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, তাঁর ডাক أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ "ভিন্ন ভিন্ন মনিব"-এর দিকে ছিল না, বরং একমাত্র মনিবের গোলামী করার দিকে ছিল। তিনি বারবার মিসরবাসীকে হুশিয়ার করেছেন যে, যে বাদশাকে তারা খোদার আসনে বসিয়ে রেখেছে

সে আমার প্রভু নয়। বরং আমার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ। আমি যে ধর্মের অনুসরণ করি তা আল্লাহর দাসত্বেরই নামান্তর মাত্র। জেলখানায় ইসলাম প্রচারের এই কাজ চালানোর সময়েই আকস্মিকভাবে এক অভাবনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে যে অসাধারণ সততা, বিশ্বস্ততা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার নিদর্শনাবলী ফুটে ওঠে, মিসরের সম্রাট তা দ্বারা এত গভীরভাবে অভিভূত হন যে, হযরত ইউসুফের (আঃ) মনে এরূপ প্রত্যয় জন্মে যে, তিনি তার কাছে সাম্রাজ্যের নিরংকুশ ক্ষমতা চাইলেও তিনি তা তাঁর কাছে হস্তান্তর করতে রাজী হয়ে যেতে পারেন। ফলে এ সময় ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে দুটো পথ উন্মুক্ত হয়। একটি হলো, ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে ব্যাপক দাওয়াত ও প্রচারাভিযান চালানো, কঠোর চেষ্টা-সাধনা, সংগ্রাম, সংঘাত ও যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যা সাধারণ অবস্থায় অবলম্বন করতে হয়। দ্বিতীয়টি হলো, আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কল্যাণে যে সুবর্ণ সুযোগটি তাঁর মুঠোর ভেতর এসে গেছে, সেটাকে কাজে লাগানো এবং তাঁর গুণমুগ্ধ ও অনুরক্ত বাদশাহর কাছ থেকে যে সুদূর প্রসারী ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তা হস্তগত করে দেশের চিন্তায় ও বিশ্বাসে, চরিত্রে, সমাজ ব্যবস্থায় ও রাজনীতিতে পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করা। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দান করেছিলেন, তার আলোকে তিনি প্রথম পথটির চাইতে দ্বিতীয় পথটিকে অধিকতর সহায়ক ও নিজের লক্ষ্যের নিকটতর মনে করলেন এবং সেটাই গ্রহণ করলেন।

এটা তাঁর পক্ষে প্রতিষ্ঠিত অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থার অধীন নিছক জীবিকা উপার্জন, ব্যক্তিগত সম্মান ও মর্যাদা লাভ অথবা বাতিল ও দুর্নীতিপরায়ন রাষ্ট্র ব্যবস্থার আংশিক সংশোধনের লক্ষ্যে গৃহীত একটি চাকরি ছিল না। বরং এটা ছিল একটা কৌশল। অন্য সকল নবীর মত হযরত ইউসুফও (আঃ) যে উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, সেই একই উদ্দেশ্যে এ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। যারা এটাকে নিছক একটা চাকরি মনে করেছেন এবং দাবী করেছেন যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ইসলামী

জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে নয় বরং খোদাদ্রোহী ব্যবস্থা যথারীতি বহাল রাখা এবং তার ক্রীড়নক অর্থ মন্ত্রী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই চাকরিটা গ্রহণ করেছিলেন, তাদের দৃষ্টিতে হযরত ইউসুফের (আঃ) মর্যাদা বর্তমান সরকারের বেতনভুক্ত কর্মচারীদের চেয়ে উচ্চতর কিছুই নয়। এমনকি আমাদের এ দেশে কংগ্রেসী মন্ত্রী সভাগুলোর যতটুকু মর্যাদা, হযরত ইউসুফের (আঃ) মর্যাদা তারা ততটুকু মনে করে না। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কার্যকলাপ এ দেশের সকল মানুষই প্রত্যক্ষ করেছে। তাদের লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা। মন্ত্রীত্ব সেই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে, এ ব্যাপারে তাদের পূর্ণ বিশ্বাস না জন্মা পর্যন্ত তারা এবং তাদের একজন নিতান্ত অধোপতিত ব্যক্তিও মন্ত্রীত্ব গ্রহণের কথা চিন্তাও করেনি। অতপর মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর যখন তারা দেখেছে যে, আসল ক্ষমতা (substance of power) তাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়নি। তখন তারা মন্ত্রীত্বের মুখে লাথি মেরে বিদায় নিয়েছে।

বাদশাহর কাছ থেকে ক্ষমতা চেয়ে নেয়া হয়েছিল না কেড়ে নেয়া হয়েছিল অথবা হযরত ইউসুফের (আঃ) ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাদশাহকে গদিচ্যুত করা হয়েছিল, না তিনি ক্ষমতায় বহাল ছিলেন, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। প্রকৃত গুরুত্ববহ প্রশ্ন এখানে এই যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম অনৈসলামিক ব্যবস্থাটাকেই চালিয়ে যাওয়া এবং তার অধীনে চাকরি করার উদ্দেশ্যেই কি তার উমেদার হয়েছিলেন, না নিজের নবুয়তের লক্ষ্য তথা ইসলামী বিধান কায়েমের জন্যই উদ্যোগী হয়েছিলেন। দ্বিতীয় যে প্রশ্ন গুরুত্বের অধিকারী তা এই যে, দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমূল ও সর্বাত্মক পরিবর্তন সূচিত করা যায় এমন ক্ষমতা তিনি যথার্থই পেয়েছিলো কি না। ইসলাম ও নবুয়ত সম্পর্কে যে তত্ত্ব আমাদের মনে বদ্ধমূল, তার আলোকে আমি মনে করি যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ (يوسف: ٥٥) এই কথাটা বলে আসলে দেশের সমস্ত উপায়-উপকরণকে (Resorces) তাঁর নিরংকুশ কর্তৃত্বে সমর্থন করার দাবীই

জানিয়েছিলেন। খান বাহাদুর সাহেব অনর্থক خَزَائِن শব্দটাকে "অর্থ দফতর" অর্থে গ্রহণ করেছেন। অথচ কুরআনের কোথাও এ শব্দটা অর্থ দফতর বা অর্থ বিষয়ক কার্যক্রম অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।[১]

কুরআনের নির্দেশাবলী অনুসন্ধান করলে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, "উপায়-উপকরণ" বলতে যা বুঝায়, এ শব্দটার মর্মার্থ ঠিক তাই। একটি দেশের যাবতীয় উপায়-উপকরণ কারো হস্তগত হওয়া এবং সেই দেশের যাবতীয় বিষয়ে তার সর্বাত্মক ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হওয়া একই অর্থবোধক। বাইবেল থেকেও এ কথার সমর্থন মেলে। সেখানে ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে, মিসরের ফিরাউন নামমাত্র রাজা ছিল। কার্যত গোটা দেশ হযরত ইউসুফের (আঃ) কর্তৃত্বাধীন হয়ে গিয়েছিল।[২]

---

১. উদাহরণ স্বরূপ নিম্নের আয়াত কয়টি লক্ষ্যণীয়ঃ

وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ (منافقون:٧) · وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ (حجر:٢١)

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ · وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ (مومن:٤٩)

"তোমার প্রভুর যাবতীয় উপকরণ কি ওদের কাছে?" (তূর-৩৭)

"প্রতিটি জিনিসেরই উৎস আমার কাছে।" (সূরা হিজর-২১)

"আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় উপায়-উপকরণ একমাত্র আল্লাহর।" (মুনাফিকুন-৭)

"দোজখবাসীরা জাহান্নামের কর্মকর্তাদেরকে বলবে—" (মুমিন-৪৯)।

২. বাইবেলে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে ফিরাউনের যে সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

"ফিরাউন তার ভৃত্যদেরকে বললো! আল্লাহর আত্মাধারী এই মহান ব্যক্তির মত কোন ব্যক্তি কি আমি খুঁজে পাবো? আর ফিরাউন ইউসুফকে বললো যে, যেহেতু আল্লাহ তোমাকে এই সবই দিয়েছেন, তাই তোমার মত জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান আর কেউ নেই। সুতরাং তুমি আমার বাড়ীর মালিক হবে এবং আমার সমস্ত প্রজা তোমার হুকুম মত চলবে। কেবল সিংহাসনের মালিক বলে আমি শ্রেষ্ঠতর হব। অতপর সে তাকে সমগ্র মিসরের শাসক বানিয়ে দিল। ফিরাউন ইউসুফকে আরো বললো যে, আমি ফিরাউন। তবে

এবার আর একটি বক্তব্য বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন। সেটি এই যে, হযরত ইউসুফের (আঃ) ক্ষমতা গ্রহণের পরও দেশে ফিরাউনের আইনেরই শাসন চালু থাকে।

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ এ আয়াতটি থেকেই এই ধারণা জন্মে। এ সম্পর্কে পয়লা কথা এই যে, এ আয়াতের সচরাচর যে অনুবাদ করা হয় তা সঠিক নয়। অনুবাদকরা এ আয়াতের এরূপ অর্থ করে থাকেন যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) রাজকীয় আইন অনুসরে তার ভাইকে গ্রেফতার করতে পারতেন না। অথচ এর বিশুদ্ধ অনুবাদ এই যে, রাজকীয় আইন অনুসারে স্বীয় ভাইকে গ্রেফতর করাটা হযরত ইউসুফের (আঃ) পক্ষে শোভন বা সমিচীন ছিল না। কুরআনের অন্যান্য স্থানেও আরবী ভাষায় এই বাকধারাটা অক্ষমতা ও অপারগতা অর্থে গ্রহণ করা হয়নি বরং অশোভন ও অনুচিত অর্থেই গৃহীত হয়েছে। যেমন مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ (আল ইমরান-১৭৯) এ বাক্যটার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তোমাদেরকে অদৃশ্য বিষয়ে অবহিত করতে পারেন না, বরং এর তাৎপর্য হলো, তোমাদেরকে অদৃশ্য তথ্য ও তত্ত্ব

তোমার হুকুম ছাড়া সমগ্র মিসরে কেউ হাত পা পর্যন্ত নাড়াতে পারবে না।" (আবির্ভাব পুস্তক, অধ্যায় ৪১, আয়াত ৩৮-৪৪)।

উপরোক্ত রেখা চিহ্নিত কথাগুলো থেকে বুঝা যায় যে, ফিরাউন হযরত ইউসুফের (আঃ) ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে যদি তাঁর নবুয়ত স্বীকার নাও করে থাকে, তথাপি সে প্রথম সাক্ষাতেই ঈমান আনার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। এর সাত আট বছর পর যখন হযরত ইউসুফের (আঃ) ভাইরা মিসরে এল, তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ এখানে তোমরা নয়, আল্লাহই আমাকে পাঠিয়েছেন এবং তিনি আমাকে বলতে গেলে ফিরাউনের পিতা এবং তার পুরো বাড়ীর শাসক বানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা তাড়াতাড়ি আমার পিতাকে গিয়ে বল যে, তোমার ছেলে ইউসুফ জানিয়েছে যে, আল্লাহ তাকে সমগ্র মিসরের মালিক বানিয়ে দিয়েছে।"

(আবির্ভাব পুস্তক, অধ্যায় ৪৫, আয়াত ৮-৯)।

জানানো আল্লাহর রীতি নয়। অনুরূপভাবে مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ (বাকারা–১৪৩) فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ এবং مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ (آل عمران) এ সব আয়াতে আল্লাহর অক্ষমতা বা অপারগতার কথা বলা হয়নি, বরং জুলুম করা, ঈমান ব্যর্থ করে দেয়া এবং মুমিন ও মুনাফেকদেরকে বাছাই না করে একাকার রেখে দেয়া আল্লাহর রীতিবিরুদ্ধ, এ কথাই বলা হয়েছে। সূরা ইউসুফেরই আলোচ্য আয়াতের পূর্বের একটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ (يوسف)
(আয়াত–৩৮) এর অর্থও এটা নয় যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করতে অক্ষম। বরং–এর অর্থ এই যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। সুতরাং আলোচ্য আয়াতেও এরূপ গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) রাজকীয় আইন অনুসারে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু সে আইনে তার ভাইকে গ্রেফতার করতে পারছিলেন না। কুরআনের অনুসৃত বাকরীতি অনুসারে এর প্রকৃত মর্মার্থ এটাই যে, রাজকীয় আইনে স্বীয় ভাইকে আটক করা তার পক্ষে শোভন ছিল না। অবশ্য এ আয়াত দ্বারা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইউসুফের (আঃ) ক্ষমতাসীন হওয়া সত্ত্বেও অনৈসলামিক ফৌজদারী বিধি অন্তত সাত আট বছর (হযরত ইউসুফের ভাইরা যখন সেখানে আসে) পর্যন্ত মিসরে কার্যকর ছিল। তবে এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে, একটি দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে রাতারাতি সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দেয়া সম্ভব নয়। ক্ষমতা হাতে আসা মাত্রই জাহেলী যুগের সমস্ত রীতিপ্রথাকে তাৎক্ষণিকভাবে পাল্টে ফেলতে হবে–ইসলামী বিপ্লবের এ ধারণা ঠিক নয়। স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলেও দেশের সমাজ ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দিতে পুরো দশ বছর সময় লেগেছিল। সুতরাং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের শাসনামলে কয়েক বছর অবধি অনৈসলামিক ফৌজদারী বিধি এবং সেই সাথে আরো কিছু অনৈসলামিক আইন যদি চালু থেকেও থাকে তবে সে জন্য এ সিদ্ধান্তে আসা সঙ্গত নয় যে, ইসলামী আইন চালু করার ইচ্ছাই

হযরত ইউসুফের (আঃ) ছিল না এবং তিনি অনৈসলামিক বিধি ব্যবস্থাই বহাল রাখতে চেয়েছিলেন।

এবার আসুন, আলোচনার সমাপ্তি টানার আগে আবিসিনিয়ায় হিজরতের বিষয়টার ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নেয়া যাক।

এ ব্যাপরটাকে যেভাবে তুলে ধরা হয়ে থাকে তা এই যে, আবিসিনিয়ায় একটি অমুসলিম সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের একটি দলকে সেখানে ঐ সরকারের প্রজা হিসেবে বসবাস করার জন্য পাঠান। অতঃপর সাহাবা কিরাম সেখানে গিয়ে অমুসলিম শাসকের অনুগত হয়ে গেলেন কেননা তারা সেখানে নিজস্ব আকীদা-বিশ্বাস পোষণ ও ইবাদাত-উপাসনা করার স্বাধীনতা ভোগ করতেন। অতঃপর যখন এক প্রতিবেশী রাজা তার রাজ্যের ওপর আক্রমণ চালায় তখন তারা তার সাফল্যের জন্য দোয়া করেন। কিন্তু এটা ঘটনার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিবরণ।

প্রথমত, মুসলমানদের একটা দলকে আবিসিনিয়ায় পাঠানোর সময়ই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধারণা ছিল যে, নাজ্জাশী একজন সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ন খৃষ্টান। হাদীসের ভাষা এরূপ যে, তিনি হিজরতকারীদেরকে নাজ্জাশীর রাজ্য সম্পর্কে বলেছিলেন যে, وَهِيَ اَرْضُ صِدْقٍ- (ওটা সত্যের দেশ)

দ্বিতীয়ত, মোহাজেরদেরকে সেখানে স্থায়ী প্রজা হয়ে বসবাস করার জন্য পাঠানো হয়নি। রসূল (সঃ) মোহাজেরগণকে হিজরতের পরামর্শ দেয়ার সময় বলেছিলেনঃ

لَوْ خَرَجْتُمْ اِلَى اَرْضِ الْحَبْشَةِ حَتّٰى يَجْعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا-

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য একটা উপায় বের না করা পর্যন্ত তোমরা যদি আবিসিনিয়ায় চলে যেতে,....।" এ কথা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কাফিরদের সাথে সংঘাতের ঐ স্তরে যে সব মুসলমান অসহনীয় বিপদ-মুসিবতের শিকার হচ্ছিলেন, তাদেরকে তিনি সাময়িকভাবে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলে মনে হয়

এমন একটি জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। পরে যখন পরিস্থিতি অনুকূল হবে, তখন তারা আবার ফিরে আসবেন এটাই ছিল অনভিপ্রেত। এ ঘটনাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কিভাবে সঠিক হতে পারে যে, কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে আকীদা ও ইবাদতের স্বাধীনতা পাওয়া গেলে সেটাই ঐ রাষ্ট্রের অনুগত প্রজা হয়ে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য যথেষ্ট হবে এবং এর চেয়ে বেশী কিছুর প্রয়োজন হবে না?

এরপর যখন মুসলমানরা সেখানে পৌছলো এবং মক্কার কাফিররা নাজ্জাশীর কাছ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য একটা প্রতিনিধি দল পাঠালো, তখন হাদীসবেত্তাগণ ও সীরাত বিশারদগণের সর্বসম্মত মত অনুসারে হযরত জাফর ও নাজ্জাশীর কথোপকথনের পর নাজ্জাশী হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কুরআন বর্ণিত তত্ত্বকে সমর্থন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তকেও সত্য বলে স্বীকৃতি দেন। এরপর নাজ্জাশীর মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকতে পারে? ইমাম আহমদ এই ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের বরাত দিয়ে নাজ্জাশীর নিম্নরূপ উক্তি উদ্ধৃত করেছেনঃ

مَرْحَبًا بِكُمْ وَلِمَنْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِهٖ اَشْهَدُ اَنَّهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّهُ الَّذِىْ
نَجِدُ فِى الْاِنْجِيْلِ وَاَنَّهُ الرَّسُوْلُ الَّذِىْ بَشَّرَ بِهٖ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ۔ [১]

এ উক্তি কি কোন অমুসলিমের হতে পারে? বায়হাকীতে স্বয়ং আমর ইবনুল আস থেকে (যিনি মোহাজেরদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য মক্কার কাফিরদের তরফ থেকে আবিসিনিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন) বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ফিরে এসে মক্কাবাসীকে বলেনঃ

---

১. তোমাদেরকে মুবারকবাদ এবং তোমরা যার কাছ থেকে এসেছ তাকেও মুবারকবাদ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি আল্লাহর রসূল, তিনি সেই ব্যক্তি যাঁর বর্ণনা আমরা ইনজিলে পাই, তিনি সেই রসূল, যার সম্পর্কে হযরত ঈসা (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

إِنَّ أَصْحَمَةَ يَزْعُمُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ نَبِيٌّ

"আসহাসা (নাজ্জাশী) বলে যে, তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মদ) নবী।" প্রশ্ন এই যে, কোন মনুষ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত স্বীকার করে নেয়ার পরও কি অমুসলিম বিবেচিত হতে পারে?

সীরাতে ইবনে হিশামে হযরত আমর ইবনুল আসের ইসলাম গ্রহণের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে বুঝা যায় যে, প্রথম প্রথম নাজ্জাশীর প্রচারের ফলেই তার মনে ঈমানের জন্ম হয়। হোদাইবিয়ার সন্ধির আগে তিনি নাজ্জাশীর হাতে হাত দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় নাজ্জাশী আমর ইবনুল আসকে যে কথাগুলো বলেন তা এইঃ

أَطِعْنِي وَاتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ وَاللّٰهِ لَعَلَى الْحَقِّ وَلَيَظْهَرَنَّ عَلٰى مَنْ خَالَفَهُ كَمَا ظَهَرَ مُوسٰى عَلٰى فِرْعَوْنَ وَجُنُوْدِهِ

"আমার কথা শোন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হয়ে যাও।"

কেননা নিশ্চিতভাবেই তিনি সত্যের ওপর রয়েছেন। মূসা আলাইহিস সালাম যেভাবে ফিরাউন ও তার বাহিনীর ওপর বিজয়ী হয়েছিলেন, সেইভাবে তিনিও তার বিরোধীদের ওপর অবশ্যই বিজয়ী হবেন।"

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার স্বীয় গ্রন্থ আল্‌ ইসতিয়াবে হযরত উম্মে হাবীবার সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গায়েবানা বিয়ে পড়ানোর সময় নাজ্জাশী যে খুৎবা দেন, তা উদ্ধৃত করেছেন। এই খুৎবায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নাজ্জাশী বলেনঃ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَأَنَّهُ الَّذِيْ بَشَّرَ بِهِ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল, যার আগমন সম্পর্কে মরিয়মের পুত্র হযরত ঈসা (আঃ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন।"

এর চেয়েও অকাট্য ও বিশ্বস্ত বর্ণনা বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে যে, নাজ্জাশীর মৃত্যুর খবর শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গায়েবানা জানাযার নামায পড়েন এবং বলেনঃ

مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ

"আজ একজন পূন্যবান মানুষ মারা গেছে। তোমরা প্রস্তুত হও এবং তোমাদের ভাই আসহামার জানাযার নামায পড়।"

এ রেওয়ায়েতের পর আবিসিনিয়ায় হিজরতের ঘটনার সূত্র ধরে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়, তার ভিত্তিই চুরমার হয়ে যায়।

(তরজমানুল কুরআন, মুহাররম–সফর, ১৩৬৪ হিঃ, জানুয়ারী–ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫)

কলকাতা থেকে জনৈক ভদ্র লোক লিখেছেনঃ

"কুরআনের তফসীর সংক্রান্ত কয়েকটি বক্তব্য অনেককে বিভ্রাটে ফেলে দিয়েছে। একটি তফসীর লেখা হয়েছে। সেটি নিয়ে আপত্তি তোলা হচ্ছে যে, ঐ তফসীর ইসলামের সর্বস্বীকৃত আকীদার বিপরীত এবং নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহীতামূলক। কয়েকটি আয়াতের তফসীর ঐ কিতাব থেকে নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করছি এবং তা নিয়ে যে সব আপত্তি তোলা হয়েছে তাও সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। যারা আপত্তি তুলেছেন তারা ঐ পুস্তকের লেখককে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক একটা চূড়ান্ত আলোচনার মাধ্যমে জানাবেন যে, ঐ সব বক্তব্যের মধ্যে এমন কিছু আছে কি না, যা কুফরী, ধর্মদ্রোহীতা ও নাস্তিকতার কারণ হতে পারে।"

এর পর প্রশ্নকর্তা যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা নিম্নরূপঃ

(١) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ـ (البقرہ: ٢٦٠)

"উল্লেখিত রেখা চিহ্নিত অংশের মর্ম এই যে, চারটা পাখী নাও, অতপর তাদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট কর। অর্থাৎ তাদেরকে এমনভাবে পোষ মানিয়ে নাও যে, তাদেরকে ছেড়ে দিলে আবার তোমার কছে ফিরে আসে। এরপর তাদের এক এক অংশ এক একটা পাহাড়ের ওপর রেখে দাও।"

আপত্তিঃ তফসীরকার তার উপরোক্ত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে হযরত ইবরাহীমের মোজেজা অস্বীকার করেছেন।

(২) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ - (ص: ١٨-١٩)

"হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম যখন পাহাড় ও পাখী দেখতেন তখন তার আল্লাহকে মনে পড়ে যেতো।"

আপত্তিঃ এ ব্যখ্যায় প্রকৃতিবাদী ধ্যানধারণা প্রাধান্য পেয়েছে। উল্লেখিত ব্যাখ্যা দ্বারা কুরআনের একাধিক আয়াতের অস্বীকৃতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। কুরআনের পূর্বাপর বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, পাহাড় ও পাখীকুল হযরত দাউদের সাথে আল্লাহর গুণগানে মুখর হয়ে উঠতো।

(৩) وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ - (سبا: ١٠)

তফসীরঃ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ হযরত দাউদকে লোহা নরম করার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিলেন।"

আপত্তিঃ উক্ত তফসীর পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণের তফসীরের বিপরীত। তারা বলেন, হযরত দাউদের (আঃ)হাতে লোহা আপনা থেকেই আটার মত নরম হয়ে যেত।

(৪) كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (آل عمران: ٣٧)

তফসীরঃ এর অর্থ হলো হযরত মরিয়ম উক্ত খাদ্যদ্রব্যকে আল্লাহর দান বলে অভিহিত করতেন। এ আয়াতে এ কথার কোন প্রমাণ নেই যে, হযরত মরিয়মের কাছে গ্রীষ্মকালের ফল শীতকালে এবং শীতকলের ফল গ্রীষ্মকলে আসতো।"

আপত্তিঃ এ তফসীর প্রাচীন তফসীরবেত্তাদের মতের পরিপন্থী।

(৫) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ (اعراف: ١٤٥)

তফসীরঃ অর্থাৎ আমি ঐ সব নির্দেশকে ফলকে লিখে রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম।"

আপত্তিঃ বোখারী শরীফে এ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ (তোমার জন্য আল্লাহ স্বহস্তে তাওরাত লিখে দিয়েছেন)" উপরোক্ত তফসীর দ্বারা বোখারীর হাদীসে বর্ণিত ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করা হয়।

(٦) وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا (يوسف: …)

তফসীরঃ অর্থাৎ লোকটি তার অভিমত ব্যক্ত করলো।"

আপত্তিঃ হযরত ইবনে আব্বাস এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, উক্ত সাক্ষ্যদাতা একটি শিশু ছিল। আলোচ্য তফসীরে এ বক্তব্যকে অস্বীকর করা হয়েছে।

(٧) يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ (انعام: …)

তফসীরঃ অর্থাৎ যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে।"

আপত্তিঃ ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, এর দ্বারা পশ্চিম দিকে সূর্য্য ওঠার দিনকে বুঝানো হয়েছে। উক্ত তফসীর আলোচ্য হাদীসের খেলাফ।

(٨) يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ - (ابراهيم: …)

তফসীরঃ "আল্লাহ তাওহীদের কল্যাণে মুমিনদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা দান করবেন।"

আপত্তিঃ উক্ত তফসীর সহীহ হাদীসের বরখেলাফ। হাদীসে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কবরে যখন মুমিনকে প্রশ্ন করা হবে তখন সে বলবেঃ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

(٩) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ - (طور)

তফসীর, "বাইতুল মামুর দ্বারা মসজিদকে বুঝানো হয়েছে।"

আপত্তিঃ একটি হাদীসে বলা হয়েছে বাইতুল মামুর ৭ম আকাশে অবস্থিত। উপরোক্ত তফসীর এ হাদীসের পরিপন্থী।

আমাদের সমাজের বহুসংখ্যক আলিম ও ধর্মপ্রাণ লোক যে কি ধরনের বেহুদা, নিরর্থক ও নিস্প্রয়োজন বিতর্কে লিপ্ত, উপরোক্ত চিঠির বক্তব্যে তারই একটা নমুনা মাত্র। এই অবান্তর বিতর্কে লিপ্ত হয়ে শুধু যে নিজেদের সময় নষ্ট করা হচ্ছে তাই নয়, বরং সাধারণ মুসলমানদের মন-মগজকেও নিদারুণভাবে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এ ধরনের ভিত্তিহীন বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার দরুন মুসলিম জনসাধারণ ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য কি এবং তাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্যই বা কি, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অবকাশই পাচ্ছে না। তদের জগতটা এত সংকীর্ণ ও সীমিত, যে, সেই সংকীর্ণ ভুবনে বসে তারা শুধু এতটুকু বুঝতে পারছে যে, সারা দুনিয়ার মুক্তি ও সফলতা কেবল হযরত মরিয়ম গ্রীষ্মের ফল শীতকালে পেতেন কিনা এবং লোহা হযরত দাউদের (আঃ) হাতে আসা মাত্র মোমের মত নরম হয়ে যেত কি না, ইত্যাকার প্রশ্নের মীমাংসার ওপর নির্ভরশীল। বড়ই ভালো হতো যদি তাদেরকে তাদের সংকীর্ণ হুজরার বাইরে এনে আল্লাহর এই বিশাল জগতকে দেখানোর কোন উপায় করা যেত এবং তারা চোখ খুলে দেখতে পেতো, যা মানব জাতির সৌভাগ্য ও সাফল্য যার ওপর নির্ভরশীল সেই আসল সমস্যাগুলো কি কি এবং যার দ্বারা জাতির ভাগ্যের ভাঙ্গাগড়া নির্ধারিত হয় সেই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো কি কি।

সবচেয়ে পরিতাপের ব্যাপার এই যে, এই সব নগণ্য ও তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মগজ ঝালাপালা করে তরাই, যারা ইসলামের বড় বড় আলেম এবং মুসলিম উম্মাহর পতাকাবাহী বলে পরিচিত। ইসলামের জ্ঞান অর্জনের জন্য মুসলমানরা তাদের স্মরণাপন্ন হয়ে থাকে। সারা দুনিয়ার মানুষ তাদরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত দীনের প্রতিনিধি বলে মনে করে। অথচ এত বড় গুরুদায়িত্ববহ পদমর্যাদায় আসীন হয়ে তারা যে ধরনের সমস্যা নিয়ে মুখ ও কলমের শক্তি ব্যয় করছে। তার একটা ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত উপরে তুলে ধরা হয়েছে। এ সব দেখে মুসলমান ও অমুসলমান

সকলেই এরূপ ভুল ধারণায় লিপ্ত হয় যে, এগুলোই বোধ হয় ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আল্লাহ বোধ হয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিরন্তন বিশ্বনবী করে এসব সমস্যার সমাধানের জন্যই পাঠিয়েছিলেন। তরা ভাবতে বাধ্য হয় যে, যে ইসলাম সারা বিশ্বের মনুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-শান্তির অধিকারী করার দাবী করে, তার সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা এত গুরুতর যে, তার ওপর মুসলমান হওয়া না হওয়া এবং থাকা না থাকা নির্ভর করে বোধ হয় এই যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও মিসরের আযীযের স্ত্রীর মধ্যকার জটিল সমস্যা নিস্পত্তিকারী শিশু ছিল, না যুবক ছিল, আর হযরত মুসা (আঃ)কে আল্লাহ নিজ হাতে লিখে তাওরাত দিয়েছিলেন কিনা। নাউজুবিল্লাহ, ইসলামের যে পরিচয় এভাবে তুলে ধরা হচ্ছে, যদি যথার্থ ইসলাম তাই হয়ে থাকে তা হলে বিশ্ববাসী ইসলামে দীক্ষিত হওয়া দূরে থাক খোদ মুসলমনদেরও তার আওতাধীন থাকা কঠিন। কেননা একটা ক্ষুদ্র মূর্খ জনগোষ্ঠী ছাড়া সাধারণ মানুষের এ সব সমস্যা নিয়ে কিসের মাথা ব্যাথা যে, তরা এর তত্বানুসন্ধানে সময় নষ্ট করবে এবং এর জন্য দ্বন্দ্বকলহ ও বিতর্কে লিপ্ত হবে?

আমি প্রশ্নকর্তার কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি পুস্তকের লেখক এবং আপত্তি ব্যক্তকারীদের নাম উল্লেখ করেননি। উভয় পক্ষের পরিচয় অজানা থাকা অবস্থায় যে মতামত ব্যক্ত করা হবে, তাতে কোন রকম পক্ষপাতিত্বের সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলবো যে, যে ধরনের আপত্তি উপরোক্ত প্রশ্নমালায় তুলে ধরা হয়েছে, তার ভিত্তিতে কোন মুসলমানকে কাফির, ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক বলা কোন মতেই যায়েজ নয়। যারা এটা করেছে তরা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ। মনে হচ্ছে, তারা কুফরী, নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহীতা শব্দের অর্থই জানে না। নচেত তারা এসব শব্দের এমন অপপ্রয়োগ করতেন না। কুফরী হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সল্লাম থেকে যে শিক্ষা ও নির্দেশ প্রামাণ্যভাবে পাওয়া যায়, তা অস্বীকার করা বা তার বিরোধিতা করা। ধর্মদ্রোহীতা হলো সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বাতিলের

দিকে ঝুঁকে পড়া (আবার হক ও বাতিলের পরিচয় নির্ণয় করতে হবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত জ্ঞানের মানদন্ডে) নাস্তিকতা হলো আল্লাহর অস্তিত অস্বীকার করা অথবা বিশ্ব প্রকৃতির পরিচালনায় তার কর্তৃত্ব অকার্য্যকর মনে করা। এবার চিন্তা করুন যে, কতিপয় আয়াতের যে ব্যাখ্যা উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে তার কোনটিতে কুফরী, নাস্তিকতা বা ধর্মদ্রোহীতা বিদ্যমান?

১। প্রথম আয়াতের তফসীর শব্দ কি ভুল সে ব্যাপারে এখানে কোন আলোচনা করছি না। ধরে নিন, ভুল। কিন্তু প্রত্যেক ভুল কি ধর্মদ্রোহীতা ও নাস্তিকতা? صُرْهُنَّ إِلَيْكَ কথাটার যে ব্যাখ্যা লেখক দিয়েছেন, তা অভিধানের দিক দিয়ে সঠিক। কোন কোন প্রাচীন মুফাসসীরও এরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন। আর দ্বিতীয় বাক্যটির ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাও শাব্দিক দিক দিয়ে যথার্থ। তাহলে তাকে কিভাবে হযরত ইবরাহীমের মোজেজা অস্বীকারকারী বলে অভিহিত করা যেতে পারে? তবু যদি মেনে নেই যে, তিনি আয়াতটির এমন ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, যা ঐ বিশেষ ঘটনাটির মোজেজা হওয়াকে স্বীকর করে না। তথাপি তার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহী হওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হয় না। ধর্মদ্রোহীতা কেবল তখনই প্রমণিত হবে যখন মোজেজার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হবে। একটি একটি সুনির্দিষ্ট ঘটনাকে আলাদা আলাদা ভাবে মোজেজা সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। কুরআনের একাধিক জায়গা এমন রয়েছে যেখানে এ প্রশ্নে মতভেদের অবকাশ রয়েছে এবং মতভেদ করাও হয়েছে যে, ঐ নির্দিষ্ট ঘটনাটিকে মোজেজা গণ্য করা হবে, না সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা বলা হবে। এ ধরনের কোন ব্যাপারে যদি কেউ আয়াতের ব্যাখ্যা এমনভাবে করে যে, একটা ঘটনা অলৌকিক না হয়ে স্বাভাবিক ঘটনা সাব্যস্ত হয়, তাহলে তাকে ধর্মদ্রোহীতার দায়ে অভিযুক্ত করা যাবে না, কেবল ব্যাখ্যাটাকে ভুল বলা যেতে পারে।

২। সন্দেহ নেই যে, দ্বিতীয় আয়াতের তফসীর কুরআনের শব্দগত মর্মের বিরোধী। কিন্তু তথাপি এটাকে কুফরী না বলে ভ্রান্তি

বলাই সঙ্গত। কুফরী হয় তখন, যখন কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করে বলা হয় যে, পাহাড় ও পাখী আল্লাহর গুণগান করে না বা করতে পারে না। এখানে লেখক তেমন কোন কাজ করেনি। বরং তিনি নিজের বুঝ অনুসরে আয়াতের মর্ম নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এ ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যদি মানুষকে কাফির বলা চলতে থাকে, তাহলে কুফরীর অভিযোগ থেকে নিস্তার পাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না। কেননা কুরআনে 'মুতাশাবিহাত' নামে পরিচিত একাধিক অর্থবোধক বহু আয়াত রয়েছে। বিভিন্ন লোক নিজ নিজ বুদ্ধি মোতাবেক তার মর্ম বিভিন্নভাবে নির্ণয় করে থাকেন। পাহাড় ও পাখী কর্তৃক আল্লাহর গুণগান করা এমন একটা ব্যাপার, যার প্রকৃত রহস্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। যদি কেউ বলে যে, আমাদের সমাজের দরবেশ প্রকৃতির লোকেরা যেমন দানাওয়ালা তসবহি টিপে থাকেন, পাহাড় ও পাখীর কাছেও সেই ধরনের তসবহি থাকে, তাহলে আমি তার মতকে ভ্রান্ত বলতে পারি, কিন্তু তাকে কাফের বলতে পারি না। আর একজন যদি বলে যে, আল্লাহর হুকুমের সামনে ওদের অবনত ও বাধ্যগত থাকাই তাদের গুনগান করা এবং তাদেরকে এ রকম বশীভূত থাকতে দেখেই হযরত দাউদের মনে আল্লাহর স্মৃতি জাগরুক হতো। (আলোচ্য তফসীরের লেখকেরও ধারণা তাই) তা হলে আমি তর সাথেও ভিন্নমত পোষণ করতে পারি। কিন্তু তকে কাফের বলতে পারি না। আমি নিজে এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করে থাকি যে, হযরত দাউদকে আল্লাহ সব চাইতে মিষ্টি সুর ও উচ্চ কণ্ঠ দান করেছিলেন। এ রূপ সুললিত কণ্ঠে তিনি যখন যবুর তেলাওয়াত করতেন, তখন সমগ্র পাহাড়তর সে আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠতো, পশু পাখীরা সমবেত হতো এবং আশপাশের যাবতীয় বস্তুরাজিতে এক ধরনের মত্ততা ছড়িয়ে পড়তো। একটি হাদীস থেকে এ ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে, একবার হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহ আলাহি ওয়াসাল্লাম পথ দিয়ে চলার সময়ে তাঁর আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে শোনার পর বললেন

لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ "এই ব্যক্তি দাউদের সুললিত কন্ঠের একটা অংশ পেয়েছে।"[১] আমার নিজস্ব রুচী ও অন্তর্দৃষ্টি থেকে আমি এ ব্যাখ্যা করেছি। কেউ যদি এটা পছন্দ না করে তা হলে একে সে ভুল বলতে পারে! কিন্তু আমাকে এ জন্য কাফের বলতে পারে না।

৩। লেখক তৃতীয় আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা কুরআনের শাব্দিক মর্মের পরিপন্থী নয়। কুরআনের কথাটার শব্দার্থ এই যে, "আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছি।" প্রাচীন মনিষীদের মধ্যে হাসান বসরী, কাতাদা ও আ'মাশ প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত দাউদের হাতে নেয়া মাত্রই লোহা আটার মত নরম হয়ে যেত।" কিন্তু এই মনিষীরা কি আল্লাহর নবী হয়ে এসেছিলেন যে, তদের মত অগ্রাহ্য করলেই মানুষ কাফের হয়ে যাবে? তদের এই ব্যাখ্যার স্বপক্ষে কুরআনেও কোন সুস্পষ্ট উক্তি নেই, এই মর্মে কোন হাদীসও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি। তাহলে এ বাড়াবাড়ির হেতু কি যে, কুরআন ও রসূল (সাঃ) এর পাশাপাশি হাসান, কাতাদা এবং আ'মাশ প্রমুখের ওপরও ঈমান আনতে মানুষের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়? তাদের কথা অগ্রাহ্যকারীকেও কুরআন ও নবীর কথা অগ্রাহ্যকারীর মত কাফির সাব্যস্ত করা হয় কোন্ যুক্তিতে?

৪। এ আয়াতের তফসীর নিয়ে যে আপত্তি তোলা হয়েছে, তাও ৩নং আয়াতের ব্যাপারে উত্থাপিত আপত্তির মতই অযৌক্তিক ও অর্থহীন। আয়াতের শব্দার্থ থেকে শুধু এতটুকুই বক্তব্য পাওয়া যায় যে, "হযরত যাকারিয়া যখনই মসজিদে হযরত মরীয়মের নিকট যেতেন, তার কাছে কিছু না কিছু খাবার জিনিস দেখতে পেতেন। তিনি হযরত মরীয়মকে যখন জিজ্ঞাসা করতেন যে, এগুলো কোথা থেকে পেলে? তিনি জবাব দিতেন যে, আল্লাহর

---

১. হযরত আবূ মূসা অত্যন্ত প্রাণমাতানো কন্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। আবূ উসমান নাহদী বলেন যে, আমি সারা জীবনেও আবূ মূসার সুরের চাইত মিষ্টি সুর কোথাও শুনিনি।

কাছ থেকে।" সেই খাদ্যদ্রব্য যে শীতকলে পাওয়া গ্রীষ্মের ফল এবং গ্রীষ্মকালে পাওয়া শীতকালীন ফল ছিল, সে কথা কুরআনেও নেই, কোন সাহ হাদীসেও নেই। এটা কেবল কাতাদা, ইকরামা, সাঈদ বিন জুবাইর এবং যুহাক প্রমুখের অভিমত। এ সব ব্যক্তির মতের বিরোধিতাকারীকেও কি কাফের বলা হবে? তা যদি হয় তা হলে আপনি ইমাম মুজাহিদকে কি বলবেন? তিনি তো ঐ সব মনীষীর মতের বিরুদ্ধাচরণ করে "রিযক" শব্দের মর্ম বিশ্লেষণ করেছেন খোদায়ী জ্ঞান বলে। তিনি বলেছেন যে, হযরত মারীয়মের কাছে খোদায়ী জ্ঞানের আধার ছোট ছোট আসমানী কিতাব পাওয়া যেত। এই হাদীস সম্পর্কেই বা কি বলবেন, যার মর্ম এরূপঃ 'হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষুধার্ত অবস্থায় হযরত ফাতিমার গৃহে গেলেন এবং কিছু খাবার দিতে বললেন। ফাতিমা জানালেন যে, তার ঘরে কিছু নেই। রসূল (সাঃ) ফিরে গেলেন। এবং ইতিমধ্যে হযরত ফাতিমার এক প্রতিবেশীনী দুটো রুটি এবং কিছু গোশত পাঠিয়ে দিল। হযরত ফাতেমা তৎক্ষণাৎ তাঁর এক ছেলেকে পাঠালেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবার ডেকে আনার জন্য। তিনি ফিরে এলে হযরত ফাতেমা খাবার দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, এটা কোত্থেকে এল? হযরত ফাতেমা বললেন, يَا أَبَتِ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ (আব্বা, এটা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে) এ কথা শুনে হুজুর (সাঃ) বললেন, মা, আল্লাহর শোকর যে, তিনি তোমাকে বনী ইসরাইলের শ্রেষ্ঠ রমনী মারীয়মের মত বানিয়েছেন। তাঁর কাছেও যখন কোন খাদ্য আসতো তখন তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা হতো যে, ওটা কোত্থেকে এসেছে। তিনি বলতেন যে, আল্লাহ্ থেকে এসেছে। এ হাদীসকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করে কেউ যদি বলে যে, হযরত মরীয়মের কাছে অদৃশ্য জগত থেকে খাবার আসতো না। বরং আল্লাহ তাঁর জন্য এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ অসহায়া ও নিঃস্ব অবস্থায় মসজিদের মেহরাবে বসে থাকতেন। আর ঠিক সময়মত কেউ না কেউ তকে খাবার পৌছে দিয়ে যেত। তা হলে এরূপ

ব্যাখ্যা দানকারীকেও কি কাফের বলা হবে? এখানে এ কথাও ভেবে দেখার মত যে, গ্রীষ্মকালের ফল শীতকালে এবং শীতকালের ফল গ্রীষ্মকালে পাওয়া একটা অলৌকিক ব্যাপার হওয়া ছাড়া এতে আর কোন চমকপ্রদ ব্যাপার রয়েছে? আল্লাহ যে মওসুমে যে ফল সৃষ্টি করেছেন, তা সেই মওসুমের জন্যই নিয়ামত। কেননা তা ঐ মৌসুমের প্রকৃতি অনুসারেই সৃজিত। অন্য মৌসুমে সেই ফল পাওয়া গেলে সেটা একটা আজব কান্ড হতে পারে সত্য, কিন্তু নিয়ামত নয়।

৫। এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম রাজী বলেনঃ

واعلم انه ليس في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك
الأنواع وعلى كيفية تلك الكتابة فان ثبت ذلك
التفصيل بدليل منفصل قوي وجب القول به والا وجب
السكوت عنه.

"জ্ঞাতব্য এই যে, এ আয়াতের ভাষা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় না যে, সেই ফলকগুলো কি ধরনের ছিল এবং তাতে কি ধরনের লেখা ছিল। তখন যদি ভিন্ন কোন মজবুত দলীল দ্বারা এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়, তা হলে তো সেটা মেনে নিতে হবে। নচেত এ সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয়।"

তবে কি ইমাম রাজিকেও কাফের বলা হবে? কেননা তিনি বোখারীর হাদীস থাকা সত্ত্বেও লেখার প্রকৃতি অপ্রমাণিত মনে করেছেন। কোন হাদীসের ভাষা বা তার সনদ সন্দেহজনক হওয়ার কারণে যদি কেউ তা মেনে না নেয়, তা হলে তাকে রসূলের (সাঃ) হাদীস অস্বীকারকারী সাব্যস্ত করার চেয়ে বড় জুলুম আর কিছু থাকতে পারে কি? এ ধরনের কুফরীর অপবাদ থেকে প্রাচীন আলিম ও ইমামদের মধ্যে কে রেহাই পেতে পারে? ছোট ছোট আলিমদের কথা বাদ দিন, শত শত বছর ধরে যারা সারা দুনিয়ায় ইমাম হিসাবে সমাদৃত, তাদের পক্ষ থেকেও এমন বহু কথার

উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, যা কোন কোন হাদীসের বিরুদ্ধে যায়। তাদের সবাইকে কি রসূলের বাণী প্রত্যাখ্যানকারী বলা হবে?

যে হাদীসটি দ্বারা আপত্তিকারীরা যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, তা বুখারীতে চার জায়গায় উদ্ধৃত হয়েছে এবং চারটি জায়গাতেই তার ভাষা ভিন্ন ভিন্ন রকমের; "কিতাবুল কাদর" (অদৃষ্ট সংক্রান্ত অধ্যায়ে) আবু হুরায়রা থেকে তাউস বর্ণণা করেছেন যে,

اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ "আল্লাহ তোমাকে (হযরত মূসাকে) তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ দান ও তোমার জন্য স্বহস্তে তাওরাত লিখে দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন।" একমাত্র এই রেওয়ায়েতেই আল্লাহর স্বহস্তে তাওরাত লেখার কথা বলা হয়েছে। কিতাবুত তাওহীদ ও আহাদীসুল আম্বিয়াতে হুমাইদ বিন আবদুর রহমান আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন যে, بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ অথবা اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ এ রেওয়ায়াতে স্বহস্তে তাওরাত লেখার উল্লেখ নেই ।

কিতাবুল তফসীরে মুহাম্মদ বিন সিরীন আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهِ وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ- এখানেও স্বহস্তে তাওরাত লিখে দেওয়ার উল্লেখ নেই।

ইমাম মুসলিম কিতাবুল কদরে চারটি হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ হুরায়রা থেকে। এর মধ্যে চারটিতে স্বহস্তে তাওরাত লিখে দেয়ার উল্লেখ নেই। অন্যান্য প্রামাণ্য হাদিসের গ্রন্থের অবস্থাও এরূপ যে, অধিকাংশ বর্ণনায় স্বহস্তে তাওরাত লিখে দেয়ার ব্যাপারে কোন স্পষ্টোক্তি নেই। এই তুলনামূলক পর্যালোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, প্রথমত এ হাদীস শাব্দিকভাবে বর্ণিত হয়নি, বরং হাদীসের বক্তব্য বর্ণনাকারীরা নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ কর্তৃক স্বহস্তে তাওরাত লিখে দেয়ার কথা বলেছিলেন কিনা, তা সন্দেহজনক। এ ধরনের একটা সন্দেহজনক উক্তির ভিত্তিতে কোন মুসলমানকে কাফের আখ্যা দেয়া শুধু যে চরম অসতর্কতা, তা নয়, বরং রীতিমত অপরাধ।

৬। এ আয়াতের তফসীরে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) উক্তিকে ওজুহাত বানিয়ে লেখককে কাফির আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথচ স্বয়ং ইবনে আব্বাসের (রাঃ) পক্ষ থেকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উক্তি উদ্বৃত হয়েছে। একটা উক্তিতে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি হযরত ইউসুফ (আঃ) ও আযীযের স্ত্রীর মধ্যকার বিরোধের নিষ্পত্তি করেছিল, সে দাড়িওয়ালা ছিল, দ্বিতীয় উক্তি যে, সে মিসরের সম্রাটের একজন সভাসদ ছিল। তৃতীয় উক্তি এই যে, সে একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিল। এখন আপত্তিকারীরা সাহস করে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) ওপরেই কাফির ফতোয়া ঝেড়ে দেন না কেন? সেই সাথে মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান, কাতাদাহ, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক, সুদ্দী এবং জায়েদ বিন আসলামকেও ফতোয়ার আওতাভুক্ত করতে পারেন। কেননা এদের সর্বসম্মত মত এই যে, ঐ ব্যাক্তি একজন বয়স্ক পুরুষ ছিল- কোন শিশু নয়।

এটা কতদুর পরিতাপের বিষয় যে, আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়কে আদৌ গুরুত্ব দেননি এমনকি তার উল্লেখ করাও প্রয়োজন মনে করেননি, তাকে এত গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে যে, কেউ সেটা উপেক্ষা করলেই তাকে অমনি কাফের সাব্যস্ত করা হচ্ছে। কুরআন ঘটনার নিষ্প্রোয়োজন খুঁটিনাটি বিবরণ সাধারনত এড়িয়ে যায় এবং শুধুমাত্র মূল বক্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট অতীত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবলী বর্ণনা করে। কিন্তু কতক তফসীরকারের মানসিকতা এমন যে, যে সব নিষ্প্রয়োজন খুঁটিনাটি তথ্য কুরআন এড়িয়ে গেছে, তারা সেগুলোর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। যেমন কুরআন বলছে যে, হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) চারটি পাখী সংগ্রহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এ ঘটনা যে উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে তাতে পাখীগুলোর জাত নির্ণয় করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কোন কোন মুফাসসির বলেছেন যে, ঐ পাখীগুলো ছিল কাক, কবুতর, ময়ুর প্রভৃতি। এ তথ্য তারা কোথা থেকে আবিষ্কার করেছেন জানিনা। একইভাবে, কুরআন হযরত ইউসুফের (আঃ) ঘটনাটা শুধু এতটুকু বর্ণনা দেয় যে, একজন পর্যবেক্ষক পারিপার্শিক নিদর্শনাবলীর সাক্ষ্য দ্বারা হযরত ইউসুফের নির্দোষিত প্রমাণ করেন। এ ক্ষেত্রে

পর্যবেক্ষকের বয়স কত ছিল সে প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর ও গুরুত্বহীন ছিল। গুরুত্বহীন ছিল বলেই কুরআন তার উল্লেখও করেনি। কিন্তু কোন কোন মুফাসসীর তার বয়স অনুসন্ধান করাও জরুরী মনে করেন। এই সব ব্যাপারে যদি কারো কৌতুহল থাকে তবে সে ঐ সব মুফাসসিরের বক্তব্য গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এটা কি ধরনের বাড়াবাড়ি যে, যারা ঐ সব উক্তি অগ্রাহ্য করে এবং তফসীরকে শুধুমাত্র কুরআনের বর্ণিত তথ্যগুলোর মধ্যে সীমিত রাখে তাদেরকে কাফের বলা হবে? আর কাফের বলাও শুধু এই ওজুহাতে যে, তোমরা প্রাচীন মনিষীদের বক্তব্যে বিরোধিতা করেছ। জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রাচীন মনিষীরা কি নবী ছিল যে, মুসলমান- দেরকে তাদের ওপর ঈমান আনতে হবে?

৭। সপ্তম আয়াতটির শাব্দিক অনুবাদ এইঃ

''তারা কি অপেক্ষায় আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসুক, অথবা তোমর প্রভু (নিজেই) আসুন অথবা তোমার প্রভুর কিছু প্রাকশ্য নিদর্শন এসে পড়ুক? যেদিন তোমার প্রভু প্রকাশ্য নিদর্শনগুলো এসে পড়বে সে দিন আগে থেকে যারা ঈমান আনেনি তাদের ঈমান আনার কোন ফায়দা হবে না। যারা আগে থেকে ঈমান এনে তদনুযায়ী কোন কল্যাণ (সৎকর্ম) সংগ্রহ করেনি, তারও কোন লাভ হবে না''

রেখা চিহ্নিত অংশে যে দিনটার কথা বলা হয়েছে, সেটা আল্লাহর আজাব নাজিল হয়ে যাওয়ার দিনও হতে পারে, যেমন কুরআনে বলা হয়েছেঃ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا (সুরা মুমিন, ৮৫) আবার এর দ্বারা মৃত্যুর সময়কেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে যে, যখন প্রাণ সংহারের কাজ শুরু হয়ে যায় এবং গোঙ্গানী শুরু হয়, তখন আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন না। আর এ দ্বারা কিয়ামতের সুস্পষ্ট আলামতগুলো প্রকাশের সময়ও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে, যেমন আপত্তিকারীরা যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তাতে বলা হয়েছে। এখন যদি কোন ব্যক্তি এই সব সম্ভাব্য অর্থের কোন একটা বর্ণনা করে এবং অন্যটি অস্বীকার করে না, তবে তাকে কিসের ভিত্তিতে

কাফের বলা হবে? অথচ কুরআনের ভাষায় তিনটি অর্থের প্রত্যেকটিরই অবকাশ রয়েছে এবং প্রত্যেকটা অর্থের সমর্থন কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়। তা হলে এই তিনটে অর্থের কোন একটা যে বর্ণনা করে সে কোন অপরাধে কাফের হয়ে যাবে?

৮। অষ্টম আয়াতের যে ব্যাখ্যা লেখক দিয়েছেন, তা কুরআনের ভাষার সাথে সম্পূর্ণ সংগতিশীল এবং যে হাদীসের বরাত আপত্তিকারীরা দিয়েছেন তারও বিরুদ্ধে নয়। এই হাদীস আলোচ্য আয়াতের কোন একটা দিক সম্পর্কেই আলোকপাত করে। অর্থাৎ মুমিন পরকালীন জীবনের দোরগোড়ায় পা রাখতেই আল্লাহ তাকে কিভাবে কলেমায়ে তাওহীদের সাহায্যে দৃঢ়তা দান করবেন, সেটা বর্ণনা করা হয়েছে। লেখক তো সে তত্ত্ব অস্বীকার করেননি? আখেরাতে মুমীনকে দৃঢ়তা দান করার কথা তিনিও স্বীকার করেন। তবে যদি আপত্তিকারীরা এই হাদীসের সুবাদে দুনিয়ার জীবনে কলেমায়ে তাওহীদের সাহায্যে দৃঢ়তা অর্জনের কথা অস্বীকার করেন, তা হলে স্বয়ং তারাই কুরআনের বক্তব্য অগ্রাহ্য করার দায়ে দোষী। কেননা কুরআন فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ (দুনিয়া ও আখেরাতে) বলছে এবং হাদীসটিতে দুনিয়ার জীবনে দৃঢ়তা দানের কথা অস্বীকার করা হয়নি।

এটা নিদারুণ মূর্খতা ও গোয়ার্তুমীর কথা যে, কোন কোন আয়াতের তফসীরে রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা সাহাবায়ে কেরামের উক্তি পাওয়া গেলেই মনে করা হবে যে, রসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের উক্তিতে আয়াতের যে মর্ম বিশ্লেষিত হয়েছে তাছাড়া বা তার অতিরিক্ত কোন মর্ম ঐ আয়াতের থাকতে পারে না। যারা তফসীরের কিতাবে রসূল (সাঃ) বা সাহাবীদের কোন উক্তি দেখেই ভাবেন যে, এ আয়াতের মর্ম এটাই এবং তার অতিরিক্ত ও তা থেকে ভিন্ন কোন মর্ম বিশ্লেষণকারীকে হাদীস বা সাহাবীদের উক্তি অগ্রাহ্যকারী বলে সাব্যস্ত করেন, তারা আসলে প্রাচীন মনীষীদের অনুসৃত রীতি সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা নিজেদের অজ্ঞতার ভোতা ছুরি দিয়ে আল্লাহর বান্দাদের ঈমানকে জবাই করে

থাকে। আল্লামা ইবনুল কাইয়েমের নিম্নোক্ত উক্তিটি তাদের মনোনিবেশ সহকারে পড়া কর্তব্যঃ

"ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্য শীর্ষ স্থনীয় প্রাচীন মনীষীর রীতি এই যে, তারা অনেক সময় আয়াতের একাধিক মর্ম ও তাৎপর্যের মধ্য থেকে কোন একটার দিকে ইংগীত দিয়ে থাকেন। কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা এই ভুল ধারণায় পড়ে যায় যে, উক্ত মর্ম ছাড়া আয়াতের আর কোন ব্যাখ্যা নেই।" (ইলামুল মুকিয়ীন, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৮)

৯। আল বাইতুল মামুরের তফসীরে যে আপত্তি তোলা হয়েছে তাও ৮ম প্রশ্নে বর্ণিত আপত্তির মতই। হাদীসে বাইতুল মামুর আকাশে অবস্থিত বলার অর্থ এ নয় যে, পৃথিবীতে বাইতুল মামুর নেই। বরং এর অর্থ এই যে, আকাশেও আছে। যেটা বলা হয়েছে, ব্যাপারটাকে তার মধ্যে সীমিত ধরে নেয়া অজ্ঞতারই পরিচায়ক। আয়াতের শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক এবং তাতে অন্যান্য অর্থেরও অবকাশ রয়েছে। কোন ব্যক্তি বাইতুল মামুর অর্থ কাবা শরীফও গ্রহণ করতে পারে। সমগ্র পৃথিবীকেও বাইতুল মামুর বলা যেতে পারে। কেউ এ কথাও বলতে পারে যে, এর অর্থ যে কোন জনবসতিপূর্ণ জায়গা। আল্লাহ তায়ালা যে উদ্দেশ্যে বাইতুল মামুরের কসম খেয়েছেন, তার সাথে উল্লেখিত সব ক'টি অর্থই সঙ্গতিপূর্ণ। একটিমাত্র অর্থ গ্রহণ করে আর সকল অর্থের জন্য মানুষের উপলব্ধির দ্বার রুদ্ধ করার কোন যুক্তি নেই।

তাছাড়া এটাও ভেবে দেখুন যে, যে ব্যক্তি কোন হাদীস সম্পর্কে নীরব থাকে, তাকে ঐ হাদীসের অস্বীকারকারী বা মিথ্যা সাব্যস্তকারী আখ্যায়িত করাটা কত মারাত্মক বাড়াবাড়ি। নীরব থাকার অর্থ কি অস্বীকার বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না? এটা কি সম্ভব নয় যে, সে ঐ হাদীস জানে না? যদি ধরেও নেই যে, সে উক্ত হাদীস সমর্থন করে না বলেই সে সম্পর্কে নীরব রয়েছে, তবুও তাকে কাফির বলা যায় কিভাবে? কোন ব্যক্তি যখন একটি হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে স্বীকার করে এবং তার পরও বলে যে, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে

প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও আমি এ কথা মানি না কেবল তখনই তাকে কাফের বলা যেতে পারে কিন্তু হাদীসটি যথার্থই রসূল(সাঃ) থেকে প্রমাণিত কি না এ ব্যাপারে যার সন্দেহ রয়েছে এবং সে জন্যই তা অগ্রাহ্য করে তাকে কাফের বা ধর্মদ্রোহী আখ্যায়িত করার কোনই যুক্তি নেই।

এ আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, কাফের ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক হওয়া বলতে যা যা বুঝায়, তার একটিও প্রশ্নকর্তার উদ্ধৃত উক্তিগুলোতে নেই। উক্ত লেখকের কিছু কিছু উক্তিকে ভ্রান্ত বা অশুদ্ধ বলার অবকাশ হয়তো আছে। কিন্তু একটি জিনিসের ভ্রান্ত বা অশুদ্ধ হওয়া এক কথা, আর তার কুফরী, ধর্মদ্রোহীতা বা নাস্তিকতার কারণ হওয়া অন্য কথা। শরীয়তের বিধান যার জানা আছে এবং কুফরী প্রমাণিত হওয়ার জন্য কোন্ কোন্ জিনিস বিদ্যমান থাকা জরুরী এ সম্পর্কে যে ব্যক্তি ওয়াকিবহাল, সে এতদূর ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য দেখাতে পারে না যে, নিজের কাছে কোন কিছু ভুল মনে হলেই কুফরীর ফতোয়া দিয়ে বসবে। কিন্তু এটা মুসলমানদের চরম দুর্ভাগ্য যে, যারা তাদের নেতা বনে বসে আছে, তাদের কতক তো শারীয়তের বিধি সম্পর্কে ওয়াকিফহালই নয়, বরং তাদের বিদ্যার দৌড় কাড়ি কাড়ি কিতাবের বোঝা বহন পর্যন্তই। আর কিছু সংখ্যক বিদ্যান ঠিকই, কিন্তু আল্লাহর কাছে জবাবদিহীর অনুভূতি তাদের নেই। এ জন্য তাদের রীতি এই যে, কারো ওপর অসন্তুষ্ট হলেই নির্দিধায় কুফরীর ফতোয়া জারী করে বসেন। তারা নির্বিচারে 'ভুলকে কুফরী' ও ধর্মদ্রোহীতা বলে চালিয়ে দেন। তাদের চোখে যেটাই ভুল, সেটা হয় কুফরী নচেৎ ধর্মদ্রোহীতা ও নাস্তিকতা। খুব কৃপা যদি করেন তবে ফাসেক কিংবা গোমরাহ বলে রায় দিয়ে দেবেন। এর চেয়ে কম ভাবত্বের কোন শব্দ তাদের অভিধানেই নেই।

যারা আমার নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তারা জানেন যে, আমি এ ধরনের বিতর্ক সব সময় এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত। এমনকি কেউ যদি বাহাস করার সখে আমার সাথে ঝগড়া করতে আসে, আমি প্রথম ঘোষণাতে হার মেনে তার কবল থেকে নিস্তার লাভ

করি। আর নিজের এই চিরাচরিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে, এই বিতর্কে কয়েক পাতা লিখে ফেলেছি, এর উদ্দেশ্য প্রশ্নকর্তার বর্ণিত সেই বিশেষ বির্তকে হস্তক্ষেপ করা নয়। এ ধরনের বির্তক তো আমাদের সমাজে এত বেশী ছড়িয়ে রয়েছে যে, তার মীমাংসা করা কোন মানুষের সাধ্যাতীত। এ আলোচনা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, আলেমদের মধ্যে যারা মুসলিম সমাজে এ ধরনের বির্তকের বিস্তার ঘটিয়ে ইসলামের শক্তি খর্ব এবং বিশ্ববাসীর সামনে নিজেদেরকে এবং সেই সাথে ইসলামকেও উপহাসের বস্তুতে পরিণত করছেন, তাদের বিবেকের কাছে এ লজ্জাজনক ধারাটা বন্ধ করার আবেদন জানাতে চাই। সেই সাথে সাধারণ মুসলমান-দেরকেও জানিয়ে দিতে চাই যে, তাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যে সব বিষয় নিয়ে বির্তকের ঝড় তুলে তাদের পরস্পরকে বিবাদ কলহে লিপ্ত করছে' তা কত তুচ্ছ ও অসার জিনিস এবং এ সব বাজে ব্যাপার নিয়ে বিতর্কে জড়িত হয়ে অহেতুক মূল্যবান সময়-অর্থ ও জাতীয় শক্তির অপচয় করা কত বড় বোকামী, যার দরুণ একদিকে বিশ্ববাসীর সামনেও নিজেদেরকে লাঞ্ছিত করা হয়, অপরদিকে আল্লাহও সন্তুষ্ট হন না। রবিউসসানী, (তরজমানুল কুরআন ১৩৫৮ হিঃ জুন, ১৯৩৯)

(তরজমানুল কুরআন, রবিউসসানী, ১৩৫৮ হিঃ, জুন, ১৯৩৯ ইং)।

কাফির ফতোয়ার আপদ

(এটা ১৯৩৫ সালের ঘটনা। ভারতের দুজন প্রখ্যাত মনীষীর বিরুদ্ধে কতিপয় নামকরা আলিম কাফির ফতোয়া দিয়েছিলেন।এ ব্যাপারে তরজমানুল কুরআনে নিম্নলিখিত নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল। যাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়া হয়েছিল তারা তো আগেই ইন্তিকাল করেছেন। আর যাঁরা ফতোয়া দিয়েছিলেন তাঁদেরও কয়েক জন ইতিমধ্যে ইন্তিকাল করেছেন। আল্লাহ তাঁদের সকলকে ক্ষমা করুন। উক্ত নিবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য পুরানো কাসুন্দি ঘাটা নয়। শুধুমাত্র জনসাধারণের উপকারার্থেই এটি উধৃত করা হচ্ছে।)

পতন যুগের মুসলিম সমাজে যেখানে বহু সংখ্যক মারাত্মক আপদের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, সেখানে একে অপরকে কাফির ও ফাসিক আখ্যা দেয়া এবং একে অপরের ওপর অভিসম্পাত করাও একটা গুরুতর ও বিপজ্জনক ব্যাধির আকারে দেখা দিয়েছে। ইসলামের সহজ সরল আকীদাগুলোতে চুলচেরা বাছ–বিচার চালাতে গিয়ে এবং আন্দাজ–অনুমান ও মনগড়া ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়ে লোকেরা তার ভেতর থেকে এমন বহু শাখা–প্রশাখা ও খুঁটিনাটি বিষয় আবিষ্কার করে নিয়েছে যা একদিকে পরস্পর থেকে আলাদা ও পরস্পরের বিরোধী, অপর দিকে কুরআন ও সুন্নাহতে তার স্বপক্ষে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল না অথবা আসলেও আল্লাহ ও রসূল তার ওপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেননি। তাছাড়া আল্লাহর এই বান্দারা (আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমা করুন) নিজের আবিষ্কৃত এই সব খুঁটিনাটি বিধিকে এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তার ওপরই মানুষের ঈমান নির্ভরশীল বলে ঘোষণা করেছেন, সেগুলোর ভিত্তিতে মুসলিম জাতিকে খন্ডবিখন্ড করে দিয়েছেন, শত শত ফের্কা ও উপদলের সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক ফের্কা পরস্পরকে কাফির,ফাসেক, দোজখবাসী এবং আরো কত কি ঘোষণা করেছেন,তার ইয়ত্তা নেই। অথচ ইসলাম

ও কুফরীর সীমারেখা আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে রেখে দিয়েছেন এবং নিজ নিজ খেয়াল খুশী মত এটাকে ইসলাম ওটাকে কুফরী বলে চিহ্নিত করার অধিকার কাউকেই দেননি। এই বিপজ্জনক প্রবণতার উৎস সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত সংকীর্ণ মানসিকতা হোক অথবা অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত স্বার্থপরতা, ঈর্ষা অথবা আত্মম্ভরিতা হোক এর দরুন মুসলিম সমাজের যত ক্ষতি হয়েছে, ততটা বোধ হয় অর কোন জিনিসের দরুন হয়নি।

কোন মানুষের সত্যিকার মুমিন হওয়া না হওয়ার ফয়সালা করা যে আদৌ কোন মানুষের কাজ নয়, সে কাথা তর্কাতীত সত্য। এ ব্যাপারটা সরাসরি আল্লাহর এখতিয়ার ভুক্ত এবং এর ফায়সালা একমাত্র তিনিই কিয়ামতের দিন করবেন। এছাড়া কোন কিছুর বিচার-ফায়সালা যদি মানুষের এখতিয়ারাধীন থেকে থাকে তবে সেটি শুধু এই যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল ইসলামী আদর্শ ও জাতীয়তার যে সব সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ও বৈশিষ্ট্য জানিয়ে দিয়েছেন তার আলোকে স্থির করতে হবে যে, কোন ব্যক্তি ইসলামের চৌহদ্দীর ভেতরে রয়েছে আর কেইবা তা ডিঙ্গিয়ে বাইরে চলে গেছে। এ উদ্দেশ্যে যে কটি জিনিস আমাদেরকে ইসলামের ভিত্তি বলে জানানো হয়েছে তা এইঃ

اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ
اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَ
تَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

"ইসলাম এই যে, তুমি এই মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল। আর নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং আল্লাহর ঘরে পৌছার ক্ষমতা থাকলে সেখানে গিয়ে হজ্জ করবে,"

(মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিজী, নাসায়ী)।

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ
فَاِذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ
وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (بخاری۔ مسلم۔ احمد)

"মানুষ যতক্ষণ সাক্ষ্য না দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল আর নামায কায়েম ও যাকাত আদায় না করে,ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ কাজগুলো যখন তারা করবে তখন তাদের প্রাণ আমার থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে । অবশ্য ইসলামের কোন অধিকার তাদের কাছে প্রাপ্য হলে সে কথা স্বতন্ত্র। এরপর তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর হাতে সমর্পিত ।" (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ)।

এই হলো ইসলামী সমাজের সীমারেখা। যারা এ সীমারেখার ভেতরে রয়েছে আমাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে তাদের সাথে মুসলমানের মত আচরণ করার। তাদেরকে মুসলিম জাতির বহির্ভূত করার অধিকার কারোর নেই। আর যারা এ সীমারেখা ডিঙ্গিয়ে বাইরে চলে গেছে, তাদের সাথে "ইসলামের অধিকারের" আলোকে যে আচরণ করা জরুরী তাই করতে হবে। উভয় অবস্থাতেই তাদের মনের ভেতরকার অবস্থা যাচাই করার অধিকার আমাদের নেই। আমাদের কাজ শুধু বাইরের অবস্থা দেখা। আমরা তো দূরের কথা ,স্বয়ং রসূলও (সঃ) বাইরের অবস্থাই শুধু দেখেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, বুখারী ও মুসলিম শরীফের সর্বসম্মত বর্ণনা এই যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার ইয়ামান থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু নগদ অর্থ পাঠালেন। রসূল (সাঃ) সেই অর্থ চার ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এতে উপস্থিত লোকজনের মধ্য থেকে একজন আপত্তি জানিয়ে বলে উঠলোঃ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اتَّقِ اللّٰهَ (হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহকে ভয় করুন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ وَيْلَكَ اَوَلَسْتُ اَحَقَّ اَهْلِ الْاَرْضِ

أَتْقَى اللّٰهِ বড়ই পরিতাপের বিষয় । বিশ্ববাসীর মধ্যে আর কে আছে, আমার চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করা যার পক্ষে সমিচীন হতে পারে?") হযরত খালেদ (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ওকে হত্যা করে ফেলি? তিনি বললেন; لَا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ يُصَلِّيْ না, হতে পারে সে নামাজ পড়ে") খালেদ বললেনঃ কত নামাযী এরকম আছে যে, মুখে ঈমানের দাবী করে কিন্তু তাদের অন্তরে তা নেই।" রসূল (সাঃ) বললেনঃ إِنِّيْ لَمْ أُؤْمَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوْبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُوْنَهُمْ। "মানুষের হৃদয় বের করে ও পেট চিরে দেখার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়নি।" ইমাম শাফেয়ী, ইমাম অহমদ ও ইমাম মালেক নিজ নিজ হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, একবার জনৈক আনসারী রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সংগোপনে কিছু বলছিল, রসূল (সাঃ) উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করলেনঃ أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ؟ ।("সে ব্যক্তি কি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাক্ষ্য দেয়না?) আনসারী বললেন! بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا شَهَادَةَ لَهُ "হাঁ, ইয়ারাসূলুল্লাহ, সে সাক্ষ দেয় ,তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নয়।" রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবার জিজ্ঞাসা করলেন أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ؟। "সে কি সাক্ষ্য দেয়, না যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল? আনসারী এবারও জবাব দিলেন ঃ بَلٰى وَلَا شَهَادَةَ لَهُ জ্বি, সে সাক্ষ্য দেয় তবে তার সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়।" হুজুর (সাঃ) বললেনঃ أَلَيْسَ يُصَلِّيْ؟ সে কি নামায পড়ে না?" তিনি বললেনঃ بَلٰى وَلَا صَلٰوةَ لَهُ জ্বি হাঁ ,তবে তার নামায ধর্তব্য নায়"। তখন রসূল (সাঃ) বললেনঃ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَهَانِيَ اللّٰهُ عَنْ قَتْلِهِمْ। "এ ধরনের লোকদেরকে হত্যা করতে আল্লাহ আমাকে নিষেধ করেছেন।"

তাহলে ভেবে দেখা দরকার যে, যে সব মুসলমান আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশিত ঈমান আনারযোগ্য বিষয়গুলোর ওপর ঈমান রাখে বলে ব্যক্ত করে এবং উল্লিখিত অকাট্য ঘটনাবলী অনুযায়ী ইসলামের চৌহদ্দীর ভেতরে অবস্থান করে, তাদেরকে মুসলিম জাতির বহির্ভূত ঘোষণা করা কতদূর বাড়াবাড়ি। এ ঔদ্ধত্য

ঔদ্ধত্য বান্দার বিরুদ্ধে নয় স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধেই দেখানো হচ্ছে। আল্লাহর আইনে যাকে মুসলমান বলে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে, তাকেই আল্লাহর এক বান্দা কাফির বলার স্পর্ধা দেখাচ্ছে। এ জন্যই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে তাকে কাফির ও ফাসিক বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। এমনকি তিনি এও বলেছেন যে, আসলে কাফির নয় এমন ব্যক্তিকে যে কাফির বলবে, সেই কুফরীর ফতোয়া স্বয়ং ফতোয়াদাতার ওপরই বর্তাবে।

أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا۔ (بخاری)

"যে ব্যক্তি স্বীয় মুসলমান ভাইকে কাফির বলবে, তার এই উক্তি ঐ দুজনের একজনের ওপর অবশ্যই বর্তাবে"(বুখারী)।

لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا
ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَٰلِكَ۔ (بخاری)

"যখনই কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ওপর কুফরী কিংবা ফাসেকীর অপবাদ আরোপ করবে, তখন অভিযুক্ত ব্যক্তি আসলে কাফের বা ফাসিক না হলে সেই অপবাদ আরোপকারীর ওপরেই ঘুরে আসবে" (বুখারী)।

مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوُّ اللهِ وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ إِلَّا
حَارَ عَلَيْهِ۔ (مسلم)

"যে ব্যক্তি কাউকে কাফির কিংবা আল্লাহর দুশমন বলবে, অথচ আসলে সে তা নয়, সেই উক্তি স্বয়ং বক্তার ওপরই বর্তাবে" (মুসলিম)।

مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ
فَهُوَ كَقَتْلِهِ۔ (بخاری)

"যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে অভিসম্পাৎ করলো সে যেন খুন করলো। যে ব্যক্তি কোন মুমিনের ওপর কুফরীর অপবাদ আরোপ করলো সে যেন তাকে হত্যা করলো"(বুখারী)।

এ ধরনের নির্বিচার কাফির ও ফাসিক আখ্যা দান শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি বিশেষের অধিকারে হস্তক্ষেপ নয়, বরং একটা সামাজিক অপরাধও বটে। এটা সমগ্র ইসলামী সমাজের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি। সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতি এর দ্বারা নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।এই ক্ষতির কারণ সামান্য চিন্তাভাবনা করলেই বুঝা যায়।

ইসলামী সমাজ ও অনৈসলামী সমাজের মধ্যে বুনিয়াদী পার্থক্য এইযে,অনৈসলামী সমাজ বর্ণ, বংশ, ভাষা ও জন্মভূমির ঐক্য সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে ইসলামী সমাজ নিরেট ইসলামী বন্ধনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অনৈসলামী সমাজে আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তার গরমিলে কোন বিভেদ সূচিত হয় না। কেননা সেখানে বর্ণ, বংশ, ভাষা ও জন্মভূমির ঐক্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে সম্পর্ক বন্ধন গড়ে ওঠে, আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার পার্থক্য তাদেরকে সেই বন্ধন থেকে বের করে দেয় না। মনের ধ্যান-ধারনার দিক দিয়ে চাই আকাশ-পাতাল পার্থক্য হোক,রক্তের সম্পর্ক চিন্ন হতে পারে না, ভৌগলিক বন্ধন টুটতে পারে না, ভাষার ঐক্য খন্ডিত হতে পারে না, বর্ণের সম্পর্কও বিভক্ত হতে পারে না। সে জন্য আকীদা বিশ্বাসের ও আদর্শের বিভিন্নতায় অমুসলিম সমাজের কোন ক্ষতির আশংকা নেই। কিন্তু ইসলামে যে জিনিস বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন বংশের, বিভিন্ন ভাষার এবং বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জাতিতে পরিণত করে, সেটা আকীদাগত ও আদর্শ গত ঐক্য চাড়া আর কিছু নয়। এখানে আদর্শই সবকিছু ,বর্ণ ,ভংশ, ভাষা দেশ কিছুই নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আকীদা ও আদর্শের ঐক্য বন্ধনকে ছিন্ন করে, সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর সেই রজ্জুকেই কেটে দেয়, যা এক আল্লাহর ইবাদতকারী, এক রসূলের উম্মত এবং এক কিতাবের অনুসারীদেরকে পরস্পরের সাথে সংঘবদ্ধ করেছে। ইসলামে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কাফির বলার অর্থ শুধু এই দাঁড়ায় না যে, তার বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের ওপর আক্রমন চালানো হলো, বরং তার অর্থ এই যে, ইসলামী সমাজ এবং তার এক কিংবা একাধিক ব্যক্তির

মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সামাজিকতা, লেনদেন ও পারস্পরিক সহযোগিতার যতগুলো বন্ধনসূত্র ছিল তার সবগুলো ভিন্ন করে দেয়া হলো এবং মুসলিম উম্মাহর দেহ থেকে তার এক একটা অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে নিক্ষেপ করা হলো।

এ কাজটা যদি আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ মোতাবেক করা হয় তা হলে তা নিশ্চিতভাবে ন্যায়সঙ্গত। সে ক্ষেত্রে পচনশীল অঙ্গকে কেটে দূরে সরিয়ে ফেলাই ইসলামের যথার্থ হীত কামনার শামীল। কিন্তু আল্লাহর আইন অনুসারে সেই অঙ্গ যদি পচা না হয় এবং কেবল অন্যায়ভাবে ও অবিচারমূলকভাবে তা কেটে ফেলা হয়, তবে এই জুলুম খোদ অঙ্গের চাইতে সেই দেহের ওপরই বিশী করা হবে,যে দেহ থেকে অঙ্গটিকে ভিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ) যে ইসলামী সম্পর্ক বন্ধনকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য কঠোরভাবে তাগিদ দিয়েছেন, তার কারণ এখানেই নিহিত। আল্লাহ বলেনঃ

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا (النساء:٩٤)

"যে ব্যক্তি (নিজের ইসলামী পরিচয় তুলে ধরার নিমিত্ত) তোমাদেরকে সালাম করে, তাঁকে (না জেনে শুনেই) বলে দিও না যে, তুমি মুমিন নও" (আননিসা–৯৪)।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,একবার এক ছোট আকারের সমরাভিযানকালে এক ব্যক্তি মুসলিম দলকে দেখে বললেনঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ কিন্তু একজন মুসলমান এই ভেবে যে সে জান বাঁচানোর জন্য কালেমা পড়েছে তাই তাকে হত্যা করলো। রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপারটা জানতে পেরে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং হত্যাকারী মুসলমানের কাছে কৈফিয়ত তলব করলেন। সে বললো,হে রসূলুল্লাহ ! সে শুধু আমাদের তলোয়ার থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য কলেমা উচ্চারণ করেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ "তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে?"

এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেনঃ এক ব্যক্তি যদি আমার ওপর হামলা করে আমার হাত কেটে ফেলে এবং আমি তার ওপর পাল্টা হামলা চালালে সে কালেমা উচ্চারণ করে, তাহলে আমি কি তাকে হত্যা করতে পারি? রসূল (সাঃ) বললেনঃ না। সাহাবী আবার বললেন সে তো আমার হাত কেটে ফেলেছে। রসূল (সাঃ) বললেনঃ তথাপি তুমি তাকে হত্যা করতে পার না। যদি কর, তবে তুমি তাকে হত্যা করার আগে যেমন ছিলে সে তেমন হয়ে যাবে। আর সে কালেমা পড়ার আগে যেমন ছিল তুমি সে রকম হয়ে যাবে।

আর এক হাদীসে আছে যে, রসূল (সাঃ) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি কোন কাফিরের ওপর বর্শা হানতে উদ্যত হয় এবং বর্শা ফলক তার কণ্ঠনালীর কাছে পৌছামাত্র সে কালেমা পড়ে, তাহলে মুসলমানকে তৎক্ষণাত বর্শা টেনে নিতে হবে।

আর এক হাদীসে আছে, মুসলমানকে গালী দেয়া মহাপাপ এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।

হাদীস ও কুরআনের এ সব উক্তির কারণ এই যে, মুসলমানদের শক্তি সামর্থ ও সংঘবদ্ধতা ইসলামী সম্পর্ক বন্ধন ছাড়া অন্য কোন জিনিসের দ্বারা বহাল হওয়া ও টিকে থাকা সম্ভব নয়। মুসলমানদের মধ্যে যদি এই বন্ধনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকে এবং কথায় কথায় তারা এই বন্ধনকে ছিন্ন করতে আরম্ভ করে, তাহলে উম্মতের সংঘবদ্ধ অস্থিত্ব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য এবং যে জাতিকে বাতিল শক্তির মোকাবিলায় আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করার এবং কল্যাণ ও সততার দিকে মানব জাতিকে আহ্বান করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে জাতির সামাজিক শক্তি বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

তাই বলে আমরা এ কথা বলতে চাইছি না যে, কোন অবস্থাতেই কাউকে কাফির বা ফাসেক বলে চিহ্নিত করা যাবে না, এমনকি কেউ যদি খোলাখুলি কুফরীর কথাবার্তা বলতে ও লিখতে থাকে তবুও তাকে মুসলমানই বলতে ও মনে করতে থাকতে হবে।

কুরআন ও সুন্নাহর উপরোক্ত উক্তিসমূহেও এ কথা বলা হয়নি এবং আমি যে কথাগুলো বলে এসেছি তারও অভিপ্রায় তা নয়। সেটা হয়ই বা কেমন করে? কোন মুসলমানকে ইসলাম থেকে খারিজ করা যতখানি ক্ষতিকর , কোন কাফিরকে ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে রাখা তার চেয়ে কম অনিষ্টকর নয়। আমি যে কথাটা জোর দিয়ে বলতে চাই, সেটা এই যে, একজন মুসলমানকে কাফির আখ্যায়িত করতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। একজন মানুষকে হত্যা করার পক্ষে রায় দিতে যতখানি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, এক্ষেত্রে ঠিক ততখানি সাবধানতা অবলম্বন করা চাই। যে ব্যক্তি মুসলমান এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' উচ্চরণ করে,তার সম্পর্কে এ ধারণাই রাখা বাঞ্ছণীয় যে,তার অন্তরে ঈমান রয়েছে। সে যদি এমন কোন কথা উচ্চারণ করে যাতে কুফরীর গন্ধ রয়েছে, তাহলে তার তার সম্পর্কে এরূপ সুধারণা পোষণ করা উচিত যে,হয়তো সে কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে ঐকথা বলেনি। সম্ভবত সে নিছক অজ্ঞতার কারণে ও না বুঝে অমন কথা বলেছে। এ জন্য তার বক্তব্য শোনা মাত্রই কাফিরী ফতোয়া ছুঁড়ে দেয়া উচিত নয়। বরং তাকে ভালোভাবে বুঝানোর চেষ্টা করা উচিত। যদি তবুও সে না মানে এবং নিজের বক্তব্য নিয়ে জিদ ধরে, তাহলে যে বক্তব্য নিয়ে সে জিদ ধরেছে সেটাকে কুরআনের আলোকে বিচার করতে হবে যে, কথাটা ঈমান ও কুফরীর মধ্যে প্রভেদকারী অকাট্য কুরআনী ঘোষণাবলীর বিরোধী কি না। তার সেই উক্তি বা কাজের অন্য কোন ব্যাখ্যার অবকাশ অছে কি না। যদি তা অকাট্য ঘোষণাবলীর বিরোধী না হয় এবং ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে তাহলে কুফরীর পক্ষে রায় দেয়া যাবে না। বড় জোর তাকে গোমরাহ বা বিভ্রান্ত বলা যেতে পারে। তাও শুধু ঐ নির্দিষ্ট ব্যাপারটার ক্ষেত্রে, সর্বিকভাবে নয় তবে যদি তার ধ্যাণ ধারণা ও আকীদা বিশ্বাস কুরআন সুন্নাহর অকাট্য ঘোষণার বিরোধী হয় এবং বিরোধী জানা সত্ত্বেও সে নিজ বিশ্বাসে অনড় থাকে, অথবা তার কথার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাও দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে বিচারাধীন বিষয়টার

আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে তার কাফির বা ফাসেক (মহাপাপী) হওয়ার পক্ষে রায় দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও স্তর ও পর্যায়ের তারম্য বিবেচনায় রাখা জরুরী। সকল অপরাধ এবং সকল অপরাধী এক পর্যায়ের হয় না। তাদের ভেতরেও স্তর ভেদ থাকে। এই পার্থক্য বিবেচনায় রেখে শাস্তি বিধান করাই ন্যায়নীতির দাবী। সবাইকে একই লাঠি দিয়ে তাড়ানো নিশ্চয়ই বেইনসাফী।

আমরা প্রথমেই বলে এসেছি যে, ইসলাম ও কুফরীর একটা দিক প্রকাশ্য ,আর একটা দিক সুপ্ত ও অদৃশ্য। যে দিকটা সুপ্ত ও অদৃশ্য তার সম্পর্ক হৃদয় ও মনের সাথে। আর প্রকাশ্য দিকটার সম্পর্ক মানুষের কথা ও কাজের সাথে। মানুষের কথা ও কাজ থেকে তার মনের অবস্থা আমরা খানিকটা আন্দাজ করতে পারি এ কথা সত্য। তবে সেটা হবে নিছক আন্দাজ, অনুমান ও ধারনা মাত্র। তাকে নিশ্চিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা যায় না। আর নিশ্চিত বিশ্বাস ও জ্ঞান ব্যতীত শুধুমাত্র আন্দাজ, অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কারো ঈমান ও কুফরীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়া বা মত প্রকাশ করা জুলুম ছাড়া আর কিছু নয়। এমন কি সে সিদ্ধান্ত যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রকৃত মানসিক অবস্থার অনুরূপও হয়। সুতরাং চূড়ান্ত সত্য কথা এইযে, ঈমানের ব্যাপারটা আল্লাহর কাছেই সোপর্দ করা উচিত। কেননা কার অন্তরে ঈমান আছে, আর কার অন্তরে ঈমান নেই,সে কথা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ (النجم ۳۰)

"নিশ্চয় একমাত্র তোমার প্রভুই সঠিকভাবে জানেন কে তার পথ হারিয়ে ফেলেছে এবং তিনিই জানেন কে সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে" (আন নাজম,৩০)।

আমাদের দৃষ্টি কেবল প্রকাশ্য জিনিস পর্যন্তই যেতে পারে এবং বাহ্যিক কাজ ও কথা দেখেই আমরা কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয় সে সম্পর্কে মতামত অবলম্বন করতে পারি। এমনও হতে পারে যে অজ্ঞতা ও মূর্খতা বশত যে ব্যক্তি মুখ দিয়ে কুফরী উদগীরন করে চলেছে, অন্তরে সে একজন সাচ্চা ও পাকা মুমিন

এবং তার দিলে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রেম অনেক পীর মুরশিদ ও ওয়াজ নসিহতকারীর চাইতেও বেশী রয়েছে। অনুরূপভাবে এটাও বিচিত্র নয় যে ,যে ব্যক্তি খুব জোরেশোরে আড়ম্বরের সাথে ঈমানদারী জাহির করতে এবং বাহ্যত শরীয়তের হুকুম পালনেও কোন ত্রুটি করে না, আসলে সে একজন ভন্ড, বকধার্মিক ও মোনাফেক। সুতরাং বাহ্যিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাউকে কাফির বলে রায় দিতে গিয়ে আমাদের আল্লাহর পাকড়াও সম্পর্কে হুশিয়ার থাকা উচিত। এরূপ ফয়সালা করার সময় হাজার বার ভেবে দেখতে হবে যে, আমরা নিজেদের ঘাড়ে কি ধরনের গুরুদায়িত্ব তুলে নিচ্ছি এবং এমন গুরুভার এড়িয়ে যাওয়ার চাইতে ঘাড়ে তুলে নেয়াই যে শ্রেয় মনে করলাম,তার পক্ষে কি কি যুক্তি সঙ্গত কারণ রয়েছে।

এ কথা সবার জানা যে, সহজাত প্রবৃত্তি, মেজাজ ও স্বভাব এবং মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান নয় বরং প্রত্যেকের মান ও অবস্থা ভিন্ন। কেউ হয় একেবারেই সাদাসিধে। তারা একটা সহজ সরল কথাকে সংক্ষিপ্তভাবেই মেনে নেয়। বিস্তারিত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুটিনাটি বুঝবার তাদের ক্ষমতাও থাকে না, বুঝতেও চায় না । পক্ষান্তরে কিছু লোক এমনও থাকে, যারা চিন্তাভাবনা করার যোগ্যতা সম্পন্ন এবং সংক্ষিপ্ত কথায় তাদের তৃপ্তি আসে না। তারা বিস্তারিত খুটিনাটি জানতে চায়। তা যখন পায় না তখন কল্পনা করে তা সৃষ্টি করে নেয়। আবার চিন্তা-গবেষণার যোগ্যতা সম্পন্ন এই শ্রেণীর লোকদের ঝোঁক প্রবণতা ও বুদ্ধির স্তরেও অনেক তারতম্য, কারো ঝোঁক থাকে সন্দেহ-সংশয়ের দিকে, কারোবা প্রত্যয় ও বিশ্বাসের দিকে। কেউ বস্তুগত ও ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের ভক্ত, কেউ বুদ্দিবৃত্তিক ও যৌক্তিক তত্ত্বের অনুরাগী, কেউ কথা শুনেই তার নিগূঢ়তম মর্ম উপলব্ধি করে। আবার কেউ খানিকটা উপলব্ধি করেই খেই হারিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকে। কেউ হয় ঘোর বাস্তববাদী (Realist) আবার কারোবা কল্পনার জগতে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে।। মোট কথা, চিন্তা-গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের বহু পথ রয়েছে, প্রত্যেক মানুষের মন

মস্তিষ্ক নিজ নিজ সহজাত রুচি ও মনোবৃত্তি অনুসারে তার মধ্য থেকে নির্দিষ্ট পথ বেছে নেয় । কোন মানুষের সাধ্য নেই অন্য মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি, সহজাত ঝোক ও আকর্ষণ এবং বুদ্ধিবৃত্তির যোগ্যতাকে বদলে দেয়ার। কোন মানুষের এরূপ দাবী করারও অধিকার নেই যে,তার নিজের সহজাত মনোবৃত্তি এবং তার নিজস্ব রুচি ও অনুরাগকেই অন্য সকলের মানদন্ড হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হবে এবং সেই মানদণ্ডে সকলকে রূপান্তরিত ও উত্তীর্ণ হতেই হবে।

যে খোদা ইসলামকে সমগ্র মানব জাতির পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত নাযিল করেছেন এবং মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির এই সব তারতম্য ও স্তরভেদ সম্পর্কে তার চেয়ে বেশী সূষ্ঠজ্ঞান এই সব তারতম্যের প্রতি তার চেয়ে বেশী সুক্ষ্ম দৃষ্টি আর কার থাকতে পারে? এ কারণেই তিনি তাঁর দীনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন এমন কয়টি সাদাসিধে, সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত আকীদা-বিশ্বাসের ওপর ,যাকে একজন স্বল্প বুদ্ধির গ্রাম্য কৃষক থেকে শুরু করে একজন সূক্ষ-দর্শী আধূনিক ও নিরেট বাস্তববাদী বিজ্ঞানী পর্যন্ত সকলেই গ্রহণ করতে সক্ষম। এই আকীদাসমূহের সরলতা ও সংক্ষিপ্ততাই হলো এর সেই চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য যার কল্যাণে এগুলো একটা বিশ্বজনীন ধর্মের মূলনীতি হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। যে ব্যক্তি চিন্তা গবেষণার যোগ্যতা রাখেনা তার জন্য। আল্লাহ এক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রসূল, কুরআন আল্লহর কিতাব এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহর সমনে আমাদের সবাইকে উপস্থিত হতে হবে। এতটুকু স্বীকার করে নেয়াই যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি চিন্তা গবেষণার যোগ্যতাসম্পন্ন, তার জন্য এই সংক্ষিপ্ত কথা কয়টির মধ্যে এত বিশাল ও বিস্তৃত চিন্তার ক্ষেত্র রয়েছে যে, সে নিজের যোগ্যতা ও ঝোঁক অনুসারে সত্যানুসন্ধানের জন্য অগণিত পথে অগ্রসর হতে পারে, যত দূর ইচ্ছে যেতে পারে। এ অনুসন্ধানে তার গোটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে এবং কোন বিন্দুতে গিয়েই তার এ কথা বলার অবকাশ থাকবে না যে, আমি যা কিছু জানার ছিল জেনে ফেলেছি।

তার পর একজন চিন্তাশীল মানুষ নিজের চিন্তা গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য চাই যে কোন পথ অবলম্বন করুক এবং চাই সে যতদূর চলে যাক ,যতক্ষণ সে আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত ইসলাম ও কুফরের সীমারেখা অতিক্রম না করবে ,ততক্ষণ তাকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করার কোন উপায় নেই, চাই তার মেধার ছুটাছুটি লম্ফঝম্পের সাথে আমাদের যত মতবিরোধই ঘটুকনা কেন।

উদাহরণ স্বরূপ, আল্লাহর প্রতি ঈমান সংক্রান্ত তত্ত্বের মূল কথাশুধু এই যে, বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টা ও পরিচালক একমাত্র আল্লাহ এবং একমাত্র তিনিই বিশ্ববাসীর ইবাদত বন্দিগী পাওয়ার যোগ্য। এ কথাটা একজন সরলমতি কৃষক যেমন মেনে নিতে পারে, একজন চিন্তাশীল মানুষও ঠিক সেইভাবে এবং ঠিক তদ্রুপ সংক্ষিপ্তভাবেই মেনে নিতে পারে না। একজন বিশেষ ধরনের তত্ত্বানুরাগী স্বভাবের মানুষ যেমন এতে গবেষণা চালিয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলী এবং বিশ্বজগতের সাথে তাঁর সম্পর্কের ধরণ ও প্রকৃতি সংক্রান্ত যে বিস্তারিত ধ্যান-ধারণা নিজ মনমগজে বদ্ধমূল করবে, এ সব ব্যাপারে অন্য ধরনের ঝোঁক ও অনুরাগ সম্পন্ন মানুষের ধ্যান-ধারনা যে ঠিক সেই ধরনের হবে,এটা সম্ভব নয়। কিন্তু এই সকল বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ যতক্ষণ আসল মৌলিক আকীদায় বিশ্বাসী থাকবে,ততক্ষণ তারা সবাই মুসলমান। তাই বিস্তারিত তত্ত্বানুশীলনে তাদের চিন্তাধারা পরস্পর থেকে যত ভিন্ন ধরনেরই হোক না কেন এবং তাদের কেউ কেউ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যতই হোচট খাক না কেন। একইভাবে ওহী, রিসালাত, ফেরেশতা ও আখিরাত সম্পর্কেও ইসলামী আকীদার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় একেবারেই মৌলিক এবং সেগুলোকে ইসলামের আবশ্যকীয় মৌল তত্ত্ব (Essentials) বলাযেতে পারে। এছাড়া আর যা কিছু আছে তা বিস্তারিত খুঁটিনাটি বিষয়। এগুলোর কোন কোনটা কুরআনে প্রত্যক্ষভাবে অথবা ব্যাখ্যা সাপেক্ষে পরোক্ষ ইংগীতের মধ্য দিয়ে বিরাজমান আর কতকগুলো মানুষ তার নিজস্ব সহজাত ঝোঁক ও অনুরাগের বশে নিজ মস্তিষ্ক থেকে

উদ্ভাবন করে নেয়। এ সব খুঁটিনাটি তত্ত্বের কোন একটির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত দিতে গিয়ে কোন মানুষের বুদ্ধি বিভ্রাট ঘটে যাওয়া এবং তার চিন্তাধারা বাস্তব থেকে বহু দূরে সরে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু যতক্ষণ ঐ সব আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মূল তত্ত্বের সাথে তার যোগসূত্র বজায় থাকে, চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কোন বিভ্রান্তিই তাকে ইসলাম থেকে বিপথগামী করতে পারে না, তাই ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু থেকে তার যত দূরত্বই সৃষ্টি হোক এবং তার আকীদাগত বিপথগামিতার জন্য তাকে আমাদের যত তিরস্কার ও ভর্ৎসনাই করতে হোক।

এ পর্যায়ে এসে আমরা সামান্য চিন্তা করলেই বুঝতে পারি, ইসলামে বিভিন্ন ফের্কা ও উপদলের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে ইসলামের যে সব অত্যাবশ্যকীয় মৌল আকীদা-বিশ্বাস নিতান্ত সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে এবং কোথাও তার বিশদ বিবরণ প্রসঙ্গে যে সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন ইংগীত করা হয়েছে তা হৃদয়ঙ্গম করতে বিভিন্ন লোক নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা ও স্বগত ঝোঁক প্রবণতার ভিত্তিতে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে এবং তার ব্যাপকতর উপলব্ধির জন্য আন্দাজ, অনুমান ও যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথক পৃথক খুঁটিনাটি তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছে। এটুকু করাতে কোন অসুবিধা ছিল না। এমনকি একটি গোষ্ঠী যদি এভাবে উদ্ভাবিত একমাত্র নিজস্ব মত ও পথকেই সত্য ও সঠিক মনে করতো এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর সাথে আলাপ আলোচনা চালিয়ে তাদেরকে নিজেদের মত ও পথের দিকে টানতে চেষ্টা করতো, তবে তাতেও দোষের কিছু ছিল না। কিন্তু সর্বনাশা ব্যাপার ঘটেছে এই যে, লোকেরা অন্যায়, বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা প্রয়োগ করে নিজেদের আন্দাজ অনুমান ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রসূত আকীদাগুলোকেও ইসলামের মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় আকীদায় পরিণত করেছে এবং তার বিরোধিতাকারীদেরকে তারা কাফির বলতে শুরু করেছে। এখান থেকেই আকিদাগত যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটেছে আর এটাই হলো চিন্তা ও বিশ্বাসের রাজ্যে সেই উপদলীয় কোন্দলের উৎপত্তিস্থল। এ কথা সত্য যে, আকায়েদের ক্ষেত্রে

আন্দাজ, অনুমান ও যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সব রকমারি মত ও পথ অবলম্বন করা হয়েছে তার অনেক গুলোই ভ্রান্ত। কিন্তু তাই বলে প্রত্যেক ভ্রান্তিই অনিবার্য্যভাবে কুফরী নয়। ভুলকে ভুল বলা, ভুল পথে চলমান লোকদেরকে ভ্রান্ত ও গোমরাহ মনে করা এবং তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করা নিসন্দেহে বৈধ। কিন্তু আল্লাহ যেই সত্যের ওপর ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন, সেই মূল সত্যকে কেউ যতক্ষণ অস্বীকার না করে, ততক্ষণ তাকে কাফির বলা কোনক্রমেই জায়েয নয় ,তা তার গোমরাহী যতই প্রচন্ড রূপ ধারণ করুক না কেন।

দুঃখের বিষয় যে, অনেক দিন ধরে চলে আসা এই ভ্রান্ত রীতিকে আমাদের সম্মানিত আলিম সমাজ কিছুতেই পরিত্যাগ করতে রাজী হন না। তারা মূল ও শাখা এবং স্পষ্টোক্তি ও ব্যাখ্যার পার্থ্যকটাকে আমলই দেন না । যে সব খুটিনাটি তত্ত্বকে তারা অথবা তাদের মুরুব্বীগণ নিজ নিজ বিশেষ বুঝ মোতাবেক মৌল তত্ত্বথেকে উদঘাটন ও উদ্ভাবন করেছেন, সেগুলোকেই তারা মৌল তত্ত্বে পরিণত করে ফেলেছেন। কুরআনের স্পষ্ট উক্তি সমূহের মর্ম উদ্ধার করতে তারা যে সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়েছেন, সেই সব ব্যাখ্যাকেও তারা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্টোক্তির পর্যায়ে রেখে দিয়েছেন। এর ফল দাড়িয়েছে এই যে, তাদের উদ্ভাবিত খুটি নাটি তত্ত্বের এবং ব্যাখ্যাবিশ্লেষনের বিরোধিকেও তারা ঠিক তেমনি ভাবে কাফির বলে আখ্যায়িত করেন, যেমন করা হয়ে থাকে মূল তত্ত্ব এবং আল্লাহ ও রসূলের স্পষ্টোক্তি প্রত্যাখ্যান কারীকে। এই টানা পোড়ন ও ভারসাম্যহীনতার কারনে আগেতো ইসলামী সমাজে শুধু দলাদলীরই সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আলেম সমাজের কাফির বানানোর এই হিড়িক মুসলমানদের মনে শুধু যে আলেমদের প্রতিই বিরক্তি জন্মাচ্ছে তাই নয়, বরং এই আলিমরা যে ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছেন, সেই পবিত্র ইসলামের বিরুদ্ধেও নানা ধরনের খারাপ ধারণার উৎপত্তি ঘটাচ্ছে। মুসলিম জনতার ওপর আলিমদের যে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, তা দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে। তাদের কথাবার্তা শুনে জনমনে ধর্মের প্রতি

অনুরাগের পরিবর্তে বিরাগ, বিতৃষ্ণা ও পলায়নপরতার ভাবধারা জন্ম নিচ্ছে। ধর্মীয় সভাসমিতি ও বই-পুস্তক সম্পর্কে এরূপ ধারণা বিস্তৃতি লাভ করেছে যে, ওগুলোতে আজে-বাজে তর্কবিতর্ক ও কলহ কোন্দল ছাড়া আর কিছু থাকে না। আজ যখন সর্বত্র কুফরী ও পাপাচারের জয়জয়কার তখন মুসলিম জনগণের কাছে ধর্মীয় জ্ঞান বিস্তারের একমাত্র উপায় এটাই ছিল যে, আলিম সমাজে প্রতিটি মানুষের প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকতো এবং তারা তারা তাদের বক্তৃতা শুনতো ও বই পুস্তক পড়তো। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সব দলাদলী ও ফের্কাবন্দীর লড়াই এবং কুফরী ফতোয়ার ছড়া ছড়ির ফলে সেই একমাত্র উপায়টিও ক্রমশ বিলুপ্ত ও বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বস্তুত এটা মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যাপক অজ্ঞতা ও গোমরাহীর একটা প্রধান কারণ। আহা! আলেম সমাজ যদি এখনো তাদের ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে পারতেন, ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর যদি তারা সদয় নাও হতে পারেন তবে অন্তত নিজেদের ওপর কৃপা করেও যদি এই আত্মঘাতী নীতি বর্জন করতে পারতেন, যে নীতি মুসলিম জাতির চোখে তাদেরকে এমন নিদারুণভাবে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত করছে। অথচ এ জাতির কাছেই একদিন তারা নয়নের মণি হয়ে বিরাজ করতেন, মাথার মুকুট হিসেবে সমাদৃত হতেন।

(তরজমানুল কুরআন, সফর ১৩৫৪ হিঃ, মে, ১৯৩৫)

কবীরা গুনাহর জন্য কাফির ফতোয়া

কিছুকাল আগের কথা। ভারতের একটি সংস্কারবাদী দলের কয়েকজন সদস্য (সম্ভবত তাদের দলের উগ্রপন্থী নীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে) তরজমানুল কুরআনের সম্পাদককে একটা চিঠি লেখেন। চিঠিতে তারা নিম্নরূপ প্রশ্ন করেনঃ

"আমরা একটা দল গঠন করেছি। এ দলের বিশ্বাস এই যে, কোন মুসলমান কবীরা গুনাহ্ করলে কাফির হয়ে যায়। আমরা কাফির হওয়া ও ফাসেক হওয়াতে কোন পার্থক্য মানি না। আসমানী কিতাবের ধারক-বাহক ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে কুরআন যে রূপ মনে করে আমরা সাধারণ মুসলমানদেরকে তদ্রুপ মনে করি। সাধারণভাবে বিয়ে-শাদী আমরা নিজেদের দলেন গন্ডির মধ্যেই করে থাকি। দলের গন্ডি বহির্ভূত মুসলমানদের মেয়ে আমরা নেই , কিন্তু মেয়ে দেই না। আমাদের এই আকীদা ও কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার মত কি? এটা সঠিক না ভুল? যদি ভুল হয়ে থাকে তবে সন্তোষজনক ভাবে আমাদের ভুল ধরিয়ে দেবেন। ”

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে আমরা ঐ দলটির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সুষ্ঠু তদন্ত চালানো জরুরী মনে করি। অতপর প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নেয়ার পর তাদেরকে নিম্নরূপ জবাব দেয়া হয় ঃ

তদন্ত করে আমি জানতে পেরেছি যে, আপনার দলে এমন কোন ব্যক্তি নেই যিনি ইসলাম সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সুগভীর পান্ডিত্যের অধিকারী। আপনি যে সব বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন তার ধরন থেকেও এর প্রমাণ মেলে। এ সমস্যাগুলো নিজেই বলে দিচ্ছে যে, যে মনমগজ থেকে এগুলোর উদ্ভব হয়েছে,তা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের (সাঃ) সুন্নাহ সম্পর্কে বুৎপত্তির অধিকারী নয়। এই

প্রেক্ষাপটে আমি এ কথা না বলে পারছি না যে, ইসলাম সম্পর্কে পারদর্শী না হয়ে ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মতামত পোষণ করা এবং নিজের মতামতকে ইসলামের অংশ আখ্যায়িত করে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের জন্য মূলনীতি রূপে নির্ধারণ করা সবচেয়ে বড় পাপাচার এবং সমস্ত কবীরা গুনাহর মধ্যে জঘন্যতম কবীরা গুনাহ্। আমার এ উক্তিকে কটূক্তি মনে না করে বরং এক মুসলমানের ওপর আরেক মুসলমানের হিত কামনার যে দায়িত্ব অর্জিত রয়েছে, সেই দায়িত্ব পালনের প্রতিক মনে করবেন বলে আমি আশা করি। আমাদের সত্যিকার মুসলমান হতে হলে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের (সাঃ) সুন্নাহতে যে জীবন বিধান তুলে ধরা হয়েছে তার ওপর ঈমান আনতে ও তার অনুকরণ করতে হবে। আর এই ঈমান ও অনুকরণের দাবী এই যে, আমাদের জীবন যাপনের জন্য যা কিছু নীতিমালা আমরা গ্রহণ করবো এবং নিজেদের বিশ্বাস ও কর্মের জন্য যে সব বিষয়কে ভিত্তি ও দিগদর্শন রূপে নির্ধারণ করবো , তার সবই আল্লাহর কিতাব ও রসূলের (সাঃ) সুন্নাহ থেকেই গৃহীত হতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে সুক্ষ্ম ও স্বচ্ছ জ্ঞান এবং সুগভীর বুৎপত্তির অধিকারী নয়, বরং নিজেদের খেয়াল খুশী ও ঝোঁকের বশে কিছু মতামত অবলম্বন করে সেগুলোকেই ইসলাম বলে চালিয়ে দিতে উদ্যোগী হয়, তারা আসলে ইসলামের নয়, বরং নিজেদের মনগড়া ধ্যান-ধারণা ও ভবাবেগেরই অনুসরী। এত বড় পাপাচারের সামনে অন্যান্য কবীরা গুনাহর কি গুরুত্ব রয়েছে?

এ প্রসঙ্গে আরো একটা বিষয় স্পষ্ট করে দিতে চাই। সেটি এই যে, ইসলামের প্রতি ঈমান আনার জন্য ইসলামের সংক্ষিপ্ত জ্ঞান যথেষ্ট হলেও এবং ইসলামের প্রধান প্রধান মূলনীতি জানার জন্য কুরআনের সর্বজন বোধ্য শিক্ষা ও হাদীসের সাধারণ জ্ঞান পর্যাপ্ত হলেও তার ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিধি ও তত্ত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ধর্মীয় প্রক্রিয়ায় মানুষের পথনির্দেশ ও নেতৃত্বদানের জন্য যথেষ্ট মনে করা ভুল। আর উপরে যে মারাত্মক ভুলের কথা উল্লেখ করেছি ; সেটা এই ভুলেরই পরিণাম।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি।

প্রকৃত পক্ষে কুফরী যে জিনিসের নাম তা হলো এই যে, কোন মানুষের সামনে ইসলামকে পেশ করা হবে, অথবা ইসলাম আপনা থেকেই তার সামনে উপস্থিত হবে এবং ইসলাম কি জিনিস তা সে অবগত হবে, অতপর সে ইসলামকে মেনে নিতে বা তার দাবী ও নির্দেশের সামনে মাথা নত করতে অস্বীকার করবে। নিরেট অজ্ঞতা, অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ ইসলাম কি তা জানেই না এবং না জানার কারণে তার বিপরীত জীবন যাপন করে ,তা কুফরীর সংজ্ঞাভুক্ত নয়। এ অবস্থাকে বলা হয় জাহেলিয়াত। আরবের কাফিররা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত লাভের পূর্বে জাহেলিয়তে লিপ্ত ছিল। তিনি যখন তাদের কাছে আল্লাহর দীন ইসলামকে পেশ করলেন এবং তারা তা অগ্রাহ্য করলো তখনই তাদেরকে কাফির বলা হলো।

আবার কুফরী সম্পর্কে এ কথাও বুঝতে হবে যে, এর দুটো দিক রয়েছেঃ

একটি দিক দিয়ে কুফরী হলো সেই খোদাদ্রোহীতামূলক ও খোদাবিমুখ অবস্থা যা নিগূঢ় সত্যের বিচারে ঈমানের বহির্ভূত থাকার নামান্তর ।

অপর দিক দিয়ে কুফরী হলো সেই অমুসলিম সুলভ অবস্থার নাম যা দৃশ্যমান হলে একজন মানুষকে ইসলামের গন্ডিবহির্ভূত ঘোষণা করা হবে এবং মুসলিম সমাজের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে।

প্রথম প্রকারের কুফরীকে গুনাহ ও পাপাচারের সাথে মিলিয়ে একাকার করা বাড়াবাড়ির শামিল এবং কুরআন বিরোধী কাজ। এ কথা সত্য যে, পাপাচার তথা নাফরমানী ঈমানের বিপরীত জিনিস। কিন্তু শুধু পাপাচার, তা সে যত বড় আকারেরই হোক না কেন, অনিবার্যভাবে ও স্থায়ীভাবে ঈমান শূন্য হয়ে যাওয়ার কারণ নয়। কাফিরের মত মুমিনের দ্বারাও বড় বড় গুনাহর কাজ সংগঠিত হতে পারে। তবে মুমিনের গুনাহ ও কাফিরের গুণাহতে পার্থক্য

এই যে, মুমিন যখন গুণাহর কাজ করে, তখন ঠিক গুনাহর কাজে লিপ্ত থাকার মুহূর্তে তো সত্য ঈমানের বহির্ভূতই থাকে। কিন্তু যখনই সে প্রবৃত্তির লালসার আধিপত্য থেকে মুক্ত হয় এবং অজ্ঞতার যে পর্দা তার হৃদয়কে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে তা থেকে বেরিয়ে আসে, অমনি সে অনুশোচনায় অধীর হয়ে পড়ে আল্লাহর সমনে লজ্জিত ও আখিরাতের ভয়ে প্রকম্পিত হয় এবং এমন কাজের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সে জন্য সংযত হয়। এ ধরনের গুনাহ বা নাফরমানী যত বড়ই হোক ,মানুষকে কাফিরে পরিণত করে না। শুধু মাত্র গুনাহগারে পরিণত করে। তওবা তাকে পুনরায় ঈমানের দিকে ফিরিয়ে আনে। কাফিরের পাপাচার ঠিক এর বিপরীত। সে পাপময় জীবন যাপনকে নিজের জন্য সঙ্গত ,সঠিক ও আনন্দদায়ক মনে করে। আল্লাহ ও তার রসূল যে এ কাজকে অবৈধ ও পাপ বলে ঘোষণা করেছেন, সে তার তোয়াক্কা করে না। পূর্ণ অবিচলতা ও দাম্ভিকতা নিয়ে সে ঐকাজ চালিয়ে যেতে থাকে। লজ্জা ও অনুশোচনা তার ধারে-কাছেও আসে না। এই শেষোক্ত ধরনের গুনাহ ঈমান সংহারক ১, চাই এরূপ মানসিকতা নিয়ে কোন বড় পাপের পরিবর্তে ছোটখাট পাপই করা হোক, যাকে সগীরা গুনাহ বলা হয়ে থাকে। এই দুই ধরনের পাপীকে একই পর্যায়ে গণ্য করা এবং একইভাবে উভয়কে কাফির বলে রায় দেয়া সম্পূর্ণ ভুল। এ ধরনের অসতর্ক ও অবিবেচনা প্রসূত লঘু অপরাধে গুরুদন্ড ও গুরু অপরাধে লঘুদন্ড দান স্বয়ং কবীরা গুনাহর আওতাভুক্ত। প্রথম শতাব্দী থেকে এ যাবত খারেজী ও মোতাজিলীদের একটি গোষ্ঠী ব্যতীত আর কেউ এ মত পোষণ করেনি। এছাড়া, নীতিগতভাবে আপনি বলতে পরেন যে, অহংকার বশত জেনে-শুনে আল্লাহ ও রসূলের (সাঃ) নির্দেশকে উপেক্ষা ও লংঘনকারী কাফির হয়ে যায়। কিন্তু এই নীতিগত কথাটা কোন ব্যক্তি বিশেষের ওপর প্রয়োগ করে এরূপ রায় দেয়ার অধিকার আপনার নেই যে,কাফির সূলভ আচরণের জন্য সে কাফির হয়ে গেছে এবং ইসলামের গন্ডির বাইরে চলে গেছে। কোন ব্যক্তির

---

১. অর্থাৎ প্রকৃত নিরেট সত্যের নিরীখে-বাহ্যিক অবস্থার বিচারে নয়।

ভেতরে প্রকৃত বেঈমানীর অবস্থা বিরাজ করছে এবং কার ভেতরে করছে না সেটা ফায়সালা করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে।

এবার দ্বিতীয় প্রকারের কুফরীর প্রসঙ্গে আসা যাক। এই প্রকারের কুফরী একজন মানুষকে ইসলামের বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা এবং মুসলিম সমাজের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে জ্ঞাতব্য এই যে, শরীয়ত এ ধরনের কুফরীর ব্যাপারে রায় দানের ক্ষমতা নির্বিচারে যে কোন ব্যক্তিকে দান করেনি। কোন ব্যক্তিকে দৈহিকভাবে হত্যা করার জন্য যেমন শর্ত রয়েছে যে, ইসলামী শাসন অবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকা চাই, ক্ষমতাবান বিচারক কর্তৃক সাক্ষীসাবুদ গ্রহণ ও সমগ্র ঘটনার ব্যাপারে পূর্ণ বিচার–বিবেচনা ও পুংখানুপুংখ তদন্ত অনুষ্ঠানের পর রায় দান করা চাই যে,আসামী মৃত্যুদন্ডের যোগ্য এবং এর পরেই তাকে হত্যা করা চলে, ঠিক তেমনি এক ব্যক্তিকে আত্মিক ভাবে হত্যা করা অর্থাৎ তাকে কাফির বলে ঘোষণা করার জন্যও এটা শর্ত রয়েছে যে, তার ওপর কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার যে অভিযোগ আরোপিত হয়েছে,তার সত্যাসত্য সম্পর্কে একজন শরয়ীত সম্মত বিচারক পূর্ন অনুসন্ধান চালাবে,স্বয়ং অভিযুক্তের বিবৃতি গ্রহণ করবে,তার অন্যান্য কথাবার্তা ও কার্য্যকলাপকে যাচাই করবে ,সাক্ষী মাবুদও পরখ করবে,তার পর ফায়সালা করবে যে,এই ব্যক্তি মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার যোগ্য। যেখানে এরূপ ব্যবস্থা নেই, শরীয়ত ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থাও নেই, কাফির ঘোষণা করার অপরিহার্য শর্তাবলী পুরণেরও সম্ভাবনা নেই, সেখানে কাউকে কাফির ঘোষণা করা এবং মুসলিম সমাজ থেকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষকে বহিষ্কার করা অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ। এ রকম রায় দানের যেমন সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তেমনি ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তা ছাড়া এটা ব্যক্তি বিশেষের এবং ক্ষমতাহীন ও অধিকারহীন দলসমুহেরও ক্ষমতা বহির্ভূত। এর অনিষ্টকারিতা বেঈমান লোকদের মুসলিম সমাজের সাথে যুক্ত থাকার অনিষ্টকারিতার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

জনসাধারণের যথার্থ ধর্মীয় সংস্কার ও সংশোধনে আগ্রহী ব্যক্তি বা দলেন সর্বপ্রথম যা করণীয়, তা হলো, আগে তাকে মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণী গোষ্ঠী পারস্পরিক পার্থক্য বুঝাতে হবে। এক শ্রেণী ঘোর অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন। আর একগোষ্ঠী ও পাপাচারে নিমজ্জিত। দ্বিতীয় গোষ্ঠী যথার্থ কুফরীর গভীর খাদে পতিত। চতুর্থ শ্রেণী প্রকৃত পক্ষে মুসলিম সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার যোগ্য। এই সকল শ্রেণীর সাথে নির্বিচারে একাই ধরনের আচরণ করা সঙ্গত নয়।

যারা অজ্ঞতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাদেরক জ্ঞানের অলোয় আলোকিত করুন। অজ্ঞ হওয়া সত্বেও তারা স্বয়ং যখন নিজেদেরক মুসলমান মনে করে তখন অনর্থক তাদেরকে এ কথা বলবেন না যে, তোমরা মুনলমান নও। তাদেরকে বলুন যে,তোমরা যখন মুসলমান, নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দাও এবং মুসলমান থাকতে চাও , তখন তোমাতের জানা উচিত যে, ইসলাম কি এবং জানার পর তা মেনে চলা উচিত।

যারা পাপাচারে লিপ্ত তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখানো এবং তাদের ভেতরে ঈমানের যে ফুলকি সুপ্ত রয়েছে,তাকে উস্কে দেয়ার চেষ্টা করুন।

যাদের ভেতরে সত্যি সত্যি কুফরী ঢুকে গেছে বলে অনুভব করেন,তাদেরকে কাফির বলা ও কাফির বলে ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারে জিদ ধরবেন না। বরঞ্চ তারা নিশ্চিতভাবে কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে এ উপলব্দি নিজেদের মধ্যেই সীমিত রেখে তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিন এবং সুকৌশলে ও সদুপদেশ দ্বারা তাদের অন্তরে ঈমান ঢোকানোর চেষ্টা চালাতে থাকুন। যেমন একজন চেকিৎসক নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছে যে,তার কাছে আগত ব্যক্তি যক্ষা রোগী। এই চিকিৎসকের নিজের তো নিশ্চিতভাবে জানা ও বুঝা অবশ্যই জরুরী যে, লোকটি যক্ষায় আক্রান্ত। কেননা তা না হলে তার চিকিৎসাই করা যাচ্ছে না। কিন্তু একজন চিকিৎসকের পক্ষে এরচেয়ে বড় বোকামী আর কিছু হতে পারে না যে, যাকেই যক্ষা রোগে ধরেছে বলে টের পেল ,তাকেই মুখের ওপর ঝট করে

বলে দিল যে, তোমার যক্ষা হয়েছে। এটা তার চিকিৎসার তো নয়ই বরং তাকে হত্যা করার ব্যবস্থা মাত্র।

যাদেরকে স্পষ্টতই মুসলিম সমাজ থেকে বহিষ্কার করার যোগ্য বলে মনে হবে, তাদের ব্যাপারে সঠিক কর্মপন্থা এই যে, ইসলামী আইন আদালত যখন চালু নেই এবং মুসলিম সমাজ থেকে বহিষ্কারযোগ্য ব্যক্তিকে সত্য সত্যই বহিষ্কার করার মত কার্য্যকর কোন ব্যবস্থাও নেই, তখন কাফির বলা ও ইসলাম থেকে বহিষ্কারের ঘোষনা দেয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। এ ক্ষেত্রে শুধু এতটুকু ব্যবস্থা গ্রহণ করেই ক্ষ্যান্ত থাকা দরকার যাতে মুসলমানরা আপনা থেকেই এ ধরনের লোকদের সাথে ওঠা-বসা, মেলামেশা বন্ধুত্ব ও আত্মিয়তা করা থেকে বিরত থাকে। তবে ইসলাম প্রচারের জন্য দেখা-সাক্ষাতের দরজা কোন অবস্থাতেই বন্ধ করা উচিত নয়।

বিয়েশাদীর ব্যাপারে আপনারা যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছেন,তার পেছনেও আপনাদের সেই একই ভুল বুঝাবুঝি সক্রিয় রয়েছে। কাফির ঘোষণার ব্যাপারে আপনারা যার শিকার হয়েছিলেন, সেই ভুল বুঝাবুঝি নিরসন হয়ে থাকলে এ প্রশ্নের মীমাংসাও আপনা আপনিই হয়ে যায়। তবে আরো একটু পিরিষ্কা করার উদ্দেশ্যে আমি শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করি যে, আজকাল যে মুসলিম সমাজ আমরা দেখতে পাই তাকে একটা একক জনগোষ্ঠী মনে করে এই গোটা সমাজটার সাথে একই ধরনের কঠোর আচরণ করা অতিশয় বাড়াবাড়ি এবং শরিয়ত বিরোধী কর্মপন্থা। এ সমাজে সব ধরনের লোক রয়েছে। সাচ্চা মুমিন দীনদার এবং সৎ লোক যেমন রয়েছে,তেমনি রয়েছে অজ্ঞ জাহেল, জেনে শুনে দুষ্কর্মে লিপ্ত জ্ঞান পাপী এবং কুফরীতে লিপ্ত মানুষ। তাছাড়া এমন লোকও এখানে বিরাজমান যারা মুসলিম সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কেবল মাত্র ইসলামী শাসক না থাকায় তাদেরকে এখনই বহিষ্কার করা সম্ভব নয়। এত রকমারি মানুষের সমষ্টিকে একই জনগোষ্ঠী ধরে নিয়ে তাদের সাথে আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) এর মত আচরণ করা কোন্

শরিয়ত মত জায়েজ? নিছক আপনার দলভুক্ত নয় এই অজুহাতে খাটি মুমিন ও দীনদার লোকদের সাথেও বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক ছিন্ন করাকে একটা অন্যায় বিশিষ্ট আচরণ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? এ ধরনের বৈষম্য করার অধিকার শরীয়ত আপনাদেরকে দেয় নি। অবশ্য ইসলাম সম্পর্কে ঘোর অজ্ঞতায় নিমজ্জিত এবং পাপাচার, দুষ্কর্ম ও কাফির সুলভ অনাচারে লিপ্ত লোকদের কথা আলাদা। এদের সাথে সত্যিই বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক স্থাপন করা অনুচিত। অনুচিত এ জন্য নয় যে, তারা সকলেই কাফির। বরং এ জন্য যে, শরীয়ত আমাদেরকে বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে সর্ব প্রথম দীনদারী ও পরহেজগারী যাচাই করতে বলেছে।

জামায়াতবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ জীবন যাপনকে অপরিহার্য আখ্যাদানকারী যে হাদীসগুলোতে একমাত্র জামায়াতী জীবনকেই ইসলামী জীবন এবং জামায়াত বহির্ভূত জীবনকে জাহেলিয়াতের জীবন বলা হয়েছে, সম্ভবত সেই হাদীসগুলোর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েই আপনারা নিজেদের দল বহির্ভূত সকল মুসলমানের সাথে আহলে কিতাব সুলভ আচরণ করে থাকেন। হয়তো এ কারণেই আপনারা আপনাদের দল বহির্ভূত ভালো ভালো পরহেজগার মুসলমানকেও মেয়ে দেয়া বৈধ মনে করেন না এবং مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ "দল থেকে বিচ্ছিন্ন লোকমাত্রই দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে" এই হাদীসটা তাদের ওপর প্রযোজ্য মনে করেন। আপনাদের ধারণা যদি এটাই হয়ে থাকে তবে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যে দলকে ত্যাগ করা ইসলাম ত্যাগ করার শামিল ,সেটা ইসলামী পরিভষায় "আল জাময়াত " নামে পরিচিত। কয়েক জন মুসলমান মিলে যেনতেন প্রকারের একটা দল গঠন করলেই তা "আল জামায়াত" হয়ে যায়না। "আলজামায়াত" পদবাচ্য হতে পারে শুধুমাত্র সেই দল ,যাতে নিম্ন লিখিত বৈশিষ্টসমূহ বিদ্যমানঃ

১. নির্ভেজাল ও পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েমের উদ্দেশ্যেই দলটি গঠিত। অর্থাৎ তার গঠনের একমাত্র উদ্দেশ্যই হবে আল্লাহর দীনকে একটা বাস্তব জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

২. মুমিনদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সেই দল ভুক্ত হবে।

৩. ইসলামের যে সব কাজ সম্পাদনের জন্য আল্লাহ পৃতিবীতে মুসলিম উম্মাতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, এই দল সেই সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবে।

এ ধরনের দল যদি বিদ্যমান থেকে থাকে তবে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নিশ্চিতভাবেই ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শামিল। এ ধরনের দল থেকে যে বিচ্ছিন্ন হবে বা বিচ্ছিন্ন থাকবে, তার ঈমান বা ইসলাম কখনো গ্রহণ যোগ্য নয়। এই দল কবেই অবলুপ্ত হয়ে গেছে এবং মুসলিম উম্মাত শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন সেই "আল জামায়াতের" অভাব ও শূন্যতা পূরণ ও প্রতিকারের নিমিত্ত যে সব দল গঠন করা হবে,তা যতদিন কার্যত ''আল-জামায়াত " -এর মর্যাদায় উন্নীত না হবে,ততদিন এ সব দলের একটিও 'আল জামায়াতের' শরীয়ত সন্মত ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করতে পারে না। আপনারা যত নেককার, পরহেজগার ও সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হোন না কেন, আপনাদের উদ্দেশ্য যদি অবিকল নবীদের আগমনের উদ্দেশ্যের অনুরূপ হয়েও থাকে এবং আপনাদের সংগঠন পদ্ধতিও যদি অবিকল ইসলামী সংগঠন পদ্ধতির অনুরূপ হয়ে থাকে, তবুও শরীয়ত আপনাদেরকে কখনো এ অধিকার দেয়া না যে, আজ আপনারা কয়েক জনে মিলে একটা দল গড়বেন আর কালই ঘোষণা করে দেবেন যে, আপনাদের দল বহির্ভূত দুনিয়ার সকল মুসলমান অমুসলিম এবং আপনাদের আমীরের হাতে বায়য়াত হয়নি এমন প্রত্যেক মুসলমানের মৃত্যু জাহেলিয়তের মৃত্যু সমতুল্য। এ ধরনের আচরণ করলে আপনারা শরীয়তের দৃষ্টিতে অনধিকার চর্চার দায়ে দায়ী হবেন এবং উম্মাতের সংশোধনের পরিবর্তে তাদের মধ্যে আরো অনাচার সৃষ্টির কারন হয়ে দাঁড়াবেন। আপনি নিজেই ঠান্ডা মাথায় ভেবে-দেখুন তো যে, আদৌ কোন হটকারিতা, ঔদ্ধত্য ও স্বার্থপরতার বশে নয় বরং নিছক অজ্ঞতা ও সংশয়বসত যে সরলমনা সাচ্চা মুমিন ও সৎকর্মশীল মুসলমান আপনার দলে যোগ দেয়নি, সে কোন কারণে কাফির হবে? দল গঠনের অধিকার কেবল আপনাদের কজনেরই একচেটিয়া হবে আর অন্যান্য

১৬

মুসলমানদের সে অধিকার থাকবে না, এর যুক্তি কি? পতন ও বিশৃংখলার যুগে সংস্কারে ব্রতী গোষ্ঠী একটাই হতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। বরং একই সময়ে একাধিক গোষ্ঠী সঠিক উদ্দেশ্যে ও সঠিক পদ্ধতিতে কর্মরত থাকে এবং থাকা সম্ভব। আবার এমন ব্যক্তিও অনেক থাকতে পারে এবং থাকেও, যারা এ সব দলের একটির সাথেও যোগ দেবেন কি না কিংবা কোনটির সাথে যোগ দেবেন, তা অনেক দিন যাবত স্থির করতে সক্ষম হন না। এরূপ পরিস্থিতিতে কোন দল যদি শরীয়ত কর্তৃক শুধু মাত্র "আল জামায়াত" কে যে অধিকার ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে,তার মলিকানা দাবী করে,তবে সেটা হবে একাধারে মিথাচার এবং বিভ্রান্তি ও নৈরাজ্যের প্ররোচনা দায়ক। এ ধরনের দাবী করার পরিবর্তে প্রত্যেক দলের নিজ নিজ জায়গায় কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং মনে মনে একাগ্রভাবে এই আশা পোষণ করা উচিত যে, খিলাফতে রাশিদার আমলে যে "আল-জামায়াত " কায়েম ছিল তা আবার যেন কায়েম হয়। তাদেরকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে যে, তাদের নিজেদের দলাদলী যেন সেই "আল-জামায়াতের" পুনপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

তরজমানুল কুরআনজিলকদ-জিলহজ্জ, ১৩৬৪হিঃ
নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৪৫ইং

কুটিল প্রতারণার এক গোলক ধাঁধা

কুটীল বন্ধুত্যের ছদ্মবেশে যে শত্রুতা করা হয়, সেটাই সবচেয়ে কুটিল ও ভয়াবহ শত্রুতা। তেমনি হেদায়াতের লেবাসে যে গোমরাহী ছড়ানো হয়, সেটাই সবচেয়ে মারাত্মক বিভ্রান্তি। আপনি প্রকাশ্য দুশমনের হাতে নাজেহাল হতে পারেন কিন্তু প্রতারিত হতে পারেন না। অনুরূপভাবে একজন মানুষ প্রকাশ্য গোমরাহীর দিকে আহ্বান কারীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হয়তো ধর্মত্যাগী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যে নতুন মতে দীক্ষিত হলো, সেটাই সত্যিকার ইসলাম এরূপ ভুল ধারণার শিকার হতে পারে না। এক ব্যক্তি যদি খোলাখুলিভাবে এসে ইসলাম বিরোধী কথাবার্তা বলে ,কুরআনের ওপর আক্রমণ চালায়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মকান্ডের ওপর আপত্তি তোলে এবং ইসলামের আকীদা বিশ্বাস, মূলনীতি ও বিধিমালাকে ভ্রান্ত আখ্যায়িত করে, তবে একজন মুসলমান হয় তার বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং ইসলামের ওপর অবিচল থাকবে,নচেত ইসলামকে পরিত্যাগ করে তার ধর্মমতে দীক্ষিত হবে এবং নিজেকে আর মুসলমান বলে পরিচয় দেবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্মপ্রচারকের মসনদে আসীন হয়, কুরআন খুলে ওয়াজ নসীহত শুরু করে দেয়, আল্লাহর আয়াতসমূহের তাফসীর নর্ণনা করে ঈমান ও নেক আমলের সদুপদেশ দেয়, ইবাদাত ও সত্য নিষ্ঠার আহ্বান জানায় এবং এভাবে যখন একজন যথার্থ ধর্ম প্রচারক ও কল্যাণের পথে আহ্বানকারী সংস্কারক হিসেবে তার ভাবমূর্তি ও প্রতিপত্তি শ্রোতার মনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, অমনি সে বুঝাতে আরম্ভ করে যে, নামায পাঁচ ওয়াক্ত নয় তিন ওয়াক্ত পড়া ফরয, রোযা সারা রমযানের নয় বরং তিন দিন অথবা বেশীর পক্ষে দশদিন থাকা ফরয, যাকাতের জন্য ধরাবাধা কোন পরিমাপ নির্ধারিত নেই, যে পরিমাণ খুশী দান করে দিলেই চলবে এবং এভাবে ইসলামের বিধিমালাকে একে একে কাট–ছাট

করতে থাকে আর সেই সাথে আপনাকে এই বলে আশ্বাসও দিয়ে যেতে থাকে যে, এটাই কুরআনের শিক্ষা এবং এটাই রসূলের আদর্শ, তাহলে এই ব্যক্তির কার্যক্রম কিরূপ ছলনাময় একবার ভাবুন তো। এভাবে মিষ্টান্নের সাথে মিশিয়ে যদি বিষ পরিবেশন সাথে মিশিয়ে যদি বিষ পরিবেশন করা হয় ,তাহলে তা থেকে নিরীহ মুসলমানদের নিস্তার পাওয়া সত্যিই দুরূহ ব্যাপার।

উত্তর প্রদেশের জনৈক মুসলমান ডেপুটি কালেক্টর যিনি "সত্যভাষী" ছদ্দনাম ব্যবহার কথোকেন এবং ইতিপূর্বে ইসলাম প্রচারের খাতিরে শুয়রের গোশ্‌ত হালাল করার প্রস্তাব দিয়েছেন[১],-আজকাল "কুরআনের উপদেশ" শীর্ষক ধারাবাহিক নিবন্ধমালা প্রকাশ করে চলেছেন। এই নিবন্ধমালাতে তিনি মুসলিম জনসাধারনকে বিভ্রান্ত করার উপরোক্ত কূটিল প্রতারণার পথ অনুসরণ করছেন। অমৃতসরের একটি কুখ্যাত হাদীস বিরোধী গোষ্ঠী তাদের মাসিক পত্রিকায় এই ধারাবাহিক নিবন্ধ প্রকাশ করছে [২]।

বর্তমানে তার "নসিহত"-এর তৃতীয় কিস্তি আমাদের পর্যালোচনাধীন রয়েছে। এতে সূরা মাউনের দুটি আয়াত فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (ماعون) নসিহতকারী তার নসিহত এভাবে শুরু করেন যে, এ আয়াতে ভবিষ্যতের সকল মুসলিম বংশধরকে এই মর্মে সাবধান করা হয়েছে যেঃ

"খবরদার, নামাযের অর্থ এটা মনে করোনা যে, মনোযোগ আসুক বা না আসুক, বুঝতে পার বা না পার, পরিবেশ অনুকূল হোক বা নাহোক, জায়নামায বিছিয়ে গোটা চারেক ঠোকর খেয়ে নিলে আর মুখ দিয়ে খানিকটা বিড়বিড় করে দিলে। এ ধরনের নামাযে লাভ না হয়ে বরং ক্ষতি হয়। এ নামায কেবল লোক

---

১. "যুক্তিবাদের প্রবঞ্চনা" শীর্ষক নিবন্ধে আমরা তার এই প্রস্তাবের পর্যালোচনা করেছি। (দেখুন, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব")

২. অমৃতসরের দাদ্দার তার এ দলটি এখন লাহোরে এসে ঠাঁই নিয়েছে।

দেখানোর জন্য পড়া হয় এবং তা আল্লাহর কাছে শুধু অপছন্দনীয় তাই নয় বরং ক্রোধোদ্দীপক.....।"

"নামাযকে শিশুদের খেলা মনে করো না। নামায পড়া একটা গুরুতর দায়িত্ব। কেননা ওটা আসলে আল্লাহ ও তার ফেরেশতাদের সামনে উপস্থিতি ও সাক্ষ্য দেয়ার সময়। তা হলে তোমাদের মনোযোগহীন নামায কি আল্লাহকে ব্যংগ করার কারণ হবে না? নামাযে এক ও মহাপবিত্র আল্লাহর শ্রেষ্টত্ব মহিমার স্বীকৃতি দেয়া হয়। তোমরা তার সামনে বিনয়ের সাথে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাক। ভেবে দেখতো, এত বড় দরবারে হাজির হয়ে যদি এমন কাজ কর, যা কোন দুনিয়াবী কর্তা ব্যক্তির সামনে করলে তোমাদেরকে তৎক্ষনাত বের করে দেয়া হবে তা হলে এটা কত বড় বেয়াদবী হবে নামায যদি তোমরা অনুগ্রহ লাভের পরিবর্তে খোদার বিরাগ ভাজন হও তাহলে তোমাদের জন্য শত আক্ষেপ। সুতরাং নামাযের জন্য চারটা শর্ত অপরিহার্যঃ দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনা বর্জন করে পূর্ণ একাগ্রতা, শরীর ও পোশাকের পবিত্রতা, কুরআনের পবিত্র আয়াতগুলোর অর্থ বুঝা এবং ঈমানদার হওয়া।"

দেখুন, কুরআনের উপদেশ দান করা হচ্ছে এবং তা "কুরআনের শিক্ষা বিস্তারকারী" পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। "সত্যভাষীর" মুখ দিয়ে নির্গত হচ্ছে। ভূমিকা এমন যে, তা যে মুসলমানই পড়বে, সে বিশ্বাস করবে যে, ইবাদাতে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা শিক্ষা দেয়াই উপদেশদাতার উদ্দেশ্য। এসব কিছু একত্রে একজন মুসলমানের মনে উপদেশদাতা সম্পর্কে পূর্ণ নিঃসংশয়তা জন্মায়। তার ওয়াযে যে কোন গোমরাহীর উপকরণ থাকতে পারে এমন কোন আশংকা তার থাকে না। এভাবে যখন শ্রোতা গোমরাহীর যাবতীয় আশংকা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অমনি সেই হেদায়াতকারীর ভঙ্গীতেই তাকে বলা হয়ঃ

"একাগ্রতা জন্মানোর শ্রেষ্ঠতম সময় হচ্ছে, প্রথমত যখন সে ঘুম থেকে জাগে, দ্বিতীয়ত যখন ঘুমাতে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় এবং তৃতীয়ত যখন সে নিজের যাবতীয় কাজ সেরে বিকাল বেলা ঘরে ফিরে আসে। এছাড়া নামাযের জন্য সকল সময় সাধারনত

সাংসারিক ব্যস্ততা অথবা বিশ্রাম, আমোদ-প্রমোদ ও বিহারের সময়। এ সব সময়ে নামাযে একাগ্রতা সৃষ্টি হওয়া কিছুটা দুরূহ ব্যাপার। এসব সময়ে নামায পড়া ঝুঁকিপূর্ণ। এসব সময়ে নামাযে খুব কম লোকেরই একাগ্রতা আসে। তাই এসব সময়ে যারা নামায পড়ে তারা অত্যন্ত অমনোযোগিতা ও ব্যস্ততার সাথে পড়ে।"

এরপর শ্রোতাকে আরো খানিকটা নসিহত শোনানো হয়, যাতে সে গোমরাহীর এই ওয়াজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে না পড়ে।

"শারীরিক তৎপরতার উদ্দেশ্য নামায নয়, এগুলো বিনয় প্রকাশের সাথে একাগ্রতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। আসল নামায হলো তোমার আল্লাহর গুণগান, প্রশংসা ও কুরআনের তেলাওয়াত। আর সে জন্য তোমার মন ও মস্তিষ্কের প্রস্তুতি ও একাগ্রতা শর্ত।"

এই দ্বিতীয় দফা নসিহত হযম করার পর যখন সরলমনা মুসলমান পুনরায় গোমরাহীর শংকামুক্ত হয়। তখন তার কণ্ঠনালীতে যে বিষ ঢেলে দেওয়া হয় তা হলো এইঃ

"আমার নগণ্য বুদ্ধিতে এ কথা দ্বারা (অর্থাৎ ويمنعون الماعون কথাটা দ্বারা) ঐ সব ফতোয়ার দিকে ইংগীত করা হচ্ছে যার স্বপক্ষে কুরআনে কোন সনদ নেই। অথচ আমরা সেগুলোকে কুরআনের চেয়েও বেশী মানতে অভ্যস্ত। এর ফলে অস্বাভাবিক সময়ে আমাদেরকে নামায পড়তে বাধ্য করা হয়, যখন আমরা নামাযে গভীরভাবে মনোনিবেশও করতে পারি না, আবার আমাদের দুনিয়াবী জীবনের মঙ্গলের জন্য কোন কাজও করতে পারি না।

এই সমস্ত নসিহতের একমাত্র উদ্দেশ্য জোহর ও মাগরীবের ওয়াক্ত বিলোপ করা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা জোহরের নামাযের জন্য বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ কোম্পানীগুলো সময় দিতে রাজী ছিল না। আর মাগরিবের সময়টা দুর্ভাগ্যবশত সিনেমা, ক্লাবের আমোদ ফুর্তি, টেনিস, তাস ও ব্রিজ খেলার সময়। এ সময় খেলা বাদ দিয়ে নামায পড়া আমাদের 'সাহেব' দের মনোপুত নয়। এ উদ্দেশ্যটা উক্ত "নসিহতকারী" মিষ্টি করে ব্যক্ত করেছেনঃ

"আমার কয়েকজন বন্ধু আছেন যারা মাশায়াল্লাহ্ নামাযের খুব পাবন্দ। আমি তাদেরকে দেখেছি যে, বিকালে টেনিস ও ব্রিজ খেলতে খেলতে হঠাৎ নামাযে লেগে গেছেন। অথবা, কোন পার্টিতে খেতে খেতে সহসা উঠে পড়লেন এবং ঝটপট নামায পড়ে নিলেন অথবা, আদালতে মামলার শুনানী চলছে, এমন সময় তাদের ঘড়ি জোহ্‌রের নামাযের কথা মনে করিয়ে দিল। ব্যাস উঠে এলেন এবং বেঞ্চির উপর নামায সেরে নিলেন। আমি কখনো এ ধরনের নামাযকে নামাযই গণ্য করি না। সব সময় কুরআনের এ আয়াতটি মনে করে আমি কেঁপে উঠি।"

এবার চিন্তা করুন। যারা অফিস চলাকালে নামাযের ছুটি দিতে রাজী হয়নি এবং এ ব্যাপারে মুসলমান কর্মচারীদের ওপর কড়াকড়ি করেছে। তারা এক ধরনের দুশমন। মুসলমানরা ঐ দুশমনদের মোকাবিলা করতে পারতো এবং করেছেও। যারা খাঁটি মুসলমান ছিল তারা আল্লাহ ও রসুলের (সঃ) নির্দেশের মোকাবিলায় কোন পরাক্রান্ত শাসকের হুকুম মানেনি। এমনকি অনেকে নামাযের খাতিরে চাকরি পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। আর যারা দুর্বল ঈমানের অধিকারী ছিল তারা যদিও চাকরির খাতিরে নামায ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তথাপি মনে মনে নিজেদের এই দুর্বলতার জন্য অনুতপ্ত ছিল। আর এক ধরনের দুশমন ছিল। যারা নামাযের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছে, নামাযকে বাজে কাজ আখ্যায়িত করেছে এবং মুসলমানদেরকে তা ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নানা ধরনের প্রলোভনের ফাঁদ পেতেছে। তবে মুসলমানরা এই দুশমনদেরও মোকাবিলা করতে সক্ষম ছিল এবং করেছে। কেননা তারা ছিল প্রকাশ্য দুশমন। তাদের অনিষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া সহজ ছিল। কিন্তু যারা উপরোক্ত দুশমনদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জবরদস্তি ও অপপ্রচারের পন্থা বর্জন করে ওয়ায নসিহ্‌তের পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সেই মুসলমানদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া কত কঠিন, তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা। তারা কুরআনকে হাতিয়ার বানিয়েই মুসলমানদেরকে বলে যে, জোহর ও মাগরিবের নামায তো আল্লাহ তোমাদের ওপর ফরযই করেননি। কেবল অন্ধ

মোল্লারাই তোমাদের ঘাড়ে এই দুটো ওয়াক্তের নামায চাপিয়ে দিয়েছে। ঐ জালেম মোল্লারা সূরা মাউনের শেষ আয়াতের কথিত "পার্থিব কল্যাণের প্রতিবন্ধক।" তারাই তোমাদেরকে এই সব অস্বাভাবিক সময়ে নামায পড়তে বলেছে।–এর ফলে তোমাদের চাকরি গেছে, পার্থিব কায়কারবার নষ্ট হয়েছে, ক্লাব সিনেমা বাদ দিতে হয়েছে। এক কথায় উন্নতি ও প্রগতির ধারা থেকে তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছ। কুরআনে কখনো এ ধরনের নামায পড়ার নির্দেশ দেয়নি। কুরআন শুধু তিন ওয়াক্ত নামায পড়তে বলেছে, আর তাও দুনিয়াবী কাজকর্ম থেকে অব্যাহতি লাভ ও একাগ্রতার শর্তে।

এটা এমন এক শত্রুতা, যা বন্ধুর বেশে করা হয়েছে। হেদায়াতের নয়নাভিরাম পোশাকে আবৃত এ এক উদ্ভট গোমরাহী। প্রকাশ্য দুশমনরা এবং খোলাখুলি গোমরাহীর দিকে আহ্বানকারীরা এ কাজ করতে পারেনি। তারা যা করতে পারেনি, সেটা করার জন্য এই সব বন্ধুবেশী দুশমন এবং সংস্কারক বেশী বিভ্রান্তকারী তৎপর হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় একমাত্র আল্লাহই সরলমনা মুসলমানদের ঈমান ও দ্বীনদারী রক্ষা করতে পারেন।

আপাত দৃষ্টিতে এটা কেবল নামাযের ওয়াক্তের বিরুদ্ধে পরিচালিত হামলা বলে মনে হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বুঝা যাবে যে, এটা আসলে একটা বৃহত্তর বিপদের সূচনা। কুরআন যেরূপ বিপুল সংখ্যক লোকের বর্ণনার অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার মাধ্যমে মুসলমানদের কাছে পৌঁছেছে, পাচঁ ওয়াক্ত নামাযও প্রায় তদ্রুপ অকাট্য ভাবেই পৌঁছেছে। কুরআন সম্পর্কে আমরা যে অবিচল বিশ্বাস পোষন করি যে, তাতেত কোন বিকৃতি বা পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি, তার ভিত্তি এইযে, তা লক্ষ লক্ষ মানুষ রসূল (সঃ)–এর মুখ থেকে শুনেছে তারপর কোটি কোটি মানুষ সাহাবীদের মুখ থেকে শুনেছে এবং তারপর প্রত্যেকটি প্রজন্মের মুসলমান পূর্ববর্তী প্রজন্মের মুসলমানদের কাছ থেকে একই ভাষায় সংগ্রহ করেছে। ঠিক তেমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফরয হওয়া সম্পর্কে অকাট্য বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আমাদের কাছে এর

চেয়ে মজবুত ও অকাট্য প্রমাণ আর নেই যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ রসূল (সঃ) এর মুখ থেকে এ নির্দেশ শুনেছে এবং তার ইমামতিতে বছরের পর বছর ধরে এ নির্দেশ পালন করেছে। অতপর পুরুষানুক্রমিকভাবে কোটি কোটি মুসলাম একথাই শুনে আসছে, দেখে আসছে ও তদনুযায়ী আমল করে আসছে যে, ইসলামে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয এবং মুসলমানদের ভিতর হাজারো মতবিরোধ ও দলাদলি হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কখনো মতান্তর দেখা দেয়নি।

এই সর্বব্যাপী ও নিরবিচ্ছিন্ন অকাট্য গণ বর্ণনার ফলে নামাযের ব্যাপারে আমাদের যে অবিচল বিশ্বাস জন্মেছে, তা যদি কারো সংশয় সৃষ্টির চেষ্টায় বিচলিত হয়, তা হলে একই প্রক্রিয়ায় কুরআন সম্পর্কে আমাদের যে প্রত্যয় ও আস্থা জন্মেছে, তাও বিচলিত হওয়া সহজ হয়ে পড়ে। বরঞ্চ আমরা এ কথাও বলতে পারি যে, এমন অটুট ও সর্বাত্মক ধারাবাহিকতা নিয়ে যে সব বিধি আমাদের কাছে পৌছেছে, তা যদি সন্দেহ সংশয়ের কবলে পড়তে পারে, তাহলে এ ব্যাপারেও কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে বসতে পারে যে, মুহাম্মদ সাল্লাললাহু আলাইহি সাল্লাম সত্যিই নবী হয়ে এসেছিলেন কি না। কেননা যেরূপ অকাট্য ও বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বর্ণনা পাই, রসূল (সাঃ)-এর নবুয়তের খবরও আমরা তদ্রূপ অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য মতেই পাই। সন্দেহের-ব্যধি যদি আমাদের ওপর এমনভাবে চড়াও হয় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফরয হওয়া সম্পর্কেও আমাদের বিশ্বাস দোদুল্যমান হয়ে পড়ে, তাহলে একদিন রসূল (সঃ) এর নবুয়ত সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয়। নাউজুবিল্লাহ্।

যারা বাতিলের প্রচার কার্যে নিয়োজিত তাদের সাধারণ রীতি এই যে, তারা তাদের বিভ্রান্তিকর প্রচারণার সকল লক্ষ্যকে এক সাথে ফাঁস করে দেয় না। বরং সর্বপ্রথম তারা ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত অকাট্য মূলনীতিগুলোর কোন একটার ওপর আক্রমণ চালায় এবং ঐ একটি জিনিসের প্রতি বিশ্বাস টলিয়ে দেয়ার কাজে

সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এটা তাদের একটা গভীর মনস্তাত্ত্বিক কূটকৌশল। হয়তো যদি তাদের সমস্ত থলের বিড়াল প্রথমবারেই বের করে দেয় তা হলে হয়তো কোন মুসলমানই তাদের ফাঁদে পা দেবে না। এ জন্য তারা তাদেরকাজ শুরু করে সন্দেহ সংশয়ের বীজ বপন ও কোন একটা বিশ্বাসকে টলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। যারা এই প্রথম হামলায় অবিচল থাকতে পারে তাদের দীন ও ঈমান চিরদিনের জন্য নিরাপদ হয়ে যায়। কিন্তু যেসব দুর্বল লোক এই হামলা সইতে পারে না, তারা প্রথমঘাঁটিতে হেরে যাবার পর এমন বিপর্যস্থ হয়ে যায় যে, অতপর হামলাকারীরা তাদের চিরন্তর বিশ্বাসের এক একটি স্তম্ভকে চুরমার করে যেতে থাকে এবং তারা গোমরাহীর শেষ গন্তব্যে পৌছা পর্যন্ত হামলাকারীদের অনুসরণ করে যেতে থাকে।

এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, মানুষের মনে যখন সন্দেহের ব্যধি জন্মে যায় এবং বিশ্বাসের ওপর সন্দেহের দাগটি প্রবল হয়ে দেখা দেয় তখন সন্দেহের সয়লাবে সে আর পা স্থির রেখে দাঁড়াতে পারে না। একবার সে যদি এই সয়লাবে ভেসে যায় তবে সে ভেসেই যেতে থাকে। কোথাও সে আর কদম জমিয়ে দাঁড়াতে পারেনা। একটা নিশ্চিত সত্যকে অস্বীকার করার পর সেই অস্বীকৃতি আর সেখানে থেমে থাকে না। বরং এতে করে মানুষের মনে অনুরূপ অন্যান্য নিশ্চিত সত্যকেও অস্বীকার করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায়। কেননা সকল বিশ্বাসের ভিত্তি একই হয়ে থাকে। কোন এক ব্যাপারে যখন সেই বিশ্বাস দোদুল্যমান হয়ে যায় তখন অন্যান্য যে সব সত্যের ওপর তার বিশ্বাস ছিল, তাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে গোমরাহীর পথ প্রদর্শক তার অনুসারীর ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে এবং যেটা ইচ্ছা সেটা তাকে দিয়ে অস্বীকার করাতে পারে।

ইসলামে যতগুলো বাতিল উপদলের সৃষ্টি হয়েছে, তাদের সকলের প্রতিষ্ঠাতারা এই পদ্ধতিতেই সাফল্য অর্জন করেছে। কাদিয়ানী আন্দোলনের জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে।এ আন্দোলনের আদিপুরুষও সর্বপ্রথম ইসলামের একটা আকাট্য

মূলনীতি (খতমে নবূয়ত) সম্পর্কে মানুষের মনে সংশয় সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছিল। যারা এই প্রথম আঘাত থেকে রক্ষা পেয়েছে তারা তো চিরতরেই রেহাই পেয়েছে। কিন্তু যাদের বিশ্বাস এই ব্যাপারে দোদুল্যমান হলো, তারা এমনভাবে পরাভূত হয়ে গেল যে, অতপর মির্জা সাহেব তাদেরকে দিয়ে যেটা চেয়েছেন সেটাই অস্বীকার করিয়ে নিয়েছেন। আর ইসলামী আর্দশের বিরুদ্ধে তিনি যে কথাই বলেছেন, সেটাই মানিয়ে ছেড়েছেন।

এই বাস্তবতাকে দৃষ্টি পথে রেখে ভাবুন তো, যাদের মনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মত অকাট্য সত্য সম্পর্কে সন্দেহ জন্মেছে, তাদের সন্দেহ কি এই একটা জিনিসেই সীমাবদ্ধ থাকবে?

"সত্যভাষী" সাহেব যে মতবাদের সূত্রপাত ঘটাতে যাচ্ছেন, তার সমস্ত রূপরেখা আমরা তার পুস্তক "হাদীস অধ্যয়ন"–এ দেখেছি। তার গোমর ফাঁক করার অবকাশ এখানে নেই। (১) কিন্তু যে হাদীস বিরোধী দলটি 'সত্যভাষী'র মতামত ও চিন্তাধারাকে মুসলিম জনগণের মধ্যে ছড়াচ্ছে, তাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, হাদীসের শত্রুতায় আপনারা কি এখন কুরআনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করতে উদ্ধত হলেন? "সত্যভাষী" সাহেব না হয় হাদীসের শত্রুতায় আপনাদের মিত্র হয়েছে। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ওপর হামলা তো শুধু হাদীসের ওপর নয়, স্বয়ং কুরআনের ওপর পরিচালিত। কুরআনে কি আপনারা এ আয়াত পাননি?

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ (بنی اسرائیل: ٧٨) ("সূর্য ঢলে পড়লেই নামায কায়েম কর") (বনী ঈসরাইল–৭৮)

এ আয়াতে সূর্য ঢলে পড়া বলতে যোহর ছাড়া আর কোন্ ওয়াক্ত বুঝানো হতে পারে? কুরআনে কি আপনারা এ আয়াতও পড়েননি?

أَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ("নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে এবং সামান্য রাত অতিবাহিত হওয়ার পর") (হূদ–১১৪)।

---

১. তাফহীমাত প্রথম খন্ডে এর সমালোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এখানে দিনের দুই প্রান্ত অর্থ ফযর ও মাগরীব ছাড়া আর কি হতে পারে? আপনারা কি কুরআনে এ আয়াতটাও পাননি?

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ
آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ - (طٰهٰ: ١٣٠)

"এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে গুণকীর্তন কর সূর্য উদয়ের পূর্বে ও সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে। আর রাতের সময়ে আবার গুণকীর্তন কর এবং দিনের প্রান্ত ভাগে।" তোয়াহা–১৩০)

এই শেষোক্ত আয়াতটিতে কি সুস্পষ্টভাবে চারটি পৃথক পৃথক নামাযের ওয়াক্ত বর্ণানা করা হয়নি? সূর্যোদয়ের পূর্বে ও দিনের প্রান্ত সমূহের এক প্রান্ত তো স্পষ্টতই ফজরের ওয়াক্ত। সূর্যাস্তের পূর্বে বলে আসর বুঝানো হয়েছে। রাতের কিয়দাংশ বলতে বুঝানো হয়েছে এশা। এই তিন ওয়াক্ত বাদ দিলে দিনের আরেক প্রান্ত বলে মাগরিব ছাড়া আর কি বুঝানো যেতে পারে? এ আয়াতও তো কুরআনেই ছিল। আপনি এটা দেখতে পেলেন না কেন?

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ - (الروم: ١٧-١٨)

''অতএব আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় এবং সকালে। বস্তুত আকাশ ও পৃথিবীতে কেবলমাত্র তারই প্রশংসা উচ্চারিত–আর তার পবিত্রতা ঘোষণা কর তৃতীয় প্রহরে এবং দ্বিপ্রহরে।

এ আয়াতে সন্ধ্যায় এবং দ্বিপ্রহরে বলে যথাক্রমে মাগরিব এবং যোহর ছাড়া আর কোন ওয়াক্ত কি বুঝানো হতে পারে?

এ আয়াতগুলো যদি কুরআনেরই হয়ে থাকে এবং এগুলো দ্বারা নামাযের পুরো পাঁচ ওয়াক্তই বুঝা যায়, তা হলে নামায মাত্র তিন ওয়াক্ত এবং যোহর ও মাগরিবের নামাযের হুকুম কুরআনে নেই বলে যে ওয়াজ নসিহত করা হচ্ছে তাকে কি কুরআনী ওয়াজ নসিহত বলা যায়?

এবার 'সত্যভাষী' সাহেব জোহর ও মাগরিবের ওয়াক্ত দুটি বিলুপ্ত করার জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি দিয়েছেন, সেটির ওপর নজর দিন।

তিনি বলেন যে, এই দুটো ওয়াক্ত এমন যে, এ সময়ে মানুষ একাগ্রতা লাভে সক্ষম হয় না। অথচ নামাযের জন্য একাগ্রতা একটা অপরীহার্য শর্ত, তাই নামাযের জন্য এটা একেবারেই অস্বাভাবিক সময়। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার যে, এই সত্যভাষী সাহেব স্বীয় গ্রন্থ 'হাদীস অধ্যয়ন'-এ কথা স্বীকার করেন যে, কুরআনে আল্লাহ তায়ালা নামাযকে সময়ানুবর্তিতার সাথে ফরয করেছেন। সূরা নিসার ১০৩ আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (নিশ্চয় নামায মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।) তিনি যদি একটুও বুদ্ধি খাটাতেন তা হলে তিনি নিজেই বুঝতে পারতেন যে, সময়নুবর্তিতার সাথে একাগ্রতার শর্ত আরোপ করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। বাস্তব জীবনে এই দুই শর্তের খাপ খাওয়া প্রায় অসম্ভব। নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়া যদি জরুরী হয় তা হলে সময় হলে নামায পড়তেই হবে, চাই একাগ্রতা থাক বা না থাক। আর যদি একাগ্রতা শর্ত হয় তা হলে সময়ানুবর্তিতার অবকাশ থাকতে পারে না। কাজ-কর্ম থেকে যখন যার ফুরসত মেলে তখন সে নামায পড়বে। এই দুটো ভিন্নধর্মী শর্ত যেখানে একত্রে জুড়ে দেয়া হবে, সেখানে এ দুটোর একটা না একটা বাদ পড়বেই।

'সত্যভাষী' সাহেবের হাবভাব দেখে মনে হয় তিনি একজন নিরেট আত্মদর্শী মানুষ হিসেবে কেবল নিজের ও নিজের শ্রেণীর লোকদের একাগ্রতার সময়টার দিকেই লক্ষ্য রেখেছেন। অন্যথায় তিনি যদি সামগ্রিকভাবে সর্ব শ্রেণীর মানুষের অবস্থার দিকে নজর রাখতেন তা হলে তিনি বুঝতে পারতেন যে, একাগ্রতাকে নামাযের জরুরী শর্ত ধার্য করার পর শুধু মাগরিব আর যোহর নয়, এ কাজের জন্য আদৌ কোন সময়ই নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আপনি বলছেন যে, ফযরের সময় একাগ্রতার সময়। কিন্তু যে শ্রমিকের সূর্যোদয়ের

আগেই কারখানায় হাজিরা দিতে হয় তার কপালেও কি ভোর বেলায় একাগ্রতা জোটে? আপনি বলেন যে, আসরের সময় নিবিষ্টচিত্ত হওয়ার সময়। বিকাল চারটা বাজতেই যারা অফিস ত্যাগ করে বাড়ীতে গিয়ে পৌছেন, সেই ডিপুটি কালেক্টর সাহেবদের বেলায় এ কথা সত্য হলেও হতে পারে। কিন্তু যে দোকানদারের কাছে বিকাল বেলায়ই খদ্দেরের ভিড় জমে, তার জন্যও কি ওটা নিরিবিলি সময়? আপনার মতে; এশার সময়টা নিভৃত সময়। আপনার জন্য তা হতেও পারে। কিন্তু নৈশ ডিউটিরত কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করুন তো। সে কি স্বীকার করবে যে, এশার সময় সে যথাযথভাবে নামাযে মনোনিবেশ করতে সক্ষম? নামায তো কোন ব্যাক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠী বিশেষের ব্যাপার নয়। আর এর সময় নির্ণয়ের ব্যাপারে কেবল হোমরা-চোমরা গোছের কর্তা ব্যক্তিদের সুবিধাজনক সময়ের দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়নি। এটা তো একটা সার্বজনীন ইবাদাত। আর সকল মানুষের জন্য দিন রাতের মধ্য থেকে এমন কোন সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, যখন সকল মানুষ পূর্ণ একাগ্রতা লাভ করতে পারে।

সকল মানুষের কথা না হয় বাদই দিলাম। যে কোন একজন মানুষের কথাই ধরুন না। কেউ কি বলতে পারবে যে, প্রতি দিন দুই বা তিনবার না হোক, একবার একই সময়ে সে পূর্ণ একাগ্রতা লাভ করে থাকে? একাগ্রতা ও মনোনিষ্ঠতা ঘড়ির কাঁটার সাথে বাঁধা জিনিস তো নয় যে, কাঁটা একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে দাঁড়ালেই অমনি একাগ্রতা এসে যাবে। হতে পারে, সচরাচর সকাল বেলা কোন ব্যক্তির সুগভীর একাগ্রতার সময়। কিন্তু সব সময়ই সেই রকম হতে হবে এমন কোন কথা নেই। সুতরং আপনার ফতোয়া মোতাবেক যে দিন সকালে সে নামাযে মনোনিবিষ্টতা করতে না পারে সে দিন ফযরের নামায বাদ দিতে পারে। অনুরূপভাবে আসর ও এশার নামাযের সময় যদি একাগ্রতার শর্তযুক্ত হয় হা হলে হয়তো এই সময় নিয়মিতভাবে নামায পড়া কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না। সুতরাং ফতোয়া প্রণয়ন করতে হলে এভাবে করতে হবে যে, এ সব ওয়াক্তের কোনটিতে যদি একাগ্রচিত্ত হতে পার তা

হলে নামায পড়ে নিও, নচেত তা অন্য সময়ের জন্য রেখে দিও। নামাযের সাথে একাগ্রতার শর্ত আরোপ করার এটা এক অমোঘ পরিণতি। আর এই শর্ত পূরণ করার অনিবার্য পরিণতি হলো, দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ সময়ানুবর্তিতার শর্ত বিলোপ করতে হবে।

প্রশ্ন এই যে, কুরআনের কোন আয়াত থেকে এ শর্ত বের করে তিনি এমন ইজতিহাদের বাহাদুরি দেখালেন! কুরআনে কোথায় বলা হয়েছে যে, নামাযের জন্য একাগ্রতা ও নিবিষ্টচিত্ত হওয়া জরুরী।

যদি তিনি বলেন যে, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (সফলকাম সেই মুমিনগণ যারা তাদের নামাযে বিনয়ী–মুমিনুন,১–২) এই আয়াত থেকে উক্ত শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে বলবো, এ আয়াত দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন সঠিক নয়। কেননা বিনয়ী হওয়ার অর্থ একাগ্রতা নয়। এর অর্থ হলো, আল্লাহর সামনে নিজেকে অতিশয় হীন, নগণ্য, দুর্বল ও অক্ষম মনে করা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা তদ্রূপ অনুভূতি ব্যক্ত করা। এজিনিসটা একাগ্রতা ছাড়াও অর্জন করা সম্ভব। মানুষ যদি হৃদয়ে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে সে আল্লাহর সামনে নিতান্ত তুচ্ছ ও অক্ষম, আর সেই বিশ্বাস ও অনুভূতি নিয়ে সে হাত বেঁধে দাঁড়ায়, রুকূতে আনত হয় এবং মাটিতে কপাল রেখে সিজদা করে তা হলে সে বিনয়ের সাথে নামায আদায়কারী রূপে গণ্য হবে, চাই দুনিয়ার যাবতীয় ঝামেলা–ঝঞ্ঝাটের চিন্তামুক্ত হয়ে একাগ্রতা লাভ করুক বা না করুক।

যদি বলেন যে, وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ (তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না– নিসা–৪৩)। এই আয়াতে এ শর্ত উপস্থিত, তবে আমি বলবো, এ কথাও ভুল। কারণ এ নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই বলে দেয়া হয়েছে, কতক্ষন পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞাটি বলবত থাকবে। সেটি হলো حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

(যতক্ষণ না তোমরা মুখ দিয়ে কি বলছ তা টের পাও।) 'সত্যভাষী' সাহেবের যুক্তি এই যে,যখন মদ হারাম হয়নি তখন মাতাল অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছিল। কারণ মাতাল

অবস্থায় একাগ্রতা অর্জিত হয় না। কিন্তু এ বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মাতলামীর প্রধান বৈশিষ্ট্যই তো এই যে, এ অবস্থায় একাগ্রতা (Concentration) প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে। যিনি কুরআন পাঠিয়েছেন, তিনি এমন অবাস্তব কথা কিভাবে বলতে পারেন? তিনি নিষেধাজ্ঞার সাথে সাথে তার কারণও জানিয়ে দিয়েছেন যে, মাতলামীর অবস্থায় তোমাদের নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। মুখ দিয়ে অনেক আবোল তাবোল কথা বেরিয়ে যায়। অথচ তোমরা টেরও পাওনা মুখ দিয়ে কি বেরুলো। সুতরাং তোমরা যখন এমন দিশেহারা অবস্থায় থাক, তখন নামাযের কাছেও যেও না। যখন মুখ দিয়ে কি বলছ তা টের পাবে তখন নামায পড়বে।

এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, একাগ্রতার সাথে নামায পড়া উত্তম। যত বেশী একাগ্রতা, অবিনিবেশ ও আল্লাহর প্রতি মনোযোগ সহকারে নামায পড়া হবে, নামায ততই পূর্ণাঙ্গ ও আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু কোন জিনিসের দ্বারা পূর্নতা লাভ হওয়া এক কথা আর সেটির অপরিহার্য শর্ত হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। নামাযের জন্য যে কয়টি আরকান নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো ঈমানের সাথে নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করলেই নামায আদায় হয়ে যাবে। চাই তা পূর্ণাঙ্গ তথা উৎকৃষ্টতম মানের নামায হোক বা না হোক। এ জন্য আমাদের ওপর শুধু হুকুম পালন করার দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। পূর্ণতার মানে উত্তীর্ণ হওয়ার দায়িত্ব অর্পন করা হয়নি। আমরা যদি এই দায়িত্ব পালন করে ক্ষ্যান্ত না হই, বরং নিজেদের আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে পূর্ণতার মানে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করি, তবে সেটা হচ্ছে 'ইহসান' তথা চরম উৎকর্ষের মান। এই মানে উন্নীত হতে পারলে সে জন্য রয়েছে অধিকতর প্রতিদান ও পুরস্কার। তবে ইহসানের মান অর্জন আমাদের উপর ফরয করা হয়নি। কেননা তা যদি করা হতো তা হলে ইসলাম শুধু শ্রেষ্টতম মানের যোগ্য লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ হয়ে যেত। যাদের মধ্যে সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্টতম মানে পৌছার যোগ্যতা ও ক্ষমতা নেই, সেই সব সাধারণ মানুষের জন্য ইসলামের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যেতো, কুরআন যে নামাযের অপরিহার্য্যতার ওপর এত জোর

দিয়েছে। অথচ সেই সাথে একাগ্রতা অর্জন ও দুনিয়াবী ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে নিবিষ্টচিত্ত হওয়ার শর্ত আরোপ করেনি। তার কারণ এটাই।

'সত্যভাষী' সাহেব ইসলামের নামাযকে সন্যাসীদের পূজা এবং যোগসাধকদের নিভৃত তপস্যা ভেবে নিয়েছেন। এ জন্য তিনি একাগ্রতাকে নামাযের অপরিহার্য শর্ত বলে গণ্য করেছেন, যা কিনা প্রায় ধ্যান ও তপস্যারই সমার্থক। অথচ নামায মূলত সংসার বিরাগী লোকদের জন্য নয়। যাদেরকে দুনিয়ার ঝনঝাটে জড়িয়ে পড়া, যাবতীয় সহজাত জৈবিক চাহিদা পূরণ করা ও দুনিয়ার জীবনের সকল দায় দায়িত্ব মাথা পেতে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এদের জন্যই নামাযের বিধান। 'সত্যভাষী' সাহেব যদি একটু গভীর চিন্তাভাবনা করতেন এবং ইসলামের নিগূঢ় মর্ম ও ইসলামী বিধানের যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তিগুলোকে বুঝতে চেষ্টা করতেন, তাহলে তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন যে, ইসলাম মানুষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনকে দুনিয়াবীজীবন থেকে আলাদা করতে চায় না। বরঞ্চ সে তার দুনিয়াবী তথা বৈষয়িক জীবনকে এমনভাবে সংশোধন ও পূর্ণগঠন করতে চায় যাতে ওটাই অবিকল তার ধর্মীয় জীবনে পরিণত হয়। সে মুক্তির পথ ইহসংসারের বাইরে কোথাও নিয়ে রেখে দেয়নি। দুনিয়াবী কায় কারবার ও ঝক্কি-ঝামেলার ঠিক মাঝখান থেকেই সে একটা সোজা রাস্তা বের করে দেখিয়ে দেয় এবং বলে যে, এই রাস্তা তোমাদেরকে অফুরন্ত নেয়ামতে ভরপুর বেহেশ্তে নিয়ে যাবে। তার সকল মূলনীতির গোড়ায় কথা এই যে, তোমরা দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্ম একজন তুখোড় ও ধুরন্ধর দুনিয়াদারের মতই সম্পাদন কর। তবে সাথে সাথে অকাট্য সত্যও মনে রেখ যে, তোমাদের আসল মনিব ও শাসক একমাত্র আল্লাহ, তারই নির্দেশ মান্য করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য, গোপনে ও প্রকাশ্যে তোমরা যাই কর, সে সবই তিনি জানেন এবং একদিন তোমাদের জীবনের সমস্ত কাজ কর্মের হিসাব তিনি নেবেনই। দুনিয়ার জীবনে তোমরা যদি তার আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করে থাক, নিজেদের

পারস্পরিক আচরণে যদি তাঁর বিধিমালা মান্য করে থাক, তাঁর রচিত আইন–কানুন অনুসারে কাজ করে থাক, তাহলে তার সন্তুষ্টি লাভ করে ধন্য হবে। নচেৎ তার বিরাগভাজন হবে। এই শিক্ষাটাই বারবার মনে করিয়ে দেয়ার জন্য নামায ফরয করা হয়েছে। আর তার জন্য এমন সময় নির্ধারণ করা হয়েছে, যে সময়ে এই কথাগুলো মনে করিয়ে দেয়া সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

কুরআনের প্রথম পৃষ্ঠা খুলতেই আপনি যে আয়াতের সম্মুখীন হন তা হচ্ছেঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ
يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
يُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ
مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (البقرة : ٢-٤)

"এটা আল্লাহর কিতাব। এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা হেদায়াতের উৎস। সেই সব সংযত লোকের জন্য যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে, আমার দেয়া সম্পদ থেকে খরচ করে, আর যারা ঈমান আনে তোমাদের প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছিন তার ওপর এবং যে সব কিতাব তোমার পূর্বে নাযিল করেছি তার ওপরও আর যারা আখিরাতের প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে" (বাকারা, ২–৪)।

এ আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করুন। কুরআনের হেদায়াত ও পথ নির্দেশনা এটাই যে, সে মানুষকে দুনিয়ায় চিন্তা ও কর্মের নির্ভুল পন্থা ও পদ্ধতি জানিয়ে দেয়। জ্ঞানের আলো বিতরণ করে। দৃষ্টি–ভঙ্গিকে সোজা ও সরল করে এবং সাধনা ও কর্মের যে রাজপথ এই দুনিয়ার আঁকাবাঁকা পথসমূহ নিরাপদে অতিক্রম করিয়ে মানুষকে আখিরাতের মুক্তি ও সাফল্যের দিকে নিয়ে যায় সেই রাজপথ দেখায়। কিন্তু এ রাজপথের সিংহদ্বার কেবল সেই ব্যক্তির জন্যই উন্মুক্ত হতে পারে এবং তার জন্যই সুগম হতে পারে, যে অদৃশ্যে বিশ্বাস করে. আল্লাহর অনুগত হয়, শেষ বিচারের দিনের

আগমন যে অবধারিত সে ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় রাখে, নামায পড়ে এবং কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রিয় সম্পদ ব্যায় করে। যে ব্যক্তি এই সকল শর্ত পূরণ করবে, কেবলমাত্র সেই পারবে কুরআনের প্রদর্শিত জীবন-পথে চলতে এবং সেই হবে সফলকাম।

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - (بقره: ٥)

"তারাই আল্লাহর নির্দেশিত সঠিক পথে রয়েছে এবং তারাই কামিয়াব।" (বাকারা-৫)।

এ থেকে বুঝা যায় যে, নামাযের গুরুত্ব কতখান।

নামায অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসকে সুদৃঢ় ও মজবুত করে। যে আল্লাহকে কেউ কখনো দেখেনি সেই আল্লাহর প্রতি ঈমানই মানুষকে তার যাবতীয় আরাম-আয়েশ, কাজ কর্ম, স্বার্থ ইত্যাদির মায়া ত্যাগ করে দিনে কয়েকবার নামায পড়তে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাকে বারবার মসজিদ বা জায়নামাযের দিকে টেনে নিয়ে যায়। ঈমানের চালনা ও তাড়নায় এভাবে মানব মনের বারংবার প্রভাবিত ও উদ্দীপিত হওয়া এবং তারই আনুগত্যে অংগ প্রত্যংগ সঞ্চালিত হওয়ার ফল দাঁড়ায় এই যে, ক্রমান্বয়ে মানুষের প্রকৃতির ওপর ঈমানের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব অটুটভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে থাকে এবং তার অভ্যন্তরে এমন শক্তি সৃষ্টি হয়, যাতে করে সে ঈমানের দাবী ও চাহিদা মোতাবেক চরিত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। প্রকৃতপক্ষে নামাযই এমন একটা কাজ, যার মধ্য দিয়ে মানুষ কথা ও কাজ উভয় প্রকারে ইসলামের সমগ্র আকীদা ও বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করে। তাকবীর থেকে সালাম পর্যন্ত যা কিছু রয়েছে, তা এই আকিদারই পুনঃ পুনঃ অনুশীলন মাত্র। আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর রাসুলের (আঃ) প্রতি ঈমান, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, তাঁর বিচার দিবসের প্রতি ঈমান, তাঁকে প্রকৃত শাসক ও বিধায়ক মনে করা, তাঁর সন্তুষ্টির অভিলাষী হওয়া, তাঁর হিসাব-নিকাশের ভয়ে ভীত হওয়া, তাঁকে সর্বজ্ঞ বলে মনে করা, এ সব কিছুই নামাযের আওতাভুক্ত। সচেতনভাবে না হলেও অবচেতনভাবে তো

এ সব তত্ত্ব—প্রত্যেক নিয়মিত নামাযীর মনে বদ্ধমূল থাকেই। কেননা এ সব বিশ্বাস থেকে মনমগজ শূন্য হলে নিয়মিত নামায পড়া সম্ভবই নয়।

এভাবে বারবার পুনরাবৃত্তি এবং ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে এই কর্ম প্রক্রিয়াটি যখন মানুষের মনে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসকে মজবুত করে এবং তারই অধীনে শরীরকে আদেশ পালনে অভ্যস্থ করে তোলে, তখন এর ফলে অনিবার্যভাবে আল্লাহর যাবতীয় আদেশের কার্যকর আনুগত্য ও সফল বাস্তবায়ন মানুষের রপ্ত হয়ে যেতে থাকে। তার ভেতরে সৃষ্টি হয় দায়িত্ব সচেতনতার মহৎগুণ। নিজ জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ইসলামের নিয়ম শৃংখলার অনুগত থাকার যোগ্যতা তার মধ্যে গড়ে ওঠে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রত্যুষে ঘুমের মজা উপেক্ষা করে নামাযের জন্য শয্যা ত্যাগ করবে শুধু মাত্র আল্লাহ নামায পড়ার আদেশ দিয়েছেন বলে, জোহর ও আসরের সময় অদেখা খোদার ডাকে সাড়া দিয়ে যে ব্যক্তি কায়-কারবারের ব্যস্ততা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে মসজিদের দিকে ছুটে যাবে, প্রতিদিন মাগরিবের সময় যে ব্যক্তি নিজের বৈকালীন আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তবিনোদনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর নির্দেশের তাগিদে নামাযের দিকে ধাবিত হবে, রাতের বেলা গুনাহর কাজের হাতছানিকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর হুকুম তামিল করতে এগিয়ে যাবে শুধুমাত্র আপন কর্তব্যবোধের চাপে ও আকর্ষণে। তার কাছ থেকে এটা প্রত্যাশা করা যায় এবং একমাত্র তার কাছ থেকেই প্রত্যাশা করা যায় যে, নামায শেষে সে যখন বাস্তব কর্মজীবনে কদম রাখবে, তখন সেই একই অদৃশ্য সর্বত্র খোদার ভয় তাকে সব ধরনের গোপন ও প্রকাশ্য পাপ থেকে বিরত রাখবে। জুলুম, অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখবে। তাকে আল্লাহর হুকুম, তাঁর আইন ও তাঁর বিধি-নিষেধ কঠোরভাবে মেনে চলতে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করবে এবং তার মধ্যে এমন এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি জন্মাবে, যার দরুন ভোগবিলাসের স্পৃহা যেমন তাকে কর্তব্য পালন থেকে নিরস্ত করতে পারবে না পার্থিব লাভের উদগ্র বাসনা যেমন

তাকে সীমা অতিক্রমে প্ররোচিত করবে না, তেমনি তার পার্থিব শখ, সাধ ও মোহ তাকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দিতে পারবে না। আর যদি নামায দ্বারা তার নৈতিক প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের এত পূর্ণতা ও চরমোৎকর্ষ নাও হয়ে থাকে, তবুও অন্তত পক্ষে তার দায়িত্ববোধ, খোদানুগত্য ও খোদাভীতি সেই ব্যক্তির চাইতে তো বেশী হবেই, যার মধ্যে আল্লাহর ডাক শুনেও কিছুমাত্র সাড়া জাগে না ও বোধোদয় হয় না এবং যার মধ্যে এই অভ্যাস কখনো গড়েই ওঠেনি যে, আল্লাহ ও তার সৃষ্টির দাবী চাহিদা যখন তাকে পরস্পরের বিপরীত দিকে আকর্ষণ করবে, তখন সৃষ্টির হাতছানিকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর দিকে এগিয়ে যাবে।

নামায যদি মনের পূর্ণ একাগ্রতা ও নিবিষ্টতা নিয়ে পড়া হয় তবে তার আধ্যাত্মিক উপকারিতা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? কিন্তু আল্লাহ যে বৃহত্তর কল্যাণের জন্য নামাযকে ফরয করেছেন, সেটাতো একাগ্রতা ছাড়াও নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করলে অর্জিত হয়ে যায়। এ জন্যই কুরআনে একাগ্রতার চেয়ে সময়ানুবর্তিতার ওপর বেশী জোর দেয়া হয়েছে। আর রাতের নিভৃত ও নির্ঝঞ্ঝাট মুহূর্তে যে নামায পড়া হয় তাকে অতটা গুরুত্ব দেয়া হয়নি। যতটা দেয়া হয়েছে দুনিয়াবী কারবারের ব্যস্ততা ও মগ্নতা থেকে উঠে গিয়ে যে নামায পড়া হয় তাকে। আল্লাহ বলেন। حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ "সকল নামাযকে সংরক্ষণ কর। বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযকে"[১] (সূরা বাকারা–২৩৮)। সাধারণত মধ্যবর্তী নামায আসরের নামাযকেই বলা হয় এবং বেশীর ভাগ হাদীস এই মতকেই সমর্থন করে। সকল নামায থেকে আলাদা করে এ নামাযের পাবন্দীর ওপর এত জোর দেয়ার কারণ এটাই যে, এ নামাযের সময়টা এমন যে, এ সময়েই মানুষ সাধারণত বেশী ব্যস্ত থাকে। এই আপেক্ষিক গুরুত্ব ও বিশিষ্টতা দান স্পষ্ট করেই বলে দিচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহর ডাক কানে যাওয়া মাত্রই দুনিয়ার যাবতীয় কর্ম ব্যস্ততা, সখ ও মোহ এবং সমস্ত স্বার্থ ও সুবিধাকে বিসর্জন দিয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড় আর তার হুকুম

পালনকে তোমাদের জন্য সকল প্রিয় কাজের ওপর অগ্রাধিকার দাও, এ কাজটি আল্লাহর কাছে তোমাদের মনোনিবেশ ও একাগ্রতার চাইতে অনেক বেশী পছন্দনীয়। এ জন্যই জুমআর নামাযের নির্দেশ দেয়ার জন্য নিম্নরূপ বাক্য চয়ন করা হয়েছেঃ

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِن يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ
فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللّٰهِ (الجمعة)

"জুমআর নামাযের জন্য তোমাদেরকে আহবান করা হলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর স্মরণের দিকে ছুটে যাও এবং বেচা-কেনা বন্ধ কর। তোমরা যদি প্রকৃত ব্যাপার জান তা হলে এটাই তোমাদের জন্য ভাল। তারপর নামায শেষ হলে পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড় এবং নিজ নিজ কারবারের মধ্য দিয়ে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর" (সূরা জুময়া-৯-১০)।

আপনি বলেন যে, দুনিয়াবী কাজের ব্যস্ততার সময়ে যে নামায পড়া হয় তা অমনোযোগিতার সাথে পড়া হয়। মন পড়ে থাকে কারবারে অথবা খেলাধুলার অঙ্গনে। তাই আল্লাহর দিকে মন ঝোঁকে না। না বুঝে-শুনে কেবল মুখস্ত দোয়া-দরুদ পড়া হয়। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা কিছু কাজ-কর্ম সংঘটিত হয়। আমি বলি এই নামাযই অত্যন্ত মূল্যবান। যে ব্যক্তি তার কায়কারবার ও আমোদফুর্তিতে এত মাতোয়ারা থাকে যে, সেখান থেকে সরার পরও তার মন ওখানেই পড়ে থাকে। সে তো আসলে আল্লাহর জন্য বিরাট ত্যাগ স্বীকার করে। নিজের এত প্রিয় ও মোহনীয় কাজের মধ্যেও সে আল্লাহর হুকুম স্মরণ করে এবং তা পালন করার জন্য মসজিদ পর্যন্ত ছুটে যায়। কত বড় মহৎ ও ভাল বান্দা সে, যে নিজের পরম লোভনীয় বস্তু থেকে মনোযোগ হটিয়ে তা আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয় এবং অনিচ্ছাক্রমে হলেও মনের ওপর জবরদস্তি করে আল্লাহকে স্মরণ করে। এত বড় ত্যাগ, এমন আগে দুই ওয়াক্ত ও পরে দুই ওয়াক্ত নামায আদায় শাব্দিক

অর্থেও আছরই মধ্যবর্তী নামায।–(অনুবাদক) আনুগত্য ও এমন কর্তব্যপরায়নতার কি কোন মূল্যই নেই আপনার কাছে? আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে কি এই ব্যক্তির কিছু বাকী আছে? আত্মসংযত ও খোদাভীতির পরিচয় কি সে দেয়নি? কর্তব্যের খাতিরে নিজের অতি প্রিয় ও আকর্ষণীয় বস্তুকে বিসর্জন দেয়ার মত দৃঢ়তা যে তার আছে, সে কথা কি সে নিজের কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেনি? সে যদি এই সব মহৎ ও দুর্লভ ঈমানী ও চারীত্রিক গুনাবলীর অধিকারী না হয়ে থাকে, তা হলে আর কোন্ জিনিস তাকে লাভজনক ও মনস্তুষ্টিকর জিনিস থেকে সরিয়ে নামাযের দিকে টেনে আনলো? আনুগত্য ও খোদাভীতি ছাড়া আর কোন গুণ বা সখ তাকে এখানে আনতে পেরেছে?

পরিতাপের বিষয় যে, ইসলামের এত বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আজকাল এমন সব লোক ইজতিহাদের কাঁচি চালাচ্ছে, যাদের ইসলামের নিগূঢ় রহস্য অনুধাবন করা দূরে থাক, তার প্রাথমিক মূলনীতিসমূহও উপলব্ধি করার মত তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মেধা নেই। এতটা খোদার ভয়ও নেই যে, ইসলামের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক বিষয়ে নিজেদের ভাসাভাসা ও অবজ্ঞাপূর্ণ চিন্তাধারা প্রকাশ করে হাজারো মুসলমানের আকীদা ও আমল নষ্ট করার গুরুদায়িত্ব মাথায় নিতে কিছুমাত্র ভয়-ডর বোধ করে, আর এতটা নৈতিক বলও নেই পান্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার মিথ্যা অহমিকা ত্যাগ করে যা তারা জানে না, তা বিজ্ঞ লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করবে এবং যা বোঝে না তা ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন লোকদের কাছ থেকে বুঝে নেবে। মুসলমানদের কি শোচনীয় দুর্ভাগ্য যে, আজ এ ধরনের লোকেরা তাদের দুনিয়াবী ও ধর্মীয় বিষয়ে নেতৃত্বদানের জন্য মাথা তোলার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে!

তরজমানুল কুরআন, রবিউসসানী ও জমাদিউল উলা, ১৩৫৪হিঃ

জুলাই–আগষ্ট–১৯৩৫

নামাজ সম্পর্কে একটা সাধারণ প্রশ্ন

পূর্ববর্তী নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর আমি একটা চিঠি পাই। ঐ চিঠিতে নিম্নলিখিত প্রশ্ন তুলে ধরা হয়ঃ

"নামাযের সময় সম্পর্কে "সত্যভাষীর" ভুল বুঝাবুঝিকে আপনি এমন ভাবে নিরসন করেছেন যে,তা নিয়ে আর কোন বাদানুবাদের অবকাশই নেই। কিন্তু মানুষের বাস্তব জীবনে নামাযের কি প্রভাব পড়ে, নামায কিভাবে মানুষের মধ্যে কর্তব্য বোধ সৃষ্টি করে, কিভাবে মানুষকে আল্লাহর আদেশ পালনে অভ্যস্ত করে তোলে, আর জীবনের ব্যাপকতর কর্মকান্ডে তাকেকিভাবে ইসলামী নিয়ম শৃংখলার আনুগত্য করার যোগ্য করে গড়ে তোলে, সে সম্পর্কে আপনি যে বক্তব্য রেখেছেন ,তার ব্যাপারে আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। এ প্রশ্নের কোন জবাব আমি খুঁজে পাচ্ছিনা। তাত্বিক ভাবে আমি এ কথা স্বীকার করি যে, শুধু নামায নয় বরং অন্যান্য ফরয ইবাদতও মানুষের বাস্তব জীবনে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করবে এ উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে।এ সব ইবাদাতের যে নিয়ম পদ্ধতি নির্ধারন করা হয়েছে,তা নিশ্চিতভাবেই এমন যে তাতে করে মানুষের কর্মে ও চরিত্রে তার কাংখিত প্রভাব প্রতিফলিত হওয়ারই কথা। কিন্তু আমরা আজ মুসলমানদের বাস্তব জীবনে এই প্রভাবের প্রতিফলন দেখতে পাইনা । এর কারন কি? নিয়মিত নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত পালনকারী মুসলমানরা ইসলামী চরিত্রে এ দৃষ্টান্ত হয়ে বিরাজ করবেন, সততা ,আমানতদারী ,পরহেজগারী ও পবিত্রতার জীবন্ত প্রতিক হবেন, এটাই তো স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত দেখা যায়। নামাযী, রোযাদার ও হাজী সাহেবদেরকে আমরা স্বভাব চরিত্রে ,আচরনে ও লেনদেনে বেনামাযীদের এবং অন্যান্য ইবাদাত বর্জনকারীদের চেয়ে মোটেই ভিন্ন রকম দেখিনা। বরঞ্চ এ সব ইবাদাতে অভ্যস্ত অনেকের ভাবগতিক এমন হয়ে দাড়িয়েছে যে,তারা তাদের

ইবাদাতকে তাদের খারাপ আচরনের কলংক ঠেকানোর জন্য ঢাল বানিয়ে রেখেছেন।এমন কি তাদের অপকর্মদেখে দেখে অধিকাংশ নব্যশিক্ষিত লোকেরা নামায রোযা সম্পর্কেই খারাপ ধারনা পোষণ করছেন।"

এই চিঠিতে লেখক যে অন্তর্দ্বন্দ তুলে ধরেছেন,তা আজকাল সাধারনভাবে অনেকের মনেই বিরাজমান। অস্বীকার করা যাবেনা যে, ব্যাপারটা অনেকাংশে বাস্তব ভিত্তিকও। তবে এতে এমন কোন জটিলতা নেই, যার নিরসন দুঃসাধ্য হতে পারে। প্রশ্নকারী নিজেই স্বীকার করেন যে,ইসলামী ইবাদাতের কার্য্যকরিতা তত্ত্বগতভাবে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল। বিবেকের সিদ্ধান্ত এইযে, যে উদ্দেশ্যে এই সব ইবাদাত ফরয করা হয়েছে,তা এর দ্বারা পরিপূর্নভাবে অর্জিত হওয়া উচিত। কেননা মানুষের মনকে আল্লাহর দিকে ঝুকিয়ে দেওয়া এবং আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য এর চেয়ে ভাল কোন বাস্তব কর্মপন্থা হতে পারেনা। ইতিহাস সাক্ষীযে, বাস্তব জগতেও এ মতবাদের বিশুদ্ধতা প্রমানিত হয়েছে। ইসলামের স্বর্নযুগের শতাব্দীগুলোতে এই নামায,রোযা,হজ্জ,জাকাতই ইসলামী লক্ষ্য ও আদর্শ মোতাবেক আরব অনারব নির্বিশেষে লক্ষ কোটি মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রশিক্ষন দিয়েছিল এবং তাদের কর্মে ও চরিত্রে ইসলাম যে পরিবর্তন সাধন করতে চায় সেই পরিবর্তনই সাধন করেছিল। আজ যদি আমরা কোন ব্যক্তি বা সমাজের মধ্যে এই ইবাদাত গুলোর সেই প্রভাব প্রতিফলিত হতে না দেখি,তা হলে এই ইবাদাত গুলোর কার্য্যকরিতা নিয়ে সন্দেহ করার পরিবর্তে আমাদের এটাই ধরে নিতে হবে যে, যে কারনেই হোক এক শ্রেনীর মানুষের মনের প্রভাব গ্রহনের ক্ষমতাই লোপ পেয়েছে। আমরা জানি, আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে দিয়ে থাকে। বারবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করায় এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, দাহন করা আগুনের কাজ এবং দগ্ধিভূত হওয়া কাঠের ধর্ম। এরূপ নিশ্চিত জ্ঞান থাকা সত্বেও যদি কখনো দেখতে পাই যে,কাঠ আগুনে দেওয়া সত্বেও তা জ্বলছেনা তাহলে আমরা কখনো এমন ধরনা

করিনা যে,আগুনের দাহন ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। বরঞ্চ আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে,ঐ কাঠই ভিজে। তাই আগুনের দাহন ক্রিয়ার প্রভাব গ্রহনের ক্ষমতা তার নেই। ঠিক তেমনি ভাবে প্রশিক্ষন ও সংশোধনের একটি পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে জানি যে,মানব মনের ওপর তার একটা বিশেষ ধরনের প্রভাব এইযে, মানব মনে তার ঐ প্রভাব না পড়েই পারেনা। আর অভিজ্ঞতা থেকেও প্রমানিত হয়েছে যে, স্থান কাল ও পাত্র নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের স্বভাব প্রকৃতিতে তার অনুরূপ প্রভাব সত্য সত্যই পৃতিফলিত হয়েছে। সেই একই প্রশিক্ষন কার্যক্রমকে আমরা যদি কিছু সংখ্যক মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ্য হতে দেখি, তাহলে তার প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের মনে সংশয় সৃষ্টি হবে কেন? আমরা কেন এ কথা মনে করবোনা যে,ভিজে কাঠের মত এই মানুষগুলোর মনও প্রভাব গ্রহনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে?

নামাযের বহ্যিক রূপটা যদি বিবেচনায় আনি,তবে এ কথা সত্য যে,এতে কতিপয় নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ কয়েকটি শারীরিক তৎপরতা ও ভাবভংগী এবং মুখ দিয়ে কতিপয় শব্দ উচ্চারন ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনা। অন্যান্য ইবাদাতের আবস্থাও তদ্রূপ । একটা বিশেষ মাসে শেষ রাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকা হলো। ব্যাস,এর নাম হয়ে গেল রোযা। বছরে একবার নিজের সম্পদ থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার জন্য বের করা হলো। আর সেটাই যাকাত হয়ে গেল। একটা নির্দিষ্ট সময়ে সউদী আরব সফর করা হলো এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে কয়েকটা বিশেষ কাজ করা হলো,অমনি তা হজ্জ নামে অভিতিহ হলো। নিছক এই কাজ গুলোতে যে মানুষের মনকে প্রভাবিত করার মত কিছু নেই,তা কারো অজানা নয়। নিরেট বাহ্যিক তৎপরতা হিসেবে নামাযের সাথে ব্যায়ামের, রোযার সাথে অনশনের,যাকাতের সাথে সরকারী কর খাজনার এবং হজ্জের সাথে সাধারন ভ্রমনের কোন প্রভেদ. নেই। কোন বুদ্ধিমান মানুষ বলতে পারেনা যে,শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা আত্মায় কোন স্নিগ্ধতা ও

কোমলতা জন্মে, অনশন দ্বারা কোন চারীত্রিক বিশুদ্ধি ঘটে, কিংবা কর দান বা বিদেশ ভ্রমণে কোন মহৎ চারিত্রিক গুন সৃষ্টি হয়।

কিন্তু যে উপকরনটি এই কাজগুলোকে অন্যান্য কাজ থেকে পৃথক ও বৈশিষ্ট মন্ডিত করে এবং এ গুলোকে চরিত্র গঠন,আত্ম শুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বোত্তম উপায়ে পরিনত করে ,তা হলো ঈমান। একমাত্র ঈমানই রুকূ, সিজদা ও ওঠা, বসাকে 'নামাযে' রূপান্তরিত করে। ঈমানই উপোষকে রোযায় পরিনত করে। আর ট্যাক্সের প্রকৃতিতে বিপ্লব সাধন করে তাকে যাকাতের 'উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত করে।এই ঈমানের বদৌলতেই একটা বিশেষ ভ্রমন মামুলী পর্যটনের স্তর থেকে উন্নীত হয়ে "হজ্জের" মহিমায় অলংকৃত হয়। প্রকৃত পক্ষে ঈমানই হলো এই সমস্ত ইবাদতের প্রান ও মুলসত্তা। এর কারনেই ইবাদাতের প্রতিটি অংশ হয়ে ওঠে তাৎপর্য্যবহ। এর বদৌলতেই ইবাদাতগুলোতে জন্মে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা এবং এর কল্যানেই মানুষের মনে সৃষ্টি হয় প্রভাব গ্রহনের যোগ্যতা।

এখন এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, কোন ব্যক্তি যদি যথার্থ ঈমানদার হয় ,আল্লাহকে নিজের মনিব মনে করে,আখেরাতের জীবনের বাস্তবতায় বিশ্বাসী হয়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর রাসূল বলে মান্য করে এবং তার আনীত আল্লাহর বিধিনির্দেশকে আল্লাহর বিধিনির্দেশ মনে করে, তা হলে প্রতিদিন পাঁচবার নামাজের শিক্ষা অনুশীলন করা সত্ত্বেও তার চিত্তপটে ঐ শিক্ষার একেবারেই কোন প্রভাব পড়বেনা এটা অসম্ভব। তার দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্যের কোন চিহ্ন পরিদৃষ্ট হবেনা–এটা অকল্পনীয়। প্রতিবছর পুরো এক মাস কঠোর বিধিনিষেধের অধীন পরহেজগারী ও খোদাভীতির প্রশিক্ষন পেতে থাকবে,তথাপি তার জীবনে কোন বিপ্লব আসবেনা,বরং সে এমন দেউলে থেকে যাবে যেন আদৌ কোন প্রশিক্ষন পায়নি–এটা অচিন্তনীয়। এটা মোটেই সম্ভব নয় যে, সে প্রতিবছর নিরেট অদৃশ্যে বিশ্বাসের প্রেরনায় নিজের প্রিয়

সম্পদ ত্যাগ করতে থাকবে,আর তা সত্ত্বেও একজন বেঈমান ও আত্মকেন্দ্রিক মানুষের মত কৃপন, পাসান হৃদয়, হারামখোর ও স্বার্থপর থেকে যাবে। আপন মনিবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে লাব্বায়কা বলতে বলতে ঘরবাড়ী ছেড়ে এবং নিজের লাভজনক ও প্রিয় ব্যবসায় বানিজ্য পরিত্যাগ করে ফকীরের বেশ ধারন করে সে সফরে বেরুবে,দীর্ঘ দিন ধরে সেই দুর্নিবার ভক্তি ও প্রেম নিয়ে প্রবাস জবীন যাপন করবে এবং ইসলামের কেন্দ্রভূমিতে পৌছে আল্লাহর সেই সব অত্যুজ্জল নিদর্শন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে যা আল্লাহর সাচ্চা ও অনুগত বান্দাদের গৌরবময় সাফল্য ও অবাধ্যদের শোচনীয় ব্যর্থতার অকাট্য সাক্ষ্য দিচ্ছে, তবুও প্রবাস থেকে ফেরার পর এই সফরের সুফল ও প্রভাব থেকে তার জীবন ও চরিত্র এত বঞ্চিত থাকবে যেন সে কোথাও সফরই করেনি এবং তার চোখ কোন কিছু দেখেওনি এটা হতেই পারেনা।

এ কথা ঠিক যে, গুনগত ও পরিমানগত দিক দিয়ে প্রত্যেক মানুষের মন মানসে এই ইবাদাত সমূহের প্রভাব সমভাবে প্রতিফলিত হতে পারেনা। মানসিক ক্ষমতা ও যোগ্যতার পার্থক্য এবং ঈমানী শক্তির মাত্রার তারতম্য অনুসারে ঐ প্রভাব কম বেশী হওয়া বা সবল দুর্বল হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এটা কিছুতেই সম্ভব নয় যে, ঈমানের সাথে যে ইবাদাত করা হবে তা একেবারেই নিস্ফল ও নিস্প্রভ প্রমানিত হবে। আমরা এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে,যার জীবনে নামায এবং পাপাচার ও অশ্লীলতা এক সাথে চলে রোযা ও আল্লাহর অবাধ্যতা গলাগলি ধরে অবস্থান করে, যার চরিত্রে যাকাত ও হারাম উপার্জন হাতে হাত ধরে চলে এবং যে ব্যক্তি হজ্জ ও অবৈধ কার্য্যকলাপের মিশ্রন ঘটায়ে চলেছে, তার নামায নামায নয়–একটা মামুলী কাজ মাত্র। তার রোযা রোযা নয় উপবাস মাত্র। তার যাকাত যাকাত নয় চাঁদা বা ট্যাক্স মাত্র। তার হজ্জ হজ্জ নয়–লন্ডন ও প্যারিস সফরের মত একটা সফর মাত্র।

উপরে যে কথাগুলো বললাম,তা কেবল সেই সব লোকের বেলায়ই সত্য প্রশ্ন কর্তার অভিযোগ মোতাবেক,যাদের জীবনে

ইসলামী ইবাদাতের কোন প্রভাবই প্রতিফলিত হয়না। কিন্তু আমি এ কথা কিছুতেই স্বীকার করিনা যে, মুসলমানদের মধ্যে নামায,রোযা, হজ্জ ও যাকাতের পাবন্দ যত লোক রয়েছে,সকলেই এ রকম। মুষ্টিমেয় সংখ্যক মোনাফেক এ ধরনের থাকতে পারে বটে। তবে আল্লাহর শোকর যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের অবস্থা এমন নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ যে ব্যধিতে আক্রান্ত, সেটা মোনাফেকী নয় বরং ঈমানের দুর্বলতা। এ দুর্বলতার ফলে ইবাদাত সমূহের প্রভাবও নিস্তেজয়েহ য়ে পড়েছে। তারা নামায পড়ে, রোযা রাখে,যাকাত দেয় এবং হজ্জ করে আসে। কিন্তু এ জিনিসগুলো হৃদয়ে একটা মৃদু পরশ বুলিয়ে এমন আলতো ভাবে চলে যায়,যেমন বাস্প আয়নার ওপর একটা হাল্কা কুয়াসা রেখে উধাও হয়ে যায়। একে প্রভাবহীনতা নয় বরং নিস্তেজ প্রভাব বলা যেতে পারে। ঈমানের স্ফুলিকি তাদের স্থানে এখানে সুপ্ত ও প্রচন্নভাবে বিদ্যমান। তার ঈষদোব উত্তাপে ইবাদাতগুলো কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই ফেলছে। কিন্তু সে প্রভাব এত দুর্বল যে, ইবাদাত কারীদের বাস্তব কর্মকান্ডে ও চরিত্রে তার চিহ্ন খুব একটা চোখে পড়ার মত হয়না।

আমি এ কথাও স্বীকার করতে রাজী নই যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা এই সব ইবাদাত সম্পাদন করে থাকে, তাদের অবস্থা ইবাদাত বর্জনকারীদের সমপর্যায়ের বা তার চেয়েও খারাপ। বরঞ্চ প্রকৃত ব্যাপার এই যে,আমাদের সমাজে এখনো যদি সামগ্রিকভাবে দেখা হয়,তা হলে নৈতিক দিক দিয়ে নামায রোযা পালনকারীরাই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট মনের। কিন্তু খোদাবিস্মৃত লোকদের তুলনায় ইবাদাত কারীদের ভুলত্রুটী দর্শকদের চোখে বেশী ফোটে। একজন বেনামাযী ও বেরোযাদার লোকের অসদাচরন ও দুশ্চরিত্রপনা অত খারাপ লাগেনা,যতটা খারাপ লাগে একজন নামাযী ও রোযাদার মানুষের দুর্ব্যবহার ও দুস্কৃতি। বেনামাযীর কাছ থেকে অপকর্মই প্রত্যাশিত। তাই সে যখন খারাপ কাজ করে, তখন তার বিরুদ্ধে তেমন অভিযোগ ওঠেনা। কিন্তু একজন নামাযীর ব্যাপারে প্রত্যেকেই আশা করে যে, সে খোদাভীরু ও সদাচারী পরহেজগার হবে। তাই এই সাধারণ প্রত্যাশার বিপরীত তার মধ্যে যখন বিভিন্ন

চারিত্রিক দোষের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখন সে হয় সকলের চক্ষুশূল এবং সবাই হয়ে ওঠে তার কুৎসায় সোচ্চার। সাদা দেওয়ালে সামান্য একটা কালো দাগ পড়লেই সকলে তা আংগুল দিয়ে দেখাবে। কিন্তু রান্না ঘরের মলীন দেওয়ালে যত খুশী কয়লা ঘষে রেখে আসুন। কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাবেনা।

বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জিতার আশ্রয় না নিলে নিরেট সত্য শুধু এতটুকুই যে, আমাদের সমাজের একটা বিরাট সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ সেই সব নামাযী, রোজাযাদার ও হাজী সাহেবদের নিয়ে গঠিত, যারা এই সব ইবাদাত দ্বারা ততটা আত্মশুদ্ধির সুফল পাচ্ছেনা,যতটা পাওয়া প্রকৃত পক্ষে সম্ভব। আর এ ব্যর্থতা একেবারে বিনা কারনে ঘটছেনা। এর পেছনে একটা গুরুত্বপূণ্য কারন রয়েছে। সে কারনটি এইযে, এই সব ইবাদাতের মূল প্রানশক্তি এবং এর কার্য্যকরিতার প্রধান উৎস যে ঈমান,তা অনেকের মনে নিস্তেজ হয়ে গেছে।

আবার ঈমানের নিস্তেজ হওয়ার পেছনেও একটা কারন রয়েছে। সেটি হলো কুরআনের শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা। আল্লাহ ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার জন্য এই কুরআনকেই একমাত্র অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। অথচ সাধারন মুসলমানরা এই কুরআনই বুঝেনা এবং এর শিক্ষাই জানে না। এমতাবস্থায় ঈমান কিভাবে সতেজ ও বিকশিত হবে?

আর একটা জিনিস আমাদের ইবাদাতগুলোর কার্য্যকরিতাকে দুর্বল ও নিস্তেজ করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেটি হলো ধর্ম ও দুনিয়াদারী আলাদা জিনিস এই ভ্রান্ত ধারনা। এটা আসলে জাহেলিয়তের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারনা ছিল। ইসলাম এটিকে সম্পূণরূপে নির্মূল করে দিয়েছিল। কিন্তু জানিনা কিভাবে তা মুসলমানদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ইসলামপূর্ব কালে মানুষ মনে করতো, ধর্ম মানুষের জীবনের অনেকগুলো অংশের একটা অংশ মাত্র। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান,পূজা অর্চনা, ও বিসর্জন ইত্যাদি কেবল স্রষ্টা বা দেবদেবীকে তুষ্ট করা এবং জীবনের বিভিন্ন

কর্মকান্ডে তাদের সাহায্য লাভ করার জন্যই জরুরী। এ সব দায়িত্ব পালন করে মানুষ উপাসনালয়ের বাইরে চলেএলে ধর্মের পক্ষ থেকে তার ওপর আর কোন দায়িত্ব বর্তায়না।তখন সে দুনিয়াবী কাজকর্ম যে ভাবে খুশী চালাতে সম্পূর্ন স্বাধীন। ইসলাম জীবনের এই ভুল সীমানা নির্ধারনকে বাতিল করে দিয়েছে। ধর্মকে জীবনের একটা অংশের জন্য নয়,বরং সমগ্র জীবনের জন্য কার্য্যকর বিধানরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আকিদা বিশ্বাস ও চরিত্রের মধ্যে, ঈমান ও জীবনাচারের মধ্যে, ইবাদাত ও পারস্পরিক লেনদেনের মধ্যে এবং ধর্মীয় কর্মকান্ড ও বৈষয়িক কর্মকান্ডের মধ্যে একটা সুগভীর যোগসূত্র স্থাপন করেছে এবং মানুষের পার্থিব জীবনকেই পুরোপুরি ধর্মীয় জীবনে রূপান্তরিত করেছে। সে বলেছে যে, ধর্ম ইহলৌকিক জীবন থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন কোন জিনিস নয় বরং এই দুনিয়ার কর্মকান্ডেই আল্লাহর আইন ও বিধানের আনুগত্য, তার নির্ধারিত সীমা লংঘন না করা এবং তার সন্তুষ্টি রক্ষা করে চলার নামই ধর্ম। ইবাদাত এবং সামাজিক আচার আচরন,লেনদেন ও সম্পর্ক নির্বাহ করা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয়–বরং সমাজিক আচার আচরনেই আল্লাহর সীমা রক্ষা করা, তার সন্তুষ্টি অন্বেষন করা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করার নাম ইবাদাত। নামায,রোযা হজ্জ ও যাকাতকে ফরয করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, ইবাদাতকে এ কাজ গুলোর মধ্যেই সীমিত করে ফেলতে হবে। বরং প্রকৃত পক্ষে এ কাজগুলো মানুষকে তার সমগ্র জীবনে পরিব্যপ্ত বৃহত্তর ও ব্যাপকতর ইবাদাতের জন্যই প্রস্তুত করে। মুসলমানের উপাসনালয় হলো সমগ্র বিশ্বচরাচর। তার সমগ্র জীবন ব্যাপী ইবাদাতের অবস্থান। তাকে প্রতিমুহূর্তে আল্লাহর অনুগত বান্দা হয়ে থাকতে হবে। তার উপাসনালয় মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মসজিদ তার প্রশিক্ষন ক্ষেত্র। এখানে বসে সে পরিপূর্ন ইবাদাতের যোগ্যতা অর্জন করে।তার নামায,রোযা ও অন্যান্য ইবাদাতের সম্পর্ক যদি তার সমাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সে তার জীবনের কর্মকান্ডে আল্লাহর আইন ও বিধানের আনুগত্য থেকে বেপরোয়া ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায়,তা হলে

কেবল নামায, রোযার আনুষ্ঠানিকতা দ্বারা সে দ্বীনদার ও ধার্মিক বান্দা হতে পারেনা।

পরিতাপের বিষয় যে, ধর্মের এই ব্যাপক ও পূর্নাঙ্গ ধারনা দিন দিন মুসলমানদের মন থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।আর তার বদলে ধর্ম ও দুনিয়াদারীকে আলাদা ভাবার সেই জাহেলী চিন্তাধারা তাদের মনে বদ্ধমূল হচ্ছে, যাকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। আর এই ভ্রান্ত ধারনারই ফল এই যে, ইবাদাত ও পারস্পরিক আবরনের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। বাস্তব জীবনের সাথে নামাযের সম্পর্ক নেই। অর্থনীতির ওপর যাকাতের নিয়ন্ত্রণ বহাল নেই। বছরের এগারো মাস রমযানের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। এমনকি বেচারা রমযান মাস নিজে তার নিজ পরিমন্ডলেও কেবল খাদ্যনালীর দ্বার রক্ষক হয়ে টিকে রয়েছে, হজ্জের মর্যাদা হিন্দু ও খৃষ্টানদের তীর্থযাত্রার (pilgrimage) চেয়ে উন্নত তর অবস্থায় নেই। ফলে এ ভ্রান্ত ধারনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের সাথে অশ্লীলতা,পাপাচার ,নাফরমানী, দুর্নীতি,হারামখোরী ইত্যাদির সহাবস্থান সম্ভব।

তরজমানুল কুরআন, শাবান, ১৩৫৪ হিঃ, নভেম্বর ১৯৩৫।

পাল্টে যায়, তা হলে আজ কুরবানী বন্ধ হলে কাল হজ্বের পালাও না এসে পারবেনা, তা আপনি চান বা না চান।

(তরজমানুল কুরআন, জিলকদ, ১৩৫৫ হিঃ,
মোতাবেক জানুয়ারী, ১৯৩৭)

"কুরবানীর নিগূঢ় তত্ত্বের" স্বরূপ উন্মোচন

পূর্ববর্তী নিবন্ধটি ছাপাখানায় চলে যাওয়ার পর অমৃতসর থেকে প্রকাশিত মাসিক "বালাগ"-এর জিলকদ ১৩৫৫ হিঃ (মোতাবেক জানুয়ারী ১৯৩৭) সংখ্যাটি হস্তগত হয়। এতে জনাব "আরশী" অমৃতসরী "কুরবানীর নিগূঢ় তত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধে নিজের গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশ করেছেন।

বিজ্ঞ নিবন্ধকার "ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটেনিকার" একটি উদ্ধৃতি দিয়ে স্বীয় তত্ত্বানুসন্ধানের সূচনা করেছেন। ঐ উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরবানী সম্পর্কে "আদিম মানুষ"দের" ধ্যান-ধারণা কি ছিল, প্রাচীন গ্রীস ও রোমে কি কি আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে কুরবানী প্রথা চালু ছিল। সেমিটিক ধর্মমতে এ ব্যাপারে ইহুদীদের চিন্তাধারা কি ছিল। "দ্বিতীয় যুগে যখন মানুষ দেবতাদের ব্যাপারে ওয়াকিফহাল হয়, তখন তারা কি কি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে কুরবানীর প্রথা বহাল রেখেছিল, ইহুদী ধর্মযাজকগণ ও গ্রীস দার্শনিকগণ খোদা ও আত্মা সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতেন এবং কুরবানী প্রথার সাথে সেই ধারণার সম্পর্ক কি ধরনের ছিল, প্রাচীন আর্য্য, রোমক ও আরবদের মধ্যে কুরবানীর কি কি রীতি-প্রথা চালু ছিল, অতপর খৃষ্টবাদ কিভাবে কুরবানী বাতিল করলো। বিভিন্ন মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে কিভাবে উচ্ছেদ করলো এবং কিভাবে এই বুদ্ধিদীপ্ত ধারণার প্রসার ঘটালো যে, "দরিদ্রদের দান করা কুরবানীর সমতুল্য" এবং "যে ব্যক্তি দান করে সে যেন নিজের প্রাপ্য প্রশংসা আল্লাহর কাছে উৎসর্গ করলো।" বিংশ শতাব্দীর 'ধর্মগ্রন্থ' সদৃশ উক্ত ইনসাইক্লোপেডিয়া থেকে ভূমিকায় উদ্ধৃত এই বিবরণসমূহ আমাদের জ্ঞানভান্ডারে বহু মূল্যবান তথ্য সংযোজন করে, এ

ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে এই প্রবন্ধে উক্ত তথ্যাবলী সন্নিবেশিত করার হেতু কি, সেটা আমার বুঝে আসেনি।

প্রথমত, এই সমগ্র বিবরণ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন ও অবান্তর। মূল প্রতিপাদ্য বিষয় শুধু এই যে, আল্লাহ ও রসূল (সাঃ) কুরবানীর নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা। যদি প্রমাণিত হয় যে, দেন নি তাহলে ইনসাইক্লোপেডিয়ার সাক্ষ্য একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। আর যদি অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, কুরবানী ইসলামের একটা অকাট্য সুন্নাত বা রীতি এবং তা আল্লাহ ও রসূলের (সাঃ) নির্দেশক্রমে চালু হয়েছে। তাহলে ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটেনিকা এটিকে যতই মূর্খতার কাজ ও কুসংস্কারজনিত প্রথা মনে করুক না কেন, মুসলমানদের তা অনুসরণ ও অনুকরণ করতেই হবে। কেননা আমাদের ইসলামী বিধানের অনুকরণ ও অনুসরণ কোন ইনসাইক্লোপেডিয়ার সমর্থন বা অনুমোদন সাপেক্ষ নয় এবং তা হওয়াও উচিত নয়।

তাছাড়া এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, যারা নিজেদেরকে কুরআনের প্রচারক বলে পরিচয় দেন এবং যারা বড় গলা করে বলেন যে, আমরা কুরআন ছাড়া আর কিছুরই অনুসারী নই, তারা একটা ধর্মীয় বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে কুরআনের বক্তব্য নয় বরং ইউরোপীয় গবেষণাকে সব কিছুর চেয়ে অগ্রগন্য মনে করেন। যদি কুরবানীর ইতিহাস এবং আদিম জাহেলিয়াতের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কেই আলোকপাত করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এ ব্যাপারে খোদ কুরআনেই প্রচুর তথ্য বিদ্যমান ছিল। জাহেলিয়াতের কুরবানী এবং ইসলামের কুরবানীতে প্রভেদ কি তাও কুরআন থেকেই জানার অবকাশ ছিল। কিন্তু জনাব আরশী সাহেব কুরআনকে বাদ দিয়ে ইউরোপীয় গবেষকদের কাছে ধর্ণা দিয়েছেন এবং সবার আগে তাদের কাছেই জানতে চেয়েছেন যে, ১৩শ বছর ধরে যে কুরবানী প্রথা ইসলামে চালু রয়েছে, তার উৎস কোথায় বলে তোমরা গবেষণা করে জানতে পেরেছ? একটা ইসলামী বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে ফিরিঙ্গী চিন্তাবিদদের জ্ঞান ও মতামতকে যে অগ্রাধিকারের সম্মান প্রদান করা হয়েছে, এর কারণ যদি আমি

বলি, তাহলে আমাকে পাল্টা দোষারোপ করা হবে যে, আমি প্রবন্ধকার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করি। তাই জনাব আরশী নিজেই এর কারণ ব্যাখ্যা করলে ভালো হয়। আমি শুধু এতটুকুই বলবো যে, যে "গবেষকদের" চিন্তাধারাকে আপনি কুরবানী তত্ত্বের গবেষণায় সূচনাবিন্দু নির্ধারণ করেছেন, আপনি যদি অনুমতি দেন তা হলে ইসলামের মৌল তত্ত্ব, স্তম্ভসমূহ এমনকি খোদ ইসলাম, নবুয়ত, ওহী ও কুরআন সম্পর্কে তাদের গবেষণা লব্ধ তথ্যসমূহ আমি আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই এবং তার পর আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামের কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনা করতে আপনি রাজী?

এটাও কম আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নয় যে, যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ ও মহান জীবনাদর্শ সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা এবং অন্যান্য সকল হাদীসগ্রন্থের বর্ণনাকে নির্দ্বিধায় অগ্রাহ্য করেন, তাদের সমালোচনার মাপকাঠিতে "আদিম মানব" রোম, গ্রীস এবং সেমিটিক ও আর্য জাতি সম্পর্কে ফিরিঙ্গী গবেষকদের চিন্তাধারা কিভাবে উত্তীর্ণ হয়? অথচ তাদের আমল নবুয়ত যুগের চেয়ে শত শত হাজার হাজার বছর আগেকার। তাদের সম্পর্কে বর্তমানে পৃথিবীতে যে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়, প্রামাণ্যতা ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে, রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ও আদর্শ সংক্রান্ত প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে তার কোন তুলনাই চলে না। যে সব সূত্রের ওপর নির্ভর করে আপনি আদিম জাতিগুলোর অবস্থা সম্পর্কে বিজ্ঞের মত বক্তব্য দিচ্ছেন তার মধ্য থেকে যে সূত্রটি সবচেয়ে প্রামাণ্য ও বিশ্বস্ত বলে মনে করা হয়, সেটিও ইবনে মাজা, হাকেম ও বায়হাকী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থের দুর্বলতম বর্ণনার সমকক্ষ নয়। এমতাবস্থায় আপনি যখন সেই সব সূত্রের ওপর নির্ভর করে যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং তদনুসারে আমাদেরকে তথ্য সরবরাহ করেন যে, 'আদিম মানুষ' এরূপ আচরণ করতো, সেমিটিক ধর্ম মতে এরূপ আকীদা-বিশ্বাসের প্রচলন ছিল এবং রোমক ও গ্রীকরা এরূপ ধ্যান-ধারণা পোষণ করতো, তখন আমাদেরও বুখারী-মুসলিমের বরাত দিয়ে

বলার অধিকার রয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ এরূপ ছিল এবং অমুক বিষয়ে তিনি অমুক নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেটি যদি আপনারা মানতে না চান তাহলে আমরা আপনাদেরকে শুধু এতটুকু জিজ্ঞাসা করবে যে,

أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ؟

"আপনাদের মধ্যে কি একজনও বিবেকবান মানুষ অবশিষ্ট নেই?

কুরবানী সম্পর্কে ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটেনিকার" তথ্যাবলির আলোকে বিজ্ঞ প্রবন্ধকার যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা এই যে "সভ্যতার অগ্রগতি ও বিকাশ থেকে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কুরবানী একটা অবাঞ্ছিত ব্যাপার।"

এ উক্তিটির তাৎপর্য সম্ভবত এটাই যে, কুরবানী আসলে তো একটা অবাঞ্ছিত জিনিসই ছিল। কিন্তু প্রাচীনকালে অজ্ঞতার কারণে মানুষের এ কথা জানা ছিল না। এখন যেহেতু সভ্যতার অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তাই তার অবাঞ্ছিত হওয়াটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। আরশী সাহেবের এ উক্তিটা নজরে রাখুন এবং তার পর সূরা হজ্জের এ আয়াতটিও লক্ষ্য করুন, যাতে বলা হয়েছেঃ

"কুরবানীর উটগুলোকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করেছি। তোমাদের জন্য ওগুলোতে কল্যাণ নিহিত। কাজেই তোমরা ওগুলোকে লাইনে দাঁড় করিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে যবাই কর। অতপর তা যখন একদিকে ঢলে পড়বে, তখন তা থেকে নিজেরাও খাও এবং স্বচ্ছল ও গরীবদেরকেও খাওয়াও।"

আল্লাহ যাকে সামান্যতম বিবেক বুদ্ধিও দিয়েছেন, সে এক নজরেই অনুধাবন করবে যে, উক্ত দুটো উক্তি পরস্পরের সাথে সংঘর্ষশীল। সূরা হজ্জে যে জিনিসকে আল্লাহর নিদর্শন বলা হয়েছে এবং যে কাজকে একটা মহৎ কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, আরশী সাহেবের উক্তিতে তাকেই একটা অবাঞ্ছিত ও অপছন্দনীয়

ব্যাপার বলা হয়েছে এবং এ কথাও আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, একে মহৎ কাজ মনে করার ধারণাটা তৎকালীন অনগ্রসর ও জাহেলিয়াতদুষ্ট সমাজেই বিরাজ করতো। আপাতত এ প্রশ্ন বিবেচনার বাইরে রাখুন যে, কুরবানী ওয়াজিব কি না, সকল গ্রাম ও শহরে তা করা উচিত না শুধু মিনাতে এবং কুরবানী করাই ভাল, না তার বদলে কিছু দান করাই ভাল। প্রশ্ন এই যে, কুরআন থেকে কোন ভাবেও যদি কুরবানীর নির্দেশ অথবা অনুমতির প্রমাণ পাওয়া যায় এবং কুরআনে এ কাজকে যদি কিছুমাত্র কল্যাণ ও মঙ্গলজনক বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে, তাহলেও কি কুরআনকে সভ্যতার একটা অনগ্রসর পশ্চাতপদ স্তরের গ্রন্থ বলে নিন্দিত করা হচ্ছে না? এর পর একে কি আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করা যাবে, না বিশ শতকের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অসভ্য ৬ষ্ঠ শতকের একজন মানুষের রচিত গ্রন্থ হিসেবে?

কুরআনের আগে ''ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটেনিকার" কাছে ধরণা দেয়ার ফলেই এ অবস্থার সৃষ্টি। যে বিন্দু থেকে আপনি নিজের গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেছেন এবং যে কয়টি সর্বস্বীকৃত মূলনীতিকে সম্বল করে আপনি কুরবানী তত্ত্বের চুল চেরা বিচার-বিশ্লেষণের পথে যাত্রা করেছিলেন, তা প্রথম পদক্ষেপেই পদস্খলন ঘটিয়ে আপনাকে পথচ্যুত করে ফেলেছে। এর যৌক্তিক পরিণতি এটাই হওয়ার কথা যে, কুরআন যে আল্লাহর কিতাব সে কথা আপনার অস্বীকার করা উচিত। কিন্তু যেহেতু আপনার বুদ্ধিবৃত্তির বিরুদ্ধে আপনার বিবেক আপনাকে এই মহিমান্বিত কিতাবের ওপর ঈমান রাখতে চাপ দিচ্ছে, তাই আপনি উক্ত যৌক্তিক পরিণতি পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করছেন। আর সে জন্যই কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আপনি এত ইনিয়ে বিনিয়ে করার চেষ্টা করছেন, যার ফলে তা কুরআনকে বিকৃত করার শামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই গোজামিলের ব্যাখ্যার মাধ্যমে আপনি প্রমাণ করতে চাইছেন যে, কুরআন আদৌ কুরবানীর হুকুম দেয়নি। অথচ আপনার স্বীকৃত মূলনীতি অনুসারে কুরআনের বিরুদ্ধে যে অপবাদ আরোপিত হয় (কুরবানীর হুকুম না দেয়ার অপবাদ) সেটা এই গোজামিলের

ব্যাখ্যা দ্বারা কিছুটা হালকা হলেও একেবারে দূর হয় না। কুরআন যদি সুস্পষ্টভাবে ও দ্ব্যর্থহীনভাবে কুরবানী দিতে নিষেধ করতো, কেবল তা হলেই সে অপবাদ থেকে অব্যাহতি পেতে পারতো।

কোন মানুষ যখন একটা বিধিব্যবস্থার অধীন থাকতেও চায়, আবার চিন্তা ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে তা থেকে বিচ্যুতও হয়ে যায়, তখন সে একটা বিদঘুটে অবস্থায় পতিত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে উক্ত বিধিব্যবস্থার প্রতিটি জিনিসই তার মেজারের সাথে বেমানান ও বেখাপ্পা লাগে। এ জন্য সে তার প্রতিটি উপাদানকে ধ্বংস করে সম্পূর্ণ নতুন করে ঐ বিধিব্যবস্থা নির্মাণে সচেষ্ট হয়। কিন্তু সে যে, জিনিসটার আসল কাঠামো ধ্বংস করে নিজেই নতুনভাবে তৈরী করেছে, সে রহস্য কেউ জেনে ফেলুক এটাও তার মনোপুত হয় না। তাই পদে পদে তাকে প্রয়োগ করতে হয় মনগড়া ব্যাখ্যা, ওলট-পালট ও হেরফের, কৃত্রিম ও বানোয়াট বাগাড়ম্বর, যুক্তির মারপ্যাচ, প্রতারণা ও ধোকাবাজির কারসাজি। আরশী সাহেব যদি কিছু মনে না করেন তবে আমি বলবো, বর্তমানে তিনি ঠিক এ ধরনেরই একটি উভয় সংকটে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে। কুরবানী সম্পর্কে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেছেন তা ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নয়। কুরআন, হাদীস, তফসীর, ফেকাহ এবং আবহমানকাল ধরে পালিত ও অনুসৃত বিশ্বজনিন মুসলিম রীতি ও কার্যধারা (সুন্নাতে মুতাওয়াতেরা) অনুসারে কুরবানী একটা ইবাদতের মর্যাদা রাখে। একটা কল্যাণকর ও পূন্যময় কাজ হিসেবে এটা পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং পালন করার নিয়মবিধিও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এর ঠিক বিপরীত আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আপনার কাছে একটা অবাঞ্ছিত ব্যাপার, মূর্খতা এবং সভ্যতার অগ্রগতির কারণে ধিকৃত। তখন আপনি আবদার ধরছেন যে, আপনার এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে যাক এবং সে অনুসারেই সকল বিধিমালা পুনর্গঠিত হোক। কিন্তু সাড়ে তেরোশ' বছর ধরে ইসলাম যে বিপুল বই কিতাবের ভান্ডার গড়ে তুলেছে, তা আগাগোড়া আপনার আবদারের পরিপন্থী তথ্যে ও বক্তব্যে ভরপুর। এমনকি কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্যও আপনার এ

মতলবসিদ্ধির প্রতিবন্ধক। আপনি "চিরাচরিত সুন্নাতকে" "চিরাচরিত মূর্খতা" বলে এড়িয়ে যাবেন, হাদীস, ফেকাহ ও তাফসীরের বিশাল পুস্তক ভান্ডারকেও হয়তোবা ভূয়া বলে পাশ কাটিয়ে যাবেন। কিন্তু কুরআনের অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন আয়াতগুলোর কি ওষুধ আছে আপনার কাছে? কত শব্দার্থের হেরফের করবেন? বক্তব্যকে কতইবা ওলট–পালট করবেন? আল্লাহর বাণীতে নিজের মনোভাব ঢুকিয়ে কত আর পার পাবেন?

এ ক্ষেত্রে আরশী সাহেব কুরআনের ভাবগত বিকৃতির যে ভয়ংকর চেষ্টা চালিয়েছেন তার মাত্র দুটো নমুনা তুলে ধরছি। হয়তো বা আমাদের এই বিপথগামী ভাইটি এবং তার সমমনা লোকেরা এই ত্রুটি বুঝতে পেরে শুধরে যাওয়ার সুযোগ পাবেন।

কুরআনে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বপ্নযোগে নিজের একমাত্র ছেলেকে যবাই করার ইংগিত পেয়েছিলেন। ইংগিত মোতাবেক তিনি সত্যি সত্যি ছেলেকে যবাই করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। নিজের কলিজার টুকরাকে চিত করে শুইয়ে দিয়ে যেই তিনি গলায় ছুরি চালাতে উদ্যত হয়েছেন, অমনি আল্লাহ বললেনঃ

يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (صافات: ١٠٥-١٠٦)

"হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা একটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল" (সাফফাত–১০৫, ১০৬)।

এ ঘটনার সরল অর্থ যে কোন বুদ্ধিমান মানুষের কাছে প্রথম নজরেই বোধ্যগম্য। ব্যাপারটা ছিল এই যে, আল্লাহ তার প্রিয় বন্ধুকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তাই ছেলেকে যবাই করার জন্য খোলাখুলি আদেশ দেননি। কেবল স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যেন তিনি নিজের কলিজার টুকরাকে যবাই করছেন। যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর প্রেমের খাতিরে অন্য যে কোন প্রেম–প্রীতি বা

স্নেহ–মমতাকে বিসর্জন দেয়ার প্রেরণা ও মনোবলের অধিকারী ছিলেন, তাই তিনি নিজের পরম প্রিয় খোদার এই ক্ষীণ ও অস্পষ্ট ইশারাতেই ছেলেকে যবাই করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এই প্রস্তুত হয়ে যাওয়াটাই ছিল আসল কুরবানী। এটা যখন সম্পন্ন হলো, তখন আল্লাহ ছেলের রক্ত প্রবাহিত করা থেকে তাকে নিবৃত্ত করলেন এবং এর বদলায় একটা বিকল্প "সুমহান কুরবানীযোগ্য প্রাণী" এনে যবাই করিয়ে দিলেন।

চিন্তা করে দেখুন, এটা কত বড় তাৎপর্যবহ একটা ঘটনা। আলে ইমরানের ৯২ আয়াত لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (তোমরা কিছুতেই পূন্যবান হতে পারবে না যতক্ষণ না নিজের প্রিয় জিনিস ব্যয় করবে) এর মর্ম কি চমৎকারভাবে এ ঘটনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু আরশী সাহেব ও তার সমমনারা নিছক "কুরবানীর" বিরোধিতার খাতিরে এমন শিক্ষাপ্রদ ঘটনাকে কিভাবে বিকৃত করেন তাও দেখুন। তাদের ব্যাখ্যা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) আসলে স্বপ্নের মর্মটাই ভুল বুঝছেন। তিনি ঈমানী ভাবাবেগে অবশ্যই উজ্জীবিত ছিলেন এবং সেটা "প্রেমাবেগের উম্মাদনার" পর্যায়ে ছিল। কিন্তু বুঝ অতটুকুও ছিল না, যতটুকু আরশী সাহেব ও মৌলবী আহমদদ্দীন মরহুমের ভাগ্যে উপচে পড়েছে। তিনি স্বপ্নের মর্ম এই মনে করে বসলেন যে, ছেলেকে যবাই করতে হবে। অথচ আসলে আল্লাহ যবাই করতে দেখিয়ে এ কথাই বুঝিয়েছিলেন যে, এই ছেলের ব্যাপারে যাবতীয় দুনিয়াবী আশা–আকাংখা ত্যাগ করে তাকে আল্লাহর দীনের খিদমতের মহান কাজে নিয়োজিত কর। তাই তিনি যখন ছেলেকে চিত করে শুইয়ে দিয়ে একটা ক্ষতিকর ভুল করতে উদ্যত হলেন, তখন আল্লাহ তাকে সাবধান করে দিলেন এবং মহত্তর কুরবানীর (অর্থাৎ ছেলেকে ইসলামের কাজে উৎসর্গ করার) নির্দেশ দিলেন।

এই মনগড়া ব্যাখ্যার পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল এটা যে, আল্লাহ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا (তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়ে দিলে) বলে নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বপ্নের নির্ভুল মর্মই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু

তাফসীরকার এই বাধা অপসারণের জন্য এই আয়াতটুকুর অনুবাদে অতি ক্ষুদ্র একটা বিকৃতি ঘটালেন। কথাটার শাব্দিক অনুবাদ ছিল এরূপঃ "তিনি স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়ে দিলেন।" আরশী সাহেব-এর অনুবাদ করলেন এভাবেঃ "তুমিতো স্বপ্নকে সত্য করে দেখালে।" পাঠক, লক্ষ্য করুন যে, একটি ক্ষুদ্র শব্দ "তো" আয়াতের মর্মকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেছে। যে উক্তিটি ছিল স্বীকৃতিবাচক তা হয়ে গেল ব্যংগাত্মক ও বিদ্রুপাত্মক। এতে করে পরবর্তী উক্তি إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।) যদি অর্থহীন হয়ে পড়ে তবে তাতে আরশী সাহেবের কিছু আসে যায় না। এ ব্যাখ্যা অনুসারে পরবর্তী আয়াত إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এই গোটা ঘটনাটা নিছক হযরত ইবরাহীমের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা ছিল যে, তিনি স্বপ্নের মর্ম সঠিকভাবে বুঝতে পারেন কি না। দুঃখের বিষয় যে, বেচারা এ পরীক্ষায় শোচনীয়ভাবে অকৃতকার্য হন।

পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, একটা ক্ষুদ্র বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বাঁকা হয়ে যাওয়ায় কিভাবে বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কুরআন বুঝার পথ মানুষের রুদ্ধ হয়ে যায়। যে ঘটনা ছিল হযরত ইবরাহীমের (আঃ) এক অসাধারণ কীর্তি, তা এখন তার ভ্রান্তি হিসেবে চিহ্নিত হলো। যে ঘটনাকে মুসলমানদের কাছে এই উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা এর মাধ্যমে ইসলামের নিগূঢ়তম মর্ম ও এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা উপলব্ধি করার এবং নিজেদের মধ্যে ত্যাগ, কুরবানী ও খোদা প্রেমের জযবা সৃষ্টি করুক, তার উদ্দেশ্যকে একেবারেই বানচাল করে দেয়া হয়েছে। তার উজ্জীবনী শক্তি নিঃশেষ করে দেয়া হয়েছে। উপরন্তু অপব্যাখ্যা দ্বারা দ্বারা এ ঘটনাকে এই মর্মে সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে যে, বড় বড় মর্যাদাবান নবীরা পর্যন্ত আল্লাহর ইংগিত বুঝতে পারেননি। বরং এ দুর্লভ বোধশক্তি পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন বিংশ শতাব্দীর একজন তথাকথিত 'রহস্যবিশ্লেষক।"

এবার দ্বিতীয় নমুনাটা দেখুন। সূরা হজ্জে আল্লাহ বলেনঃ

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا
رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ (الحج: ٣٤)

আয়াতটির শব্দার্থ এ রকমঃ

"প্রত্যেক উম্মাতের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি ইবাদতের একটা পদ্ধতি, যাতে করে তারা আল্লাহ্ তাদের যে সব চতুষ্পদ জন্তু দান করেছেন, তার ওপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে" (আয়াত-৩৪)।

এই উক্তি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করছে যে, কুরবানী একটা ইবাদাত এবং এ পদ্ধতিটা আল্লাহ্ কতৃক নির্ধারিত।

কিন্তু আরশী সাহেব এ আয়াতের অনুবাদ করেন এভাবেঃ

"আমি প্রত্যেক উম্মাতের জন্য ইবাদাতের নিয়ম-কানুন স্থির করে দিয়েছি যে, তারা আমার দেয়া চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু যদি যবাই করে তবে যেন আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে।"

লক্ষ্য করুন, "যদি যবাই করে তবে" কথাটা বলে কিভাবে আয়াতের অর্থ ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে। এর ফলে আয়াতের মর্ম দাঁড়ালো এই যে, কসাইখানায় প্রতিদিন আমাদের যে হাজার হাজার গরু-ছাগল কসাইদের হাতে যবাই হয় এবং যবাই-এর সময় "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর" পড়া হয়, এটাই সেই 'ইবাদাতের নিয়ম-কানুন' যা আল্লাহ্ প্রত্যেক উম্মতের জন্য স্থির করেছেন। বিকৃতকরণের এ সব অপচেষ্টা দেখে বুঝা যায় যে, কুরআনকে শাব্দিকভাবে সংরক্ষণ করে আল্লাহ্ আমাদের ওপর কত বড় অনুগ্রহ করেছেন। তা না হলে হয়তো বা ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটেনিকার সাহায্য নিয়ে এ যুগে কয়েকটা নতুন কুরআনই রচনা করে ফেলা হতো।

আরশী সাহেব কুরবানীর নির্দেশ সম্বলিত প্রায় সব ক'টি আয়াতেরই এরূপ অপব্যাখ্যা করেছেন। তাছাড়া ফিকাহ্ শাস্ত্রীয় বিধিসমূহের এমন সব উদ্ভট ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা দেখে স্পষ্টতই

বুঝা যায় যে, তিনি আসল বিধিসমূহকে বুঝবার চেষ্টা করেননি। বরং হাদীস–তাফসীর ও ফিকাহর কিতাবাদি যত ঘাটাঘাটিই করে থাকুন, তার একটাই উদ্দেশ্য ছিল। সেটি হলো, কুরবানীর সমর্থনে যদি পর্বত প্রমাণ শক্তিশালী কোন প্রমাণও চোখে পড়ে, তবুও তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না। আর তার বিপক্ষে যদি চুল পরিমাণও কিছু নজরে আসে, তবে তা সরলপ্রাণ মুসলমানদের সামনে পাহাড়ের মত বিরাট আকারে তুলে ধরবেন। কেননা মূল উৎস তাদের নাগালের বাইরে। আর যে সব দলীল–প্রমাণকে তিনি বড় করে দেখান, তার বাস্তবতা কতটুকু, তা নির্ণয়ের ক্ষমতাও তাদের নেই। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, যেখানে আলোচনার এমন অদ্ভুত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় এবং যেখানে গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের এরূপ নীচু মান বহাল রাখা হয়, সেখানে যথার্থ তাত্ত্বিক আলোচনার কোন অবকাশ থাকতে পারেনা। তিনি চাইলে তার প্রত্যেকটা ভ্রান্তির রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব। কিন্তু যতক্ষণ তিনি নিজের মানসিকতা ও চিন্তা–পদ্ধতি শুধরে নিতে প্রস্তুত না হন, ততক্ষণ তার ভ্রান্তি উন্মোচন করে কোন লাভ হবে না।

(তরজমানুল কুরআন, জিলকদ ১৩৫৫ হিঃ
মোতাবেক জানুয়ারী, ১৯৩৭)

ইসলামী শরীয়তে কুরবানীর গুরুত্ব ও মর্যাদা

ইদানীং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এই মর্মে বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার চালানো হচ্ছে যে, ইসলামে কুরবানী করার কোন আদেশ নেই। এটা নিছক মোল্লা–মৌলবীদের উদ্ভাবিত একটা প্রথা মাত্র। আর এই "বেহুদা" প্রথা উদযাপনে টাকা নষ্ট করার চেয়ে এই টাকা কোন সামাজিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যয় করাই শ্রেয়। কয়েক বছর আগে হাদীস বিরোধী কতিপয় ব্যক্তি এই চিন্তাধারা প্রচার করতে শুরু করে। সেই সময়েই আমি মাসিক তরজমানুল কুরআনে কুরআন ও হাদীসের বরাত এবং যুক্তি দ্বারা বিশদভাবে তা খন্ডন করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, পাকিস্তানে এই বিভ্রান্তি পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এ জন্য এ সম্পর্কে ইসলামের বিধান সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা জরুরী মনে করছি, যাতে করে নিছক অজ্ঞতার কারণে কেউ এই বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে না পড়ে।

কুরবানী সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ

সর্ব প্রথম আমাদের দেখতে হবে কুরবানী সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য কি? এটা কি তার মতে শুধু হজ্জ ও হজ্জ সংক্রান্ত কার্যকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ, না অন্যান্য পরিস্থিতিতেও সে কুরবানীর নির্দেশ দেয়। এ ব্যাপারে দুটো আয়াত অত্যন্ত অকাট্য ও স্পষ্ট। এ দুটো আয়াতের হজ্জের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। প্রথম আয়াত সূরা আনয়ামের শেষ রুকূতে রয়েছেঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

"হে নবী! তুমি বল! আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছুই বিশ্বপ্রভু আল্লাহর জন্য নিবেদিত, যার কোন শরীক নেই। আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমিই সবার আগে আনুগত্যকারী।"

এ আয়াত মক্কায় নাজিল হয়েছিল। এ সময় হজ্জও ফরয হয়নি, হজ্জের নিয়ম-বিধিও প্রবর্তিত হয়নি। আর এ নির্দেশ দ্বারা যে হজ্জের সময়কার কুরবানী বুঝানো হয়েছে, তেমন কোন ইংগিতও এতে নেই। এ আয়াতে যে 'নুসুক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা স্বয়ং কুরআনের অন্য জায়গায় কুরবানী অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ
صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (البقرة-١٩٦)

"তোমাদের কেউ যদি হজ্জের সফরে রুগ্ন হয়ে পড়ে অথবা তার মাথায় কোন যন্ত্রণা থাকে, তাহলে সে যেন ফিদিয়া স্বরূপ রোযা রাখে অথবা সদকা দেয় অথবা কুরবানী করে" (বাকারা-১৯৬)।

এ থেকে জানা গেল যে, সূরা আনয়ামের উপরোক্ত আয়াতেও নুসুকের অর্থ কুরবানী। তথাপি যদি একে সাধারণ ইবাদাত অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহলেও কুরবানীকে তার অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেয়া হবে।

দ্বিতীয় আয়াত রয়েছে সূরা কাওসারেঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
"অতএব তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর" (আয়াত-২)।

এ আয়াতও মক্কী। এতেও এমন কোন ইংগিত বা প্রেক্ষিতগত সাক্ষ্য-প্রমাণ এমন নেই যার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, কুরবানীর এ নির্দেশ হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট। এ কথা সত্য যে, আরব ভাষাবিদরা 'নাহর' শব্দের অর্থ বুকে হাত বাঁধা, কিবলামুখী হওয়া এবং ওয়াক্তের প্রথমভাগে নামায পড়াও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ সব হলো দূরবর্তী অর্থ। সর্ব শ্রেণীর মানুষের বোধগম্য

প্রচলিত আরবী ভাষায় এ শব্দটি কুরবানী অর্থেই গৃহীত হয়ে থাকে। 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে আল্লামা জাসসাস লেখেনঃ

"যারা এ শব্দটির অর্থ উট যবাই করা বলেছেন, তাদের কথাই সঠিক। কেননা এ শব্দের প্রকৃত মর্ম এটাই। 'নাহর' শব্দটা শুনে একজন সাধারণ আরব এই অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থ বুঝবে না। যদি বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি আজ 'নাহর' করেছে তবে সকলে তার এই অর্থই বুঝবে যে, সে উট যবাই করেছে। এটা কেউ বুঝবে না যে, সে বাম হাতের ওপর ডান হাত বেঁধেছে" (তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৫৮৫)।

বস্তুত এ কারণেই কুরআনের সকল অনুবাদক শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব, শাহ রফীউদ্দীন সাহেব, শাহ আব্দুল কাদের সাহেব, মওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব, মওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব, ডেপুটি নাজির আহমদ সাহেব প্রমুখ সর্বসম্মতভাবে এ শব্দের অনুবাদ কুরবানীই করেছেন।

কুরবানী সম্পর্কে হাদীসের নির্দেশ

এখন আমাদের দেখতে হবে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নির্দেশের কিরূপ মর্ম উপলব্ধি করেছেন এবং সে অনুসারে কি কাজ করেছেন। তিনি কি শুধু হজ্জের সময়ই কুরবানী করতেন, না মদীনাতেও তিনি ঈদুল আযহার সময় কুরবানী করতেন? আর বকরা ঈদের সময়ে তিনি কি কেবল মাঝে মধ্যে কুরবানী করতেন, না সব সময় করতেন? তিনি কি শুধু নিজেই কুরবানী করেছেন না মুসলমানদেরকেও তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে যে ক'টি প্রামাণ্য ও বিশুদ্ধ হাদীস আমাদের কাছে পৌছেছে, তা অবিকল এখানে উদ্ধৃত করছিঃ

(১) عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ
اَوَّلَ مَا نَبْدَاُ بِهِ فِيْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُّصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ مَنْ

فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ
لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ۔

(٢) وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ
سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ۔ (بخاری۔ کتاب الضحایا)

বারা বিন আযেব বর্ণনা করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ সর্ব প্রথম যে কাজটি দিয়ে আমরা আজকের দিনের সূচনা করি, তা হলো এই যে, আমরা নামায পড়ি, তার পর ফিরে গিয়ে কুরবানী করি।[১] যে ব্যক্তি এভাবে কাজ করে সে আমাদের নীতিই বাস্তবায়িত করে, আর যে ব্যক্তি নামাযের আগে যবাই করে, তার ঐ কাজটি কুরবানী বলে গণ্য হবে না, বরং ওটা হবে কেবল পরিবার পরিজনকে গোশত খাওয়ানো।"

অপর রেওয়াতে বলা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি নামাযের পর কুরবানী করে তার কুরবানী পূর্ণাঙ্গ হয় এবং সে মুসলমানদের নীতির অনুসারী রূপে পরিগণিত হয়" (বুখারী, কুরবানী অধ্যায়)।

এই হাদীস যে বকরা ঈদ সংক্রান্ত এবং হজ্জের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, তা সুস্পষ্ট। কেননা হজ্জে এমন কোন বিশেষ নামায নেই, যার আগে কুরবানী করলে তা মুসলমানদের সুন্নাত বা নীতির পরিপন্থী এবং পরে কুরবানী করা সুন্নাতের সাথে সংগতিশীল।

(٣) قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا
نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ۔
(بخاری۔ کتاب الاضاحی)

---

১. স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, এ হাদীস অবিকল উপরোক্ত আয়াত দুটোর তাফসীর, যাতে প্রথমে নামায ও পরে কুরবানীর উল্লেখ রয়েছে। রসূল (সঃ) হুবহু কুরআনের নির্দেশ অনুসারেই প্রথমে নামায ও পরে কুরবানীর নিয়ম ধার্য করেছেন।

"ইয়াহিয়া বিন সাঈদ বলেন যে, আমি আবূ উসামা বিন সাহল আনসারীর কাছে শুনেছি, তিনি বলতেনঃ আমরা মদীনায় কুরবানীর জন্তুকে খুব করে খাইয়ে–দাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট করতাম। সাধারণ মুসলমানদেরও অনুরূপ রেওয়াজ ছিল" (বুখারী–কুরবানী অধ্যায়)।

(৪) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ وَاَنَا اُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ - (بخاری-کتاب الاضاحی)

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ খাদিম আনাস বিন মালেক বলেন যে, হুজুর (সঃ) দুটো ভেড়া কুরবানী করতেন আর আমিও দুটো ভেড়া কুরবানী করতাম" (বুখারী, কুরবানী অধ্যায়)।

(৫) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الْاَضْحِيَةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنُقَدِّمُ بِهِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ (بخاری-کتاب الاضاحی)

"হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা মদীনায় কুরবানীর গোশতে লবণ মেখে রেখে দিতাম, অতপর তা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিতাম" (বুখারী, কুরবানী অধ্যায়)।

(৬) عَنْ اَبِيْ عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ اَزْهَرَ اَنَّهُ شَهِدَ الْعِيْدَ يَوْمَ الْاَضْحٰى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هٰذَيْنِ الْعِيْدَيْنِ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيَوْمٌ تَاْكُلُوْنَ مِنْ نُسُكِكُمْ - (بخاری-کتاب الاضاحی)

"ইবনে আযহারের সাবেক গোলাম আবূ ওবায়েদ জানান যে, তিনি বকরা ঈদের দিন হযরত ওমরের (রাঃ) সাথে নামায পড়েছেন। তিনি প্রথমে নামায পড়ালেন। অতপর খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন! "হে জনমন্ডলী! রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে দুই ঈদে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। এর মধ্যে একটা ঈদ হলো তোমাদের রোযা খোলার দিন। আর দ্বিতীয়টা হলো তোমাদের কুরবানীর গোশত খাওয়ার দিন" (বুখারী, কুরবানী অধ্যায়)।

প্রসঙ্গত জানা প্রয়োজন যে, হজ্জে বকরা ঈদের নামাযই নেই। সুতরাং হযরত ওমরের (রাঃ) এ ভাষণ যে মদীনাতেই দেয়া হয়েছিল এবং বকরা ঈদের কুরবানী সম্পর্কে তিনি যে বিধি বর্ণনা করেছেন তা যে হজ্জের ক্ষেত্র মক্কার বাইরের স্থানগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট , সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

(٧) قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ صَلَّى
بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ فَتَقَدَّمَ
رِجَالٌ فَنَحَرُوا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَحَرَ
فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ
بِنَحْرٍ آخَرَ وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(مسلم باب وقت الاضحيه)

"আবূ যোবাইর বলেন আমি জাবের বিন আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর দিন মদীনায় আমাদের নামায পড়ালেন। অতপর কিছু লোক রসূল (সাঃ) কুরবানী করেছেন মনে করে নিজেদের জন্তু কুরবানী করে দিল। এতে রসূল (সাঃ) নির্দেশ দিলেন যে, যে ব্যক্তি আমার আগে কুরবানী করেছে সে যেন আর একটা কুরবানী করে এবং ভবিষ্যতে আমি কুরবনী করার আগে কেউ যেন কুরবানী না করে (মুসলিম–কুরবনীর সময় সংক্রান্ত অধ্যায়)।

(٨) عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عِيدَ الْأَضْحَى فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ فَقَالَ بِسْمِ
اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

"হযরত জাবের (রাঃ) বলেনঃ আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বকরা ঈদের নামায পড়েছিলাম। তিনি নামায শেষে যখন পেছনে ঘুরলেন, অমনি তাঁর কাছে একটা ভেড়া হাজির করা হলো। তিনি সেটা জবাই করার সময় বললেনঃ আল্লাহর নামে এবং আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ ! এ কুরবানী আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মতের যারা কুরবানী করেনি তাদের পক্ষ থেকে" (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)।

(৯) عن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية - (مسند احمد)

আলী বিন হোসাইন (রাঃ) আবু রাফে থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বকরা ঈদের সময় দুটো ভেড়া কিনতেন। ভেড়া দুটো খুব মোটা-তাজা, নাদুস-নুদস ও বড় শিংধারী হতো। নামায ও খুতবা শেষ হলে তাঁর কাছে একটা ভেড়া আনা হতো এবং তিনি নামাযের জায়গায় দাঁড়িয়ে তা জবাই করতেন" (মুসনাদে আহমদ)।

(১০) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا (مسند احمد - ابن ماجه)

"আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, রসূল (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদগায় না আসে" (মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজা)।

(১১) عن ابن عمر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي (ترمذي)

"ইবনে ওমর বলেনঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশ বছর মদীনায় অবস্থান করেন এবং সব সময়ই কুরবানী করতে থাকেন" (তিরমিযী)।

উল্লিখিত এগারোটি হাদীস বিভিন্ন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং ছয়টি বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল (সাঃ) কুরআনের উপরোক্ত নির্দেশসমূহের মর্ম এটাই বুঝেছেন যে, কুরবানী শুধু হাজীদের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের নিজ নিজ অবস্থানে থেকে বকরা ঈদের সময় কুরবানী করতে হবে। রসূল (সাঃ) নিজেও এই বিধি অনুসারে কাজ করে গেছেন, আর অন্যান্য মুসলমানদেরকে করতে বলেছেন এবং ইসলামের একটা চিরস্থায়ী বিধান হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে চালু করেছেন।

মুসলিম ফিকাহবিদগণের রায়

কুরআন ও হাদীসের এই সব অকাট্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে মুসলিম ফকীহগণ বকরা ঈদের কুরবানী সম্পর্কে সর্ব সম্মতভাবে রায় দিয়েছেন যে, এটা শরীয়তের একটা বিধিবদ্ধ কাজ এবং ইসলামের একটা চিরস্থায়ী সুন্নাত বা রীতি। দ্বিমত যদি কিছু থেকে থাকে তবে সেটা কেবল এই মর্মে যে, এটা ওয়াজেব কি না। কিন্তু এটা যে একটা শরীয়ত সম্মত কাজ এবং সুন্নাত, সে ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে ফকীহগণের বিভিন্ন মতামতের সংক্ষিপ্ত সার এভাবে বর্ণনা করেছেন;

"বকরা ঈদের কুরবানী যে শরীয়তের বিধিবদ্ধ একটা কাজ সে ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। শাফেয়ী ও অধিকাংশ ফকীহর মতে এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিফায়া। শাফেয়ীদের অপর একটি মত হলো, এটা ফরযে কিফায়া। ইমাম আবূ হানিফার মতে নিজ আবাসিক এলাকায় অবস্থানরত স্বচ্ছল লোকের ওপর এটা ওয়াজেব। একটি বর্ণনা মোতাবেক ইমাম মালিকের মতও তদ্রুপ। তবে তিনি প্রবাসীর ক্ষেত্রেও এই বিধি প্রযোজ্য মনে করেন। ইমাম আওযায়ী, রবিয়া এবং লায়েসের মতও অনুরূপ। হানাফীদের মধ্য থেকে ইমাম আবূ ইউসুফ এবং মালিকীদের মধ্য থেকে আশহাব সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারী। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মত

সক্ষম লোকের পক্ষে কুরবানী না করা মাকরূহ। অপর বর্ণনা মোতাবেক তাঁর মতে কুরবানী ওয়াজেব। ইমাম মুহাম্মদ বলেন, কুরবানী একটা অপরিহার্য সুন্নাত" (দশম খন্ড, পৃঃ ২)।

এ থেকে বুঝা গেল যে, কুরবানী সুন্নাত ও শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত কাজ হওয়া সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহ শুরু থেকে এ যাবত সর্বদা একমত রয়েছে এবং কখনো মতভেদ দেখা দেয়নি।

মুসলিম উম্মাহর চিরন্তন রীতি (সুন্নাতে মুতাওয়াতেরা)

কুরবানী যে সুন্নাত এবং শরীয়তের অংগীভূত, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের প্রতিটি প্রজন্ম ক্রমাগতভাবে এটা পালন করে আসছে। দু'চারজন বা পাঁচ দশজন নয়, বরং প্রতিটি বংশধরের লক্ষ কোটি মুসলমান পূর্ববর্তী বংশধরের লক্ষ কোটি মুসলমানের কাছ থেকে এই বিধি গ্রহণ ও রপ্ত করেছে এবং প্রত্যেক অধোস্তন বংশধরের লক্ষ কোটি মুসলমনের কাছে তা হস্তান্তর করেছে। যদি এমন হতো যে, ইসলামের ইতিহাসের কোন একটা স্তরে কোন ব্যক্তি এটা উদ্ভাবন করে শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চালিয়েছে তা হলে কিছুতেই সকল মুসলমান একমত হয়ে তা গ্রহণ করতে পারতো না এবং কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও এর সমালোচনা না করে পারতো না। আর কোন ব্যক্তি কবে কোথায় বসে এই অভিনব রীতিটা উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করলো, সেটা একেবারে ইতিহাসের চোখের আড়ালে থাকাটা বা সম্ভবই হতো কি করে? মুসলিম উম্মাতের সকলেই তো আর মুনাফিক ছিলনা যে, কুরবানীকে শরীয়তের অংশ প্রমাণ করার জন্য গাদা গাদা মনগড়া হাদীস তৈরী করা হবে এবং একটা অভিনব বিধি রচনা করে তা আল্লাহর রসূলের (সাঃ) হাদীস বলে চালিয়ে দেয়া হবে, আর সমগ্র উম্মাত চোখ বুঝে তা মেনে নেবে। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, আমাদের পূর্ববর্তী বংশধরের সবাই এ রকম মুনাফিকই ছিল, তা হলে তো ব্যাপারটা আর কেবল কুরবানীর মধ্যে সীমবদ্ধ থাকে না। তেমন

হলে তো নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, এমন কি মুহাম্মাদ (সাঃ) -এর নবুয়ত এবং কুরআন পর্যন্ত সন্দেহাচ্ছন্ন হয়ে যেতে বাধ্য। কেননা যে তাওয়াতুর তথা পুরুষানুক্রমিক গ্রহণ ও হস্তান্তরের যে সার্বজনীন নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার প্রক্রিয়ায় কুরবানী আমাদের কাছে পৌছেছে ঐ জিনিসগুলোও সেই প্রক্রিয়ায়ই পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে আমাদের হস্তগত হয়েছে। এমন অটুট ধারাবাহিকতার প্রক্রিয়া যদি কোন ব্যাপারে সন্দেহভাজন হয়ে থাকে, তা হলে আর কোন ব্যাপারে তা সন্দেহের উর্ধে থাকতে পারবে?

পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান যুগে এমন এক শ্রেণীর লোকের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, যাদের না আছে খোদার ভয়, না আছে লজ্জা শরমের বালাই। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনা ছাড়াই যার যেমন খুশী ধর্মীয় ব্যাপারে নির্দ্বিধায় করাত চালিয়ে দেয়। এতে করে শুধু ঐ নির্দিষ্ট ব্যাপারটারই শিকড় কাটা হচ্ছে না, সেই সাথে গোটা ইসলামেরই মূলোৎপাটন হয়ে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে একটু ভেবে দেখুন।

অর্থনৈতিক আপত্তি

প্রকৃতপক্ষে কুরবানীর যে বিরোধিতা করা হচ্ছে, তার কারণ এ নয় যে, যথার্থ তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য কেউ কুরআন হাদীস অধ্যয়ন করেছে এবং তাতে কুরবানীর নির্দেশ খুঁজে পায়নি। বরঞ্চ এই বিরোধিতার প্রকৃত কারণ এই যে, বস্তুবাদ ও ভোগবাদের এই যুগে মানুষের মনমগজে অর্থনৈতিক স্বার্থের গুরুত্ব ও প্রাধান্য মারাত্মকভাবে চড়াও হয়ে পড়েছে এবং অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ছাড়া আর কোন মূল্যবোধ তাদের সামনে অবশিষ্ট নেই। তারা হিসাব করে দেখে যে, প্রতি বছর কত লাখ কিংবা কত কোটি মুসলমান কুরবানী করে থাকে এবং এ জন্য গড়ে প্রতি জনে কত টাকা খরচ হয়। এই হিসাব করে তারা কুরবানীর সার্বিক ব্যয়ের একটা বিরাট অংক দেখতে পায়। আর কেবল পশু কুরবানীতে এত বিপুল অর্থ নষ্ট করা হচ্ছে দেখে তারা চিৎকার করে ওঠে। তারা মনে করে যে, এই অর্থ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোতে ব্যয়

করা হলে তাতে প্রচুর কল্যাণ সাধিত হতে পারতো। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এ একটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মানসিকতা আমাদের সমাজে গড়ে উঠেছে। এটিকে যদি এভাবেই বিকাশ লাভের সুযোগ দেয়া হয় তা হলে কাল ঠিক এভাবেই যুক্তি দেখিয়ে আর একজন বলে উঠবে যে, প্রতি বছর গড়ে এত লাখ মুসলমান হজ্জ করতে গিয়ে এত টাকা ব্যয় করে এবং তার সমষ্টি দাঁড়ায় এত কোটি টাকা। কেবল মাত্র কয়েকটি জায়গা ভ্রমণের জন্য ফি বছর এত বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় না করে এ টাকাও জাতীয় প্রতিষ্ঠানাদিতে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনায়, রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করা হোক। এটা কেবল একটা আনুমানিক অংক নয়। কার্যত এই মানসিকতার প্রভাবেই তুরস্কের ধর্মনিপেক্ষ সরকার ২৫ বছর যাবত হজ্জ নিষিদ্ধ করে রেখেছে। আর অন্য কেউ হয়তো নামাযের হিসাব কষে বলবে যে, প্রতিদিন এত কোটি মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। এতে গড়ে মাথা প্রতি এত সময় ব্যয় হয় এবং তার সমষ্টি দাঁড়ায় এত লক্ষ ঘন্টা। এই সময়কে যদি কোন উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যয় করা হতো তা হলে তাতে এত পরিমাণ সম্পদ উৎপন্ন হতে পারতো। নিকুচি করি এই মোল্লাদের যারা মুসলমানদেরকে নামাযে লাগিয়ে দিয়ে শত শত বছরব্যাপী তাদের এমন ক্ষতি সাধন করে চলেছে। এটাও নিছক অনুমান প্রসূত ধারণা নয়। বাস্তবিক পক্ষেই সোভিয়েট ইউনিয়নে বহু সহৃদয় হিতাকাংখী সেখানকার মুসলমানদেরকে নামাযের অর্থনৈতিক ক্ষতি এ ধরনের যুক্তি দিয়েই বুঝিয়েছেন। এই একই যুক্তি রোযার বিরুদ্ধেও বেশ সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করা যেতে পারে। আর এর চূড়ান্ত পরিণতি এই দাঁড়াবে যে, মুসলমানরা নিছক অর্থনৈতির দাঁড়িপাল্লায় ইসলামের প্রতিটি জিনিস মেপে দেখতে থাকবে। যে জিনিসই এই পাল্লায় ভারত্বহীন মনে হবে, তাকেই তারা 'মুহাম্মদের' উদ্ভট আবিষ্কার আখ্যায়িত করে বাদ দিতে থাকবে। প্রশ্ন এই যে, আসলেই কি ইসলামের বিধিসমূহের সার্থকতা যাচাই করার জন্য এই মানদন্ডটা ছাড়া আর কোন মানদন্ডই মুসলমানদের কাছে অবশিষ্ট নেই?

"আখবারে কাসেদ" ২২শে সেপ্টম্বর, ১৯৫০

হেগেল ও মার্কসের ইতিহাস দর্শন

আধুনিক সভ্যতা মানব জাতিকে যে সব মারাত্মক বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করেছে, তার অন্যতম তাত্ত্বিক ও আদর্শিক উৎস হলো হেগেলের ইতিহাস দর্শন। আর এই হেগেলীয় ইতিহাস দর্শনের উপাদান নিয়েই কার্ল মার্কস পরবর্তীকালে তার জড়বাদী ইতিহাস তত্ত্ব প্রণয়ন করেন।

হেগেলীয় ইতিহাস দর্শনের সার কথা এই যে, মানবীয় সভ্যতা ও তমদ্দুনের বিকাশ সাধিত হয় কতিপয় পরস্পর বিরোধী ধারার উদ্ভব, সংঘাত ও সম্মিলনের প্রক্রিয়ায়। ইতিহাসের প্রতিটি যুগ এক একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ একক, এক একটা স্বনির্ভর সত্তা অথবা রূপক অর্থে বলা যেতে পারে, একটা জীবন্ত দেহ কাঠামো সদৃশ। এক একটা যুগের মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, তাত্ত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় মতাদর্শ এক বিশেষ স্তরে অবস্থান করে। এ সবের মধ্যে এক ধরনের সাযুজ্য ও এক ধরনের সুষম ও অখণ্ড ঐক্য বিরাজ করে। জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট এসব মতাদর্শ যেন একটা একক সজীব সত্তা অথবা একটা সমকালীন ঐক্যের বিভিন্ন দিক বা শাখা। আর এইসব দিক ও শাখায় গোটা যুগের ভাবধারা প্রবাহমান থাকে।

এভাবে একটা বিরাট যুগ যখন স্বীয় ভাবধারা ও প্রাণশক্তির বিকাশ সাধন করে তাকে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে এবং সেই যুগটির চালক, নীতি, আদর্শ ও চিন্তাধারা মাননীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে স্বীয় ক্ষমতা ও যোগ্যতার শেষ ধাপে পৌঁছে দেয়, তখন সেই যুগেরই ক্রোড়ে প্রতিপালিত হয়ে তার এক শত্রুর আবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক নতুন চিন্তাধারা, নতুন উদ্যম ও ঝোঁক-প্রবণতা, নতুন মতবাদ ও নীতিমালা সেই পতনোন্মুখ যুগের

স্বাভাবিক চাহিদা অনুসারেই আবির্ভূত হয় এবং প্রাচীন চিন্তাধারার সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়।

নতুন ও প্রাচীনের মধ্যে কিছুকাল দ্বন্দ্ব সংঘাত চলতে থাকে। অবশেষে ছাটাই বাছাই-এর পর নতুন ও প্রাচীনের মিশ্রণ সমন্বয় হয়। কিছু পুরানো উপাদান ও কিছু নতুন উপাদানের সংমিশ্রণে একটা নতুন যুগ-সভ্যতার উদ্ভব ও উত্থান ঘটে এবং এভাবে ইতিহাসের আর একটা নতুন যুগের পত্তন হয়।

অতপর এই নবাগত যুগের প্রাণশক্তিও যখন সর্বোচ্চ মাত্রায় বিকশিত ও উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। তখন তার ক্রোড় থেকে আবার এক শত্রুর জন্ম হয়। আবার সূচনা হয় এক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের। পুনরায় ছাটাই-বাছাই ও আপোস রফার মাধ্যমে এক নতুন মিশ্র উপাদান আত্মপ্রকাশ করে এবং তা এক নতুন সভ্যতা ও তমদ্দুনের চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়।

ক্রমবিকাশের এই প্রক্রিয়াকে হেগেল ''দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া'' (Dialectic Process) নাম দিয়েছেন। তার মতে, ইতিহাস বা যুগের অঙ্গনে এক বিরামহীন আদর্শিক বা তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, বিতর্ক ও লড়াই চলছে। প্রথমে একটা তত্ত্ব বা মতবাদ (Thesis)-এর আবির্ভাব হয়। তারপর আসে তার পাল্টা মতবাদ। (Anti thesis) অতপর এক দীর্ঘ বিতর্ক বা দ্বন্দ্বের পর মহাজাগতিক বিবেক বা মহাজাগতিক শক্তি এসে উভয় বিবদমান পক্ষের মধ্যে আপোস করিয়ে দেয়। অর্থাৎ উভয়ের কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করে একটা মিশ্রণ (synthesis) তৈরি করে। পরবর্তীতে এ মিশ্রণ আবার একটা স্বতন্ত্র মতবাদে রূপ নেয়। আবার তার প্রতিবাদী হয়ে আসে আর এক পাল্টা মতবাদ। পুনরায় তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পর আপোস রফা হয় এবং একটা মিশ্র ফর্মুলা তৈরী হয়।

হেগেলের এই দর্শন অনুসারে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া একটা সঠিক সামাজিক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ ইতিহাসের একটি যুগের গোটা মানব সভ্যতা একটা জীবন্ত দেহ বা একটা একক সত্ত্বা বিশেষ। বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এই দেহেরই অংশ বা অংগপ্রত্যংগ সরূপ।

সমকালীন সামষ্টিক ভাবধারা বা সমকালীন সভ্যতা ও তমদ্দুনের সর্বব্যাপী জীবনধারার নিয়ন্ত্রণ থেকে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মুক্ত ও স্বাধীন থাকতে পারে না। ইতিহাসের বড় বড় খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত এই দ্বান্দ্বিক খেলায় তথা এই একক সত্ত্বার অন্তর্দ্বন্দ্বে দাবার গুটির চেয়ে বেশী মর্যাদা রাখে না। চির বহমান এই দরিয়ার দীগন্তপ্লাবী স্রোতে ভর করে রাজসিক ভাবমূর্তি নিয়ে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে এক চিরায়ত ভাবাদর্শ ইতিহাসের অন্তহীন রাজপথে। এই বিরামহীন যাত্রাপথে সে নিজেই এক দাবী তোলে অতপর নিজেই সোচ্চার হয়ে ওঠে পাল্টা দাবীতে। আর সবশেষে উভয় দাবীর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে আপোস–রফা করে। মহাজাগতিক বিবেক 'বা' 'বিশ্বসত্তা'র নির্মম পরিহাস এই যে, সে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহকে এই ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত রেখেছে যে, ইতিহাসের নাট্যমঞ্চে তারাই নেতৃত্বমূলক বা কর্তৃত্বমূলক ভূমিকা পালন করছে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, 'বিশ্বসত্তা' তাদেরকে নিজের সত্তার পূর্ণতা সাধনের জন্যই ব্যবহার করছে [১]।

কার্ল মার্কস হেগেলের এই দার্শনিক মতবাদ থেকে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াটাকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আত্মা বা বিবেকের যে ধারণা হেগেলীয় দর্শনের মূল কথা ছিল, সেটা ছাটাই করে ফেলেছেন। এর বদলে তিনি বস্তুগত উপকরণ এবং অর্থনৈতিক চাহিদা ও প্রেরণাকে ঐতিহাসিক বিকাশের ভিত্তি বলে অভিহিত করেছেন।

তিনি বলেছেন যে, মানব জীবনে অর্থনীতিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। একটা ঐতিহাসিক যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও

১। হেগেল মূলত খোদাকেই মহাজাগতিক বিবেক (World spirit) বিশ্বসত্তা (World reason) চিরায়ত আত্মা (Absolute spirit) এবং চিরায়ত চিন্তা বা চিরায়ত ভাবাদর্শ (Absolute Idea) ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করেছেন। তার মতে, মানবীয় সভ্যতা ও তমদ্দুনের বিকাশের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে খোদার সত্তারই বিকাশ ও স্ফুরণ ঘটছে। খোদা নিজেই সভ্যতার পর্দায় নিজেকে প্রদর্শন করছেন এবং নিজ সত্তার পূর্ণতা সাধনে সচেষ্ট রয়েছেন। ইতিহাসের রাজপথে যাত্রাকালে তিনি এ কাজই করে চলেছেন। মানুষ বেচারা নিছক তার বহিরাবরণ বা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কার্যধারাই সে যুগের গোটা মানব সভ্যতার রূপকার। প্রত্যেক যুগের আইন-কানুন, নৈতিকতা, ধর্ম, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, এক কথায় যাবতীয় মানবীয় চিন্তাধারা ও মতাদর্শ (Idologies) তৎকালীন সমাজে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দাবী ও চাহিদা অনুসারে অথবা তা পরিচালনা করা ও টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।

মার্কসের মতে, ইতিহাসের বিবর্তন কালে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া এভাবে দেখা দেয় যে, একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধীন যখন একটা শ্রেণী জীবন যাপনের যাবতীয় উপকরণের উৎপাদন, সরবরাহ ও বন্টনের একচেটিয়া কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে অন্যান্য শ্রেণীগুলোকে নিজেদের কতৃত্বাধীণ করে ফেলে, তখন এই দমিত ও নির্যাতিত শ্রেনীগুলোর মধ্যে অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়। তারা অর্থনৈতিক উৎপাদন (Production) ও জীবন যাপনের উপকরণের বন্টন এবং মালিকানা সম্পর্কের (Property relations) এক নতুন ব্যবস্থা দাবী করে, যা তাদের স্বার্থের সাথে অধিকতর সংগতিশীল। এটা সেই পুরানো ব্যবস্থার পাল্টা দাবী বা তার শত্রু সরূপ। এই শত্রু প্রচলিত পুরানো ব্যবস্থার ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েই আত্মপ্রকাশ করে। এর পর উভয়ের মধ্যে সংঘাত শুরু হয় এবং এই সংঘর্ষে বিদ্যমান ব্যবস্থার আইন-কানুন, ধর্ম, নৈতিকতা ও মতাদর্শের গোটা সমষ্টি কায়েমী ব্যবস্থাকে সমর্থন জানায়। এর মোকাবিলায় অর্থনৈতিক অবকাঠামো পাল্টানোর দাবীতে সোচ্চার উদীয়মান নতুন শ্রেণী শক্তিগুলো প্রতিষ্ঠিত আইনগত, ধর্মীয় ও সামাজিক মতাদর্শ সম্বলিত প্রাচীন অবকাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়। ওটা প্রত্যাখ্যান করে তাদের ইপ্সিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সমাঞ্জস্যশীল একটা পাল্টা অবকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ হয়।

দুই বিবদমান শক্তির এই বিপরীত মুখী চেষ্টার পরিণামে চিরকালব্যাপী শ্রেণী যুদ্ধ (Class struggle) চলতে থাকে। অবশেষে এই দ্বন্দ্বের ফলে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পাল্টে যায় এবং সেই সাথে প্রাচীন আইনগত, ধর্মীয়, নৈতিক ও তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শকে নতুন ধ্যান-ধারণার জন্য জায়গা খালি করে দিতে হয়।

এই হলো কার্ল মার্কসের বস্তুবাদী ইতিহাস তত্ত্ব। এর অপর নাম ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (HistoricaL Materialism) বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectic materialism) অর্থনৈতিক উপকরণের সরবরাহ ও বন্টনের প্রশ্নকে মানবীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির বিকাশ এবং ইতিহাসের যাবতীয় আবর্তন-বিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়েছে। মার্কসের মধ্যে সমগ্র মানব জীবন এই কেন্দ্রবিন্দুর চার পাশেই আবর্তিত এবং শ্রেণী সংগ্রামের শক্তিই এই আবর্তনের চালিকা শক্তি। তার মতে ধর্ম, নৈতিকতা এবং মানবীয় সভ্যতা ও তমদ্দুনের জন্য এমন কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতি ও আদর্শ নেই, যা চিরন্তন ও শাশ্বত এবং স্বতসিদ্ধভাবেই সত্য ও ন্যায়সঙ্গত। বরঞ্চ তিনি মনে করেন, মানুষ প্রথমে নিজের বস্তুগত স্বার্থে ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে একটা বিশেষ কর্মপন্থা অবলম্বন করে। অতপর সেটিকে মজবুত করা এবং সুষ্ঠুভাবে সাফল্যের সাথে চালিয়ে যাওয়া ও ন্যায়সঙ্গত সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে একটা ধর্ম, চরিত্র, দর্শন ও এক ধরনের চিন্তাগত ও আদর্শিক ব্যবস্থা ও অবকাঠামো তৈরী করে নেয়। তার ধারণা এই যে, মানুষের যে শ্রেণী ও গোষ্ঠী অন্য কোন ব্যবস্থায় নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থ নিহিত দেখতে পাবে, সে সাবেক ব্যবস্থার অধীন প্রাচীন ধর্ম, নৈতিকতা এবং সভ্যতা ও সামাজিক মতাদর্শকেও প্রত্যাখ্যান করবে এবং নিজস্ব স্বার্থের অনুকূলে ভিন্ন ধাঁচের আকীদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শ তৈরী করে নেবে এটাই সম্পূর্ণ স্বভাবিক ও যুক্তি সঙ্গত। তিনি মনে করেন যে স্বার্থের তাগিদে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়াই প্রকৃত স্বভাবসুলভ ব্যাপার এবং মানবেতিহাসের অগ্রগতি ও বিকাশের একমাত্র পথ এটাই যে, মানুষের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠী নিজ নিজ গরজ ও স্বার্থের তাগিদে পরস্পরে ঝগড়া, কলহ, সংঘাত সংঘর্ষ ও লুটতরাজ চালাবে। মানুষ আবহমানকাল ধরে ইতিহাসের রাজপথ বেয়ে এভাবে লড়াই-সংঘর্ষ করতে করতে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও এভাবে দ্বন্দ্ব-সংঘাত করে চলাই তার কাজ। আপোষ ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার কোন উপায় যদি থেকে থাকে তবে অর্থনৈতিক স্বার্থের ঐক্য ও সমন্বয়ই একমাত্র উপায়। যারা এ বাপারে ঐক্যবদ্ধ হবে, তাদের

একটি শ্রেণী বা গোষ্ঠীর আওতায় সংগঠিত হওয়াই সঙ্গত। আর যাদের সাথে এ ব্যাপারে তাদের দ্বিমত ও বিরোধ ঘটবে, তাদের সাথে তাদের লড়াই ও সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়াই সমিচিন।

এ নিবন্ধে আমি হেগেলীয়-মার্কসীয় দর্শনের বিস্তারিত সমালোচনা করতে ইচ্ছুক নই। এখানে আমি যে কথাটা বলতে চাই সেটা শুধু এই যে, এই দর্শন ধর্ম, নীতিকথা, সভ্যতা ও সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণভাবে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে মৌলিকভাবে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে দিয়েছে।

যারা হেগেলীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তাদের মনমগজে দুটো তত্ত্ব গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেছে।

প্রথমত, তারা বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক যুগের গোটা সভ্যতা একটা স্বতন্ত্র একক। নীতি-দর্শন, আইন-কানুন, ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা এবং আন্তমানবিক সম্পর্কের যে ধারা কোন বিশেষ যুগে বিদ্যমান থাকে, তা সম্পূর্ণত ঐ যুগের সামষ্টিক মানসিকতা অথবা তৎকালে বিরাজিত মহাজাগতিক প্রাণসত্তার প্রতিফলন।

দ্বিতীয়ত, একটা সভ্যতা যখন পরিপক্কতা ও উৎকর্ষের শেষ ধাপে উপনীত হয়, তখন ঐতিহাসিক কারণে স্বতস্ফূর্তভাবে সেই সভ্যতার পেট থেকেই জন্ম নেয় এক অভিনব ভাবধারা এবং এক নবতর চেতনা ও প্রেরণার সামষ্টি। আবির্ভূত হয় চিন্তাধারা, মতবাদ ও মতাদর্শের এক নতুন বাহিনী। তারা এসে কায়েমী সভ্যতা ও কৃষ্টি-মূলনীতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অবশেষে এক নতুন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে। এই নয়া সভ্যতায় প্রাচীন সভ্যতার উত্তম ও টেকসই উপাদানগুলো অক্ষুণ্ন থাকে। আর অবাঞ্ছিত উপাদানগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয় নব্য ভাবধারার মূল্যবান অংশসমূহ। এভাবে একের পর এক যে সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটতে থাকে তার প্রত্যেক নবাগত সভ্যতা বিগত সভ্যতার চেয়ে উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। কেননা তাতে পুরানো সভ্যতার উত্তম উপাদনগুলোর সমাবেশ ঘটার পাশাপাশি নতুন চিন্তাধারা ও মতাদর্শের মূল্যবান উপাদানেও সমৃদ্ধ হয়।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এই দুই তত্ত্ব যাদের মনমগজে বদ্ধমূল হয়ে যায়, তারা বাস্তবিক পক্ষে এমন কোন আদর্শের ওপর ঈমান আনতে সক্ষম হয় না, যা এখন থেকে বহু শত বছর আগে (তাদের ধারণা অনুসারে একটা অধুনালুপ্ত সভ্যতার আমলে) প্রদত্ত হয়েছিল। তাদের সামনে যখন ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উচ্চারণ করা হবে, তখন তারা জবাবে এ কথাই বলবে যে, "তারা সবাই নিজ নিজ যুগের ফসল ব্যক্তি ছিলেন। তাদের প্রত্যেকে স্ব স্ব যুগের প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার বিরুদ্ধে একটা পাল্টা আদর্শ (Antithesis) পেশ করে ছিলেন এবং তা একটা সংঘাতের পর একটা মিশ্রণ সভ্যতার (Synthesis) অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। তার পরে আরো কত পাল্টা বক্তব্য এসেছে এবং কত মিশ্র ধারার সৃষ্টি হয়েছে এবং মানব সভ্যতা ক্রমবিকাশ লাভ করতে করতে আমাদের যুগ পর্যন্ত উপনীত হয়েছে। আমরা তাদেরকে অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাবো এ জন্য যে, তারা স্ব স্ব যুগে মানব সভ্যতাকে সামনে এগিয়ে দেয়ার জন্য কাজ করেছেন। কিন্তু তাই বলে একটা তামাদি হয়ে যাওয়া পাল্টা বক্তব্যকে নতুন করে বিবেচনায় আনার কোন অবকাশ নেই।"

মার্কসের অনুসারীরা হেগেলের শিষ্যদের সাথে উপরোক্ত দুটো তত্ত্বেই সমান অংশীদার। তদুপরি একটা তৃতীয় মতবাদও তাদের মাথায় চেপে বসেছে। তারা ইতিহাসের কোন বিশেষ স্তরে বিরাজমান ধর্মীয়, নৈতিক ও আইনগত মতাদর্শকে সেই নির্দিষ্ট যুগেরই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎপন্নদ্রব্য মনে করে। তাদের ধারণা এই যে, সেই সব ধ্যান-ধারণা, মতাদর্শ ও আইনবিধি তৎকালীন অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে সমর্থন ও সংরক্ষণের জন্যই রচিত ও প্রবর্তিত হয়েছিল। সুতরাং যুক্তিসঙ্গতভাবেই এ বিশ্বাসের ফলশ্রুতি এই দাঁড়ায় যে, মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদার যোগান ও বন্টনের নিয়ম-পদ্ধতি (System of production and distribution) যখন বদলে যাবে তখন তার সাথে সাথে ধর্ম, নীতিকথা, আইন-কানুন সব কিছুই পাল্টে যাওয়া উচিত। কেননা একমাত্র প্রাচীন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথেই তার সংশ্রব ছিল, আজকের প্রচলিত

ব্যবস্থার চেতনা ও প্রেরণার সাথে তার কোন সংযোগ ও সামঞ্জস্য নেই।

এহেন মার্কসীয় মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি কোন ক্রমেই শত শত বছর আগেকার কোন ধর্মীয় শিক্ষা, কোন শরীয়ত ও নৈতিক বিধি–ব্যবস্থার প্রতি ঈমান আনতে পারে না।

সম্প্রতি আমাদের এক সমাজতন্ত্রী ভাই "কোনটা সমাজতন্ত্র নয়" শীর্ষক একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, সমাজতন্ত্র ও ইসলামে কোন বিরোধ নেই। তার মত অন্যান্য সমাজতন্ত্রীরাও হয়তো এই ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত থাকতে পারেন। এ জন্য আমি তাদেরকে বলবো যে, তারা যেন একবার মার্কসের জড়বাদী ইতিহাস–তত্ত্ব ও তার যৌক্তিক ফলাফল নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেন এবং তার পর ভেবে দেখেন যে, এই মতবাদকে মেনে নেয়ার পর কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়ার আদৌ কোন অবকাশ থাকে কি না। কে কোন্ আকীদা ও মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সেটা নির্বাচনের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। তারা যদি মার্কসীয় মতবাদকে সঠিক মনে করেন, তবে তা অবশ্যই অবলম্বন করুন। কিন্তু তাদের অন্তত নিজ নিজ মনমগজকে পরিষ্কার রাখা উচিত। একটা আদর্শের অনুসরণের সাথে সাথে তার বিপরীত আদর্শেও বিশ্বাসী হবার দাবী করা এক জটিল মানসিক ব্যাধির ইংগিত বহন করে। এটা নিঃসন্দেহে পরিতাপের ব্যাপার।

হেগেল ও মার্কস উভয়েই নিগূঢ় সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দু'জনেই এ চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন। তারা সত্যের একটা অংশ মাত্র খুঁজে পেয়েছে এবং তাকেই পূর্ণাঙ্গ সত্যরূপে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেছেন। এর ফল হয়েছে এই যে, তারা নিজেরাও ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন, আর সেই সাথে অন্যদেরকেও ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করে রেখে গেছেন।

হেগেলের ইতিহাস দর্শনে কেবল এই কথাটুকু সত্য যে, ইতিহাসের আবর্তনকালে মানবীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার বিকাশ

পরস্পর বিরোধী তত্ত্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং অবশেষে উভয়ের আপোস রফার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়ে এসেছে। কিন্তু এই সঠিক ধারণার সাথে তিনি আরো অনেকগুলো কল্পনা প্রসূত ধ্যান-ধারণার মিশ্রণ ঘটিয়ে তার ওপর এমন এক মতবাদের ইমারত গড়ে তুলেছেন, যার অধিকাংশ স্তম্ভ নিছক হাওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

হেগেল খোদাকে বিশ্বজগতের প্রাণ বা আত্মা আখ্যায়িত করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে,খোদা মানুষকে নিজের পূর্ণত্ব লাভের হাতিয়ার হিসেবে ব্যাবহার করছেন। এও বলেছেন যে, মানবীয় সভ্যতা ও তমদ্দুনের বিকাশের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে স্বীয় চরমোৎকর্ষ লাভের লক্ষ্যস্থলের দিকে স্বয়ং খোদার অভিযাত্রারই ইতিহাস। তার এ সব বক্তব্য নিছক খেয়ালী প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। এ বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন যথার্থ প্রমাণ আকাশ পাতালের কোথাও মিলবে না।

তার ধারণা এই যে, ইতিহাসের নাট্যমঞ্চে মানুষ এক অচেতন, অক্ষম ও স্বাধীনতাহীন অভিনেতা। তিনি বলেন, খোদাই মানুষের মাধ্যমে বিপরীতমুখী ধ্যান-ধারণা উপস্থাপন করেন, তাদের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে দেন। আবার তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে চিন্তা ও মতামতের নতুন নতুন ধারা ও মডেল গড়ে তোলেন। এটাও একটা অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন অনুমান মাত্র। কোন বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক সত্য থেকে এ ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় না।

এই মৌলিক ত্রুটিগুলো গোটা হেগেলীয় দর্শনকে একটা কল্পনা সর্বস্ব ভুয়া দর্শনে পরিণত করেছে। এরপর যখন আমরা তার ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিকতার মতবাদের প্রতি দৃষ্টি দেই। তখন এ মতবাদে সত্যের খানিকটা দীপ্তি থাকা সত্ত্বেও তার ভেতরে আন্দাজ-অনুমানের (Speculation) উপাদান অতিমাত্রায় বেশী এবং ইতিহাসের প্রামাণ্য ঘটনাবলী দ্বারা সাক্ষ্য ও যুক্তি প্রদর্শনের উপাদান অতিমাত্রায় কম দেখতে পাই। তিনি এটা ঠিকই ধরতে পেরেছেন যে, ইতিহাসের আবর্তনকালে পরস্পর বিরোধী ধ্যান-

কুরবানী সম্পর্কে হাদীস বিরোধীদের অপপ্রচার

গত বছর ঈদুল আযহার সময় পাঞ্জাবের একটি দল একটি প্রচারপত্র বিলি করে। সেই প্রচারপত্রে কুরবাণীকে একটা নিষ্প্রয়োজন, নিরর্থক, বাজে এমনকি একটা ক্ষতিকর ও অপব্যায়মূলক অনুষ্ঠান বলে আখ্যায়িত করা হয়। সেই সোথে মুসলমানদেরকে পরামর্শ দেয়া হয় যে, "অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়ের এই তথাকথিত সুন্নাত" বর্জন করে কুরবানীতে যে টাকা নষ্ট করা হয় তা যেন তারা জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের সহায়তা, এতিম, বিধবাদের প্রতিপালন এবং বেকারদের জীবিকার ব্যবস্থা করার কাজে ব্যয় করে। পরবর্তীতে জানা গেছে যে, প্রতি বছর বকরা ঈদের সময় মুসলমানদেরকে কুরবাণী করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ বিতরণকে এ দলটি স্বীয় প্রচার কার্যক্রমের একটা স্থায়ী অংশ বানিয়ে নিয়েছে। এই ভদ্র লোকদের উক্ত চেষ্টা কতদূর সফল হয়েছে জানিনা। তবে আজকাল মুসলমান জনগণের মনস্তাত্বিক অবস্থা যে রকম দেখতে পাচ্ছি এবং এই মহলটি প্রচারের যে ভঙ্গী অবলম্বন করেছে, তাতে করে আমাদের আশংকা হয় যে, হয়তো ইতিমধ্যেই হাজার হাজার মুসলমান এই চক্রান্তের শিকার হয়েছে এবং এখনই এর প্রতিকার না করা হলে ভবিষ্যতে আরো কত মুসলমান এর শিকার হবে বলা যায় না। এ জন্য কুরবানীর বিরুদ্ধে এই মহল যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, বকরা ঈদ আসার আগেই তা নিরসন করা আমরা জরুরী মনে করছি।[১]

---

১. এ নিবন্ধ লেখা হয়েছে ১৩৫৫ হিঃ সনের জিলকদ মাসে, (মোতাবেক জানুয়ারী ১৯৩৭) দুঃখের বিষয় যে, দলটি এখনো তার কুরবানী বিরোধী প্রচারাভিযান বন্ধ করেনি। ১৩৬৮ হিজরী সনেও কুরবানীর সময় আমরা জানতে পারলাম যে, তারা যথারীতি জনগণের মধ্যে এই মর্মে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে যে, কুরবানী

এই গোষ্ঠীটির যে সব প্রচারপত্র আমাদের নজরে পড়েছে,তা থেকে জানা যায় যে, কুরবানীর বিরুদ্ধে তাদের আপত্তি তিনটি কারণেঃ

প্রথমতঃ কুরবানী তাদের মতে প্রাগৈসলামিক অজ্ঞতার যুগের একটি প্রথা। "মৌলবী"রা নিছক অজ্ঞতাবশত এটিকে একটি ইসলামী রীতি বানিয়ে নিয়েছে। এই গোষ্ঠীর জনৈক লেখক কুরবানী সম্পর্কে তার অভিনব গবেষণালব্ধ তত্ত্বকে ব্যক্ত করেছেন এভাবেঃ "কুরবানীর প্রথাটা দুনিয়ার সভ্য ও অসভ্য জাতিগুলোতে প্রচলিত ছিল। আজকাল মুসলমানরা ছাড়া আর কেউ ওটা করে না।"

দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক দিক থেকে এটিকে তারা ক্ষতিকর মনে করে। তাদের ধারণা এই যে, গরু ছাগলের গলায় ছুরি চালাতে গিয়ে যে অর্থ ব্যয় হয়, তা সম্পূর্ণ অপব্যয় ও অপচয়। এর বিনিময়ে কোন বস্তুগত বা বুদ্ধিবৃত্তিক ফায়দা অর্জিত হয় না।

তৃতীয়তঃ কুরআনে কোথাও কুরবানীর হুকুম তাদের চোখে পড়ে না। হাদীসে থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করা তাদের কাছে সবচেয়ে সহজ কাজ। হাদীসকে অগ্রাহ্য করার নীতি তারা এ জন্যই অবলম্বন করেছে, যাতে করে ইসলামের যে বিধি অমুসলিমদের কাছে আপত্তিকর মনে হয় অথবা যে বিধির তাৎপর্য ও কল্যাণকারিতা এই গোষ্ঠীর লোকদের বুঝে আসে না, তাকে অকাতরে ইসলাম বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা যায়।

যেহেতু এই সব আপত্তি উত্থাপনকারী মহল নিজেদেরকে মুসলমান বলে অভিহিত করে থাকে এবং কুরআনকে চূড়ান্ত দলীল হিসেবে মান্য করে, সেহেতু আমি কুরআন থেকেই কুরবানীর হুকুম বর্ণনা করবো এবং আল্লাহ কোন্ কল্যাণকর উদ্দেশ্যে ইবাদতের বিশেষ রীতিনীতির মধ্যে কুরবানীকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাও কুরআন থেকেই তুলে ধরবো।

"মৌলবীদের" আবিষ্কৃত একটা বিদয়াত। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে একটি "কুটীল প্রতারণার ফাঁদ" শীর্ষক নিবন্ধে আমি যে গোষ্ঠীটির উল্লেখ করেছি, আলোচ্য মহলটি তাদেরই স্বগোত্রীয়।

পবিত্র কুরআনে কুরবানীর যে সব নির্দেশ বিধিবদ্ধ হয়েছে, তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এর একটি হলো, হজ্জ বিধির অঙ্গীভূত কুরবানী। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ .... وَأَذِّنْ
فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ
كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ - (الحج: ٢٦، ٢٧، ٢٨)

"যখন আমি কা'বা সংলগ্ন স্থানকে ইবরাহীমের আবাসস্থল হিসেবে নির্ধারন করলাম (তখন আদেশ দিলাম যে,).... এবং মানুষকে হজ্জের জন্য আহ্বান জানাও। লোকেরা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে পায়ে হেঁটে এবং দূর্বল জন্তুর ওপর সওয়ার হয়ে তোমার কাছে আসুক যাতে করে তারা নিজেদের জন্য ফায়দা হাসিল করে এবং নির্দিষ্ট কতিপয় দিনে আল্লাহর দেয়া জন্তুগুলোকে আল্লাহর নামে জবাই করে। অতপর তোমরা সেই সব জন্তু নিজেরাও খাও, বিপন্ন ফকীরকেও খাওয়াও।"

(সূরা হজ্জ, ২৬, ২৭, ২৮)

আয়াতের ভাষা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কা'বা শরীফ নির্মাণের সাথে সাথেই ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে হজ্জ প্রবর্তনের এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আর এর উদ্দেশ্য এই বলা হয়েছিল যে, লোকেরা এখানে এসে ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় দিক দিয়ে লাভবান হোক এবং আল্লাহর নামে কুরবানী করুক। তারপর এই হজ্জ এই সব বিধি সমেত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতের জন্যও প্রবর্তন করা হয়। কেননা এ উম্মত হযরত ইবরাহীমেরই আদর্শের উত্তরাধিকারী। আল্লাহু তায়ালা সূরা আল ইমরানের ৯৭ আয়াতে বলেনঃ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا "মানুষের ওপর আল্লাহ এই কর্তব্য আরোপ করেছেন যে, যে ব্যক্তি সফর করতে সক্ষম সে যেন কা'বা

শরীফে গিয়ে হজ্ব আদায় করে।" আর হযরত ইবরাহীমের শরীয়তে যেভাবে কুরবানী হজ্ব বিধির অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেভাবে তা উম্মাতে মুহাম্মাদীর হজ্বেও বিধিবদ্ধ হয়েছে। সূরা হজ্বের ৫ম রুকূতে ৩৬ নং আয়াতে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَتْ
جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ـ (الحج: ٣٦)

"বস্তুত কুরবানীর উটগুলোকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শনরূপে নির্ধারণ করেছি। ওগুলোতে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত। অতএব তোমরা ওগুলোকে কাতারবদ্ধ করে ওদের ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। (অর্থাৎ ওগুলো কুরবানী কর) আর যখন ওগুলো শুয়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে (অর্থাৎ যখন তার প্রাণ বেরিয়ে যাবে) তখন তা থেকে নিজেরাও খাও, আর স্বচ্ছল ও ভিখারীকেও খাওয়াও।"

দ্বিতীয় প্রকারের কুরবানী হলো, হজ্বে তামাত্তু ও হজ্বে কিরানের ফিদিয়া হিসেবে। পথিমধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে গেলে অথবা ইহরাম অবস্থায় কোন নিষিদ্ধ কাজ করার শাস্তি হিসেবে প্রদত্ত কুরবানী। এ সংক্রান্ত বিধিসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ
مَحِلَّهٗ ـ (البقرة: ١٩٦)

"আল্লাহর জন্য হজ্ব ও উমরা সম্পন্ন কর। তবে যদি কোথাও আটকা পড়ে যাও তাহলে কুরবাণী করার মত যা কিছু (জীবজন্তু) পাঠাতে পার পাঠিয়ে দাও। এই জন্তু যতক্ষণ কুরবানীর নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে না যায় ততক্ষণ মাথা মুন্ডন করোনা।" (আল বাকারা-১৯৬)

(২) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ بِهٖٓ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ

مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ - (بقره:١٩٦)

"অতপর তোমাদের কেউ যদি রুগ্ন হয়ে পড়ে অথবা তার মাথায় কোন কষ্ট দেখা দেয় (এবং সে জন্য সে ইহরামের বিধিনিষেধ ভঙ্গ করতে বাধ্য হয়) তা হলে ফিদিয়া হিসেবে সে যেন রোযা রাখে, অথবা সদকা করে অথবা কুরবানী দেয়।" (আল বাকারা–১৯৬)

(৩) فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ (بقره : ١٩٦)

"আর যদি কেউ হজ্জের সময় হওয়া পর্যন্ত উমরার সুবিধা গ্রহণ করে [১] তবে সে যেন সাধ্য অনুযায়ী কুরবানী দেয়। আর তা সম্ভব না হলে সে যেন হজ্জের সময়ে তিন দিন এবং ঘরে ফিরে আসার পর সাত দিন রোযা রাখে।"

(৪) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ (المائده:٩٥)

"হে মুমিনগণ! ইহরাম অবস্থায় কোন জীব শিকার করোনা। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করে ফেলে, তবে সে যেন তার বদলায় শিকারকৃত প্রাণীর সমমানের একটা প্রাণী কুরবানী করে। এ ব্যাপরে ফায়সালা করবে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি। এই কুরবানী কা'বা পর্যন্ত পৌছিয়ে দিতে হবে।" (মায়েদা–৯৫)

---

১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জের কিছুদিন বাকী থাকতে মক্কায় পৌছে যায়, সে উমরা করে ইহরাম খুলতে পারে এবং ইহরাম অবস্থার বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত হতে পারে। এর পর হজ্জের সময় সমাগত হলে আবার ইহরাম বেঁধে নেবে। এ ক্ষেত্রে উমরা আদায় করে যে সুবিধাটা ভোগ করা হয়, তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কুরবানী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াত গুলোতে কুরবানীর জন্তুকে "হাদ্‌য়ুন" বলা হয়েছে ২। ইমাম রাযী এই শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছিলেনঃ

معنى الهدى ما يهدى الى بيت الله عز وجل تقربا اليه بمنزلة الهدية يهديها الانسان الى غيره تقربا اليه.

"হাদ্‌য়ুন শব্দটার অর্থ হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যে জিনিস কা'বা শরীফে উপঢৌকন হিসেবে পাঠানো হয়। মানুষ যেমন অন্য মানুষের ঘনিষ্ঠতা লাভের উদ্দেশ্যে তার কাছে উপহার ও উপঢৌকন পাঠায় এটা ঠিক তদ্রূপ।"

বাস্, আর যায় কোথায়। কুরবানী বিরোধীরা এর সুযোগ গ্রহণ করে নির্দিধায় রায় দিয়ে দিল যে, 'হাদয়ুন' অর্থ কুরবানী নয়, যে কোন একটা হাদিয়া তথা উপঢৌকন আল্লাহর কাছে পেশ করা। কিন্তু ইমাম রাযী উল্লেখিত কথাটার কয়েক লাইন পরে এ কথাও লিখেছিলেন যে,

فتقديره لا تحلقوا حتى يبلغ الهدى محله وينحر فاذا نحر فاحلقوا.

"অতএব, আয়াতের পুরো বক্তব্যটা দাঁড়াচ্ছে এ রকমঃ যতক্ষণ উপঢৌকনটি যথাস্থানে না পৌঁছে এবং তা জবাই না করা হয়। ততক্ষণ মাথা কামিওনা। যখন জবাই হয়ে যাবে, মাথা কামিয়ে ফেল।"

কিন্তু ইমাম রাযীর এই শেষোক্ত কথাটা যেহেতু মতলব সিদ্ধির সহায়ক নয়, তাই "আধুনিক যুগের ইসলামী গবেষকগণ" ঐ কথাটার দিকে ভ্রুক্ষেপ করা সমিচীন মনে করেননি।। ইমাম রাযীকে তারা থোড়াই পরোয়া করেন। স্বয়ং আল্লাহর উক্তিকে পর্যন্ত

---

২. 'হাদ্‌য়ুন' শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তার ঘরে প্রেরিত উপঢৌকন বিশেষ। পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ও সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য মানুষের সাথে মানুষের যে উপহার বা উপঢৌকন আদান-প্রদান হয়ে থাকে, এটাও তেমনি।

তারা গ্রাহ্য করেননি। সূরা মায়েদার আয়াতে কা'বার প্রেরিতব্য উপঢৌকনের" ব্যাখ্যা আল্লাহ নিজেই এই বলে করে দিয়েছে যে, "শিকারের বদলায় তারই সমমানের একটি জন্তু কুরবাণী করা চাই।" এ আয়াত অকাট্যভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, কুরআনে যেখানেই 'হাদয়ুন' শব্দটা এসেছে, তা কুরবানীর জন্তু অর্থেই এসেছে-অন্য কোন অর্থে নয়।

তৃতীয় প্রকারের কুরবানী হলো, যে কুরবানীর জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং তার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমনঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (انعام: ١٦٢، ١٦٣)

"হে মুহাম্মদ! তুমি বল যে, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্ববিধাতা আল্লাহর জন্য যার কোন অংশীদার নেই। আর আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমি তার নির্দেশ পালনে সর্ব প্রথম।"

এ আয়াতে "সালাত"-এর পরেই "নুসুক" এর উল্লেখ রয়েছে। নুসুকের অর্থ ইবাদত, স্বেচ্ছা প্রনোদিত কাজ এবং কুরবানীও। কুরআনে এ শব্দ কুরবানী অর্থেই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা হজ্বের ৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا
رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ (الحج: ٣٤)

"প্রত্যেক উম্মাতের জন্য আমি কুরবানীর রীতি প্রবর্তন করেছি, যেন তারা আল্লাহ প্রদত্ত জীবজন্তুর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।"

সূরা বাকারাতে রয়েছে فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

"তা হলে (অসুস্থ হলে বা মাথায় অসুখ করলে) তার ফিদিয়া রোযা, সদকা অথবা কুরবানী দিয়ে করতে হবে।" (১৯৬)

এ আয়াত ক'টি দ্বারা 'নুসুক' এর অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। সেই সাথে লক্ষ্যনীয় যে, সালাতের পাশাপাশি 'নুসুকের জন্যও بِذٰلِكَ اُمِرْتُ (আমাকে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।) কথাটা প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমাকে নুসুকের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর পর বলা হয়েছে اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ("আমি প্রথম নির্দেশ পালনকারী)।") এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে এ নির্দেশ শুধু রসূল (সাঃ) এ জন্য নয় বরং সকল মুসলমানের জন্য। এ জন্যই রসূল (সাঃ) সকল সক্ষম মুসলমানকে কুরবানী করার আদেশ দিয়েছেন এবং সে জন্য জোর তাগিদ দিয়েছেন। নিম্নে কয়েকটি হাদীস দেখুনঃ

مَنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا ـ

"সামর্থ থাকা সত্বেও যে কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহের ধারেও না আসে।"

اِنَّ اَوَّلَ نُسُكِنَا فِىْ يَوْمِنَا هٰذَا الصَّلٰوةُ ثُمَّ الذَّبْحُ ـ

"আমাদের আজকের দিনে (অর্থাৎ বকরা ঈদের দিনে) আমাদের পয়লা ইবাদাত নামায তার পর যবেহ্ করা।"

مَنْ صَلّٰى مَعَنَا هٰذِهِ الصَّلٰوةَ فَلْيَذْبَحْ بَعْدَ الصَّلٰوةِ

"যে ব্যক্তি আমাদের সাথে বকরা ঈদের নামায পড়বে, সে যেন নামাযের পর যবাই করে।"

কুরবানী সম্পর্কে কুরআনের অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন নির্দেশসমূহ উপরে বর্ণিত হলো। পাঠক এগুলো পড়ুন। অতপর যারা একদিকে কুরআনের "সবচেয়ে একনিষ্ট ভক্ত" বলে দাবী করে আবার অপর দিকে প্রকাশ্যে এ সব কথা লেখে ও ঘোষণা করে, তাদের ধৃষ্টতা দেখুনঃ

"কুরবানীর প্রথা দুনিয়ার সকল সভ্য ও অসভ্য জাতিতে প্রচলিত ছিল। আজকাল মুসলমানরা ছাড়া আর কেউ ওটা আদায় করে না।"

শুধু পালনকারীরা ব্যতীত অন্যদের পক্ষে এমন নিষ্প্রয়োজন ও অপব্যয়মূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা কিভাবে জরুরী হয়ে গেল?

"গরু ছাগলের গলায় ছুরি চালাতে ও তাকে মাটিতে পুতে ফেলতে যে টাকা খরচ করা হয় তা জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাপ্য। এ টাকা দিয়ে প্রতি বছর এক বিরাট বাণিজ্যিক ব্যাংক খোলা যায়, কুরআন ও অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার ও বিস্তার ঘটানো যায়, আকীদা আখলাক শুধরানো যায়, এতিম ও বিধবাদের সাহায্য করা যায় এবং আরো হাজারো কল্যাণকর কাজ করা যায়। শুধুমাত্র সর্ত এই যে, অন্ধ অনুকরণের মায়াজাল এবং বেহুদা ও ক্ষতিকর প্রথাগুলো থেকে মুক্ত হওয়া চাই।"

"দুঃখের বিষয় যে, অন্ধ অনুকরণ ও গতানুগতিকতা ছাড়া আজ পর্যন্ত কেউ কুরবানীর যৌক্তিক ও বাস্তব উপকারিতার ওপর আলোকপাত করেনি।"

এটা কুরআনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া ছাড়া আর কি? কুরআন একটা কাজের আদেশ দিচ্ছে। আর আপনি বলছেন, আগে ওটার যৌক্তিক ও বাস্তব উপকারিতার ওপর আলোকপাত করা হোক। কুরআন যে জিনিস সম্পর্কে বলছে যে, "এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে।" আপনি তাকে বেহুদা ও অপব্যয়মূলক প্রথা বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন। কুরআন একটা জিনিসকে আল্লাহর নিদর্শন বলে গণ্য করছে এবং সেটি আল্লাহর নির্ধারিত ও প্রবর্তিত বিধান বলে জানাচ্ছে। আর আপনি তার মোকাবিলায় পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদদের এই তত্ত্ব তুলে ধরছেন যে, এটা জাহেলিয়ত যুগের একটা প্রথা ছিল।" যা কেবলমাত্র মুসলমানরা আকড়ে ধরে রেখেছে। এমন উদ্ভট আবিষ্কারের কথা শুনে বোধ করি কোন বিবেকবান মানুষই স্তম্ভিত না হয়ে পারবে না।

এক দিকে কুরআনের প্রতি ঈমানের গালভরা দাবী, অপরদিকে কুরআনের বিরুদ্ধে এমন ধৃষ্টতা, এ দুটোর সহাবস্থান যদি সম্ভব হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, কোন জিনিসের

বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা একই সময়ে সংঘটিত হওয়াও সম্ভব।

কুরআনের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তার সম্পর্কে যত আপত্তি ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে, তার জবাব সে নিজেই আগে ভাগে দিয়ে দেয়। বস্তুতঃ এটাও তার একটা মোজে'যা। কুরবানীর বিধান সম্পর্কে উত্থাপিত আপত্তিগুলোর জবাবে কুরআনের বক্তব্য কি, আসুন, এবার তাও একটু দেখে নেয়া যাক।

জাহেলিয়াতের যুগে যেমন গায়রুল্লাহর সামনে রুকু, সিজদা ও প্রার্থনা করা হতো, তেমনি কাল্পনিক দেবদেবীর উদ্দেশ্যে নযর, নেয়ায, মান্নত, কুরবানীও করার রেওয়াজ ছিল। আরব, ভারত, রোম, মিসর, মোট কথা কোন দেশই এমন ছিল না, যেখানে ভূয়া উপাস্যদের প্রতিমূর্তির সামনে ও তাদের বেদীতে বলি দেয়া হতো না। এমনকি এক আল্লাহতে বিশ্বাসী ইহুদী জাতিও এই শেরকে লিপ্ত হয় এবং বারংবার তারা মূর্তির সামনে বলি দেয়। বাইবেলের আদি পুস্তকে এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযোগ উচ্চারিত হয়েছে। কুরআনেও জাহেলিয়ত যুগের এই সব মোশরেকী প্রথার উল্লেখ রয়েছে। যেমনঃ

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا - (انعام: ١٣٧)

"তারা ক্ষেতের ফসল ও গৃহপালিত পশুদের একটা অংশকে আল্লাহর জন্য নিবেদিত করেছে এবং আপন খেয়ালের বশে বলেছে যে, 'এটা আল্লাহর আর এটা আমাদের অংশীদারদের।" (আনয়াম, ১৩৭)

وَقَالُوا هٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ - (الانعام: ١٣٩)

"তারা বলে যে, এই জন্তুগুলো এবং ক্ষেতসমূহ নিষিদ্ধ জিনিস। আমরা যাকে আমাদের ধ্যানধারণা মোতাবেক

খাওয়াতে চাইব, সে ছাড়া আর কেউ এসব খেতে পারবে না। আর কিছু পশু রয়েছে যার ওপর সওয়ার হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া এক শ্রেণীর জন্তু রয়েছে, যাকে তারা আল্লাহর নাম না নিয়েই যবাই করে থাকে। এ সবই তাদের আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয় (অর্থাৎ এমন মূর্খজনোচিত মোশরেকী ধ্যানধারণাকে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বলে প্রচার করে থাকে)।

কুরআন একদিকে যেমন অন্য সকল ধরণের ইবাদাত উপাসনাকে গায়রুল্লাহর দিক থেকে ফিরিয়ে এনে আল্লাহমুখী করে, অপর দিকে ঠিক তেমনিভাবে মান্নত ও কুরবানীকেও ওদিক থেকে এদিকে ফিরিয়ে আনে। সে নির্দেশ দেয় যে, মোশরেকরা যখন আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যদের সামনে রুকু সিজদা করে থাকে, তোমরা তখন ঘোষণা কর যে, আমাদের রুকু, সিজদা ও কুরবানী এক মাত্র আল্লাহর জন্য। قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (আনয়াম-১৬৩) মোশরেকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যের নাম নিয়ে জন্তু যবাই করে, তোমরা তার পবির্তে আল্লাহর নাম নিয়ে যবাই কর। فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا - তারা গায়রুল্লাহর নামে জীব জানোয়ারকে ছেড়ে দেয় এবং কাউকে তার ওপর সওয়ার হতেও দেয় না, আর তার গোশত নিজেরাও খায় না, অন্যকেও খাওয়ায় না। তোমরা এই গোয়ার্তুমীর জবাবে উৎসর্গীকৃত পশুকে সব ধরনের কাজে লাগাও। لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ - (সুরাহজ্ব-৩৩) কুরবানীর গোশত নিজেরাও খাও, অন্যদেরকেও খাওয়াও। فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ (সূরা হজ্ব-৩৬) কেননা পশুর রক্ত ও গোশত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। যে খালেস নিয়তের কল্যাণে তোমরা গায়রুল্লাহকে ত্যাগ করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছ, সেটাই আল্লাহর কাছে পৌঁছে। لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (সূরা হজ্ব-৩৭)

ইসলামী শরীয়তের যৌক্তিকতা সম্পর্কে যার বিন্দুমাত্রও জ্ঞান আছে, তার পক্ষে একথা বুঝা মোটেই কঠিন নয় যে, শেরক, মূর্তিপূজা ও জাহেলী রসম রেওয়াজকে নির্মূল করার জন্য কুরআন যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সেটাই সবচেয়ে কার্যকর ও ফলপ্রসূ পদ্ধতি। মোট কথা হলো মোশরেক জাতির মধ্যে যে যে ধরণের এবং যে যে আকৃতির পূজা উপাসনা চালু রয়েছে, সেগুলোকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া এবং গায়রুল্লাহর জন্য তার সবগুলোকে নিষিদ্ধ করা। পৃথিবীতে ইবাদাতের ক্ষেত্রে একত্ববাদ এবং তার মাধ্যমে আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা এই কৌশল ছাড়া সম্ভব ছিল না। এটা মানুষের জন্মগত ও মজ্জাগত স্বভাব যে, সে যাকেই নিজের মালিক, মনিব ও আশ্রয়স্থল মনে করে, তার কাছে সে মান্নত ও কুরবানী নিবেদন করবেই। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই পদ্ধতির উপাসনা ধারা কম হোক বেশী হোক, পৃথিবীর সর্বত্র চালু রয়েছে। এমনকি অজ্ঞতাবশতঃ মুসলমানরাও এ ধরণের শেরেকী পূজা উপাসনায় লিপ্ত হচ্ছে। সুতরাং উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে এই পদ্ধতিটাও (কুরবানী ও মান্নত) যখন মানব জাতির মধ্যে প্রচলিত রয়েছে এবং এর প্রতি মানুষ মাত্রেরই এক ধরণের সহজাত আকর্ষণ বিদ্যমান, তখন মান্নত কুরবানীকেও গায়রুল্লাহর জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়ে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া ইবাদাতে একত্ববাদ ও একনিষ্ঠতা সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য। এ জিনিসটার বুদ্ধিমত্তা, নৈতিক ও বস্তুগত উপকারিতা যদি আপাত দৃষ্টিতে অনুভূত না হয় তবে সে জন্য দৃষ্টির স্থূলতা ও অপরাগতাই দায়ী। আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও গভীর প্রজ্ঞায় মানুষের একনিষ্ঠভাবে আল্লাহমুখী ও আল্লাহর অনুগত হওয়া যতখানি উপকারী ও কল্যাণকর, তাদের জন্য লক্ষ লক্ষ বড় বড় ব্যাংক বা হাজার হাজার কলেজ নির্মিত হওয়া তার সামনে কিছুই নয়।

কুরবানীর আরো একটা কল্যাণকর দিক রয়েছে এবং কুরআন সে সম্পর্কেও আলোকপাত করেছে।

এক শ্রেণীর মানুষের কথা তো উপরে উল্লেখ করা হলো। অর্থাৎ যারা স্রষ্টার সথে সৃষ্টকেও বিশ্বাস ও উপাসনার অংশীদার মনে করে এবং আল্লাহর দেয়া জীবিকার মধ্য থেকে মান্নত ও কুরবানী সৃষ্টির চরণে নিবেন করে থাকে। এর পাশাপাশি আর একটা শ্রেণী সর্বকালেই বিদ্যমান ছিল এবং এখন ক্রমেই তাদের চিন্তা ঘটছে। এরা আদৌ স্রষ্টায় বিশ্বাস করেনা। করলেও শুধুমাত্র গণিতের সূত্রের মত একটা অবধারিত যৌক্তিক সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে। তবে সেই বিশ্ববিধাতার সাথে মানুষের কোন সম্পর্ক থাকার কথা তারা মানে না। তারা এতটুকুও অনুভব করে না যে, দুনিয়ার যে সহায় সম্পদ তারা ভোগ করছে, যে ক্ষেতের ফসল তারা আহার করছে, যে জীবজন্তু দ্বারা তারা উপকৃত হচ্ছে, এ সবের কোন কিছুরই তারা মালিক মুক্তার নয়, এর কোন কিছুর ওপরই তাদের স্বতঃসিদ্ধ জন্মগত অধিকার নেই বরং এ সবই আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ মাত্র। এই উদাসীনতা ও চেতনাহীনতার দরুন তারা যে কত রকমের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও আচরণগত বিশৃংখলা ও অনাচারের শিকার হচ্ছে, তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। আজ যে কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি সেই সব অনাচার স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে। আল্লাহ এই সব অনাচার রোধ করার জন্যই ধনসম্পদ ও ফসল থেকে যাকাত এবং পশু সম্পদ থেকে কুরবানী দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। উদ্দেশ্য শুধু এই যে, আল্লাহ মানুষকে যে জীবিকা ও সম্পদ দান করেছেন তার একটা অংশ সে নিয়মিতভাবে আল্লাহর দরবারে সমর্পন করতে থাকুক এবং এ কথা প্রতিনিয়ত স্মরণ করতে থাকুক যে, আমরা এ সব জিনিসের একচেটিয়া মালিক নই, বরং কোন স্বতঃসিদ্ধ অধিকার ছাড়াই এগুলো আমাদেরকে দান করা হয়েছে এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এগুলো ব্যয় ও ব্যবহার করার অধিকার আমাদের নেই। লক্ষ্য করুন, নিম্ন লিখিত আয়াতগুলোতে এই সত্যের দিকে কিরূপ সূক্ষ্ম ইংগীত করা হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ
وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ ...... كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ - وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ - (الانعام)

"তিনিই (সেই মহান সত্তা) যিনি বাগান সমূহ সৃষ্টি করেছেন, কতক বাগানে (ফলের) ছড়াগুলোকে ঘুরিতে চড়িয়ে দেয়া হয়, আর কতক বাগানে চড়ানো হয় না, আর তিনিই খেজুরের বাগান ও ফসলের ক্ষেত্র জন্মিয়েছেন........... এগুলোতে যখন ফল ধরে, তখন তোমরা ফল খাও এবং ফসল তোলার সময় আল্লাহর প্রাপ্য দাও। অপচয় করো না। আল্লাহ অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। তিনি বৃহদাকার ভারবাহী পশু এবং ক্ষুদ্রাকার পশু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর দেয়া এ সব জীবিকা থেকে আহার কর এবং শয়তানের পদানুসরণ করো না। (আনয়াম-১৪২, ১৪৩)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا
رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ
فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ
وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَ
الْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (الحج)

"আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে করে তারা আল্লাহর দেয়া পশুসমূহের ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। কাজেই মনে রেখ, তোমাদের খোদা সেই একই খোদা। তার কাছেই নতি স্বীকার কর। হে নবী! সেই সব বিনয়ী লোকদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও, যাদের মন আল্লাহর কথা শুনলেই কেঁপে ওঠে, যারা বিপদ মুসিবতে ধৈর্য্য ধারণ করে, নামায কায়েম করে এবং আমার দেয়া জীবিকা থেকে খরচ করে।" (সূরা হজ্জ-৩৪, ৩৫)

কুরবানী প্রথার এ হলো দ্বিতীয় কল্যাণকর দিক। যদি কারো কাছে বুদ্ধিবৃত্তিক দাড়িপাল্লা থেকে থাকে তবে সে যেন এই কল্যাণকর দিকটাকে এক পাল্লায় রাখে এবং যে সব জাতীয় প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও এতিমখানা ইত্যাদি চাঁদা দেয়ার জন্য হাদীস বিরোধী মহল কুরবানী বন্ধ করাতে চায়, সেগুলোকে যেন, অপর পাল্লায় রাখে। অতপর পরিমাপ করে তারা যেন আমাকে জানায় কোন পাল্লা বেশী ভারী।

এবার আসুন, অর্থনৈতিক আপত্তিগুলোও পর্যালোচনা করে দেখা যাক। আপনারা বলেন যে, এটা অর্থের অপচয়। কিন্তু কুরআন বলে যে, لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ "এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে।" কুরআন আরো বলেঃ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ "এ থেকে তোমরা নিজেরাও খাও এবং স্বচ্ছল ও অভাবী লোকদেরকেও খাওয়াও।" আজ তোমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে, যারা সাপ্তাহের পর সাপ্তাহ এবং মাসের পর মাস পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পায় না। তাদেরকে সদকা, হজ্বের কুরবানী এবং সাধারণ কুরবানীর মাধ্যমে গোশত সরবরাহ করাটা কি আপনাদের মতে অর্থনৈতিক মূলনীতির পরিপন্থী? লাখ লাখ সাধারণ মানুষ ও পশু পালক সারা বছর পশু পালন করে এবং বকরা ঈদের সময় তা বাজারজাত করে অর্থনৈতিক ফায়দা অর্জন করে। তাদের এই জীবিকার পথ রুদ্ধ করা কি আপনাদের মতে বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা? হাজার হাজার গরীব মানুষ কুরবানীর চামড়া এবং হাজার হাজার কসাই যবাই এর পরিশ্রমিক পায়। এরা সবাই কি আমাদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, তাদের জীবীকা সরবরাহকে আপনারা অপচয়, অর্থনাশ ও বেহুদা কাজ গণ্য করেন?

আল্লাহর কোন বিধান বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যখন টাকা পয়সা খরচ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, ঠিক তখনই সমস্ত জাতীয় প্রয়োজন এবং লাভলোকসানের কথা আপনাদের মনে পড়ে যায় কেন? এর পেছনে রহস্যটা কি? ভাবখানা এই যে, ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, জাতীয় প্রতিষ্ঠানাদির বিকাশ ও উন্নয়ন জনগণের ঈমান আকীদা ও

চরিত্র সংশোধন এবং এতিম বিধবাদের লালন পালনের যাবতীয় কর্মকান্ড যেন শুধুমাত্র কুরবানীর জন্যই আটকে রয়েছে। এই কুরবানীটা বন্ধ হলেই যেন ঐ সব জাতীয় প্রতিষ্ঠানে টাকার সয়লাব বয়েযাবে।

আপনাদের জাতীয় সংগঠন যদি এতই পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে যে, সারা ভারতের কুরবানীর টাকা সংগ্রহ করে আপনারা প্রতি বছর একটা করে বাণিজ্যিক ব্যাংক খুলতে পারেন, তা হলে বেশ তো, একটু করে প্রথমে সারা দেশের সিনেমা হল, বেশ্যাখানা এবং অপকর্ম ও অপচয়ের অন্য যতগুলো আড্ডাখানা রয়েছে, সেখানে আপনাদের আদায়কারী নিয়োগ করুন, যাতে ওখানে মুসলমানদের যে গাদাগাদা টাকা নষ্ট হচ্ছে, তা জাতীয় তহবিলে সংগৃহীত হওয়া শুরু হোক। এতে করে আপনি বছর বছর নয়, রোজ রোজই একটা করে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

তা ছাড়া আপনাদের মধ্যে যদি কিছু গঠনমূলক ক্ষমতা থেকে থাকে, তা হলে তা কুরবানীকে বন্ধ করার বদলে যাকাতকে চালু করার কাজে ব্যয় করে দেখুন না। যে সব জাতীয় প্রয়োজনের দোহাই পেড়ে আপনারা কুরবানী বন্ধ করার আবদার জানানো শুরু করেছেন, শুধুমাত্র যাকাত ব্যবস্থা চালু করে তার সবই পুরণ করা সম্ভব।

আমার শেষ কথা এই যে, একবার যদি মুসলমানদের মধ্যে এই মানসিকতার সৃষ্টি হয়ে যায় যে, ব্যয়বহুল ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো বন্ধ করে তার টাকা জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বাণিজ্যিক ব্যাংক ইত্যাদি কায়েমে খরচ হওয়া উচিত, তা হলে ব্যাপারটা শুধুমাত্র কুরবানীতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আগামীতে আরেক ব্যক্তি এসে বলবেন, " কোটি কোটি টাকা খরচ করে হজ্ব করা কেন? এর তো কোন উপকারিতা দেখিনা। এটা বন্ধ করতে হবে। এই টাকা দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক স্থাপন করতে হবে।" আসলে সমগ্র ব্যাপরটা মূল্যবোধের সাথেই যুক্ত। একবার যদি আমাদের চিরন্তন মূল্যবোধ

ধারণার মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল এবং তার পর ঐ সব বিপরীত মতাদর্শের মধ্যে আপোস-মীমাংসা হওয়ার মাধ্যমে তার একটা মিশ্রণ তৈরী হয়ে তা মানব সভ্যতার অঙ্গীভূত হয়ে চলেছে। কিন্তু তিনি ঘটনাবলীর অভ্যন্তরে ঢুকে এটা অনুসন্ধান করেননি যে, যে বিপরীত তত্ত্বসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজ করতো তার প্রকৃত ধরণটা কি, কেনইবা তাদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা হয় এবং এ আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে যে মিশ্রণ তৈরী হয়, তার ভেতর থেকে পুনরায় পরবর্তী সময়ে তার শত্রু জন্মে কেন। এই দ্বান্দ্বিক বিবর্তন ধারার বিশদ ও বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ না করে হেগেল তার ওপর এমনি দায়সারা দৃষ্টি দেন যেমন কোন পাখী আকাশে উড়ে যাওয়ার সময় কোন শহরের ওপর একটা ভাসাভাসা দৃষ্টি দিয়ে চলে যায়।

তবুও হেগেল যতটা উঁচু মানের চিন্তা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, মার্কসের কপালে তাও জোটেনি। তিনি মানুষের স্বভাব প্রকৃতি, তার গঠন ও বিন্যাস জানবার ও বুঝবার চেষ্টা করেননি। মানুষের বাহ্যিক কাঠামোতে অর্থনৈতিক চাহিদা সম্বলিত যে পাশবিক সত্তা দৃশ্যমান সেটা তিনি বেশ দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু বাইরের এ জৈব খোলটার ভেতরে তার যে মানব সত্তাটি লুকিয়ে রয়েছে, যে মানব সত্তার জন্য বাইরের পশুটাকে হাতিয়ার বানানো হয়েছে এবং যার স্বভাবসুলভ দাবী ও চাহিদা বাইরের পশুর প্রকৃতি থেকে বহুলাংশে পৃথক, সেটি তার চোখে পড়েনি। দৃষ্টির এই সংকীর্ণতা ও খর্বতার জন্য তার সামাজিক মতবাদগুলো সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিযুক্ত ও ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তিনি মনে করেন যে, ভেতরকার মানুষ বাইরের পশুর কেবল সেবক ও সাহায্যকারী নয়, বরং তার গোলামও। বিবেকবুদ্ধি, যুক্তি প্রদর্শন, চিন্তা-ভাবনা, তদন্ত ও অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, প্রজ্ঞা ও সৃজনশীলতার যে ক্ষমতা ও প্রতিভাসমূহ তাকে দেয়া হয়েছে তার সবই বাইরের পশুর ভোগ-বাসনা, চাহিদা, প্রয়োজন ও স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। সুতরাং ভেতরের মানুষটি স্বীয় মনিব অর্থাৎ বাইরের পশুর ইচ্ছা ও চাহিদা মোতাবেক নৈতিকতা ও আইন-কানুনের মূলনীতি তৈরী করা,

ধর্মীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং নিজের জীবন যাপনের পথ ও পদ্ধতি নির্বাচন করা ছাড়া আর কিছু এ যাবত করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না এবং করতে সমর্থও নয়। মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে এত হীন ও নিকৃষ্ট ধারণা এবং মানবীয় সভ্যতা সম্পর্কে এত নীচ ও জঘন্য মতামত পোষণ কিভাবে সম্ভবপর হয়, ভাবতেও অবাক লাগে। যে ইতরসুলভ মগজ থেকে এহেন ধারণার জন্ম হয় এবং যে নির্বোধ মন এরূপ মতামতকে গ্রহণ করে, তাদের উভয়কে ধিক্।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাইরের পাশবিক সত্তার অনুভূতি ও দাবী ভেতরকার মানবীয় সত্তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে থাকে। এ কথাও অনস্বীকার্য যে, অনেক মানুষ নিজের পশুত্বের কাছে হার মানে। কিন্তু মার্কসের এ ধারণা সর্বতোভাবে ভ্রান্ত যে, ভেতরের মানব সত্তা বাইরের পশু সত্তার ওপর মোটেই শাসকসুলভ কর্তৃত্ব খাটায় না। মানব সভ্যতার ইতিহাসকে তিনি এমন ভ্রান্ত দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করেছেন যে, সমগ্র সভ্যতাকে তিনি কেবল সেই সব মানুষের তৈরী রূপে দেখতে পেয়েছেন যাদের মনুষ্যত্ব তাদের পশুত্বের অনুগত ছিল। অথচ একটু স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে দেখলে তিনি দেখতে পেতেন যে, মানব সভ্যতার যা কিছু মহৎ, মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট উপাদান রয়েছে তা সেই সব মানুষেরই অবদান যারা পশুত্বকে জয় করে মনুষ্যত্বের শাসনাধীন করে নিয়েছিলেন এবং যারা নিজেদের প্রভাবান্বিত ব্যক্তিত্বের জোরে পশু স্বভাব মানুষগুলোর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে প্রভাবিত করে ভদ্রতা ও শালীনতা, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা এবং ন্যায় বিচার ও ইনসাফের শাশ্বত আদর্শ দ্বারা মানব জীবনকে অলংকৃত করেছেন।

হেগেল ও মার্কস যদি কুরআন পড়তেন, তাহলে মানব প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে এবং মানব সভ্যতার বিকাশের মৌল বিধি নিরূপনে এত হোঁচট খেতেন না, যা তারা খেয়েছেন আন্দাজ-অনুমান চালানোর কারণে। মানব তত্ত্ব ও ইতিহাস দর্শনের যে সব জটিল সমস্যায় তারা হাবুডুবু খেয়েছেন, কুরআন সে সব সমস্যার অভ্যন্তরে নির্ভুল ও তৃপ্তিদায়ক সমাধান দেয়।

কুরআনের দৃষ্টিতে মনুষ কেবল ক্ষুধা, কাম, ক্রোধ, লোভ ও ভয় ইত্যাকার উপসর্গ সম্বলিত পাশবিক সত্তার নাম নয়। বরং আসলে উপরের এই পাশবিক খোলের ভেতরে প্রচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক সত্তা ও নৈতিক বিধির প্রয়োগ ক্ষেত্রের নামই হলো "মানুষ"। অন্যান্য পশুর মত তাকে নৈতিক চাহিদা (Instinct) ও লালসার অসহায় গোলাম বানানো হয়নি, বরং তাকে বুদ্ধি-বিবেক, বাছ-বিচার ও নির্বাচনের ক্ষমতা এবং জ্ঞানার্জন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা দিয়ে খানিকটা স্বায়ত্ত শাসন (Autonomy) দেয়া হয়েছে। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় প্রকৃতি তাকে একটা গদবাধা পথে পরিচালিত করে না এবং তার প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণও সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে আপনা থেকে সংগৃহীত হবে, এমন নিশ্চয়তা দেয় না। বরঞ্চ আল্লাহ তাকে চেষ্টা-তদবীরের ক্ষমতা দিয়ে দুনিয়ায় স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন। কেননা তিনি চান, মানুষ যা কিছু অর্জন করতে চায় নিজ চেষ্টা দ্বারা অর্জন করুক, নিজের চেষ্টা সাধনার যে পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে চায় করুক এবং স্বেচ্ছায় গৃহীত পথ ধরে সে যতদূর অগ্রসর হতে চায় হোক। এই স্ব নির্বাচনী ক্ষমতার মালিক, এই চেষ্টা-তদবীরের সামর্থের অধিকারী এবং চেষ্টা-তদবীরের গতিপথ ও পন্থা স্বেচ্ছায় বাছাইকরী আত্মার নামই হলো মানুষ।

আর বাইরের যে পশু সত্তাটি রয়েছে, সেটি সরবরাহ করা হয়েছে এই অভ্যন্তরীণ মনুষের ভৃত্য ও হাতিয়ার হিসেবে। এই ভৃত্যটি অজ্ঞ। তার কছে আছে কেবল কামনা-বাসনা ও দৈহিক চাহিদা। তার লক্ষ্য কেবল ইপ্সিত ভোগের উপকরণ অর্জন করা এবং নিজের চাহিদা পূরণ করা। এই ভৃত্য ভেতরকার মনুষটিকে উল্টো নিজের গোলাম বানাতে চায় এবং তার সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানগত ক্ষমতা-যোগ্যতা সমেত নিছক তার জৈব কামনা বাসনাকে চরিতার্থ করার ক্রীড়নকে পরিণত হতে বাধ্য করতে চায়। তার চিন্তার উড্ডয়নকে উর্ধগামী না হয়ে নিম্নগামী হতে উদ্বুদ্ধ করে। তার দৃষ্টিকে সংকীর্ণ করে। তাকে ইন্দ্রিয়ানুগামী ও ভোগ লিপ্সার গোলাম বানাতে চায় এবং তার ভেতরে জাহেলিয়াত সুলভ বিদ্বেষ ও আভিজাত্যবোধ সৃষ্টি করে।

পক্ষান্তরে ভেতরে অবস্থানরত মানুষটির স্বভাবসুলভ অভিলাস বাইরের পশুটিকে নিজের ভৃত্য ও সেবকে পরিণত করে। আল্লাহ তাকে পাপ-পূণ্য সম্পর্কে ঐশী জ্ঞান দান করেছেন। ভালো-মন্দের ভিন্ন ভিন্ন পথ চেনা ও বাছাই করার সামর্থ দিয়েছেন। তার ভেতরে এমনএক নৈতিক চেতনা ও অনুভূতি জাগিয়ে দিয়েছেন যা জাগিয়ে দিয়েছেন যা স্বগতভাবেই দাবী জানায় যে, সে যেন তার জৈবিক ও পাশবিক প্রয়োজনকেও পশুসুলভ পথে নয় বরং মানবচিত পন্থায় চরিতার্থ করে। পাশবিক পন্থা অবলম্বন করতে তার আপনা থেকেই লজ্জা বোধ হয়। কেননা তার জীবন-লক্ষ্য পাশবিক জীবন-লক্ষ্যের চেয়ে উচ্চতর ও মহত্তর। সে চায় একটা উচ্চতর মর্যাদা বিশিষ্ট সত্তায় পরিণত হতে। জন্মগতভাবেই তার ভেতরে এরূপ আকাংখা ও অনুভূতি বিদ্যমান যে, তার জীবন একটা শ্রেষ্ঠতর ও উৎকৃষ্টতর লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিবেদিত।

সমগ্র মানবেতিহাস প্রকৃত পক্ষে ভেতরের মানব সত্তা ও বাইরের পশু সত্তার মধ্যে বিরাজিত দ্বন্দ্ব ও লড়াইয়েরই খতিয়ান। বাইরের পাশবিক শক্তি মানুষকে অব্যাহতভাবে নীচের দিকে টানে এবং নিজের অনুগত করে তকে দিয়ে জীবনের বক্র ও পিচ্ছিল কানাগলির সৃষ্টি করায়। সে সব কানাগলিতে রয়েছে কেবল জুলুম ও অন্যায়, অশ্লীলতা ও দুষ্কর্ম, পাপাচার ও ব্যাভিচার, ভোগ-লিপসা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব এবং মানবীয় সম্পর্ক ও সম্বন্ধের অসমতা ও ভারসাম্যহীনতা। ভেতরের মানুষটি এ পরিস্থিতিতে অস্থির ও অশান্ত থাকে এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু বাইরের পশুটিকে বশ মনানোর চেষ্টায় সে অন্য কয়েকটি বাঁকা পথ অবলম্বন করে। সে বাঁকা পথে রয়েছে বৈরাগ্য ও সন্যাস ব্রত, প্রবৃত্তি হনন ও স্বভাব সুলভ চাহিদা ও প্রয়োজনকে পাশ কাটানো এবং সভ্যতা ও সমাজ জীবনের দায়দায়িত্ব থেকে পলায়নী মোনোবৃত্তি। বাইরের পশুটিও এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় এবং তাকে তার বাঁকা পথের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

বিপরীত মুখী চরমপন্থী এই উভয় শক্তি বারংবার আপন শক্তি প্রদর্শন করে। উভয়ের প্রভাবে এমন কিছু মতবাদ, মতাদর্শ ও

নীতিমালার উদ্ভব হয়, যার ভেতরে সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায় উভয় রকমের উপাদানের মিশ্রণ ঘটে। কিছুকাল যাবত মানুষ এই মিশ্র নীতিমালার পরীক্ষা–নীরিক্ষা চালাতে থাকে। অবশেষে তার মূল স্বভাব, যা সচেতন বা অবচেতনভাবে "সিরাতুল মুস্তাকীম" (সরল সঠিক পথ) এর জন্য উদগ্রীব থাকে, বাঁকা পথগুলোর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তার বাতিল উপাদানগুলোকে ছাটাই করে দূরে নিক্ষেপ করে এবং মানব জীবনে শুধুমাত্র নির্ভেজাল সত্য ও ন্যায়ের উপাদানগুলো অবশিষ্ট থেকে যায়।

كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا
مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (الرعد-١٧)

"এভাবেই আল্লাহ্ হক ও বাতিলের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যে টুকু ফেনা থাকে, তা কোন কজে লাগে না। আর যেটুকু মনুষের যথার্থ উপকারী, তা মাটিতে স্থির হয়ে টিকে থাকে" (সূরা রা'দ)।

কিন্তু চরমপন্থী একটি গোষ্ঠীর ব্যর্থতার পর আর এক গোষ্ঠী সক্রিয় হয়। আবার কিছুকাল সংঘাত–সংঘর্ষ চলে। অতপর মনুষের সহজাত বৃত্তি একই কারণে আগের মতই হক ও বাতিলের জগাখিঁচুড়ি গোষ্ঠীকে প্রত্যাখ্যান করে।

এভাবে ইতিহাসের আবর্তনকালে মানবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ একটি বক্র রেখার আকারে সম্পন্ন হয়ে আসছে। এই বক্র রেখা বারবার একটা সরল রেখার আশপাশ দিয়ে চক্কর দিতে থাকে। এর নমুনা স্বরূপ নিম্নের চিত্রটি লক্ষ্যণীয়ঃ

এই চিত্রে ক–খ রেখাটি মানব জীবনের একমাত্র স্বাভাবিক পথ। কুরআনে এই পথটাকেই সিরাতুল মুস্তাকীম, হেদায়াত, ন্যায়নীতি, সরল পথ, আল্লাহর পথ ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে। মানব জাতি তার সূচনা লগ্নে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً (البقرة-٢١٣) "মানুষ একক উম্মাত ছিল" (বাকারা–২১৩)। অতপর তাদের মধ্যে সীমা অতিক্রমের প্রবণতা জন্মে

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ

بَغْيًا بَيْنَهُمْ (بقره ٢١٣)

"আল্লাহর কিতাবে কেবল তারাই মতবিরোধের সূত্রপাত করলো যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল এবং নির্ভুল জ্ঞান লাভের পর নিজেদের মধ্যে বাড়াবাড়ি করেই তারা এই মতবিরোধের সূচনা করলো" (বাকারা-২১৩)। এই সব ঝোঁক প্রবণতা মানুষকে বারবার সিরাতে মুস্তাকিম থেকে হটিয়ে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। প্রত্যেকবার তিক্ত অভিজ্ঞতা ও মূল মানবীয় স্বভাবের অস্থিরতার কারণে মানুষ স্বভাবসিদ্ধ সরল পথে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু সে সঠিক পথে এসে পুনরায় বিপথগামী হয়, অতপর পুনরায় সঠিক পথে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

হেগেল যাকে দাবী ও পাল্টা দাবী বলেন, সেটা এই সব চরমপন্থী প্রবণতা ছাড়া আর কিছু নয়, যা মানুষকে কখনো সরল রেখার এদিকে, কখনো ওদিকে টেনে নিয়ে যায়। আর যেটিকে তিনি সমন্বয় ও সংমিশ্রণ বলেন সেটা বক্র রেখা ঘুরে ঘুরে যেখানে সরল রেখার সাথে মিলিত হয়ে এ পাশ থেকে ওপাশ চলে যায়, সেই মিলন বিন্দু।

হেগেল ও মার্কস উভয়ে ইতিহাসের এই বাঁকা রেখাটি দেখতে পেয়েছেন কিন্তু সরল রেখাটি দেখতে পাননি, যা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সোজা টানা রেখা। মানুষের আদি স্বভাব এই পথে চলার জন্যই উদগ্রীব থাকে। প্রত্যেক মানুষের মন সাক্ষ্য দেয় যে, এই সব বক্র রেখার মধ্যেই সরল রেখাটি বিদ্যমান। সেই পথটি অনুসন্ধানের অস্থিরতা প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে বিরাজ করছে।

একমাত্র নবীদেরই এই "সিরাতুল মুস্তাকীম" জানা ও চেনা ছিল। তারা বারবার এসে মানুষকে এই মধ্যবর্তী পথের দিকে ডেকেছেন এবং এই সোজা-সরল রেখার ওপর মানব সভ্যতাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحديد : ٢٥)

"আমি আমার রসূলদেরকে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দিয়ে পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও দাড়িপাল্লা নাযিল করেছি, যাতে মানুষ ন্যায় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়" (হাদীদ–২৫)।

(তরজুমানুল কুরআন, জমাদিউল উখরা–১৩৫৮ হিঃ, আগষ্ট, ১৯৩৯)

তরজমানুল কুরআনের জনৈক পাঠক নিম্নরূপ প্রশ্ন করেছেনঃ

"ডারউইনের বিবর্তনবাদ বা ক্রমবিকাশ তত্ত্ব আধুনিক যুগের একটি অন্যতম সর্বস্বীকৃত মতবাদ। কিন্তু কুরআন অধ্যয়ন করার সময় বার বার মনে হয় যে, উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে সুস্পষ্ট বৈপরিত্য বিদ্যমান। সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে যে জিনিসটা এক নজরেই ধরা পড়ে সেটা এই যে, কুরআনে যাকে মানুষ বলা হয়েছে, সে প্রথম দিন থেকেই মানুষ ছিল–অন্য কিছু ছিল না। এক নির্দিষ্ট দিনে এক সৃজনী পদক্ষেপের মাধ্যমে তাকে সৃষ্টি করা হয়। অতপর তার থেকেই মানব বংশধরের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু আমাদেরকে যে সব প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পড়ানো হয়, তার বক্তব্য এই যে, পশু থেকে ক্রমান্বয়ে উন্নতি ও বিকাশ লাভ করতে করতে মানুষের উদ্ভব হয়েছে। এই ধারাবাহিক বিকাশ ও রূপান্তর প্রক্রিয়ার কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে আংগুল রেখে বলা যাবে না যে, এই স্তর পর্যন্ত এসে পশুত্বের বিলুপ্তি ও মনুষ্যত্বের সূচনা হয়েছিল। মনুষ্যত্বের এই সূচনাপর্ব সম্পর্কেই কুরআন বলেছেঃ وَاِذَا نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ "অতপর যখন আমি তার ভেতরে আমার আত্মা সঞ্চালিত করবো, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পতিত হবে" (সূরা সোয়াদ–৭২, সূরা হিজর–২৯)। কুরআন ও ক্রমবিকাশবাদের বৈপরিত্য নিরূপণে এ আয়াত কেবল একটা সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। আসলে সৃষ্টিতত্ত্বের এমন বহু বিশদ বিবরণ রয়েছে, যেখানে এই দুটো উৎসের বক্তব্য পরস্পরের সাথে সংঘর্ষশীল। এসব দেখে একজন বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে ঈমান বাঁচানো অসম্ভব। আপনি কি এ সমস্যার কোন সমাধান দিতে পারেন?"

পত্র লেখক ভদ্রলোক তার এ প্রশ্নটি এত প্রাণচঞ্চল ও সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন যে, এর পর এ মীমাংসার জন্য

ডারউইনের বিবর্তনবাদের যুক্তি-প্রমাণ যাচাই করার কোন দরকার হয় না। শুধুমাত্র এটুকুই অনুসন্ধান করার প্রয়োজন থাকে যে, ডারউইনের উদ্ভাবিত ক্রমবিকাশ তত্ত্ব একটা প্রমাণিত সত্য,না শুধুই একটা মতবাদ? আর যদি তা কেবল একটা মতবাদই হয়ে থাকে, তবে এটা কি যথার্থই এতখানি গুরুত্বপূর্ণ যে, ঐ মতবাদ সামনে এসে যাওয়ার পর একজন মুসলমান দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যেতে বাধ্য হবে যে, ওটা মানবো,না কুরআন মানবো?

এই অনুসন্ধানী প্রশ্নের জবাবে সর্বপ্রথম যে বিষয়টা জানা প্রয়োজন, তা হলো এই যে, ডারউইনের মতবাদ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যেমন একটা নিরেট মতবাদ ছিল, তেমনি আজ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও তা নিছক একটা মতবাদই রয়ে গেছে। আজও তা বাস্তবে (Fact) পরিণত হতে পারেনি। মতবাদ ও বাস্তবতার প্রভেদ কোন শিক্ষিত ব্যক্তির অজানা থাকার কথা নয়। এ কথা কারো বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, কোন জিনিসের ওপর মানুষের বিশ্বাস স্থাপন করার পর সেই বিশ্বাস পুনর্বিবেচনা করার প্রশ্ন কেবল তখনই উঠতে পারে, যখন একটা প্রমাণিত সত্যের সাথে তার বিশ্বাস করা বিষয়ের সংঘর্ষ ও বিরোধ ঘটে। যে বিশ্বাস আন্দাজ-অনুমান ও মতবাদের আঘাত সইতে পারে না, সেটা বিশ্বাস নয়, বরং নিছক একটা সুধারণা বিশেষ। এ জাতীয় সুধারণা একটা মামুলি গুজব শোনা মাত্রই কুধারণায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের এই বাস্তব রূপ দৃষ্টিতে রেখে এবার তার তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক মান যাচাই করে দেখুন। জীব বিজ্ঞানের (Biology) জটিলতম যে সমস্যাটির বৈজ্ঞানিকরা আজও কোন কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছে না, তাহলো এই যে, জীবনের উৎস কি। কুরআন এ প্রশ্নের জবাব দেয় এই যে, জীবনের উৎস হলো আল্লাহর হুকুম। নিষ্প্রাণ জড় পদার্থে আল্লাহর আদেশক্রমেই প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্যের রেনেসাঁ যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ ও উন্নয়ন যাদের হাতে সম্পন্ন হয়ে আসছে, তারা সব সময় এই (Super natural) কর্তৃত্ব ও কারিগরি

স্বীকার করা ও অনুভব করাকে যেভাবেই পারা যায় পাশ কাটিয়ে যাওয়া চাই। এ সৃষ্টি জগতের আওতার মধ্যেই কোথাও এর কার্যনির্বাহী শক্তির সন্ধান পেতে হবে এটাই ছিল তাদের কাম্য। এই মৌলিক ত্রুটির কারণেই তাদের কতগুলো জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় এবং তার সমাধানের জন্য তাদেরকে নানা রকমের আন্দাজ-অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়। আন্দাজ-অনুমানের সাহায্যেই তারা জীবনের সূচনা সংক্রান্ত বিশ্বাসের জটিলতা নিরসনের চেষ্টা চালায়। জীবের এত বৈচিত্র ও রকমফের কেন এবং রকমারি জীবনের মধ্যে একটির চেয়ে অপরটির শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি। এ প্রশ্নের সমাধানও তারা আন্দাজ-অনুমানের সাহায্যেই করতে সচেষ্ট হয়েছে। এ রকম অনুমানের পথ ধরে যারা এ সব প্রশ্নের সমাধান খুঁজেছে, ডারউইন তাদেরই একজন। তিনি নিজে কখনো বলেননি যে, প্রকৃত সত্যের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। তার মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে যারা প্রকৃত বিজ্ঞানী তারাও তাদের আন্দাজ অনুমানকে কখনও সত্য ও বাস্তব বলে দাবী করেননি। অথচ যাদের গায়ে বিজ্ঞানের একটুখানি বাতাস লেগেছে, তারা এ মতবাদ নিয়ে এত গলাবাজি করে যে, মনে হয় যেন প্রকৃত সত্য তাদের সামনে পুরোপুরি উম্মোচিত হয়ে ধরা দিয়েছে।

গবেষণা ও অনুসন্ধানের শুরুতেই যদি ডারউইন কুরআনের সূচনাবিন্দু (Starting paint) থেকে যাত্রা আরম্ভ করতেন তা হলে তিনি এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতেন যে, জীবনের যে রূপবৈচিত্র ও একটির তুলনায় আর একটির শ্রেষ্টত্ব ক্ষুদ্রতম পরমাণু থেকে শুরু করে মানুষের মধ্যে পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়, তা এক দক্ষ কুশলীর পরিকল্পনার (Desing) ফল ছাড়া আর কিছু নয়। সেই মহা বিজ্ঞানী শ্রষ্টা রকমারি জীবের জন্য অনুকূল পরিবেশ ও উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরী করার পর তাদেরকে নিজ নিজ শ্রেণীগত মান অনুসারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করে চলেছেন আর তার নীল নকশায় যে শ্রেণীর জীবের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, তাদেরকে নিপাত ও নির্মূলও করে চলেছেন। কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে, এ সব লোক কোন অতিপ্রাকৃতিক পরিকল্পনাবিদের (Designer) অস্তিত্ব মানতে রাজী

নয় এবং তার কারখানায় তার কর্তৃত্বের চিহ্ন দেখতে ইচ্ছুক নয়। এ জন্য যে সব নিদর্শন তাদের পর্যবেক্ষনে আসে, তার ব্যাখ্যা তারা এমনভাবে করতে চায় যাতে করে এই কারখানা আপনা থেকে চলে ও বিকাশ লাভ করে বলে মনে হতে পারে। এ জন্যই ডারউইন সৃষ্টির বৈচিত্র ও আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা তার নিজের নামে খ্যাত ক্রমবিকাশ তত্ত্ব দ্বারা করেছে। আর যে ইউরোপ যুক্তির অভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা নাস্তিকবাদকে এ যাবত গায়ের জোরে ঠেলে চালিয়ে নিয়ে আসছিল, ডারউইনবাদের কৃত্রিম পা খানি সে পরম উৎসাহে গ্রহণ করলো। অতপর এই পা শুধু বিজ্ঞানের সব ক'টি শাখাতেই নয়, বরং দর্শন, নৈতিকতা ও সমাজ বিজ্ঞানের শাখাগুলোতেও সে যুক্ত করে দিল। অথচ তাত্বিক ও বুদ্দিবৃত্তিক বিচারে ডারউইনের ব্যাখ্যায় এত গোঁজামিল ছিল এবং রয়েছে যে, কোন সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষের পক্ষে তাকে দৃশ্যমান সৃষ্টি বৈচিত্রের বিবেচনাযোগ্য ব্যাখ্যা হিসেবে মেনে নেয়া কঠিন।

জটিল ও সুক্ষ্ম তাত্বিক সমালোচনায় না গিয়ে আমি একটি উদাহরণ দ্বারা আপনাকে ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদের আসল ও মৌলিক ত্রুটি বুঝাতে চেষ্টা করবো। মনে করুন, মঙ্গলগ্রহ থেকে বিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক কতিপয় শিষ্যকে সাথে নিয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে এলেন। আপাতত এও ধরে নিন যে, এ আগন্তুকদের দৃষ্টি শক্তিতে এমন একটা দুর্বলতা রয়েছে, যার দরুন তারা এখানে মানুষকে দেখতে পান না। তবে মানুষের শিল্পকর্ম এবং তার প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার উপকরণ ও সাজসরঞ্জামকে ভালোভাবেই দেখতে পান। এই অনিসন্ধিৎসু অধ্যাপক এখানে মানুষের যে সব শিল্পকর্ম দেখতে পান, তাতে আকৃতি ও গুণাগুণের দিক দিয়ে বিস্তর তারতম্য তার স্পষ্টতই নজরে পড়ে। তিনি এও দেখতে পান যে, ঐ সব বস্তুর কোন কোনটি অপর কোন কোন বস্তু থেকে উত্তম। অনুসন্ধানকালে তিনি আরো বুঝতে পারেন যে, কোন কোন জিনিস আগে প্রচলিত ছিল না, পরে প্রচলিত হয়েছে। কোন কোনটি আদিমকাল থেকেই প্রচলিত ছিল এবং এখনো রয়েছে। কোনটি আবার আগে প্রচলিত

ছিল কিন্তু এখন নেই। কিছুকাল যাবত তিনি এই বিক্ষিপ্ত দৃশ্যপটের জিনিসগুলোকে আপন মনে শ্রেণী বিন্যস্ত করার চেষ্টা করতে থাকেন। অবশেষে রকমারি জিনিসকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাকে মান অনুসারে সাজিয়ে রাখেন।

এরপর তার অনুসন্ধান কার্য আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়। এ পর্যায়ে তিনি এই সব রকমারি ও বিবিধ মানের জিনিস কিভাবে তৈরী হলো এবং এসব জিনিসের প্রকার ভেদ, আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব কোনটার বহাল থাকা ও কোনটার বিলীন হয়ে যাওয়ার কারণ কি এবং কোন বিধি অনুসারে এসব পরিবর্তন ঘটে তা জানার জন্য কৌতুহলী হয়ে ওঠেন।'

এ প্রশ্নের একটা সম্ভাব্য জবাব এই ছিল যে, এখানে খুব সম্ভবত এমন কোন সত্তা বিরাজমান যা এসব বস্তুকে নিজের বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ ও প্রয়োজনের তাগিদে তৈরী করে থাকে। যে জিনিসের প্রয়োজন অব্যাহত রয়েছে তা প্রস্তুত করে চলেছে, যার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, তা বানানো বন্ধ করে দিয়েছে এবং যে জিনিসের প্রয়োজন অন্য কোন আকৃতি বিশিষ্ট জিনিস দ্বারা অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনকভাবে পূরণ হচ্ছে তা বানানো পর্যায়ক্রমে বাদ দিয়ে চলেছে। কিন্তু কোন অজানা কারণে মঙ্গল গ্রহের এই গবেষক এ ধরনের কোন সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করা এড়িয়ে যেতে চান। এ জন্য তিনি তার আন্দাজ-অনুমানকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে দৃশ্যপটের ব্যাখ্যা অন্য একটা উপায়ে দিতে আরম্ভ করেন। তিনি অনুমান করেন যে, এই সমস্ত শিল্প কর্মের সূচনা সম্ভবত একটি মাত্র আদি বীজাণু থেকেই হয়েছে। অতপর তার বিকাশ বৃদ্ধি শুরু হয়েছে এবং অমুক অমুক পরিবেশগত কারণে এই জিনিসগুলোর বিবিধ শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছে। অতপর এই শ্রেণীগুলো পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। প্রত্যেকে পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানো ও পারিপার্শ্বিক শক্তিসমূহের দ্বারা লাভবাণ হবার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। এই সংঘাতময় প্রতিযোগিতায় যে শিল্প কর্মগুলো অকৃতকার্য হয়েছে, সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যারা কৃতকার্য হয়েছে, পরিবেশ

তাদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্য বাছাই করেছে। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতই এই জিনিসগুলোর আকৃতিগত ও গুণগত বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হয়েছে আর এই টিকে থাকার লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই এক শ্রেণীর জিনিস উন্নতি সাধন করে, ভিন্ন ধরণের জিনিসে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে।

উদারহরণ সরূপ, তিনি অনুমান করলেন যে, ঠেলাগাড়ীর গোষ্ঠী বড় হওয়ার জন্য দীর্ঘদিন যাবত পরস্পরের সাথে প্রবল প্রতিযোগিতা চালায়। অবশেষে তাদের মধ্যে যে ঠেলাগাড়ীগুলো অপেক্ষাকৃত যোগ্যতা ও ক্ষমতার পরিচয় দেয়, তাদের কলেবরে পরিবর্তন দেখা দিতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত তা ভ্যানগাড়ীতে রূপান্তরিত হয়। অতপর ভ্যানগাড়ীগুলো আবার প্রতিযোগিতা শুরু করে। এই ভ্যানগাড়ীগুলোর মধ্যে যেগুলো অপেক্ষাকৃত করিৎকর্মা ও যোগ্যতর ছিল, তাদের অবয়বে আবার পরিবর্তন সূচিত হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত তা মোটর গাড়ীর রূপধারণ করলো। পরবর্তী সময় কিছু কিছু মোটরগাড়ী উঁচু উঁচু গাছপালা, ভবন ও বাড়ী দেখে তার ছাদে ওঠবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলো। এই ঔৎসুক্যের বশে কোন কোন মোটর গাড়ী ওপর মুখী লম্ফ-ঝম্প দিতে আরম্ভ করলো। লাফাতে লাফাতে কারো কারো পাখা গজাতে আরম্ভ করে এবং শেষ পর্যন্ত তা উড়ো জাহাজে পরিণত হয়।

এই দোর্দন্ড প্রতাপ গবেষকের সাথে মঙ্গল গ্রহের বিজ্ঞান কলেজ থেকে যে কয়জন ছাত্র এসেছিল, তারা বললো যে, স্যার, ঠেলাগাড়ী থেকে ভ্যানগাড়ী, ভ্যানগাড়ী থেকে মোটর গাড়ী এবং মোটর গাড়ী থেকে উড়োজাহাজ পর্যন্ত যে পর্যায়ক্রমিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া চলেছে, সে প্রক্রিয়ায় ঠেলাগাড়ী থেকে ভ্যানগাড়ীর মাঝখানে, ভ্যানগাড়ী থেকে মোটর গাড়ীর মাঝখানে এবং মোটর গাড়ী থেকে উড়োজাহাজের মাঝখানে এমন বহুসংখ্যক বিকাশমান স্তর থাকা চাই, যা এখনো অতিক্রম করা হয়নি। এই মধ্যবর্তী স্তরে প্রতি পদে পদে পরিবর্তনশীল কলেবরের বিভিন্ন গাড়ীর বহর চোখে পড়ার কথা। যেমন ঠেলাগাড়ী থেকে ভ্যানগাড়ীতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় মাঝপথে এমন বহু শ্রেণীর গাড়ী নজরে আসা

দরকার যারা এখনো আংশিক ভ্যান গাড়ী সদৃশ রয়ে গেছে এবং যাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই কিছু কিছু মোটর গাড়ীর চেহারা ফুটে উঠেছে। অনুরূপভাবে যে সব মোটর গাড়ী উড়োজাহাজে পরিণত হওয়ার পথে, তাদেরও এমন বহু শ্রেণী নজরে আসা চাই, যাদের সবে পাখা গজাতে শুরু করেছে।

এ প্রশ্ন শুনে অধ্যাপক সাহেব কিছুক্ষণ ভাবলেন। তার পর বললেন, মধ্যবর্তী এই শ্রেণীগুলো অবশ্যই থেকে থাকবে। ভ্যানগাড়ী তো ঐ দেখ তোমাদের সামনেই রয়েছে। এই গাড়ী রূপান্তরের প্রাথমিক পর্যায়ে বেশীর ভাগ ভ্যানগাড়ী এবং সামান্য কিছু মোটর গাড়ীর রূপ ধারণ করেছে। এরপর অর্ধেক ভানগ্যাড়ী ও অর্ধেক মোটর গাড়ীর আকারে রূপান্তরিত হয়েছে। তারপর বেশীর ভাগ মোটর গাড়ী ও সামান্য কিছু ভ্যানগাড়ী সদৃশ হয়েছে। আর কিছুদিন পর তা পুরোপুরি মোটর গাড়ীতে পরিণত হয়ে গেছে। এই পূর্ন রূপান্তরিত মোটর গাড়ীই তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ। অতপর মোটর গাড়ী আবার উন্নতির পথে যাত্রা করে। প্রথমে তার পাখা গজায়। অতপর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য অংশের রূপান্তর ঘটতে ঘটতে পূর্ণ উড়োজাহাজে পরিণত হয়। এই উড়োজাহজই বর্তমানে তোমরা উড়তে দেখতে পাচ্ছ। মধ্যবর্তী স্তরের এই অসম্পূর্ণ বিকশিত যানবাহনগুলো কোথাও না কোথাও অবশ্যই পাওয়া যাবে। যাও, মাটির ঢিবি খোদাই কর এবং অনুসন্ধান চালাও।

শিক্ষক এতটুকু বলেই ক্ষ্যান্ত হলেন। কিন্তু তার ছাত্ররা যেহেতু মঙ্গল গ্রহ থেকে আসার সময়ই মানুষের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিদ্বেষ পুষে নিয়ে এসেছিল তাই তারা শিক্ষকের চমকপ্রদ আবিষ্কারে এমন প্রবল বিশ্বাস স্থাপন করলো যে, শিক্ষক যেখানে "সম্ভবত" এবং "মনে হয়" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে ছিলেন তারা তার কথার ভেতর থেকে এই শব্দগুলো বাদ দিয়ে তার বক্তব্যকে "নিশ্চয়ই" এবং "অবশ্যই" জাতীয় শব্দ প্রয়োগ করে উপস্থাপিত করতে শুরু করলো।

ডারউইনের এই ভাব শিষ্যরা তাদের তাত্ত্বিক বক্তৃতাসমূহে ঠেলাগাড়ী, মোটর গাড়ী ও উড়োজাহাজের মধ্যবর্তী স্তরের সংক্রান্ত

অনুমান সর্বস্ব বিলুপ্ত রূপের কথা এমনভাবে বলে থাকে, যেন এগুলো তাদের জাদুঘরেরই কোথাও পড়ে আছে। অথচ অস্তিত্ব যদি কিছুর থেকে থাকে তবে একমাত্র ঠেলাগাড়ী, ভ্যানগাড়ী অথবা উড়োজাহাজেরই রয়েছে। মধ্যবর্তী কিছুর নয়।

ডারউইনের মতবাদ ও তার অনুসারীদের বেলায় উপরোক্ত উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। এই মতবাদের মূল সাহিত্য ভান্ডার যদি আপনি পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, তা পুরোপুরি আন্দাজ, অনুমান ও কল্পনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ বিজ্ঞানে কল্পনাকে নয় বাস্তবকে এবং অনুমানকে নয় প্রামাণ্য ও অকাট্য সত্যকেই গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। আমি জানতে চাই যে, বিজ্ঞানে যিদ আন্দাজ-অনুমানেরই গুরুত্ব থেকে থাকে তা হলে এক অনুমানের সাথে আর এক অনুমানের পার্থক্য কেন থাকবে? বিশেষত এই অনুমানের চেয়ে আর এক অনুমান যখন খানিকটা বেশী যুক্তিযুক্ত মনে হয়, তখন তো কথাই নেই। পৃথিবীর বাস্তব দৃশ্যপটে বিরাজমান বস্তু নিয়ে ও তার বিকাশ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যায় আপনি যদি ডারউইনের "মনে হয়" কে মেনে নিতে প্রস্তুত থেকে থাকেন, তা হলে তার "মনে হয়"-এর চেয়ে আমার "মনে হয়" অনেক বেশী বাস্তব সম্মত। আমার বক্তব্য এই যে, জীবনের সূচনা এবং প্রাণীকূলের বৈচিত্র ও আপেক্ষিক শ্রেষ্টত্ব সব কিছুই এক মহাকুশলী সত্তার নির্দেশ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনারই ফল বলে মনে হয়। আমার এই অনুমান ডারউইনের অনুমানের চেয়ে নিপূনভাবে সকল দৃশ্যমান জিনিসের ব্যাখ্যা দেয়। এতে কোন প্রশ্ন জবাবহীন থাকে না। সর্বোপরি এটির গ্রহণযোগ্যতার কারন এই যে, ডারউইনবাদের পক্ষে যখন কোন ব্যক্তি নিশ্চিয়তার সাথে " মনে হয়" এর চেয়ে বেশী কিছু বলতে সক্ষম নয় তখন আমার বক্তব্যকে এমন বহু লোক পূর্ণ দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার সাথে সত্য ও বাস্তব বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন যারা সমসাময়িক মানব সমাজে সর্বাপেক্ষা সৎ লোক ছিলেন এবং যাদেরকে কখনো মিথ্যা বলতে দেখা যায়নি। এই সব বিশ্বস্ততম মানুষ বলেছেন যে, এটাই সত্য ও বাস্তব ব্যাপার এবং আমরা স্বচক্ষে দেখেই বলছি যে,এটাই সত্য। তা হলে বিজ্ঞানের ছাত্রদের

এদিকে না এসে ওদিকে যাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া খোদাবিমুখতা (Theophobia) ছাড়া কি এর আর কোন কারণ থাকতে পারে? যদি তাই হয় ,তা হলে লোকেরা 'গোয়ার্তুমী'কে জ্ঞান নামে আখ্যায়িত করেছে কেন, এটাই আমি বুঝে উঠতে পারি না।

তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিচারে এ মতবাদে যে সব দুর্বলতা ও গলদ রয়েছে,সে কথা না হয় বাদই দিলাম। কেবল দর্শন, নৈতিকতা এবং সমাজ ও সভ্যতার নিয়ামক জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনুপ্রবেশ করে এই বর্বরোচিত মতবাদ যে মারাত্মক সর্বব বিধ্বংসী বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে সেটা লক্ষ্য করলে কোন বিবেকবান মানুষই বিচলিত না হয়ে পারে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে সৃষ্টি করা তার সেই সুদূর প্রসারী বিভ্রান্তি দেখে যে কোন বুদ্ধিমান মানুষ এ কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবে না যে,বর্তমান যুগের যেসব মতাদর্শ মানবজাতির সাথে সর্বাধিক শত্রুতা করেছে, ডারউইনবাদ তার মধ্যে নিকৃষ্টতম। এ মতবাদ মানুষকে শিখিয়েছে যে,তুমি অন্যান্য বস্তুর মত একটি পশু ছাড়া আর কিছু নও। এ শিক্ষার ফল হয়েছে এই যে,আদম সন্তান আজ মহা উল্লাসে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পশুসুলভ আচরণ করে চলেছে ।এরই প্রভাবে মানুষ নিজ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন,বিধান ও আদর্শ কোন উচ্চতর উপাস্যের পরিবর্তে জীবজন্তুর জীবনে অনুসন্ধান করছে। এই ডারউইনবাদই মানুষের সামনে গোটা বিশ্ব প্রকৃতির একটি রণক্ষেত্র হিসেবে দেখিয়েছে এবং তাকে বলেছে যে, দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও যুদ্ধ বিগ্রহ প্রকৃতির আসল দাবী। এটিই তার আদি প্রেরণা ও অভিপ্রায়। এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে যে সবল সেই টিকে থাকে ও সফল হয় এবং সেই ন্যায়পরায়ন ও সত্যনিষ্ঠ আর যে দুর্বল সেই অসৎ ও অযোগ্য। তার নির্মূল ও নিপাত হওয়া প্রকৃতির অমোঘ পরিণতি বিধায় সেটাই সঠিক বলে মেনে নেওয়া উচিত। এই চিন্তাধারার কল্যাণেই মানুষ আজ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, শ্রেনীতে শ্রেণীতে ও জাতিতে জাতিতে সংঘাত বাধিয়ে গোটা পৃথিবীকে কার্যত এক নরকীয়

যুদ্ধক্ষেত্রে পরিনত করেছে। যে সবল সে দুর্বলকে ধ্বংস করবে এটাকেই তারা মনে করেছে প্রকৃতির মোক্ষম দাবী।

তরজমানুল কুরআন, মুহাররম-সফর ,১৩৬৩ হিঃ
মোতাবেক জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী। ১৯৪৪

সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ভাষণ

(পাঞ্জাবের একটি ইসলামিয়া কলেজের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ১৯৪০ সালে এ ভাষণ প্রদত্ত হয়।)

সম্মানিত অধ্যাপক মণ্ডলী, সমবেত সুধীবৃন্দ এবং প্রিয় শিক্ষার্থীগণ!

আপনাদের এই সমাবর্তন সভায় (প্রাচীন পরিভাষা অনুসারে পাগড়ী বিতরণ অনুষ্ঠানে) আমাকে আমার মতামত ব্যক্ত করার যে সুযোগ দেয়া হয়েছে, সে জন্য আমি যথার্থই কৃতজ্ঞ । যথার্থ কথাটা বিশেষ ভাবে এ জন্য বলছি যে, এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নিছক আনুষ্ঠানিক নয় বরং আন্তরিক এবং গভীর মর্যাদাবোধের প্রতিক । যে শিক্ষা ব্যবস্থার অধীন আপনাদের এই মহান শিক্ষাঙ্গনটি প্রতিষ্ঠিত, এবং যার অধীন শিক্ষা লাভ করে সফলকাম ছাত্ররা সনদ লাভ করতে যাচ্ছেন আমি তার একজন কট্টর দুশমন। যাঁরা আমাকে চেনেন, তাদের কাছে আমার এই দুশমনী অজানা নয়। এই বাস্তব ব্যাপারটা জেনে-শুনেও যখন আমাকে এখানে এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেয়ার জন্য দাওয়াত দেয়া হয়েছে, তখন স্বভাবতই উদ্যোক্তাদের কৃতজ্ঞতায় আমার মন পরিপ্লুত না হয়ে পারে ন। কেননা তাঁরা নির্জেদের অনুসৃত নীতির শত্রুর বক্তব্যও শোনাার মত উদার ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী। এছাড়া আপনাদের এ অনুগ্রহের জন্যও আমি কৃতজ্ঞ না হয়ে পারিনি যে, আপনারা আমাকে ঠিক এমন মুহূর্তে জাতির এই তরুণদেরকে লক্ষ্য করে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন, যখন তারা আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের কাছে জীবনের কর্মময় ক্ষেত্রে চলে আসছেন।

প্রিয় শ্রোতামন্ডলী! এবার আমাকে অনুমতি দিন, কিছুক্ষণের জন্য আপনাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আমার এ প্রিয় সনদ গ্রহণকারী বন্ধুদের সাথে কথা বলে নেই। কেননা হাতে সময় কম এবং ওদের সাথে আমার কিছু জরুরী কথা বলার রয়েছে।

প্রিয় বিদায়ী বন্ধুগন! আপনারা এখানে জীবনের বেশ কটা মূল্যবান বছর কাটিয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন। বড় আশা নিয়ে আপনারা এই সময়টির প্রতীক্ষায় ছিলেন, যখন একটি ডিগ্রীর আকারে আপনারা নিজ নিজ সাধনার সুফল লাভ করবেন। এমন গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তে আপনাদের আবেগ অনুভূতি কত স্পর্শকাতর হতে পারে, সেটা আমি পুরোপুরিভাবেই উপলব্ধি করি। এ জন্যই আপনাদের কাছে আমার মনোভাব খোলাখুলিভাবে ব্যক্তকরতে গিয়ে আমার মন দুঃখভারাক্রান্ত হচ্ছে। তবে আমি যদি নিছক লোক দেখানোর খাতিরে আপনাদের ভাবাবেগের প্রতিলক্ষ্য করে যে সত্য কথাটি আপনারেদকেএই মুহূর্তেই বলা ও সতর্ক করা জরুরী মনে করি,তা না বলি,তা হলে সেটা হবে আপনাদের সাথে আমার বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। কেননা এ মুহূর্তে আপনারা জীবনের এক স্তর পাড়ি দিয়ে অন্য স্তরে যাচ্ছেন। সত্যি বলতে কি, আমি আপনাদের এই শিক্ষাঙ্গনকে একটা বধ্যভূমি মনে করি। বিশেষভাবে কেবল এই শিক্ষাঙ্গনটিই নয়,বরং সকল শিক্ষাঙ্গনকেই আমি তদ্রূপ মনে করি। আমার মতে,এখানে আপনাদেরকে প্রকৃতপক্ষে হত্যা করা হয়েছে। যে সনদ আপনারা লাভ করতে যাচ্চেন,তা আসলে আপনাদের মৃত্যুসনদ (Death certificate)। আপনাদের খুনীরা নিজেদের ধারণামতে যখন পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পেরেছে যে, আপনারা সত্যি সত্যিই মৃত্যুবরণ করেছেন, কেবল তখনই এই সনদ দিচ্ছে। এহেন সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিত বধ্যভূমি থেকে আপনারা যদি অক্ষত প্রাণে বেরিয়ে আসতে পেরে থাকেন, তবে সেটা আপনাদের পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমি এখানে এই মৃত্যু সনদপ্রাপ্তি উপলক্ষে আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাতে আসিনি। বরং স্বজাতীয় হিসেবে আপনাদের প্রতি আমার যে স্বাভাবিক সহানুভূতি রয়েছে,সেই টানেই আমি এখানে এসেছি ।

কোন ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের পাইকারীভাবে খুন হয়ে যাওয়ার পর যেমন লাশের স্তুপে এসে খুঁজতে থাকে যে,এখনো কেউ বেঁচে আছে কি না, আমার ব্যাপারটা ঠিক তেমনি।

বিশ্বাস করুন ,আমি অতিরঞ্জিত করে এ কথা বলছিনা। সংবাদপত্রের ভাষায় "চাঞ্চল্য" সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বর্তমান শিক্ষা ব্যাবস্থা সম্পর্কে আসলেই আমার দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ । আমি যদি বিশদভাবে বুঝিয়ে বলি এ সিদ্ধান্তে কেন উপনীত হয়েছি,তা হলে হয়তোবা আপনারাও আমার সাথে একমত না হয়ে পারবেননা।

একথা হয়তো আপনাদের প্রত্যেকেরই জানা আছে যে, একটা চারা গাছকে এক জায়গা থেকে উপড়ে এনে এমন এক জায়গায় রোপণ করা হয়, যেখানকার মাটি, আবহাওয়া ও পরিবেশ সব কিছুই তার স্বাভাবিক চাহিদার প্রতিকূল, তা হলে ঐ চারাটি সেখানে কখনো শেকড় গাড়বে না। অবশ্য তার আদি জন্ম স্থানে যে পরিবেশ বিরাজমান ছিল, তা যদি নতুন জায়গায় কৃত্রিমভাবে তৈরী করা হয়, তা হলে সেটা ভিন্ন কথা। তবে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পরিক্ষামূলক খামারের কৃত্রিম জীবন সব চারা গাছের ভাগ্যে জোটে না। এই ব্যতিক্রমী অবস্থা বাদ দিয়ে এ কথা বলা মোটেই ভুল হবে না যে, কোন চারা গাছকে তার আসল জন্মস্থান থেকে উপড়ে তার সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে নিয়ে লাগিয়ে দেয়া মূলত তাকে ধ্বংস করার শামিল।

এবার আর এটি হতভাগা চারা গাছের কথা ভাবুন। এ চারাকে তার জন্মস্থান থেকে উপড়ানো হয়নি,তার নিজস্ব পরিবেশ থেকে বের করাও হয়নি। সে যে মাটিতে, যে আবহাওয়ায় এবং যে পরিবেশে জন্মেছিল,সেখানেই আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তার মধ্যে এমন পরিবর্তন আনা হয়েছে যে, নিজের জন্মস্থানে থাকা সত্ত্বেও তার স্বভাব নিজ দেশের মাটি , আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন ও খাপছাড়া হয়ে গেছে এবং সেই মাটিতে শেকড় গাড়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। সেখানকার পানি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা সে নিজের পুষ্টি ও দেহ সৌষ্ঠবের

বিকাশ-বৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে না। এই আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের দরুন সে একেবারেই ভিন্ন জায়গায় জন্মানো ও অপরিচিত পরিবেশে লাগানো চারার মত হয়ে গেছে। তাই এখন তার চার পাশে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং কৃত্রিম উপায়ে তার বাঁচার উপকরণ সরবরাহ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই পরীক্ষামূলক খামারের জীবন যদি তাকে যোগাড় করে দেয়া না হয় তাহলে নিজের জন্মস্থানে থাকা সত্ত্বেও মাটির সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে এবং মরে যাবে।

প্রথম কাজটা অর্থাৎ চারাকে উপড়ে অজানা প্রতিকূল পরিবেশে নিয়ে লাগানো অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের জুলুম। কিন্তু দ্বিতীয় কাজটা অর্থাৎ চারাকে তার জন্মস্থানেই পরিবেশের সাথে সম্পর্কহীন ও বেখাপ্পা বানিয়ে দেয়া আরো মারাত্মক জুলুম। আর যখন একটা দুটো নয়, লাখ লাখ চারার সাথে এ রকম আচরণ করা হয় এবং এত বিপুল সংখ্যক চারাকে পরীক্ষামূলক খামারের কৃত্রিম পরিবেশগত সুযোগ-সুবিধা দেয়া সম্ভব না হয়, তখন যে অবস্থা দাঁড়ায়, তাকে জুলুম না বলে যদি গণহত্যা বলা হয়, তবে সেটা অত্যুক্তি হবে না।

বাস্তব পরিস্থিতির যে পর্যবেক্ষণ আমি চালিয়েছি, তা থেকে আমি উপলব্ধি করেছি যে, এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনাদের সাথে অবিকল এ আচরণই করা হচ্ছে। আপনারা ভারতের মাটিতে[১] মুসলিম সমাজে জন্ম গ্রহণ করেছেন। আপনারা এই মাটিতে, এই তামাদ্দুনিক আবহাওয়া এবং এই সাংস্কৃতিক পরিবেশেই জন্মেছেন। আপনাদের লালন ও বিকাশ সাধন এবং আপনাদেরকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করার একমাত্র উপায় এই যে, আপনাদেরকে এই মাটিতেই শেকড় বিস্তার করতে এবং এই আবহাওয়া থেকেই সঞ্জিবনী শক্তি অর্জন করতে হবে। এখানে বিরাজমান ইসলামী পরিবেশের সাথে আপনাদের যত বেশী সংহতি

---

১. উল্লেখ্য যে, এ ভাষণ ভারত বিভাগের কয়েক বছর আগে প্রদত্ত হয়েছিল।

ও ঘনিষ্টতা হবে, আপনাদের রূপলাবণ্য ও পরিপুষ্টি ততই বৃদ্ধি পাবে এবং এই বাগিচার শ্রীবৃদ্ধিতে আপনারা ততই বেশী অবদান রাখতে পারবেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা কি? এখানে যে শিক্ষা-দীক্ষা আপনারা পাচ্ছেন, যে মনোবৃত্তি ও মানসিকতা আপনাদের সৃষ্টি হচ্ছে, যে ধ্যান-ধারণা, আবেগ-অনুভূতি ও কামনা-বাসনা আপনাদের ভিতর জন্ম লাভ করছে, যে আদত-অভ্যাস ও চাল-চলন আপনাদের ভিতরে বদ্ধমূল হচ্ছে এবং যে ধরনের চিন্তাধারা, স্বভাব-চরিত্র ও জীবনাচার আপনাদের গড়ে উঠছে, সে সব মিলিত হয়ে এই মাটি, এই সামাজিক পরিবেশ ও এই আবহাওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলার কোনো যোগ্যতা কি আপনাদের ভিতরে অবশিষ্ট থাকতে দিচ্ছে? বলা ও লেখার যে ভাষা আপনারা রপ্ত করেছেন, যে পোশাক পরিচ্ছদ পরতে আপনারা অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন, যে জীবনধারা আপনারা অবলম্বন করেছেন এবং যে সব মতবাদ ও মতাদর্শ আপনারা এই শিক্ষাক্রম থেকে অর্জন করেছেন, এ সবের সাথে আপনাদের জীবন-মরণের সাথী কোটি কোটি মুসলিম ভাইদের এবং আপনাদের চারপাশে বিরাজমান সমাজ ও সংস্কৃতির কতটুকু মিল আছে? এ পরিবেশের সাথে আপনার ব্যক্তিত্ব যে কতখানি অচেনা ও বেমানান এবং আপনার ব্যক্তিত্বের সাথে এ পরিবেশ যে কতখানি বেখাপ্পা তা ভেবে দেখেছেন কি? এই বৈসাদৃশ্য ও তার মর্মযাতনা অনুভব করার মত সংবেদনশীলতাও যদি আপনাদেরমধ্যে বহাল রাখা হতো, তাহলেও হয়তোবা কিছুটা সান্ত্বনা লাভের উপায় খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, সে জিনিসটাও অবশিষ্ট রাখা হয়নি।

আপনারা এ কথা তো সহজেই বুঝতে পারেন যে, কাঁচা মালের ওপর শৈল্পিক শ্রম ও প্রযুক্তি খাটিয়ে নতুন উপকরণ তৈরী করা হয় শুধু এ জন্য যে, এতে করে ঐ কাঁচামাল মানুষের জন্য অধিকতর লাভজনক ও কার্যোপযোগী হয়। কিন্তু যদি কোন জিনিস এমনভাবে তৈরী করা হয় যে, তার দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব হয় না, তাহলে সেই কাঁচামালও নষ্ট হয় এবং তার ওপর প্রয়োগ করা প্রযুক্তিও বৃথা যায়। কাপড়ের ওপর দর্জিগিরির প্রযুক্তি

এ জন্যই ব্যবহৃত হয় যাতে তা শরীরের সাথে মিল হয়। এ উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে বলতেই হবে যে, এ প্রযুক্তি কাপড়কে তৈরী করার পরিবর্তে আরো নষ্ট করলো। কাঁচা জিনিসের ওপর বাবুর্চির কারিগরি কারিগরি দক্ষতা প্রয়োগ করা হয় ঐ জিনিসকে খাবার যোগ্য করার জন্য। জিনিসটা যদি খাবার যোগ্যই না হলো, তাহলে বাবুর্চি তাকে গঠন করলো না বরং নষ্ট করলো। ঠিক অনুরূপভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য এটাই হয়ে থাকে যে, সমাজে যে নতুন মানুষগুলো জন্ম গ্রহণ করেছে এবং যাদের সহজাত প্রতিভা (Potentialities) এখনো কাঁচামালের পর্যায়ে রয়েছে, তাকে গড়ে পিটিয়ে ও উন্নততর উপায়ে বিকশিত করে ঐ সমাজের উপযোগী ও উপকারী সদস্যরূপে গড়ে তোলা হবে এবং তাকে সমাজের উন্নতি, কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক বানানো হবে। কিন্তু যে শিক্ষা মানুষকে তার সমাজ ও প্রকৃত সামাজিক জীবন ধারার কাছে অপরিচিত ও সংশ্রবহীন করে দেয় সে শিক্ষা ব্যক্তিকে গড়ার পরিবর্তে নষ্ট করে দিচ্ছে বলা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? প্রত্যেক জাতির শিশুরা প্রকৃতপক্ষে তার ভবিষ্যতের ভাগ্যলিপি হয়ে থাকে। স্রষ্টার কাছ থেকে তারা এক একখানা নির্মল শ্লেটের আকারে আসে এবং জাতিকে ঐ শ্লেটে স্বীয় ভবিষ্যতের ফায়সালা লিখে নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়। আমরা এমনই দুর্ভাগা জাতি যে, এই শ্লেটে নিজেদের ভবিষ্যত সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আমরা নিজেরা না লিখে তা অন্যদের কাছে সোপর্দ করে দিচ্ছি এ উদ্দেশ্যে যে, তারা এতে যা ইচ্ছে তাই লিখে দিক, এমনকি আমাদের ধ্বংসের সিদ্ধান্তও যদি লিখে দিতে চায় তো দিক।

আপনি যখন কোনো জামা কাপড় তৈরী করান এবং তা আপনার গায়ে লাগে না, তখন আপনি বাধ্য হয়ে সেটা বাজারে নিয়ে যান এবং তা যে দামেই হোক বেচে দিয়ে অন্তত কিছু পয়সা উসুল করতে সচেষ্ট হন। জামাটা যদি সচেতন প্রাণী হতো তাহলে সে নিজে এ কথাই ভাবতো যে, কোথাও তার মত একই মাপের ও একই কাট-ছাটের কাপড়ের চাহিদা থেকে থাকলে সেখানে সে কাজে লাগতে পারতো। যতক্ষণ সে কারো দেহে না লাগবে, ততক্ষণ তাকে এক নিলাম ঘর থেকে আর এক নিলাম ঘরে এবং

এক গুদাম থেকে আর এক গুদামে ঘুরে বেড়াতে হবে। প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করে যারা বেরুচ্ছে, তাদের অবস্থাও এ রকম দাঁড়িয়েছে। যে সমাজ তাদেরকে তৈরী করার জন্য শিক্ষাঙ্গনে সোপর্দ করেছিল, সে সমাজের কাছে তারা যখন তৈরী হয়ে ফিরে যায়, তখন সমাজ যেমন অনুভব করে, তেমনি তারা নিজেরাও অনুভব করে যে, তারা ঐ সমাজের কৃষ্টি ও জীবনধারার সাথে সংগতিশীল হয়ে তৈরী হয়নি। পাকস্থলী যেমন তার উপযোগী না হলে খাদ্য গ্রহণ করে না, তেমনি সমাজও তার অনুপযোগী লোকদেরকে স্বভাবতই কাজে লাগাতে পারে না। এর ফলে ঐ সমস্ত বেখাপ্পা লোকদেরকে সে নিলামে চড়ায়, যে দাম পাওয়া যায় তাতেই বেচে দেয়। আর ঐ লোকেরাও মনে করে, কোথাও কাজে খেটে যেতে পারলেই তাদের জীবন স্বার্থক হবে, নচেত বৃথা যাবে। একটু ভাবুন তো দেখি, যে জাতি তার উৎকৃষ্টতম মানব সম্পদ অন্যদের কাছে বিক্রি করে দেয়, তার মত হতভাগা জাতি আর কে আছে। আমরা সেই দেউলে জাতি, যে নিজের মানুষগুলোকে বিলিয়ে দেয় আর তার বিনিময়ে লাভ করে জুতো, কাপড় ও খাদ্য। প্রকৃতি আমাদেরকে আমাদেরই কাজে লাগানোর জন্য যে মানব সম্পদ (Manpower) ও মেধা সম্পদ (Brain power) দিয়েছে, তা অন্যদের কাজে লাগছে। আমাদের হৃষ্টপুষ্ট সতেজ দেহগুলোতে নিহিত বলবীর্য, বড় বড় মাথা বোঝাই প্রতিভা, সুপরিসর বক্ষগুলোতে বিদ্যমান বিচিত্র ক্ষমতার অধিকারী হৃদয়-এসব খোদা প্রদত্ত সম্পদের শতকরা ২ ভাগও আমাদের কাজে লাগে কি না বলা সহজ নয়। বাদবাকী সম্পদের সবটাই অন্যেরা কিনে নিয়ে যায়। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, এই ঘাটতির ব্যবসাকে আমরা খুবই লাভজনক ব্যবসা মনে করছি। এই মানব সম্পদই যে আমাদের আসল পুঁজি এবং এটি বেচে দেয়া যে লাভজনক নয় বরং নিদারুণ ক্ষতিকর যে কথাটা কারুর বুঝেই আসছে না। বর্তমানে উচ্চ শিক্ষা অর্জনে নিয়োজিত এবং সদ্য উচ্চ শিক্ষা নিয়ে বেরিয়ে আসা বহুসংখ্যক তরুণের সাথে আমার প্রায়ই দেখা সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে থাকে। এসব সাক্ষাতকালে আমি

সর্বপ্রথম এটাই জানতে চেষ্টা করি যে, তারা জীবনের কোনো লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করেছে কি না। কিন্তু যখন দেখি যে, জীবনের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, এমন ব্যক্তি হাজারে একজনও পাওয়া দুষ্কর, তখন আমার হতাশার অবধি থাকে না। লক্ষ্য নির্ধারিত হওয়া তো দূরের কথা, মানব জীবনের আদৌ কোনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকতে হয় বা থাকা সম্ভব এমন ধারণাই তাদের অধিকাংশের মধ্যে নেই। জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকার প্রশ্নটাকে তারা একটা দার্শনিক বা কবি সুলভ প্রশ্ন মনে করেন। পার্থিব জীবনে আমাদের চেষ্টা, সাধনা, শ্রম ও তৎপরতার কোনো লক্ষ্য (goal) ও উদ্দেশ্য থাকা উচিত কি না, সেটা কার্যকরভাবে স্থির করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে তারা অনুভব করেন না। উচ্চ শিক্ষিত তরুণদের এ অবস্থা দেখে আমার মাথা ঘুরে যায়। আমি দিশেহারা হয়ে ভাবতে থাকি যে, যে শিক্ষা ব্যবস্থা এক নাগাড়ে পনেরো-বিশ বছর ধরে মেধা ও মনিষার অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধনের পরও মানুষকে তার ক্ষমতা ও যোগ্যতার সঠিক প্রয়োগস্থল এবং তার চেষ্টা-সাধনার কোনো লক্ষ্য স্থির করার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয় না, এমন কি জীবনের কোনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করতে শিখায় না, সে শিক্ষা ব্যবস্থাকে কি নামে আখ্যায়িত করা যায়। আমি বুঝে উঠতে পারি না যে, এটা মনুষ্যত্ব গড়ার না ধ্বংস করার শিক্ষা? উদ্দেশ্যহীন ও লক্ষহীন (Aimless) জীবন যাপন করা তো ইতর প্রাণীর কাজ। মানুষও যদি কেবল বাঁচার খাতিরেই বাঁচে এবং নিজের সংরক্ষণ ও বংশধর প্রজনন ছাড়া তার যোগ্যতা ও ক্ষমতা প্রয়োগের আর কোনো ক্ষেত্র আছে বলে মনে না করে, তাহলে তার মধ্যে ও অন্যান্য জীবজানোয়ারের মধ্যে কি পার্থক্য থাকে?

আমার এ সমালোচনার উদ্দেশ্য আপনাদেরকে ভর্ৎসনা করা নয়। ভর্ৎসনা তো দোষী ব্যক্তিকে করতে হয়। অথচ আপনারা দোষী নন, বরং নির্যাতিত। আসলে আপনাদের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনার বশবর্তী হয়েই আমি এ কথাগুলো বলছি। জীবনের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে পদার্পণের প্রাক্কালে আপনারা নিজেদের প্রকৃত অবস্থাটা খতিয়ে দেখুন, এটাই আমার ঐকান্তিক বাসনা।

আপনারা মুসলিম উম্মাহর সদস্য। এ উম্মাহ কোনো বর্ণ ও বংশ ভিত্তিক জাতি নয় যে, এর আওতায় কেউ জন্ম গ্রহণ করলেই আপনা আপনি মুসলমান পদবাচ্য হবে। এটা কোনো সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীও নয় যে, এর সাথে কেবল সামাজিক বন্ধন থাকাই মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। আসলে ইসলাম একটা বিশেষ মতাদর্শের (Ideology) নাম- যার ভিত্তিতে মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন তার সকল দিক ও বিভাগ সমেত গড়ে ওঠে। এ জাতির প্রতিটি ব্যক্তি যখন এ মতাদর্শকে বুঝবে, এর প্রাণশক্তির সাথে পরিচিত হবে এবং নিজের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি অংশে এই প্রাণশক্তির বাস্তব ব্যাখ্যা দান ও তার কার্যকর রূপদানে সক্ষম, উদগ্রীব ও উদ্বুদ্ধ হবে কেবল তখনই এ জাতির স্থিতি ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত হবে। বিশেষত জাতির মননশীল শ্রেণীর (Intelligentia) জন্য এর জ্ঞান, বুঝ ও তদনুসারে কাজ করার প্রেরণা ও অভ্যাস সবচেয়ে বেশী থাকা আবশ্যক। কেননা এই শ্রেণীর হাতেই রয়েছে জাতির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাটি। চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জীবনে যে স্বতন্ত্র জাতীয় সংস্কৃতির গভীর ছাপ পড়া অত্যাবশ্যক- এ কথা যদিও প্রত্যেক জাতির ক্ষেত্রেই সত্য কিন্তু মুসলিম জাতির জন্য এর প্রয়োজন সর্বাধিক। কেননা আমাদের স্বকীয়তার (Individuality) ভিত্তি মাটি, রক্ত, বর্ণ ভাষা কিংবা অন্য কোনো জড় বস্তু নয়। আমাদের স্বকীয়তার ভিত্তি হলো একমাত্র ইসলাম। আমাদের জাতিসত্তার স্থিতি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় হলো জাতির প্রতিটি ব্যক্তির, বিশেষত চিন্তাশীল ও মননশীল শ্রেণীর ইসলামী চিন্তা ও কর্ম পদ্ধতির একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়া। এ ব্যাপারে তাদের তাত্ত্বিক শিক্ষা-দীক্ষায় ও বাস্তব প্রশিক্ষণে যতটুকু ও যে ধরনের গলদ থাকবে, তার ছাপ আমাদের জাতীয় জীবনে হুবহু প্রতিফলিত হবে। আর ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ থেকে তারা যদি একেবারেই বঞ্চিত থাকে, তা হলে সেটা হবে আমাদের জাতির মৃত্যুঘন্টা বাজার সমতুল্য।

এটা এমন এক দিব্য সত্য যা কারো পক্ষেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও এটা কি বাস্তব নয় যে, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলিম জাতির নব্য-বংশধরের শিক্ষা-দীক্ষার যে ব্যবস্থা করা হয়, সেটা তাদেরকে মুসলিম জাতির নেতৃত্ব দেয়ার জন্য নয় বরং তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যই গড়ে তোলে? এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনাদের বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, আইনশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং অন্য যত সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাজারে চাহিদা আছে, তা সবই পড়ানো হয়। কিন্তু ইসলামী দর্শন, ইসলামী বিজ্ঞানের মৌল তত্ত্ব, ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি, ইসলামী আইনের বুনিয়াদী সূত্র, ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ এবং ইসলামী ইতিহাস ও ইতিহাস দর্শনের বাতাসও আপনাদের গায়ে লাগতে পারে না। এর ফল কি দাড়ায়? সকল দিক ও বিভাগসহ জীবনের যে সামগ্রিক রূপরেখা আপনাদের মনে সৃষ্টি হয়, তা হয় আগাগোড়াই অনৈসলামিক। আপনারা অনৈসলামিক পদ্ধতিতে চিন্তা করতে এবং অনৈসলামিক দৃষ্টিভংগিতে জীবনের প্রতিটি ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন এবং তা ছাড়া আপনাদের কোনো উপায়ও থাকে না। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আপনারা পরিচিতই হন না। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু তথ্য আপনারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেন ঠিকই, কিন্তু তা অপ্রামাণ্য এবং অনেক সময় ভুলভ্রান্তি, অলীক কল্পনা ও ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণায় মিশ্রিত থাকে। এ ধরনের তথ্য দ্বারা মানসিকভাবে ইসলাম থেকে আরো দূরে সরে যাওয়া ছাড়া আপনাদের আর কোনো লাভ হয় না। আপনাদের মধ্যে যারা পৈতৃক ধর্ম হওয়ার কারণে ইসলামের প্রতি গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করেন, তারা মনমগজের দিক দিয়ে অমুসলিম হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কোনো না কোনোভাবে মনকে এই বলে প্রবোধ দিয়ে থাকেন যে, ইসলাম নিশ্চয়ই সত্য হবে, যদিও বুঝে আসে না। আর যারা এটুকু ভক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে নানা রকমের আপত্তি তুলতে এবং উপহাস করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।

এ ধরনের অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান লাভের পর যেটুকু বাস্তব প্রশিক্ষণের সুযোগ আপনারা পেয়ে থাকেন, যে পরিবেশে আপনারা পরিবেষ্ঠিত থাকেন, বাস্তব জীবন যাপনের যে ধরনের নমুনা আপনাদের সামনে পড়ে, তাতে কদাচিৎ কোথাও ইসলামী চরিত্র এবং ইসলামী চালচলন ও কার্যকলাপের চিহ্ন পরিস্ফুট। এখন এ কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, যারা তাত্ত্বিকভাবেও ইসলামের জ্ঞান লাভ করলো না। হাতে কলমেও ইসলামী প্রশিক্ষণ পেল না। তারা তো আর ফেরেশতা নয় যে, আপনা থেকেই মুসলমান হয়ে গড়ে উঠবে। তাদের ওপর তো ওহি নাজিল হয়না যে, আপনা আপনি তাদের মনে ইসলামের জ্ঞান ঢুকে যাবে। তারা পানি আর বাতাস থেকে তো ইসলামী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে না। তাই চিন্তা ও কর্ম উভয় দিক দিয়ে তারা যদি অনৈসলামিক ভাবধারার বাহক হয়, তাহলে সেটা তাদের দোষ নয়, বরং প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার আওতায় প্রতিষ্ঠিত এ সব বিদ্যাপীঠই সে জন্য দায়ী। আমি আগেও বলেছি, এখন আবার বলছি, আমার অর্ন্তদৃষ্টিতে এটাই প্রতিভাত হয় যে, এ সব বিদ্যাপীঠে আসলে আপনাদেরকে যবাই করা হয়। এখানে এই জাতির কবর খোঁড়া হয় এবং আপনারা এ জাতিরই সন্তান। যে সমাজে আপনারা জন্ম গ্রহণ করেছেন, যে সমাজ আপনাদের লেখা-পড়ার ব্যয়ভার বহন করে, যে জাতির সুখ-শান্তিতে আপনাদের সুখ-শান্তি এবং যে জাতির জীবনমরণের সাথে আপনাদের জীবনমরণ একসূত্রে গাঁথা, সে জাতির জন্য আপনারা সম্পূর্ণ নিষ্কর্মা ও নিরর্থক। আপনাদেরকে এ জাতির কল্যাণের জন্য কাজ করার অযোগ্যই শুধু করা হয়নি বরং সুপরিকল্পিতভাবেই ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে আপনাদেরকে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাদের প্রতিটি তৎপরতা এ জাতির ক্ষতি ও বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এমন কি আপনারা যদি তার হিতাকংখী হয়েও কিছু করতে চান তবে তাও তার জন্য ক্ষতিকর হবে। কেননা এ জাতির আজন্ম লালিত আদর্শ ও তার প্রাথমিক মূলনীতিগুলো পর্যন্ত আপনাদেরকে জানতে দেয়া হয়নি এবং আপনাদের গোটা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণ এ জাতির আদর্শিক রূপকাঠামোর সম্পূর্ণ বিপরীত ছক অনুসারে দেয়া হয়েছে।

নিজেদের এই বাস্তব অবস্থানটা যদি আপনারা বুঝতে পারেন এবং কত বড় ভয়াবহ স্তরে পৌঁছে দিয়ে আপনাদেরকে জীবনের কঠিন রণাঙ্গনে পাঠানো হচ্ছে সেটা যদি অনুভব করতে পারেন তা হলে আমার বিশ্বাস আপনারা কিছু না কিছু ক্ষতি পূরণের চেষ্টা অবশ্যই করবেন। ক্ষতি যা হয়েছে তা সম্পূর্ণ পুষিয়ে নেয়া এখন হয়তো খুবই দুরূহ ব্যাপার। তথাপি আমি আপনাদেরকে তিনটে কাজের পরামর্শ দেবো। এ তিনটে কাজ করলে আপনারা যথেষ্ট উপকৃত হবেনঃ

১. যতদূর সম্ভব হয়, আরবী ভাষা শিখতে চেষ্টা করুন। কেননা ইসলামের প্রধান ও মূল উৎস কুরআন এ ভাষাতেই লিপিবদ্ধ। কুরআনকে তার নিজস্ব ভাষায় না পড়া পর্যন্ত ইসলামের তাত্ত্বিক ও আদর্শিক কাঠামোটা পুরোপুরিভাবে আপনাদের বুঝে আসবেনা। আরবী ভাষা শেখার প্রাচীন ভীতিপ্রদ প্রণালীর এখন আর প্রয়োজন নেই। নতুন শিক্ষা পদ্ধতিতে মাত্র ছ' মাসেই আপনারা কুরআনের ভাষা বুঝার মত আরবী শিখে নিতে পারেন।

২. পবিত্র কুরআন, রসূলের (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবন বৃত্তান্ত পড়া ইসলামকে বুঝার জন্য অপরিহার্য। জীবনের ১২ থেকে ১৫টা বছর যখন অন্যান্য বিদ্যা শিখতে ব্যয় করেছেন, এখন তার অর্ধেক, বরঞ্চ সিকি পরিমাণ সময় ব্যয় করে ইসলামের এই মৌলিক জিনিসগুলো শিখে নিন। কেননা এগুলো আপনার জাতির ভিত্তিমূল এবং এগুলো আয়ত্ত্ব না করে আপনি আপনার স্বজাতির কোন উপকারেই আসতে পারবেন না।

৩. অসম্পূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইসলাম সম্পর্কে আপনার ভালো-মন্দ যে ধারণাই জন্মে থাকুক সেটা মন থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দিন এবং নতুন করে ইসলামকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যায়ন (systematic study) করুন। এরপর আপনি যে সিদ্ধান্তে আসবেন, তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনার যোগ্য হবে। কোন জিনিস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান হাসিল না করে তার সম্পর্কে মত স্থির করা কোন শিক্ষিত লোকের পক্ষে সমিচিন নয়।

আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করুন এবং যে সংকটজনক অবস্থায় আপনাদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তা থেকে আপনাদেরকে উদ্ধার করুন। এই দোয়া করেই এখন আমার এ ভাষণ শেষ করছি।

তরজমানুল কুরআন, মুহাররম–সফর, ১৩৬৩ হিঃ
জানু–ফেব্রু, ১৯৪৪

পোশাক সম্পর্কে ইসলামের বিধান [১]

সভ্যতার সৃষ্ট বাড়তি জাকজমক ও আড়ম্বরকে বাদ দিয়ে পোশাককে যদি শুধু তার সেই স্বাভাবিক প্রয়োজনের নিরীখে দেখা হয়, যার তাগিদে মানুষ সর্ব প্রথম, পোশাক পরিধানে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তা হলে দেখা যাবে যে, প্রধানত দুটো কারণই এর পেছনে সক্রিয় ছিল। প্রথমত সহজাত লজ্জার তাড়নায় শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশকে আবৃত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, আবহওয়া জনিত প্রতিকূল প্রভাব থেকে দেহকে রক্ষা করা অপরিহার্য মনে হয়েছিল। সাদামাটাভাবে যে পোশাক শুধুমাত্র এই দুটো প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম, তা প্রায় একই ধরনের ও একই কাট-ছাঁটের হওয়ার কথা। কেননা সকল মানুষের দেহ একই রকমের এবং তাকে আবৃত করার সহজ ও স্বাভাবিক পন্থাও একই ধরনের। বড় জোর আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে পোশাকের রূপকাঠামোতে এতটুকু পার্থক্য হতে পারে যে, যেখানে অধিকতর গরম আবহওয়া বিরাজমান সেখানকার পোশাক তুলনামূলকভাবে হালকা এবং শরীরের অপেক্ষাকৃত কম অংশ জুড়ে বিস্তৃত হবে। আর যেখানে শীত বেশী সেখানে পোশাক হবে অপেক্ষাকৃত ভারি এবং দেহের ব্যাপকতর অংশ জুড়ে হবে তার অবস্থান।

আদিম মানুষ সম্পর্কে যেটুকু তথ্য আমাদের হস্তগত হয়েছে, তা থেকেও জানা যায় যে, যখন নিছক প্রকৃতির প্রাথমিক দাবী ও মানবীয় প্রয়োজনের তাগিদে পোশাক ব্যবহৃত হতো, তখন তার

---

১. এ প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম আযমগড় (ভারত) থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা ''মায়ারেফ'' -এর জন্য লিখিত হয়েছিল এবং তাতে ছাপাও হয়েছিল। পরে ১৯৪০ সালে এটা মাসিক তরজমানুল কুরআনে পুনপ্রকশিত হয় এবং সেটিই এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

কাট-ছাঁট ও আকৃতিতে তেমন বৈচিত্র ছিল না, যাও ছিল তা প্রধানত আবহওয়ার প্রভাবের তারতম্যের কারণেই। কিন্তু যখন ক্রমান্বয়ে মানুষের চেতনা ও অনুভূতির বিকাশ ঘটলো, যখন সে সভ্যতার দিকে পা বাড়ালো, শিল্পকারখানা গড়ে উঠলো, নতুন উপরকণ উদ্ভাবিত হলো এবং "রুচি" বা "সৌখিনতা" নামক সহজাতবৃত্তি মানুষের মনে লালিত ও বিকশিত হলো, তখন প্রাথমিক স্বাভাবিক প্রয়োজনের ওপর ক্রমশ অন্যান্য জিনিসের সংয়োজন ঘটতে লাগলো। এই নবোদ্ভূত চাহিদার প্রভাব যেহেতু বিভিন্ন জাতিতে গুণগত ও পরিমাণগত দিক দিয়ে বিভিন্ন রকমের ছিল, এ জন্য প্রাথমিক স্বভাবসুলভ পোশাকের ওপর বিভিন্ন জাতি যে সংযোজন ঘটালো, তাও আকৃতি ও প্রকৃতিগতভাবে বিচিত্র ধরনের হওয়ার কথা ছিল এবং হয়ে ছিলও তাই।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে পোশাক পরিচ্ছদের বিচিত্র স্টাইলের উদ্ভব এবং পরবর্তীকালে তাতে রদবদল ও ক্রমবিকাশের পেছনে যে অসংখ্য কারণ সক্রিয় ছিল, সে সবের বিবরণ দেয়া অসম্ভব। হাজার হাজার বছরে বিভিন্ন জাতির সামাজিক জীবনে এবং প্রত্যেক জাতির লোকদের ব্যক্তিগত জীবনে অগণিত অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত উপকরণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সে সবের কোন তালিকা কোথাও সংরক্ষিত থাকে না। বরঞ্চ বহু উপকরণ এত সুক্ষ্মভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে যে, তা অনুভূতই হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র খুটিনাটি বাদ দিয়ে আমরা যদি কেবল বড় বড় কার্যকারণগুলো অনুসন্ধান করি, যার প্রভাবে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন স্টাইলের পোশাক প্রচলিত হয়ে থাকে, তবে আমরা নিম্নলিখিত ৮টি প্রধান কার্যকারণের সন্ধান পাইঃ

১. ভৌগোলিক পরিবেশ ও অবস্থান, যা কোন দেশের অধিবাসীদেরকে এক বিশেষ ধরনের পোশাক ও বিশেষ ধরনের পারস্পরিক আচরণ ভঙ্গি অবলম্বনে বাধ্য করে।

২. নৈতিক ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও মতামর্শ, যার বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন জাতিতে নারী ও পুরুষের পোশাকে পার্থক্য ঘটে।

৩. স্বভাবসুলভ রুচি ও সখ, যার বিকাশ-বিস্তৃতি প্রত্যেক জাতিতে রকমারি প্রভাব ও প্রেরণার অধীন বিভিন্ন উপায়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। রুচি ও সখের এই বৈচিত্র ও বিভিন্নতার কারণেই প্রত্যেক জাতির মনোপূত পোশাক অন্য জাতি থেকে ভিন্নতর হয়ে থাকে।

৪. সামাজিক রীতি-প্রথা, যা প্রত্যেক জাতির বিশিষ্ট ভৌগলিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিকাশ লাভ করে থাকে। প্রত্যেক জাতি তার স্বকীয় সাধারণ সামাজিক রীতি-প্রথার সাথে তাল মিলিয়ে যথোপযুক্ত কাট-ছাঁটের পোশাক পরিধান করে থাকে।

৫. অর্থনৈতিক অবস্থা; একটি জাতির জীবিকা উপার্জনের যাবতীয় উপায়-উপকরণ, রকমারি পেশা, শিল্পকারখানা, আর্থিক অবস্থা (সচ্ছলতা বা দারিদ্র) সবই এর আওতাভুক্ত। প্রত্যেক জাতির পোশাক এ সব অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য। পরিবর্তিত অবস্থায় পোশাকের পরিবর্তন এসে থাকে।

৬. শিষ্টাচার ও শালীনতা, এ ব্যাপারে প্রত্যেক জাতি একটা মান বজায় রেখে চলে। তার জাতীয় পোশাক অনিবার্যভাবে তার শালীনতা ও শিষ্টাচারের মানের সাথে সংগতিশীল হয়ে থাকে।

৭. জাতীয় ঐতিহ্য, একটি প্রজন্ম তার পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে এক বিশেষ ধরনের জীবনধারা ও পোশাক উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে এবং কিঞ্চিত রদবদল করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যায়। জীবন যাপনের রীতি-নীত ও বৈশিষ্ট্যের এই পুরুষাক্রমিক ধারাবাহিকতা প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সত্তার চিরস্থায়ীত্বেরই নিশ্চয়তা বিধান করে। এ জন্য প্রত্যেক জাতি স্বাভাবিকভাবেই এর প্রতি গভীর অনুরাগী হয়ে থাকে।

৮. বহিরাগত প্রভাব ভিন্ন জাতির সাথে মেলা-মেশা ও সংশ্রব রাখার কারণে প্রত্যেক জাতির চিন্তায় ও জীবন যাপন প্রণালীতে বিজাতীয় প্রভাব পড়ে। তবে একটি জাতি কি পরিমাণে

ও কি প্রকারে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হবে, সেটা নির্ভর করে তার রাজনৈতিক, মনস্তাত্বিক ও নৈতিক অবস্থার ওপর।

একটি জাতির শুধু পোশাকে নয় বরং তার গোটা সামাজিক জীবনে উল্লিখিত বিষয়গুলো সর্বাত্মক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। প্রত্যেক জাতির পোশাক উক্ত বিষয়গুলোর সম্মিলিত অবদান হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে। এই পর্যালোচনার আলোকে আমরা যখন জাতীয় পোশাকের বিষয়টা বিবেচনা করি, তখন দুটো মৌলিক তথ্য আমাদের হস্তগত হয়;

প্রথমত, পোশাক আমাদের জন্য শুধু বাহ্যিক সতর ঢাকা ও দেহকে সংরক্ষণের উপকরণ নয়. বরং জাতীয় মনস্তত্ব. জাতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি, জাতীয় ঐতিহ্য এবং জাতির সামষ্টিক অবস্থার অভ্যন্তরে তার গভীর শিকড় বিদ্যমান থাকে। ওটা আসলে জাতির সমষ্টিক দেহে প্রবহমান প্রাণশক্তির প্রতিক এবং তার বিকাশ ও প্রবৃত্তির সহায়ক। বস্তুত পোশাক প্রত্যেক জাতির ভাষা সদৃশ। তার জাতীয়তা এর মাধ্যমে কথা বলে। তার জাতিসত্তা এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে নিজের পরিচয় তুলে ধরে।

দ্বিতীয়ত, পোশাকের পেছনে যতগুলো কার্যকারণ সক্রিয় রয়েছে, তার মধ্যে ভৌগোলিক অবস্থান ছাড়া আর সবগুলোই প্রত্যেক জাতির জীবনে প্রতিনিয়ত পরিবর্তশীল। এই পরিবর্তনের গতিধারাও টের পাওয়া যায় না। এর কোনটিই নিশ্চল ও নিথর নয়। বরং স্বভাবগতভাবেই প্রত্যেকটি পরিবর্তনশীল। তাদের পরির্তন ও বিকাশ শুধু পোশাকের ওপর নয়, বরং সমগ্র জাতীয় জীবনের ওপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। একটি উন্নয়নমুখী জাতিতে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে, তাদের ধ্যান-ধারণায় যখন আলোর দীপ্তি আসে, তাদের শিল্প, বাণিজ্য ও পেশাগত তৎপরতায় যখন অগ্রগতি ঘটে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাড়ে, অন্যান্য জাতির সাথে মেলা-মেশার সুযোগ হয়, তাদের নৈতিকতা, সামাজিকতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে যখন নানা রকমের শিক্ষা লাভ করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের সামাজিক জীবনে একটা স্বতস্ফূর্ত

উন্নয়ন মুখী তৎপরতা উন্মেষ ঘটে, তাদের আবেগ অনুভূতি পাল্টে যায়। স্বভাবসুলভ রুচি ও মনোবৃত্তির সংস্কার সাধিত হয়, সামাজিক আচরণ–পদ্ধতিতে স্নিগ্ধতা আসে। শালীনতা ও সৌজন্যের মান উন্নত হয়, নতুন চাহিদাগুলো পূরণে নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করা হয়, জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ আরো পরিচ্ছন্ন রূপ ধারণ করে এবং জীবনের সকল বিভাগে পর্যায়ক্রমিক উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার সাথে সাথে জাতীয় পোশাক বস্তুগত ও আকৃতিগত উভয় দিক দিয়ে অধিকতর সৌন্দর্য্যময়, মনোরম রূপবৈচিত্র মন্ডিত ও শালীনতর হতে থাকে। এই অগ্রগতির যাত্রাপথের কোন মাস্তুলে এমন কোন প্রয়োজনের তাগিদ অনুভূত হয় না যে, কোন সভা–সম্মেলন করে অথবা পার্লামেন্টে কোন প্রস্তাব পাস করে সমগ্র জাতির জন্য কোন বিশেষ ধরনের পোশাক নির্ধারণ বা আকস্মিকভাবে চালু করে দেয়া হবে। সামাজিক উপকরণগুলোর সম্মিলিত আবর্তনের প্রভাবে পুরানো পোশাক স্টাইলে আপনা–আপনি সংস্কার সাধিত হতে থাকে, নতুন নতুন স্টাইলের উদ্ভব হয় এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র জাতির রুচি ও মেজাজ স্বক্রিয় গতিধারার সাথে তাল মিলিয়ে পোশাককে উন্নত করতে থাকে।

এটাই জাতীয় পোশাকের উদ্ভব, পরিবর্তন ও বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। পক্ষান্তরে এর অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম প্রক্রিয়া হলো জাতীয় পোশাককে কৃত্রিমভাবে পাল্টানো এবং ভিন্ন জাতির পোশাক আমদানি করা। পরিবর্তনের দুটো পথ আছে। একটা হলো স্বাভাবিক পর্যায়জনিত বিকাশ ও উন্নয়ন। আর একটা হলো অস্বাভাবিক বৈপ্লবিক রূপান্তর। কিন্তু এই উভয় ধরনের পরিবর্তনে আকাশ পাতাল প্রভেদ। প্রথম ধরনের পরিবর্তনকে বৃক্ষের বিকাশ–বৃদ্ধির সাথে তুলনা করা যায়। বৃক্ষের বয়স যত বাড়ে, তার রূপ, বর্ণ, কলেবর, ফল, ফুল, ডাল ও পাতার ততই ক্রমবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু এতসব পরিবর্তন সত্বেও বৃক্ষের স্বকীয়তার কোন পরিবর্তন হয় না। তেঁতুলের গাছ হলে তা শেষ পর্যন্ত তেঁতুলের গাছই থাকে। আম গাছ হয়ে থাকে তো বিকাশ–বৃদ্ধির প্রতিটি স্তরে তা

আমগাছই থাকবে। পানি, মাটি, বাতাস, রোদ ও তাপ থেকে সে অনেক কিছুই গ্রহণ করবে। কিন্তু যা কিছুই গ্রহণ করবে, তাকে সে নিজের অংশ বানিয়ে ফেলবে। দ্বিতীয় ধরনের পরিবর্তনটা এ রকম যে, গাছ জন্মেছিল তো তেঁতুল গাছ হিসেবে। কিন্তু সহসা তার কাণ্ডে আমগাছের ছাল জড়িয়ে দেয়া হলো। আমগাছের পাতা ও ডাল তার সাথে যুক্ত করে দেয়া হলো। এভাবে এমন অবস্থা করে দেয়া হলো যে, ঐ কিম্ভূৎ কিমাকার গাছটা আসলে আম গাছ, না তেঁতুল গাছ, তা কারো বলার সাধ্য থাকলো না। এ ধরনের কৃত্রিম পরিবর্তন দ্বারা আসলে কোন যথার্থ ও ফলপ্রসূ পরিবর্তন সাধিত হয় না। বরঞ্চ এতে স্বাভাবিক বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু যারা সামাজিক ব্যাপারে কোন প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার অধিকারী নন এবং নিছক ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে জীবনের সমস্যাবলীর বিচার-বিবেচনা করেন, তারা শিশুসুলভ সরলতা নিয়ে ভাবেন যে, পোশাক ও সামাজিক আবরণ-পদ্ধতির কিছু বাহ্যিক রূপ পাল্টে দিলেই একটা জাতির সত্যিকার রূপান্তর ঘটে যায়।

পোশাক পরিবর্তনের স্বপক্ষে সচরাচর যেসব যুক্তি প্রদর্শন করা হয়, তা এই যে, এতে একটা পশ্চাদপদ জাতির মানসিকতায় পরিবর্তন আসে। স্থবিরতা ও জড়তা কেটে গিয়ে চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়। পশ্চাদপদতার যুগের পোশাক খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই যুগের যত গলদ এবং যত খারাপ মানসিকতা ছিল, তা সব কর্পূরের মত উবে যায়। আর নতুন পোশাক পরা মাত্রই-বিশেষত তা যখন কোন উন্নত জাতির কাছ থেকে নেয়া পোশাক হয়, জাতির মনস্তত্ত্বে ও কর্মময় জীবনে রাতারাতি শুভ পরিবর্তন আসে এবং তার মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে উন্নত হওয়ার অনুভূতি জেগে ওঠে। সে জাতি নিজেকে অগ্রসর জাতিগুলোর সমপর্যায়ের ভাবতে আরম্ভ করে। উন্নত জাতিগুলোও তাদেরকে নিজেদের সমপর্যায়ের গণ্য করতে থাকে। আর সে যখন উন্নত জাতিসুলভ জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করে তখন তার মধ্যে তাদের মতই শিষ্টাচার, কর্মচাঞ্চল্য ও কর্মঠতা জন্মে। কেননা সভ্য ও কর্মঠ জাতিগুলোর মধ্যে যে পোশাক ও জীবন যাত্রা প্রণালীর উদ্ভব হয়েছে, তা

অবলম্বন করা সভ্য ও কর্মঠ হওয়ার জন্য জরুরী ও ফলপ্রসূও। এ ধরনের বহুযুক্তি দর্শানো হয়ে থাকে। কিন্তু এগুলো নিতান্ত স্থূল ধারণা মাত্র। এর পেছনে কোন গভীর চিন্তা ও সূক্ষ্মদর্শিতা নেই। এ সব ধ্যান-ধারনার সনদ হিসেবে কোন কোন নাম করা ব্যক্তিত্বের বক্তব্যও পেশ করা হয় এবং এ সব ব্যক্তিত্বের নাম শুনেই সকলের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়।[১]

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যাদের সনদ দেয়া হয়, তারা সনদদাতাদের চেয়ে চিন্তা ও মননশীলতার দিক থেকে তেমন উন্নত নয়। নিজেদের অনুসারীদের মতই এই বেচারারাও চিন্তার দিক দিয়ে স্থূলদর্শী এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে দৈন্যগ্রস্ত। দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় সাফল্যজনক কৌশল অবলম্বন করে কোন সামরিক অধিনায়ক যদি নিজ জাতিকে ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করতে পেরে থাকেন, তবে নিসন্দেহে তিনি প্রশংসার যোগ্য। তবে তাকে তার প্রাপ্য কদর ও সম্মান যতটুকু ততটুকু দেয়া যেতে পারে এবং যে হিসাবে তিনি কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন সে হিসাবেই তার স্বীকৃতি দেয়া চলে। তার প্রকৃত মর্যাদার চেয়ে বেশী মর্যাদা দিয়ে তাকে চিন্তানায়ক, সংস্কারক এবং নতুন সভ্যতা ও কৃষ্টির বিনির্মাতা বলে আখ্যায়িত করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। একজন দক্ষ প্রকৌশলী যদি বন্যা নিরোধক বাঁধ দিয়ে কোন জনপদকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করে, তা হলে তাকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক ও মুক্তিদাতা বলে মেনে নেয়া এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও তদারকি তার হাতে সোর্পদ যত বড় নির্বুদ্ধিতা, এটাও ঠিক তত বড় কান্ডজ্ঞানহীনতা।

নীতিগতভাবে আমাদের উপরোক্ত আলোচনা পোশাকের ক্ষেত্রে পরিবর্তনকামীদের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট।

---

১. উল্লেখ থাকে যে, এ প্রবন্ধ যে সময় লেখা হয়, তখন কোন কোন মুসলিম দেশের শাসক নিজ নিজ জাতির পোশাক জবরদস্তিমূলকভাবে পরিবর্তন করে জনগণকে উন্নত বানাচ্ছিলেন। সে সময় আমাদের দেশেরও কেউ কেউ উন্নয়নের এই দাওয়াই পরীক্ষা করার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন।

কিন্তু এ যুগের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার প্রভাবে মানুষের মনে সাধারণভাবে যে বিভ্রান্তি বদ্ধমূল হয়ে গেছে, তা এত সহজে দূর হবে বলে মনে হয় না। তাই এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমার যুক্তি-প্রমাণ আরো সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি।

১. এ কথা আগেই যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, পোশাকের কাট-ছাঁট বা ফ্যাশন কোন স্বতন্ত্র জিনিস নয়, বরং তা একাধিক স্বাভাবিক ও সামাজিক কার্য্যকারণের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফল। এ সত্যটা যদি মেনে নেয়া হয়, তা হলে এ কথাও অস্বীকার করা যাবে না যে,এসব কার্যকারণের ক্রিয়ার ফলে কোন জাতির ভেতরে পোশাকের যে বিশেষ গড়ন বা স্টাইল তৈরী হয় সেটাই তার স্বাভাবিক স্টাইল। এই স্বাভাবিক স্টাইল বর্জন করে আকস্মিকভাবে এমন কোন ফ্যাশন অবলম্বন করা যা এই সব কার্যকারণের সম্মিলিত ক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়নি। সম্পূর্ণরূপে একটা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক কাজ।

২. একটি জাতির সামাজিক রীতি-নীতির সাথে তার পোশাকের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। তার সামাজিক আচরণ-পদ্ধতি তার গোটা সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে কয়েক রকমের সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য রাখে। পোশাক ও সামাজিক রীতি-প্রথার স্বাভাবিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এ সামঞ্জস্য বহাল থাকে। কেননা সে ক্ষেত্রে গোটা জীবন তার সকল দিক ও বিভাগকে সাথে নিয়ে সক্রিয় হয়। কিন্তু যদি অস্বাভাবিক পন্থায় কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে পোশাক ও সামাজিক আচরণ প্রণালীতে পরিবর্তন আনা হয় অথবা শুধু পোশাকের রদবদল ঘটানো হয়, তা হলে গোটা সামাজিক জীবনে এক ধরনের বিশৃংখলা ও অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। কেননা জীবনের অন্যান্য অংশ এই পরিবর্তনের সহযোগী হয় না। ফলে জীবনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়।

৩. জাতি নিজে যখন সামগ্রিকভাবে উন্নয়নমুখী ও প্রগতিশীল হবে এবং একটা শিষ্টাচারী সংস্কৃতিবান, সুরুচি সম্পন্ন, সুস্থমনা ও কর্মঠ জাতিতে পরিণত হবে, কেবল তখনই তার পোশাক

ভদ্রজনোচিত, সুন্দর ও উন্নয়নশীল অবস্থার উপযোগী হবে। এ পথে জাতি যত অগ্রসর হবে, সেই অনুপাতেই তার জাতীয় পোশাক আপনা থেকেই শুধরে যেতে থাকবে। উন্নয়নশীল সমাজ স্বতস্ফূর্তভাবে অকৃত্রিম ও অনিচ্ছাকৃত পন্থায় এবং নির্ভেজাল স্বভাবের তাগিদে নিজের কিছু পুরানো বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ও সংশোধন করবে আর কিছু অন্যদের সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিজের কাছে এমনভাবে সাজাবে যে, তা অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণভাবে তার সাথে খাপ খেয়ে যাবে। সংস্কার ও উন্নয়নের এই স্বাভাবিক নিয়ম বাদ দিয়ে রাতারাতি এক পোশাকের স্থলে আর এক পোশাক গ্রহণ করা লাফ দিয়ে এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় পৌঁছার চেষ্টা করার সাথে তুলনীয়। সামাজিক জীবনে এ ধরনের লাফ দেয়াতে কোন সত্যিকার পরিবর্তন সাধিত হয় না।

৪. কোন জাতির সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়নের আগে তার পোশাক ও সমাজিকতা উন্নয়ন এবং তার প্রকৃত মর্যাদার চেয়ে উচ্চতর মানে উন্নীত করার চেষ্টা করা একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুকে উত্তেজক খাদ্য ও তেজস্ক্রিয় ওষুধ খাইয়ে এবং উত্তেজনাময় পরিবেশে রেখে জোর পূর্বক সাবালক বানানোর মত কাজ। এ ধরনের অস্বাভাবিক ''প্রচার কার্য'' দ্বারা এই অসহায় শিশুর দেহ কাঠামো ও মানসিক অবস্থায় যে মারাত্মক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হবে সেটা সেই অরাজক অবস্থা ও বিশৃংখলার সাথেই তুলনীয়, যা কোন জাতিকে জোরপূর্বক "ভদ্র ও সংস্কৃতিবান" বানানোর পরিণামে তার সামগ্রিক ব্যবস্থায় তার নৈতিক ও মানসিক অবস্থায় দেখা দেবে।

৫. একটি জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা যে ধরনের পোশাক, রীতি ও সমাজরীতির বোঝা বহন করতে সক্ষম, তার চেয়ে বেশী ব্যয়সাপেক্ষ পোশাক ও সমাজ পদ্ধতির বোঝা তার ওপর চাপিয়ে দেয়া তাকে কার্যত ধ্বংস করার শামিল। পোশাক ও সমাজরীতির সাথে সাথে সে সমৃদ্ধিশালী জাতিগুলোর অন্যান্য সাংস্কৃতিক আচরণ–প্রণালীও অবলম্বন করতে সচেষ্ট হবে এবং সেটা হবে তার পক্ষে ধ্বংসাত্মক।

৬. পোশাক, ভাষা ও বর্ণমালাই হলো একটি জাতির স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত্তি। কোন জাতির জাতীয়তার এই ভিত্তিগুলোকে যদি ধ্বংস করে দেয়া হয়, তা হলে তার স্বকীয়তা ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। অবশেষে একদিন সে অন্যান্য জাতির মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। প্রাচীন যুগের যে জাতিগুলোর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং যাদেরকে আমরা "লুপ্ত জাতি" বলে অভিহিত করে থাকি,তাদের সবগুলো এ কারণেই নিপাত হয়ে গেছে। তাদের ধ্বংস হওয়ার অর্থ এ নয় যে, ঐ সব জাতির সকল ব্যক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং পৃথিবীতে তারা কোন বংশধর রেখে যায়নি। তাদের উধাও হয়ে যাওয়া ও নির্মূল হয়ে যাওয়ার অর্থ এই যে, তাদের স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্র জাতিসত্তা খতম হয়ে গেছে। তারা তাদের জাতীয়তার ভিত্তি নিজেরাই ধসিয়ে দিয়েছে অথবা ধসে যেতে দিয়েছে। তাদের লোকেরা ভিন্ন জাতির পোশাক ,ভাষা, বর্ণমালা ও সামাজিক আচরন রীতি গ্রহণ করেছে। এর ফলে তাদের নিজস্ব জাতীয়তা নির্বুদ্ধিতায় ও নিস্তেজ হতে হতে এক সময় বিলীন হয়ে গেছে। আজকের যে সব জাতি তাদের মুর্খনেতাদের নির্বুদ্ধিতা পূর্ণ কলাকৌশলকে উন্নতির মোক্ষম উপায় মনে করে গ্রহণ করে চলেছে,তাদের জন্যও এই শোচনীয় পরিনতিই অবধারিত।

৭. একটি জাতির পক্ষে অন্য জাতির পোশাক ও সামাজিক রীতি–নীতি অবলম্বন করা মূলত হীনমন্যতারই ফল ও পরিচায়ক। এ থেকে আসলে এ কথাই বুঝা যায় যে, নিজেকে অত্যন্ত নীচ, হীন ও নিকৃষ্ট মনে করে। যেন গর্ব করার মত কিছুই তার নেই। তার পূর্ব পুরুষেরা যেন এমন কোন উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার যোগ্যই ছিলনা, যা তাদের ধারণ করতে ও বহাল রাখতে লজ্জাবোধ হয় না। তার জাতীয় রুচি ও মনোবৃত্তি এত নীচ, তার জাতীয় মেধা ও মনীষা এত ভোঁতা এবং তার ভেতরে সৃজনশীলতার এত অভাব যে, সে নিজের জন্য কোন উৎকৃষ্টতর জীবন প্রণালী তৈরী করতেই সক্ষম নয়। সে নিজেকে সংস্কৃতিবান ও রুচিবান দেখানোর জন্য সব কিছু অন্যের কাছ থেকে চেয়ে–চিন্তে আনে এবং নির্লজ্জের মত

বিশ্ববাসীর সামনে ঘোষণা করে যে,সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও সৌন্দর্য্য-সুষমা বলতে যা কিছু আছে, তা অন্য জাতির জীবনেই আছে, অন্য জাতিই পূর্ণতা ও উৎকৃষ্টতার মানদন্ড আর আমরা হাজার হাজার বছর ধরে কেবল ইতর প্রাণীর মত বেঁচে আছি। শ্রদ্ধা করার মত ও টিকে থাকার মত কোন জিনিসই আমরা সৃষ্টি করতে পারিনি। এটা ধ্রুব সত্য যে, যে জাতির ভেতরে বিন্দুমাত্রও আত্মসম্ভ্রমবোধ অবশিষ্ট আছে, সে এভাবে নিজের হীনতা ও নীচতার জীবন্ত প্রতিক হওয়া কখনো পছন্দ করতে পারে না। ইতিহাস সাক্ষী এবং বর্তমান কালের চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করা ঘটনাবলীও এটাই সাক্ষ্য দেয় যে, এহেন হীন ও অবমাননাকর অবস্থা একটি জাতি কেবল দুই অবস্থায় বরদাশত করে থাকে। প্রথমত, যখন সে জীবনের প্রত্যেক ময়দানে মার খেয়ে এবং ক্রমাগত পরাজিত হয়ে হয়ে সর্বশান্ত হয় এবং হার মানে, যেমন ভারত, তুরস্ক, মিসর,ইরান ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, যখন বাস্তবিক পক্ষেই তার পেছনে কোন গৌরব জনক ঐতিহ্য থাকেনা, তার নিজস্ব কোন ঐতিহ্যবাহী সভ্যতা-সংস্কৃতি থাকে না,তার মধ্যে উচুঁ মানের সৃজনশীল শক্তিও অবশিষ্ট থাকে না এবং বিশ্ব সমাজের কাছে সে নিছক একটি উপনিবেশ হিসেবে বিরাজ করে, যেমন জাপান।

৮. একটি জাতির কাছ থেকে আর একটি জাতির কোন কিছু যদি নিতে হয় এবং নেয়ার মত থাকে, তবে সেটি হলো তার জ্ঞান, গবেষণার ফল,সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার ফসল এবং যার দ্বারা সে পৃথিবীতে সাফল্য মন্ডিত হয়েছে সেই সব বাস্তব কর্মপ্রণালী। তার ইতিহাসে,তার সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডে অথবা তার নৈতিকতায় যদি কোন লাভজনক শিক্ষা থেকে থাকে, তবে তা অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। তার উন্নতি ও সমৃদ্ধির উৎস ও উপকরণগুলোর পূর্ণ যাচাই-বাছাই সহকারে পর্যালোচনা করা উচিত এবং তার মধ্য থেকে প্রতিটি উপকারী ও কল্যাণকর জিনিস গ্রহন করা কর্তব্য। এসব জিনিস মানব সমাজের অভিন্ন ও সার্বজনীন সম্পত্তি। এগুলোর কদর না করা এবং এগুলো

গ্রহন করার ব্যাপারে জাতীয় আভিজাত্যবোধ ও বিদ্বেষের বশে কার্পণ্য করা নিরেট কূপমন্ডুকতা ও মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এ জিনিসগুলো ছাড়া ভিন্ন জাতির পরিধেয় কাপড়ের ফ্যাশান, তার জীবন যাপনের রীতি, পানাহারের সাজ-সরঞ্জাম ও রীতি-প্রথা গ্রহণ এবং তাকে উন্নতির উপকরণ মনে করা নিবুর্দ্ধিতার আলামত ছাড়া আর কিছু নয়। কোনো কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ কি এক মুহূর্তের জন্যও এমন কথা ভাবতে পারে যে, ইউরোপ কেবল কোট-প্যান্ট, নেকটাই, হ্যাট ও বুটের সাহায্যেই উন্নতি অর্জন করেছে? কেউ কি বলতে পারবে যে, কাঁটাচামচ ও ছুরির সাহায্যে খাওয়া কিংবা পাউডার, লিপস্টিক ও কসমেটিক্স ইত্যাকার বিলাস ও সৌন্দর্য্য চর্চার সামগ্রীই তাকে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়েছে? তা যদি না হয়-এবং জানা কথা যে, তা নয়-তা হলে উন্নতি ও প্রগতির দাবীদাররা যে সবার আগে এসব জিনিসের ওপরই হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার কারণ কি? এ কথা কেন তাদের বুঝে আসে না যে, ইউরোপীয় জীবনের এসব চমক আসলে শত শত বছরের অক্লান্ত সাধনার ফল? যে জাতিই লাগাতার পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও দৃঢ় সংকল্পের সাথে কাজ করবে, তার জীবন ইউরোপবাসীর জীবনের মতই ঈর্ষণীয় হতে পারে।

উপরোক্ত যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, একটি জাতি কর্তৃক অন্য একটি জাতির কেবল পোশাক ও সামাজিক আচরণের অনুকরণ করা একটা অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক ব্যাপার। এ কাজকে কোনো দিক দিয়েই যুক্তিগ্রাহ্য বলার অবকাশ নেই। স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার চার পাশে আগে থেকে বিদ্যমান সাধারণ জীবন প্রণালীকে বর্জন করার কথা চিন্তা করারও প্রয়োজন আছে বলে মনে করার অবকাশ নেই এবং তার পরিবর্তে ভিন্ন জাতির জীবন প্রণালী অনুসরণেরও কোনো কারণ থাকতে পারে না। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা কেবল অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই (Abnormal condition) মাথায় এসে থাকে। গর্ভাবস্থায় যেমন কোনো কোনো মহিলা মাটি খায় কিংবা দৃষ্টিশক্তিতে ত্রুটি দেখা দিলে যেমন প্রত্যেক জিনিস বাকা দেখা

যায়। উপরোক্ত ধরনের চিন্তা-ভাবনা ঠিক সেই ধরনের পরিস্থিতিতেই উদগত হয়ে থাকে।

শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গী

এ যাবত কেবল সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই আলোচনা করা হলো। এবার আমি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করবো।

ইসলাম স্বভাব ধর্ম। প্রত্যেক ব্যপারেই সাধারণ বিবেক ও সুস্থ মন যে পথ অবলম্বন করে ইসলামও সেটাই অবলম্বন করে। রঙ্গীন চশমা ফেলে দিয়ে প্রত্যেক সমস্যাকে তার আসল ও স্বাভাবিক রূপে দেখুন। এরূপ পর্যবেক্ষণে আপনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, সেটাই ইসলামের সিদ্ধান্ত হবে। ইসলাম পৃথকভাবে কোনো বিশেষ পোশাক এবং কোনো বিশেষ জীবন প্রণালী মানুষের জন্য নির্ধারণ করে না। বরং স্বাভাবিকভাবে যে পোশাক ও যে জীবন প্রণালীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে, ইসলাম তাকেই হুবহু মেনে নেয়। তবে খালেস নৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে কতিপয় মূলনীতি নির্ধারণ করে দেয় এবং প্রত্যেক জাতি তার জাতীয় পোশাক ও জীবন প্রণালীকে সেই মূলনীতি অনুসারে শুধরে নিক-এটাই তার কাম্য।

পয়লা জিনিস হলো সতরের সীমা। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম দেশ ও জাতি নির্বিশেষে সকল পুরুষের জন্য নাভি ও হাটুর মধ্যবর্তী স্থান এবং সকল নারীর জন্য মুখমন্ডল ও হাত পা ছাড়া সমগ্র শরীর আবৃত করা অপরিহার্য্য মনে করে। [১]

---

১. উল্লেখ থাকে যে, এটা নারীর সতরের সীমা, পর্দার নয়। সতর হলো শরীরের সেই সব অংশ যে, স্বামী ছাড়া আর সকলের দৃষ্টির আড়ালে রাখা চাই। এমন কি বাপ বা ছেলের সামনেও তা খোলা যায় না। আর পর্দা হলো এর অতিরিক্ত একটা জিনিস। এর ব্যাপারে ঘনিষ্ট আত্মীয় এবং বেগানা পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। ঘরোয়া জীবনের অঙ্গনের বাইরে নারী স্বীয় সৌন্দর্য্য ও সাজ-সজ্জার প্রদর্শনী করুক ইসলাম তা অনুমোদন করেনা।

কোন জাতির পোশাক যদি এমন হয় যে, এই সব শর্ত তাতে পূরণ হয় না, তা হলে ইসলাম তার কাছে দাবী জানাবে যে, এই শর্ত অনুসারে তাদের পোশাক রীতি শুধরে নিক। যখন তারা শুধরে নেবে, তখন ইসলামের লক্ষ্য হাসিল হয়ে যাবে। এর পর তার পোশাকের আকৃতি ও কাটছাট কি ধরনের হয় তা নিয়ে তার আর কিছু বলার থাকে না।

ইসলামের দ্বিতীয় জরুরী সংস্কার এই যে, পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক ও সোনা–রূপার গহনা পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অযথা অহংকার, গর্ব, নিষ্প্রয়োজন প্রদর্শনী ও বিলাসিতার প্রকাশ ঘটে এমন পোশাক নারী–পুরুষ সকলের জন্যই পরিত্যাজ্য ঘোষণা করা হয়েছে। মাটিতে ঘঁষতে ঘঁষতে টেনে নেয়া হয় যে অহংকারের পোশাক, যা পরে মানুষ অন্য মানুষের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দেখায়, তার ওপর অভিসম্পাত করা হয়েছে।(১) যে পোশাকপরে এক শ্রেণীর মানুষ সাধারণ মানুষের ওপর নিজের শান–শওকত, জৌলুস ও বড়লোকীর দাপট দেখায়, তা ইসলামে হারাম। প্রবৃত্তির পূজা ও বিলাসিতার লালনকারী অতিমাত্রায় ঢিলাঢালা পোশাকও ইসলামের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত। এ জিনিসগুলো থেকে পোশাক পরিচ্ছদকে মুক্ত করুন। এরপর আপনার দেশে ও সমাজে যে পোশাক প্রচলিত রয়েছে, সেটাই ইসলামী পোশাকে পরিণত হবে।

তৃতীয় যে জিনিসটা ইসলাম দাবী করে তা হলো এই যে, শিরক ও মূর্তি পূজার যে সব সুনির্দিষ্ট প্রতিক কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় নিজেদের জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছে, আপনার পোশাক তা থেকে মুক্ত হতে হবে। যেমন পৈতা, ক্রস, ছবি অথবা অনুরূপ কোনো জিনিস, যা অনৈসলামিক প্রতিক রূপে গণ্য হয়ে থাকে।

---

১. এর একটা উজ্জ্বল উদাহরণ হলো রাজা, বাদশাহ, পোপ, খৃষ্টান ধর্মযাজক, আদালতের বিচারপতি ও এ ধরনের উচ্চ পদস্থ লোকেরা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানাদিতে যা পরে থাকেন এবং বিয়ের সময় কনেকে যা পরানো হয়–এ সব পোশাক এত লম্বা হয়ে থাকে যে, পেছনে কয়েকজন মানুষ তা উচু করে নিয়ে চলতে থাকে। এটাই

এই কটি নৈতিক ও তমদ্দুনিক সংস্কারের পাশাপাশি ইসলাম এটাও কামনা করে যে, মুসলমানদের পোশাকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকা উচিত, যা দ্বারা তাদেরকে অমুসলিমদের মোকাবিলায় চিহ্নিত ও পৃথক করা যায়। তারা অমুসলিমদের মধ্যে মিশে একাকার হয়ে না যায়, পরস্পরকে চিনতে পারে এবং তাদের সামাজিক জীবন সুসংহত হয়। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট প্রতিক বা কোনো বিশেষ ধরনের বেশভূষা নির্ধারণ করেনি। বরঞ্চ এ ব্যাপারটাকে সে প্রচলিত সমাজ রীতির ওপর ন্যস্ত করেছে। আরবে যখন ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হলো, তখন স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য মুসলমানরা আরবদের তৎকালীন সাধারণ জাতীয় পোশাক যা ছিল, তা–ই পরতেন। তবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে আরবের মুশরিকদের থেকে পৃথক করার জন্য একটা আলামত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। সেটি হলো এই যে, মুসলমানরা টুপির ওপর পাগড়ী পরবে।[১] সাধারণ আরবরা হয় শুধু পাগড়ী পরতো নতুবা শুধু টুপি

হলো অহংকারের পোশাক এবং এর সম্পর্কেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি অহংকার বশে নিজের কাপড় মাটি দিয়ে টেনে নিয়ে চলবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার মুখও দেখতে চাইবেন না"।

১. আবু দাউদ, তিরমিযী ও মুসতাদরাকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ অর্থাৎ আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্যকারী জিনিস হচ্ছে টুপির ওপর পাগড়ী পরা। কেউ কেউ এ হাদীস থেকে ধরে নিয়েছেন যে, এটা সকল মুসলমানের জন্য চিরস্থায়ী আইন। এ জন্য অনেকে এখনো এ কাজকে সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। কিন্তু আসলে এ ধারণা না বুঝে হাদীস পড়ার ফল। আসলে সুন্নাত শুধু এতটুকু যে, মুসলমানরা যখন কোনো অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশে বাস করবে, তখন তাদেরকে তাদের পোশাকে অমুসলিমদের থেকে পার্থক্য করা যায় এমন কোনো প্রতিক নির্ধারণ করে নিতে হবে।

মাথায় দিত। এ জন্য টুপির ওপর পাগড়ী বাঁধা মুসলমানদের জন্য প্রতিকী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হলো। নবাগত ইসলামী আন্দোলনের অনুসারীদেরকে স্বদেশের সাধারণ অধিবাসীদের মধ্য থেকে পৃথকভাবে চেনার জন্য এটুকু আলামতই যথেষ্ট মনে করা হলো। পরবর্তীকালে যখন সমগ্র আরববাসী মুসলমান হলো, তখন এ আলামতের আর প্রয়োজন রইল না। কেননা তখন আরবীয় পোশাকই পোশাকই ইসলামী পোশাকে পরিণত হয়েছে। এ পোশাক পরা কোনো মানুষ কাফির বা মুশরিক থাকেনি যে, তাকে মুসলমানদের মধ্য থেকে পৃথক করার জন্য কোন আলামতের দরকার হবে। অনুরূপভাবে যখন ইরান ও অন্যান্য দেশে ইসলামের বিস্তার ঘটলো, তখন প্রথম প্রথম প্রয়োজন দেখা দিল যে, নও মুসলিমদের হয় আরবী পোশাক পরা চাই, নচেত দেশী পোশাকে কোনো বিশেষ আলামত (যেমন পাগড়ী অথবা বিশেষ ধরনের লম্বা ঢিলাঢালা জামা) সংযোজন করা চাই। কেননা তৎকালে তাদের দেশীয় পোশাক ছিল অমুসলিমদের পোশাক। তাই পৃথক কোনো চিহ্ন ব্যবহার না করলে মুসলমানদের আলাদা সামাজিক জীবন যাপন কোনো ক্রমেই সম্ভব হতো না। কিন্তু এ সব দেশের অধিকাংশ মানুষ যখন মুসলমান হয়ে গেল এবং তাদের প্রচলিত দেশী পোশাকে উপরে বর্ণিত নৈতিক ও তমদ্দুনিক সংস্কার প্রবর্তন করা হলো, তখন তাদের হরেক রকমের স্থানীয় পোশাকই হুবহু ইসলামী পোশাকে পরিণত হলো। আজকের যুগেও যেসব দেশের অধিকাংশ কিংবা সকল অধিবাসী মুসলমান হয়ে গেছে, সে সব দেশের প্রচলিত রকমারি পোশাক সম্পূর্ণরূপে ইসলামী পোশাক। আর যেখানে মুসলিম ও অমুসলিম অধিবাসী মিশ্রিত, সেখানে যে পোশাক পরলে কে মুসলমান এবং কে অমুসলমান তা চেনা যায়, সে পোশাক ইসলামী পোশাক। আর যেখানকার পুরো জনসংখ্যা অমুসলিম, সেখানে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে সাধারণভাবে ইসলামী আলামত হিসেবে পরিচিত যে কোনো প্রতিক স্বীয় পোশাকে যুক্ত করা তার কর্তব্য, যাতে সাধারণ অমুসলিমদের মধ্যে তাকে চিহ্নিত করা যায়।

অনুকরণ প্রবণতা

এ পর্যায়ে আমাদের "তাশাববুহ" তথা অন্যের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন, অন্য কথায় পরানুকরণ প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করা অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। এই সাদৃশ্য অবলম্বন বা অনুকরণের চারটা পদ্ধতি হতে পারে। এই চারটা সম্ভাব্য পদ্ধতির প্রত্যেকটি সম্পর্কে ইসলামের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

১. নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সাদৃশ্য অবলম্বন বা অনুকরণঃ যেহেতু এটা একটা অস্বাভাবিক কাজ এবং বিকারগ্রস্ত মানসিকতার আলামত। তাই ইসলাম এর প্রতি অভিসম্পাত দিয়েছে। যে সব পুরুষ নারীসুলভ এবং যে সব নারী পুরুষসুলভ পোশাক পরে, রসূল (সঃ) তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় অভিশাপ দিয়েছেন। যে ব্যক্তির মনমানস স্বাভাবিক ও সুস্থ হবে, তার দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই রসূলের (সঃ) দৃষ্টিভঙ্গীর অনুরূপ হবে। পুরুষের নারীর মত আচরণ এবং নারীর পুরুষের মত আচরণ, তা যে ব্যাপারেই হোক না কেন, ঘৃণার উদ্রেক করে থাকে এবং এর বিরুদ্ধে মানুষের মন আপনা থেকেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

২. জাতিতে জাতিতে পারস্পরিক অনুকরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বনঃ সামগ্রিকভাবে এক জাতি কর্তৃক আর এক জাতির পোশাক–রীতি বা ফ্যাশন অবলম্বন করাও একটা অযৌক্তিক ও স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ। কোনো জাতিতে যখন হীনমন্যতা ও নীচাশয়তা মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ে, তখনই এই প্রবণতা দেখা দিয়ে থাকে। এ জন্য ইসলামে এটাও অবৈধ। সাহাবায়ে কিরামের আমলে বিজাতীয় অনুকরণ প্রবণতাকে যেভাবে প্রতিরোধ করা হয়েছিল এবং বিজিত দেশের জনগণকে যেরূপ কঠোরভাবে আরবীয় বেশভূষা অবলম্বন করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তা থেকে ইসলামের প্রকৃত ভাবধারা পরিস্ফুট হয়।

৩. ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিজাতীয় অনুকরণের মানসিকতাঃ কোনো জাতির কিছু কিছু লোক যখন নিজেদের বেশভূষায় ভিন্ন জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, তখন সেটাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে

বিজাতীয় অনুকরণের মানসিকতা বলা যায়। এটা মূলত ব্যক্তিগত চরিত্রের দুর্বলতার লক্ষণ। যে সকল ব্যক্তি এ ধরনের নীতি অবলম্বন করে, তারা কার্য্যত এ কথাই প্রমাণ করে যে, তারা গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়ার ব্যধিতে আক্রান্ত। তাদের ব্যক্তিত্বে কোনো দৃঢ়তা ও স্থিরতা নেই। তরল পদার্থের মত যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের রং ও আকৃতি ধারন করে। তাছাড়া নৈতিক দিক থেকেও এটা একটা ঘৃনিত কাজ। যে ব্যক্তি নিজের প্রকৃত বংশ পরিচয়কে অস্বীকার করে অন্য বংশের লোক বলে নিজেকে পরিচিত করে সে যেমন নিন্দনীয়, এই ব্যক্তিও ঠিক তেমনি ধিক্কারের পাত্র। কৃত্রিম বংশ পরিচয়দানকারী ব্যক্তি নিন্দনীয় এ জন্য যে, সে নিজেকে সত্যিকার পিতার সন্তান বলে পরিচয় দেয়াকে কলংকজনক মনে করছে। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি একটি বিশেষ জাতির বংশোদ্ভুত হয়েও সম্মান ও গৌরব অর্জনের জন্য ভিন্ন জাতির বেশভূষা ও ফ্যাশন অবলম্বন করে, সেও নিন্দনীয়। কেননা এভাবে সে প্রমাণ দেয় যে, সে যে জাতির সন্তান, সে জাতির সাথে যুক্ত হওয়া তার চোখে অবমাননাকর। তার দৃষ্টিতে অন্য জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়াই মর্যাদাবান হওয়ার একমাত্র উপায়। সাংস্কৃতিক দিক থেকেও এ আচরণ একেবারেই ভ্রান্ত। যারা এ পথ অবলম্বন করে তারা চামচিকেয় পরিণত হয়। না ঘরকা, না ঘাটকা হয়ে যায়। যে জাতিতে জন্মেছে তার সাথেও তার যোগসূত্র থাকেনা। আবার যে জাতির ভেতরে শামিল হতে চায় সে জাতির কাছেও পাত্তা পায় না। আরবের যে লোকগুলো প্রবাসে যেয়ে আরবের বেদুইনসুলভ পোশাক ত্যাগ করেছিল এবং রোম ও ইরানের চটকদার সংস্কৃতির জৌলুসে মতিভ্রান্ত হয়ে তাদের বেশভূষা অবলম্বন করেছিল, হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) তাদেরকে যে তিরস্কার করেছিলেন, তার কারণ এখানেই নিহিত।

৪. অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনঃ অর্থাৎ কোনো মুসলমানের অমুসলমানের মত বেশভূষা ও পোশাক পরিচ্ছদ অবলম্বন করার মাধ্যমে তাদের সাথে একাকার হয়ে যাওয়া। এ কাজ মুসলমানদের সামাজিক ও জাতীয় ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

এর দরুন মুসলমান মুসলমানের পর হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে যে ঐক্য সংহতি ও সহযোগিতা ইসলাম দেখতে চায়, তা সৃষ্টি হতে পারে না। তাছাড়া এ দ্বারা এ কথাও বুঝা যায় যে, মুসলমান হয়েও একজন মানুষ অমুসলিমদের দিকে আকৃষ্ট। রাজনৈতিক দিক দিয়েও এ আচরণ ক্ষতিকর। কেননা যে ব্যক্তি অমুসলিমদের আকৃতি অবলম্বন করেছে, তার সাথে মুসলমানরা অজ্ঞাতসারে অমুসলিমসুলভ আচরণ করে বসতে পারে এমন আশংকা রয়েছে। এ সব কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলিমদের অনুকরণ করতে বার বার নিষেধ করেছেন। خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارٰى خَالِفُوا الْمَجُوسَ (ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিউপাসকদের বিরুদ্ধাচারণ কর) এ নির্দেশ একাধিক হাদীসে পাওয়া যায়। এ থেকে বুঝা যায় যে, মুসলমান যেন মুসলমানকে দেখেই চিনতে পারে এবং তার সাথে মুসলমানসুলভ আচরণ করতে পারে–এটাই তিনি চাইতেন। তিনি এ কথাও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, যে মুসলমান অমুসলিমদের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকবে, আমি তার কোনো দায়দায়িত্ব বহন করবো না। অর্থাৎ কোনো যুদ্ধে যদি মুসলমানরা তাকে শত্রুর লোক মনে করে হত্যা করে, তা হলে সে জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (যে ব্যক্তি ভিন্ন কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত বলে গণ্য হবে) এ উক্তিরও মর্মার্থ এই যে, যাকে অন্য জাতির মানুষের মত দেখা যাবে, তাকে অনিবার্য্যভাবে সেই জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ধরে নেয়া হবে এবং ঐ জাতির অন্যান্য মানুষের সাথে যে আচরণ করা হয় তার সাথেও সেই আচরণ করা হবে।(১)

তরজমানুল কুরআন, জিলকদ–১৩৫৮ হিঃ
জানুয়ারী–১৯৪০

---

১. এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমার লেখা "ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ" দ্রষ্টব্য।

মুসলমান কর্তৃক ইহুদী ও খৃষ্টান মহিলা বিয়ে করা প্রসঙ্গে

এক সুহৃদের অনুযোগ এই যে, ফিরিঙ্গী নারীদের আমদানি ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং ''আহলে কিতাব'' মহিলাদের বিয়ে করার অনুমতি একটা ওজুহাতে পরিণত হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে শারীয়তের বিধির সঠিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

নিঃসন্দেহে এটা একটা গুরুতর ফিতনা হয়ে দাঁড়ায়েছে। ভারত, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে মেম সাহেবাদের দৌরাত্ম্য এত দূর গড়িয়েছে যে, তারা ইসলামী সমাজকাঠামোতে ঢুকে তার মূলোৎপাটনের কাজটা বেশ দক্ষতার সাথেই করেছে। কিন্তু তুরস্কে তাদের তৎপরতা আরো বিস্তৃতি লাভ করে রাজনীতিতেও মারাত্মক পরিনতি ডেকে এনেছে। তুরস্কের বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের পতনের এটা একটা অন্যতম কারণ। এ কারণে বেদনাভারাক্রান্ত মুসলমানরা যদি এ ফিতনা প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তবে সেটা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। তবে আমাদের মতে, জনস্বার্থের কোন একটি দিকের ওপর প্রয়োজনের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে শরীয়তের কোন বিধিকে সংশোধন করা ঠিক নয়। যিনি কুরআন নাজিল করেছেন তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বাধিক বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ। মানুষের যাবতীয় স্বার্থ, কল্যাণ ও প্রয়োজনকে তিনি সর্বোচ্চ পরিমাণ ভারসাম্য ও সুক্ষ্মতম আনুপাতিক বিন্যাস সহকারে বিবেচনা করে থাকেন। তাঁর নির্দেশাবলীকে বুঝতে এবং বিরাজমান পরিস্থিতিতে তাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হলে দৃষ্টিকে যথা সম্ভব প্রশস্ত করে ছোট–বড় সংশ্লিষ্ট সকল প্রয়োজনের পর্যালোচনা করতে হবে এবং প্রত্যেকটি প্রয়োজনকে স্বয়ং বিধানদাতা যতখানি গুরত্ব দিয়েছেন ঠিক ততখানি গুরুত্ব দিতে হবে।

কুরআনের যে আয়াতে আহলি কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) নারীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে তা এইঃ

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ
لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ
الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ-

''আজ তোমাদের জন্য পবিত্র জিনিসগুলো হালাল করে দেয়া হলো। আহলে কিতাবের খাদ্য তোমাদের জন্য এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। সতী মুমিন নারী এবং সতী আহলে কিতাব নারীরাও (তোমাদের জন্য হলাল) কেবল শর্ত এই যে, তোমরা মোহরানা প্রদান করে তাদেরকে বিয়ে করবে, প্রকাশ্য লাম্পট্যে লিপ্ত অথবা গোপন সম্পর্ক রক্ষাকারী হবেনা। (মায়েদা–৫)

প্রাচীন মুসলিম মনীষীদের নানা মত

এ আয়াতের তাফসীরের ব্যাপারে প্রাচীন ইমামদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ হয়েছে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ শরীয়ত বিজ্ঞদের কাছে এ এ আয়াতের প্রকাশ্য শাব্দিক মর্মই গৃহীত এবং সর্বকালে সর্বাবস্থায় এর বিধি প্রযোজ্য। কেননা কুরআনের কোন বিধিকে বাহ্যিক শাব্দিক অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থে গ্রহণ করা এবং তার মুক্ত অবাধ প্রয়োগকে সীমিত ও নির্দিষ্ট করার জন্য উপযুক্ত দলীল প্রয়োজন। এখানে সে ব্যাপারে আদৌ কোন দলিল নেই। কুরআন যিনি নাজিল করেছেন, সেই মহান আল্লাহর চেয়ে বিজ্ঞতর আইনদাতা আর কেউ হতে পারে না। তিনি নিজে যদি তার আইনকে কোন ব্যতিক্রম বা শর্তাধীন করার প্রয়োজন বোধ করতেন, তা হলে '' আহলে কিতাবভুক্ত সতী নারীদের''এই কথার সাথে কিছু শর্ত বা বিশেষন অবশ্যই সংযুক্ত করতেন। নিজের আইনগত নির্দেশাবলীর জন্য যথোপযুক্ত ভাষা প্রয়োগ ও শব্দ চয়নে

তিনি দুনিয়ার আইন রচনাকারী মানবকূলে সমান নৈপূণ্যও দেখাতে পারবেন না-এটা একেবারেই অসম্ভব। তিনি মনে মনে ইচ্ছা করলেন আহলি কিতাবের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর নারীদেরকে হালাল করতে, অথচ স্বীয় বিধি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি এমন শব্দ বাছাই করে বসলেন, যা সমগ্র আহলি কিতাবকেই বুঝায় এবং যাতে গোষ্ঠী বিশেষকে নির্দিষ্ঠ করা অথবা বাদ দেয়ার কোন ইংগিতই নেই-এটা কিভাবে সম্ভব? এ জন্যই সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং প্রাচীন ইমামগনের প্রায় সকলেই এ আয়াতকে যে কোন আহলি কিতাব নারীকে বিয়ে করার অবাধ অনুমতি অর্থেই গ্রহণ করেছেন। শুধু ঐ অর্থে গ্রহণই করেননি, তদনুসারে কাজও করেছেন। হযরত উসমান (রাঃ) নায়েলা নাম্নী জনৈকা খৃস্টান মহিলাকে বিয়ে করেন। হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ জনৈকা সিরীয় ইহুদী রমনীকে বিয়ে করেন। হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান, কা'ব ইবনে মালিক এবং মুগীরা বিন সুবা প্রমূখও আহলি কিতাব রমনীকে বিয়ে করেন অথবা বিয়ের প্রস্তাব দেন।

হযরত ইবনে ওমরের অভিমত

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত ইবনে ওমরই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ইহুদী ও খৃস্টান নারীদেরকে বিয়ে করা সম্পূর্ণ অবৈধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন যে, ''আল্লাহ তায়ালা মুশরিক নারীদেরকে হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ (بقره: ۲۲۱)

''তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না যতক্ষন তারা ঈমান না আনে।'' আর হযরত ঈসা (আঃ) বা অন্য কোন বান্দাকে আল্লাহর পুত্র বলার চেয়ে বড় শিরক আর কিছু হতে পারে বলে আমার জানা নেই। এ কারণে আহলি কিতাবের যেসব নারীর আকীদা-বিশ্বাস শিরক যুক্ত রয়েছে তাদের সকলকেই তিনি হারাম মনে করেন। والمحصنت শব্দের অর্থ তাঁর মতে والمسلمات অর্থাৎ মুসলিম নারী। (সতী নারী নয়) অর্থাৎ তাঁর মতে পূর্বোল্লিখিত আয়াতের মর্ম এই যে, আহলি কিতাবের যেসব নারী মুসলমান হয়ে যাবে, তাদেরকেও বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ।

তবে এ ক্ষেত্রে হযরত ইবনে ওমরের মত সঠিক নয়। এর কারণ নিম্নে বর্ণনা করা যাচ্ছেঃ

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে নিজেই আহলি কিতাবের আকীদা বিশ্বাস বর্ণনা করেছেন যা সুস্পষ্ট শিরক ভিত্তিক। যেমন স্বয়ং হযরত ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ বলা, আল্লাহকে তিন উপাস্যের একজন বলা, হযরত ঈসাকে (আঃ)আল্লাহর পুত্র বলে খৃষ্টানদের এবং হযরত উযায়েরক আল্লাহর পুত্র বলে ইহুদীদের বিশ্বাস করা প্রভৃতির বর্ণনা কুরআনে দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা যে ''শিরক'' ও ''কুফরিতে'' লিপ্ত, সে কথাও কুরআনে বলা হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও কুরআনের কোথাও তাদের ব্যাপারে পরিভাষা হিসাবে মুশরিক শব্দের প্রয়োগ হয়নি। সমগ্র কুরআনে যেখানেই তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আহলি কিতাব অথবা এর সমার্থক শব্দ দ্বারাই করা হয়েছে। কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে যান। তিনটি গোষ্ঠী সম্পূর্ণ আলাদা আলাদাভাবে দেখতে পাবেন। একটি হচ্ছে কাফির ও মুশরিকদের। অর্থাৎ যাদের কাছে বিকৃত অথবা অবিকৃত কোন অবস্থাতেই কোন আসমানী কিতাব নেই। দ্বিতীয়টি আহলি কিতাব, যারা বিশ্বাস ও কর্মে যত গোমরাহীতেই লিপ্ত থাকুক, কোন না কোন নবী এবং কোন না কোন আসমানী কিতাবে তাদের ঈমান রয়েছে। তৃতীয়টি মুমিনদের অর্থাৎ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের গোষ্ঠী। এরা মুসলমানদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে থাকুক, আহলি কিতাব গোষ্ঠীর মধ্য থেকে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে থাকুক অথবা কাফির ও মুশরিকদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে মুসলমান হয়ে থাকুক সর্বাবস্থাই তাদেরকে মুমিন বা মুসলিম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন এই তিন গোষ্ঠীর মধ্যে সব সময় সুস্পষ্ট প্রভেদ বজায় রেখেছে। কোথাও তাদেরকে একাকার করে ফেলেনি যে, আহলি কিতাব বলে মুশরিক অথবা মুশরিক বলে আহলি কিতাব বুঝাবে অথবা আহলি কিতাব বলে মুসলমান বুঝাবে। সুতরাং এক আয়াতে যখন আল্লাহ ''মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না'' বলে বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন এবং অন্য আয়াতে ''আহলি কিতাবের

সতী নারীদের'' বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন, তখন এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, প্রথম আয়াতে ''মুশরিক নারী'' শব্দ দ্বারা মূর্তিপূজারী ও অন্যান্য অকিতাবী সম্প্রদায়ের নারী বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা সেই সব অমুসলিম সম্প্রদায়ের নারীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের কাছে কুরআনের পূর্বে অন্যান্য আসমানী কিতাব ছিল। এ রকম অর্থ গ্রহণ না করা হলে কুরআনের দুটো আয়াতে স্পষ্ট বিরোধ ও বৈপরিত্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ বৈপরিত্য কেবল এ কথা বলে নিরসন করা সম্ভব নয় যে, وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ এর অর্থ ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে যাওয়া নারীগণ অথবা শিরক ও কুফরিতে লিপ্ত হয়নি এমন ইহুদী ও খৃষ্টান নারীগণ। কেননা প্রথমত আল্লাহ তায়ালা وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ এর আগেই وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنَٰتِ বলে দিয়েছেন। জানা কথা যে, মুমিন নারী বলতে কেবল জন্ম সূত্রে মুমিন নারীদেরকে বুঝায় না, বরং সাবেক ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণকারীনীদেরকেও বুঝায়। সুতরাং মুমিন নারীদেরকে যখন শর্তহীনভাবে হালাল করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম থেকে আসা মুমিন নারীরাও অন্তর্ভুক্ত, তখন পুনরায় নির্দিষ্ট করে ইসলাম গ্রহণকারীনী কিতাবী নারীদের কথা উল্লেখ করার কি প্রয়োজন ছিল? এতে তো কিতাবী নারীদের কথা আলাদা উল্লেখ করা একেবারেই নিরর্থক হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, এ আয়াতের পূর্বে এ কথাও বলা হয়েছে যে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের খাদ্য হালাল। সেখানেও কি আহলি কিতাব বলতে ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণকারীনী মহিলাদেরকে বুঝানো হবে? তা যখন নয়, তখন একই আয়াতের একাংশে আহলি কিতাবের এক অর্থ এবং অপর অংশে আর এক অর্থ গ্রহণ করা কিভাবে শুদ্ধ হয়?

তৃতীয়ত, ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে এমন কোন গোষ্ঠী আদৌ দেখানো যাবে কি, যারা শিরক ও কুফরি থেকে মুক্ত? আল্লাহ সম্পর্কে বিশুদ্ধ আকীদা তাদের মধ্যে থাকবে কি করে

এবং আসবেই বা কোথেকে? হযরত মূসা ও ঈসার (আঃ) আসল শিক্ষাই তারা বিকৃত করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় বিশুদ্ধ আকীদা সৃষ্টির পথই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের মধ্যে সঠিক পথের অনুসারী কোন গোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ কথাটা দ্বারা ইহুদী ও নাসারাদের কোন সত্যপন্থী গোষ্ঠী বুঝানো হয়েছে—এ ধারণা আদৌ সঠিক নয়। কুরআনের যে সব আয়াত থেকে ইহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে কিছু সত্যপন্থী গোষ্ঠী থাকার ধারণা জন্মে, আসলে সে সব আয়াতের ইংগিত এমন কিছু সংখ্যক ইহুদী ও খৃস্টানের প্রতি যারা অত্যন্ত সৎ স্বভাব ও মহৎ হৃদয়ের অধিকারী হওয়ায় রসূল (সাঃ)—এর হেদায়াত গ্রহণ করেছিলেন বা গ্রহণ করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।

চতুর্থত, যদি ধরেও নেয়া হয় যে, ইহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে এমন কোন ঈমানদার গোষ্ঠী ছিল, তাহলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ্ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ "যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব লাভ করেছিল" এ কথায় এমন কোন শর্ত যোগ করেননি, যা থেকে বুঝা যায় যে, এ অনুমতি কেবলমাত্র সেই ঈমানদার গোষ্ঠীর বেলায়ই প্রযোজ্য, অন্যান্য আহলি কিতাবের বেলায় প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ্ নিজেই যখন আকীদার ব্যাপারে কোন শর্ত আরোপ করেননি, তখন আমাদের কি ঠেকা পড়েছে যে, আমরা তাদের ঈমান—আকিদার তল্লাশী চালাতে যাবো এবং নিজেরা আন্দাজ—অনুমান করে তাদের কোন গোষ্ঠীর নারীকে বিয়ে করা জায়েয আর কোন গোষ্ঠীর জায়েয নয় তা স্থির করতে যাবো?

যারা হযরত ইবনে ওমরের অভিমতকে সমর্থন করেছেন তারা সূরা মুমতাহিনার ১০ নং আয়াতের উক্তি وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ "কাফির মহিলাদেরকে বৈবাহিক সম্পর্কে আটকে রেখ না" দ্বারা তাদের স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে থাকেন, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, এ আয়াত বিশেষভাবে দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামের দিকে মুসলমান হয়ে হিজরত করে আসা নারী ও পুরুষদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছিল, যাদের স্বামী বা স্ত্রীরা দারুল

হারবে অর্থাৎ কাফিরদের নিয়ন্ত্রনাধীন দেশে কাফির অবস্থায় অবস্থনরত ছিল। আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের দারুল ইসলামে আসা মাত্রই জাহেলিয়াতের বৈবাহিক সম্পর্ক বাতিল হয়ে যায় এবং হিজরতকারী নারী ও পুরুষ উভয়ে নতুনভাবে বিয়ে করতে পারে। আয়াতের নাজিল হওয়ার প্রেক্ষাপট (শানে নজুল) বিবেচনা করলে এর এ অর্থই বিশুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তবু যদি কেউ এর শাব্দিক অর্থের ওপরই নির্ভর করে (অর্থ্যাৎ কুফরি আকীদা পোষণকারীনীকে বিয়ে করা চলে না-এ কথাই আয়াতের বক্তব্য বলে ধরে নেয়) তা হলে আমরা বলবো যে, এক আয়াতে কাফির মহিলাদেরকে বিয়ে করার ব্যাপারে সাধারণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলেও অন্য আয়াতে সতী সাধ্বী আহলি কিতাব মহিলাদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়ে বলে দেয়া হয়েছে যে, কাফির মহিলাদের মধ্যে একটি বিশেষ গোষ্ঠী ইহুদী ও খৃস্টান মহিলারা-এই সাধারণ নিষেধাজ্ঞার ব্যতিক্রম এবং আওতা বহির্ভূত। আপনি যদি এ কথা না মানেন যে, প্রথম সাধারণ নিষেধাজ্ঞাকে দ্বিতীয় নির্দেশবলে বিশেষিত ও নির্দিষ্ট করা হচ্ছে, তা হলে অপনার এ কথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যে, আল্লাহ তায়ালা স্ববিরোধী কথাবার্তা বলে থাকেন। এক জায়গায় একটা জিনিসের অনুমতি দেন এবং অন্য জায়গায় তা নিষিদ্ধ করেন। নাউজুবিল্লাহ!

হযরত ইবনে আব্বাসের মতামত

হযরত ইবনে ওমরের পর হযরত ইবনে আব্বাস দ্বিতীয় সাহাবী, যিনি আহলি কিতাব নারীদের বিয়ে করার অনুমতিকে সীমিত ও শর্তাধীন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য এই যে, এ বিধি কেবল জিম্মী অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক নারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। খৃস্টান ও ইহুদীদের মধ্যে যারা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক, কেবল তাদের মধ্যকার নারীদেরকে বিয়ে করা যায়, তা সে তাদের আকীদা-বিশ্বাস যতই খারপ হোক না কেন। পক্ষান্তরে যারা ইসলামী রাষ্ট্রের বাইরে বাস করে তাদের মহিলাদেরকে বিয়ে

করা জায়েয নয়। তাঁর যুক্তি এই যে, আল্লাহ্ তায়ালা সূরা তওবার ২৯ নং আয়াতে আহলি কিতাবের এই গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। আয়াতটি এই–

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّ
مُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ (التوبة:٢٩)

"কিতাবধারীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নিষিদ্ধ করা জিনিসকে নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দীনের আনুগত্য করে না, তারা যতক্ষণ পদানত হয়ে স্বহস্তে জিজিয়া না দেয়, ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।" এছাড়া সূরা মুজাদালার ২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ ও রসূলের শত্রু তাদের সাথে প্রীতি ও ভালোবাসা রাখা ঈমানদার লোকদের পক্ষে সমীচীন নয়। আয়াতটি এই ঃ

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ . . . . يُوَادُّونَ
مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ (المجادلة:٢٢)

"আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোন গোষ্ঠীকে তুমি দেখবে না যে তারা আল্লাহ্ ও রসূলের দুশমনদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখে।" অন্যদিকে আল্লাহ্ তায়ালা প্রীতি, ভালোবাসা ও সহৃদয়তাকেই দাম্পত্য সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তি বলে অভিহিত করেছেন। যেমন সূরা রুমের ২১ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً - (الروم:٢١)

"আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের কাছে বসবাস করতে পার এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহৃদয়তা সৃষ্টি

করেছেন।" অতএব বৈবাহিক সম্পর্ক যখন ভালোবাসা ও আন্তরিকতার দাবী জানায়, অথচ ইসলামে বৈরী মুশরিক ও কিতাবীদের সাথে ভালোবাসা রাখা হারাম এবং যুদ্ধ করা কর্তব্য—তখন তাদের নারীদের সাথে বিয়ে বৈধ হতে পারে না।

কিন্তু ইবনে ওমরের ন্যায় ইবনে আব্বাসের যুক্তিকেও সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবী, তাবেঈন ও ফিকাহবিশারদ ইমামগণ গ্রাহ্য করেননি। এ কথা যদিও সত্য যে, কাফির শাসিত এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত অমুসলিম দেশের নাগরিক ইহুদী ও খৃস্টান নারীদেরকে বিয়ে করা সকলের মতেই গর্হিত কাজ (মাকরূহ) তথাপি কেউই একে হারাম বলেননি। কেননা وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ এ আয়াতে কিতাবধারী নারীদেরকে বিয়ে করার যে অনুমতি দেয়া হয়েছে তা শর্তহীন এবং নাগরিকত্ব নির্বিশেষে সকল কিতাবী নারীই তার আওতাভুক্ত। সুতরাং আইনগত বৈধতার বিধিকে কুরআন যেমন অবাধ ও শর্তহীন রেখেছে, ঠিক তেমনি অবাধ ও শর্তহীনভাবেই তাকে বহাল রাখতে হবে। অবশ্য জাতীয় স্বার্থে ও ব্যক্তিগত অবস্থার প্রেক্ষিতে এ বিয়ে যদি সঙ্গত না হয় এবং এটা পরিহার করার প্রয়োজন দেখা দেয় তবে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। আমরা জায়েযকে না জায়েয বানাতে পারি না। তবে এ অধিকার আমাদের অবশ্যই রয়েছে যে, যে কাজ কোন বিশেষ অবস্থায় বা কোন বিশেষ কারণে আমাদের জন্য সঙ্গত হয় না, তা আমরা পরিহার করতে পারি। কেননা জায়েয হওয়ার অর্থ এ নয় যে, সেটা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক কিংবা তা করতে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইসলামী আইনবিদদের সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত

হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রাঃ)—এর অভিমত অগ্রাহ্য করার পর যারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধিকে অবাধ ও শর্তহীন বলে মনে করেন, তাদের মধ্যে কেবল দু'টো শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ ঘটেছে। একটি হলো اَلْمُحْصَنٰتُ অপরটি হলো

أُوتُوا الْكِتٰبَ -

مُحْصَنٰتُ অর্থ একটি গোষ্ঠীর মতে "সতীসাধ্বী" অপর গোষ্ঠীর মতে এর অর্থ স্বাধীন মহিলা দাসী- বাদী নয়। প্রথমোক্ত গোষ্ঠীর মতে আহলি কিতাবের মধ্য থেকে কেবল সেই সব মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয যারা সতী। বদকার, বেহায়া ও কুলটা মেয়েরা এই বিধির আওতার বাইরে। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর মতে আহলি কিতাবভুক্ত দাসী-বাদীকে বিয়ে করা বৈধ নয়, চাই সে যতই সতী হোক। আর স্বাধীন কিতাবী মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয, চাই সে যতই অসতী ও ব্যভিচারিনী হোক।

কোন কোন সম্প্রদায় আহলি কিতাবের সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, কেবলমাত্র বনী ইসরাঈল বংশোদ্ভূত ইহুদী ও খৃষ্টানরাই আহলি কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। এর বাইরের যে সব সম্প্রদায় ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদকে গ্রহণ করেছে, তারা আহলি কিতাব নয়। কেননা হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা(আঃ) শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। অন্যান্য জাতি তাদের দাওয়াতের লক্ষ্য ছিল না। হানাফি আলেমগণ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ফিকাহবিদগণের মতানুসারে যে কোন নবী এবং যে কোন ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাসী লোকেরা আহলি কিতাব হিসাবে গণ্য। এ জন্য ইহুদী ও খৃষ্টান হওয়া শর্ত নয়। শুধুমাত্র হযরত ইবরাহীমের (আঃ) প্রতি নাজিলকৃত গ্রন্থ সমষ্টি এবং শুধুমাত্র হযরত দাউদের (আঃ) প্রতি নাজিলকৃত কিতাব যবুরেরও কোন অনুসারী যদি থাকতো তবে তাকেও আহলি কিতাব বলে গণ্য করা হতো। প্রাচীন মুসলিম ইমামগণের একটি ক্ষুদ্র দল এরূপ মত পোষণ করতেন যে, যে সব সম্প্রদায়ের কাছে এমন ধর্মগ্রন্থ রয়েছে, যা ঐশী গ্রন্থ হতে পারে বলে অনুমান করা যায়, তারাও আহলি কিতাবরূপে বিবেচিত। যেমন অগ্নি উপাসক সম্প্রদায়। এ অভিমতটি আরো একটু প্রসারিত করে বর্তমান যুগের কোন কোন ''ইসলামী চিন্তাবিদ'' এরূপ ইজতিহাদ করেছেন যে, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীরাও আহলি কিতাবভুক্ত এবং এ সব

সম্প্রদায়ের মেয়েদেরকেও বিয়ে করা জায়েয। কেননা তাদের কাছেও কোন না কোন নবী অবশ্যই এসে থাকবেন এবং কোন না কোন আসমানী কিতাব তাদেরকে অবশ্যই দেয়া হয়ে থাকবে।

বিশুদ্ধ মত

এত রকমারি মতামতের মধ্যে যে মতটি সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ, তা হলো এই যে, শুধু মাত্র ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকেই আহলি কিতাব গণ্য করা হবে, চাই ইসরাঈলী বংশোদ্ভূত হোক বা না হোক। কুরআনে কেবলমাত্র এ দুই জাতির বেলায়ই আহলি কিতাব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এক জায়গায় তো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, এই দুই জাতিই আহলি কিতাব। সূরা আনয়ামের ১৫৬ ও ১৫৭ নং আয়াত লক্ষ্য করুনঃ

وَهٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُوْنَ - اَنْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلٰى طَائِفَتَيْنِ
مِنْ قَبْلِنَا (انعام: ١٥٦، ١٥٧)

''আমার নাজিল করা এই গ্রন্থ পরম কল্যাণময়। সুতরাং এ কিতাব মেনে চল এবং সংযমী হও। হয়তো তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করা হবে। (এ কিতাব নাজিল করেছি এ জন্য) যেন তোমরা না বলতে পার যে, কিতাব তো কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দু'টি সম্প্রদায়ের ওপরই নাজিল করা হয়েছে।'' এই দুই গোষ্ঠী ছাড়া অন্যান্য যে সব জাতিকে আসমানী কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা যেহেতু তাদের কিতাবগুলোকে একেবারেই নষ্ট করে ফেলেছে এবং তাদের বিশ্বাসে ও কর্মে নবীদের শিক্ষার কিছুই অবশিষ্ঠ নেই, তাই তাদের আহলি কিতাব নামে আখ্যায়িত করা চলে না। এ জন্যই রসূল (সাঃ) অগ্নি উপাসকদেরকে আহলি কিতাব আখ্যা দেননি, অথচ তারা যরদাশতের অনুসারী–যাকে নবী বলে অনুমান করার অবকাশ রয়েছে। হাজর অঞ্চলের অগ্নি উপাসকদের ব্যাপারে তিনি বলেছিলেনঃ سُنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ اَهْلِ الْكِتَابِ- ''ওদের সাথে আহলি কিতাবের মত আচরণ কর।'' অথচ তিনি এ কথা

বলেননি যে, ওরা আহলি কিতাব। তাছাড়া তিনি হাজর অঞ্চলের অগ্নি উপাসকদেরকে যে চিঠি লেখেন তাতে সুস্পষ্টভাবে বলেন যে–

فَاِنْ اَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْكُمْ مَا عَلَيْنَا وَمَنْ اَبٰى فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ غَيْرَ اٰكِلِىْ ذَبَائِحِهِمْ وَلَا نِكَاحِ نِسَائِهِمْ

"তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ কর তা হলে অধিকার ও দায়–দায়িত্বের ক্ষেত্রে তোমরা আমাদের সমান হয়ে যাবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না, তাদের জিযিয়া দিতে হবে। তবে মুসলমানরা তাদের যবাই করা জন্তুর গোশ্ত খেতে ও তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করতে পারবেনা।"

এ অকাট্য ঘোষণার পর এরূপ ধারণা করার কোন অবকাশই থাকেনা যে, ইহুদী ও খৃস্টান ছাড়া অন্য কোন জাতিকে তাদের যবাই করা জন্তুর গোশ্ত খাওয়া ও তাদের নারীদেরকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে আহলি কিতাব ধরে নেয়া যেতে পারে।

ইমাম শাফেয়ী আহলি কিতাব হওয়ার জন্য ইসরাঈলী বংশোদ্ভূত হওয়ার যে শর্ত আরোপ করেছেন, সেটাও ঠিক নয়। এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না যে, হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ) বনি ইসরাঈলের কাছেই প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু যেসব অইসরাঈলী সম্প্রদায় খৃস্টবাদে দিক্ষীত হয়েছিল, আল্লাহ ও রসূল (সাঃ) যে তাদেরকেও আহলি কিতাব বলে গণ্য করেছেন, সে কথা কিভাবে অস্বীকার করা চলে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোম সম্রাটকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তিনি সূরা আলইমরানের ৬৪ নং আয়াত উদ্ধৃত করেন। আয়াতটি হলোঃ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (آل عمران: ٦٤)

"হে আহলি কিতাব! এস, এমন একটি কথা মেনে নেই যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য।" এখানে লক্ষ্যণীয় যে, রোমকদেরকে আহলি কিতাব বলে

সম্বোধন করা হচ্ছে। অথচ রোমকরা যে ইসরাঈলী ছিলনা তা সুবিদিত।

যারা 'মুহসানাত' শব্দের অনুবাদ সতী কিংবা স্বাধীন মহিলা করেছেন এবং দাসী–বাদী না হওয়া বা সতীসাধ্বী হওয়াকে কিতাবী নারী বিয়ে করার শর্ত বলে গণ্য করেছেন, তাদের অভিমতও সঠিক বলে মনে হয়না। এ কথা নিসন্দেহে সত্য যে, সতী ও সম্রান্ত হওয়াও 'মুহসানাত' শব্দের মর্মের অন্তর্ভুক্ত এবং যে নারী সতী হওয়ার সাথে সাথে সম্মানিত ও সম্রান্তও তাকেই 'মুহসানা' নারী বলা হয়। কিন্তু তাই বলে এই দুটো জিনিসকে বিয়ের শর্ত হিসেবে আরোপ করা আল্লাহর অভিপ্রেত নয়। বরং এই দুটো জিনিসের উপস্থিতিকে তিনি শুধু উত্তম ও বাঞ্ছিত বলে আখ্যায়িত করতে চেয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ শুধু এ কথাই বলতে চান যে, তোমরা যে কোন মুমিন বা আহলে কিতাব নারীকেই বিয়ে করতে পার। তবে সে নারী সম্রান্ত ও সতী হলেই ভালো হয়। কুরআনের নির্দেশাবলীতে এ ধরনের বিশেষণ অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তা উক্ত নির্দেশের জন্য শর্ত বলে গণ্য হয় না। এটা কেবল কোন বৈধ কাজের উত্তম দিক এবং কোন অবৈধ কাজের নিকৃষ্ট দিক প্রকাশ করার জন্য একটা অতিরিক্ত বর্ননা হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যাতে করে ঈমানদার লোকেরা উত্তম জিনিস গ্রহণ এবং নিকৃষ্ট জিনিস বর্জনে যত্নবান হয়। এ ব্যাপারে হযরত ওমরের (রাঃ) নীতিও ছিল অবিকল তাই। হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান জনৈকা ইহুদী মহিলাকে বিয়ে করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) জানতে পেরে লিখে পাঠালেন যে, ওকে ছেড়ে দাও। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন যে, এ নির্দেশ কিসের ভিত্তিতে দিচ্ছেন? কিতাবী নারীকে বিয়ে করা কি হারাম? হযরত ওমর (রাঃ) জবাব দিলেন! হারাম নয়। তবে আমার আশংকা হয় যে, তোমরা আহলি কিতাবের চরিত্রহীনা মেয়েদের ফাঁদে আটকা পড়ে না যাও।

সুতরাং আমাদের মতে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল নীতি এই যে, আহলি কিতাবের মেয়েদেরকে বিয়ে করার ব্যাপারে ইসলামী

শরীয়তে যে অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাকে অবাধ ও শর্তহীন বলে মেনে নিতে হবে । কিতাবী মহিলা কাফির শাসিত দেশের অধিবাসী হোক কিংবা মুসলিম শাসিত দেশের অধিবাসী, সতী হোক কিংবা অসতী, দাসী হোক কিংবা মুক্ত-সর্বাবস্থায়ই এ বৈধতাকে অবারিত রাখা উচিত।

জাতীয় স্বার্থ ও যৌক্তিকতার প্রেক্ষাপট

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হলো, তা ছিল কেবল বিষয়টির অইনগত দিক নিয়ে। এবার আমরা ধর্মীয় ও জাতীয় স্বার্থের প্রেক্ষাপটে এ ব্যাপারে যথাযথ ও সঙ্গত কর্মপন্থা কি এবং ইসলামের অদর্শগত দাবী কি, সে সম্পর্কে অলোচনা করবো।

বিয়ে সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

ইসলামী শরিয়তে বিয়ে কেবল একটা সামাজিক চুক্তি (social contract) নয়-যেমন আজকাল অনেকেই ব্যাখ্যা করে থাকে-বরং এর ভেতরে একটা ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার ভাবগাম্ভীর্য্যও বিদ্যমান। এ আধ্যাত্মিকতা অবশ্য হিন্দু ও খৃষ্টানদের বিয়ের মত (saerament) পুরোদস্তুর ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার পর্যায়ের নয়, তবে ইবাদাতের পর্যায়ভুক্ত অবশ্যই । শরীয়তের বিধান প্রবর্তক আল্লাহ এর মাধ্যমে শুধু যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ লাভ নিশ্চিত করতে চান তা নয় বরং সেই সাথে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ অর্জনের পথ সুগম হয়েছে,তাও দেখতে চান। তাঁর উদ্দেশ্য এইযে,এর দ্বারা মানুষের চরিত্রের সংশোধন হোক, সমাজের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হোক,একটি সত্যিকার ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার স্থিতি ও বিকাশ সাধিত হোক এবং দুনিয়াতে আল্লাহর মাহাত্ম্য ঘোষণাকারী ও আল্লাহর বিধানকে সমুন্নতকারী বংশধরের আবির্ভাব ঘটুক । বিয়ে এই সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক বিধায় তাকে ইবাদতসমূহের নিকটতম জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে। মুসলিম ফকীহগণের কেউ কেউ তো এতদূরও বলেছেন যে, কোন কোন

দিক দিয়ে বিয়ে জিহাদের চেয়েও মর্যাদাবান। কেননা বিয়ে ও জেহাদ উভয়টি ইসলাম ও মুসলমানের অস্তিত্ব সংরক্ষণের উপায় বিশেষ। তবে মুসলিম নর-নারীর বৈবাহিক বন্ধনে যে সুফল অর্জিত হয়, তা জিহাদের সুফলের চেয়ে বহুগুন অধিক। জিহাদে তো এ সম্ভাবনাই বেশী থাকে যে, কাফিররা খতম হবে, অথবা পরাজিত হয়ে জিম্মী হিসেবে কাফির অবস্থায়ই বেঁচে থাকবে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের বিয়ের সুনিশ্চিত ফল এই যে, এর দ্বারা মুসলমানদের একটি প্রজন্মের চরিত্র ভালো থাকবে এবং ইসলামের অনুসারী আর একটি প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটবে।"

এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য বিয়ে সংক্রান্ত হাদীসগুলোর ওপর নজর বুলানো প্রয়োজন। মুসনাদে আবুইয়ালাতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আক্কাফ বিন ওয়াদ্দায়া হিলালীকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ " তুমি কি বিয়ে করেছ? তিনি জবাব দিলেনঃ না। রসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার কোন দাসীও নেই? সাহাবী বললেনঃ না। রসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি সুস্থ এবং স্বচ্ছল ? সাহাবী বললেনঃ জ্বি! তখন রসূল(সাঃ) বললেনঃ তা হলে তো তুমি হয় শয়তানের ভাই, নচেত খৃষ্টানদের অন্তর্ভুক্ত। তুমি যদি আমাদের দলে থাকতে চাও, তাহলে আমরা যা করি তুমিও তা কর। বিয়ে করা আমাদের একটা রীতি। তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত থাকে তারা নিকৃষ্টতম লোক। আর যারা অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়, তারা মৃতদের মধ্যে নিকৃষ্টতম।"

অন্য এক হাদীসে আছেঃ

تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

"তোমরা বিয়ে কর, বংশধর বাড়াও, নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি কর, কেননা আমি কিয়ামতের দিন সকল জাতির তুলনায় তোমাদের সংখ্যা বেশী দেখতে চাই।"

তাবরানী স্বীয় "কবিরুল আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার বলেনঃ

أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَلْبًا
شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا وَزَوْجَةً
لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ (رواه الطبراني في الكبير والاوسط)

"চারটা জিনিস আছে। যাকে এই চারটা জিনিস দেয়া হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ দেয়া হয়েছে। একটি হলো, আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন তার ওপর শুকর আদায়কারী মন, দ্বিতীয় আল্লাহকে স্মরণ কারী জিহ্বা, তৃতীয় বিপদ মুসিবতে অবিচল থাকার ক্ষমতাসম্পন্ন শরীর, চতুর্থ সেই স্ত্রী, যে নিজের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদে কোন খেয়ানত করতে প্রবৃত্ত হয় না।"

ইবনে মাজা বর্ণনা করেন যে, রসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللّٰهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ (ابن ماجه)

"যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হতে ইচ্ছুক, সে যেন সম্ভ্রান্ত ও শিষ্টাচারী নারীকে বিয়ে করে।"

ইবনে মাজা বর্ণিত আর একটি হাদীস নিম্নরূপঃ

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ
لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلٰكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ
وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ (ابن ماجه)

"কেবল সৌন্দর্যের খাতিরে নারীদেরকে বিয়ে করো না। হতে পারে যে, সৌন্দর্য্য তাদেরকে বিপদগামী করে দেবে। অর্থ-সম্পদের খাতিরেও তাদেরকে বিয়ে করো না। কেননা সম্পদ তাদেরকে দাম্ভিক বানিয়ে দিতে পারে। কেবলমাত্র দ্বীনদার দেখে তাদেরকে বিয়ে কর। একজন কালো, কুৎসিত ও স্বল্প বুদ্ধিমতী দাসীও যদি দীনদার হয় তবে সে অন্যান্য নারীদের চেয়ে উত্তম।"

এ ধরনের আরো বহু হাদীস রয়েছে। সে সব হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামে নিছক একটা সামাজিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য বিয়ের বিধান দেয়া হয়নি বরং এর প্রধানতম উদ্দেশ্য হলো, প্রবৃত্তিকে সংযত রাখা,চরিত্র ভালো রাখা, ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ সাধন এবং খাটি ইসলামী বংশধর বৃদ্ধি করা। আর এ সব উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কেবল বিয়ে করাই যথেষ্ট নয়,বরং দীনদার , সদাচারী, সম্ভ্রান্ত ও সতী নারী বিয়ে করা জরুরী। কেননা একটা নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ এ ধরনের গুণসম্পন্ন নারী ও পুরুষের সমন্বয়েই গড়ে উঠতে পারে। এ ধরনের গুণাবলী সম্পন্না মায়ের পেটেই জন্ম নিতে পারে একটি সচ্চরিত্র মুসলিম প্রজন্ম।

আন্ত ধর্মীয় বিয়ের কুফল

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও এ কথা স্বীকার না করে উপায় থাকবে না যে, আন্তধর্মীয় বিয়ে-শাদীর চেয়ে সমাজ ব্যবস্থা ও পারিবারিক জীবনকে বিনষ্টকারী জিনিস আর কিছু হতে পারে না। এমন স্বামী-স্ত্রী -যাদের চিন্তাধারায় আকাশ-পাতাল ব্যবধান, যারা সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী দুটো পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ঐতিহ্য ও সমাজ ব্যবস্থার অধীন লালিত-পালিত হয়েছে, তারা পারস্পরিক মিলনে নিজেদের জীবনেও সুখ-শান্তি লাভ করতে পারে না, নিজেদের পরিবারকেও কোন সমাজ ব্যবস্থার অংশীদার করে গড়ে তুলতে পারে না। আর কোন সাংস্কৃতিক অবকাঠামোর সাথে মানানসই হতে পারে এমন বংশধরও জন্ম দিতে সক্ষম হয় না। তাদের দু'জনের মধ্যে দাম্পত্য ভালোবাসা হয়তোবা থাকতে পারে এবং তা শেষ পর্যন্ত টেকসইও হতে পারে। কিন্তু তাদের ভালোবাসা ও সহচর্য বড়জোর তাদের ব্যক্তিগত আনন্দ ও সুখ নিশ্চিত করতে পারে। এর চেয়ে বেশী কোন সামাজিক উপকারিতা তাতে নিহিত নেই। ধর্ম এবং জাতীয়তার বিভিন্নতা তো অনেক বড় জিনিস। তার কথা না হয় বাদই দিন। পারিবারিক জীবনের সাফল্য এবং

সাংস্কৃতিক অবকাঠামোর কল্যাণের জন্য তো একই সমাজের দুটো ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সাথে সংশ্লিষ্ট দুই নর-নারীর বৈবাহিক সম্পর্কও মঙ্গলজনক হয় না। শহর ও গ্রামের পার্থক্য পর্যন্ত অনেক সময় দাম্পত্য বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বনিবনা সৃষ্টির জন্য স্বামী-স্ত্রী ও তাদের পরিবারের মধ্যে যত বেশী ব্যাপারে সম্ভব ঐক্য ও সমতার প্রয়োজন। শুধু ধর্মের ঐক্যই যথেষ্ট নয়, বরং উভয়ের আচরণ পদ্ধতি, চিন্তধারা, জীবন-যাপনের রীতি নীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রেও অধিকতর সাম্য, সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই এবং এ সব ব্যাপারে পার্থক্য ও গরমিল যত কম হয় ততই ভাল। এ জিনিসটাকেই ইসলামী শরীয়তের বিধিতে 'কুফু' বলা হয়। শরীয়ত বিয়ে-শাদীতে কুফুর ওপর যে গুরুত্ব দিয়েছে, সেটা এ জন্যই যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকতর সাদৃশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা সাদৃশ্য শুধু স্বামী-স্ত্রীর মিল মুহাব্বতই নিশ্চিত করে না, বরং সমগ্র সমাজের জন্যও উপকারী এবং ভবিষ্যত বংশধরের কল্যাণও এর ওপরই নির্ভরশীল। যে দম্পতির মধ্যে সাদৃশ্য থাকে না, তাদের মিলন কেবল দৈহিক মিলন হয়ে থাকে। এ ধরনের মিলন আর যাই হোক, সমাজ ও সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে হয় পুরোপুরি নিস্ফল, নচেত প্রায় নিস্ফল হতে বাধ্য।

ধর্মীয় পার্থক্যের কুফল

অন্যান্য ব্যাপারে পার্থক্য ও অসমতার ফলে কেবল এতটুকুই ক্ষতি হয়ে থাকে যে, দাম্পত্য ভালোবাসা ও সমমর্মিতা কম এবং ফলপ্রসূ সহযোগিতা তদোধিক কম হয়। কিন্তু ধর্ম ও জাতীয়তার পার্থক্য এর চেয়ে বহু গুণ বেশী ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। এর সবচেয়ে বিপজ্জনক কুফল এই যে, একজন অমুসলিম মায়ের কোলে লালিত পালিত হয়ে যে সন্তান আবির্ভূত হবে, তা ইসলামী সমাজের জন্য কোন কাজেই আসবো না। তা ছাড়া এ আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, অমুসলিম নারী একটি মুসলিম পরিবারে এসে ইসলাম বিরোধী রীতি-নীতি চালু করতে পারে এবং সেই

পরিবারের সংস্পর্শে আসা অন্যান্য পরিবারও কমবেশী এই ক্ষতিকর সদস্যটির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। স্বয়ং স্বামীও তার কুপ্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারবে না। আর যদি তার প্রেমাসক্তি প্রবলতর হয়, তা হলে তার ঈমান ও ধর্ম হারিয়ে বসাও বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু বিকৃতিটা এত মারাত্মক পর্যায়ের না হলেও নিদেন পক্ষে এতটুকু প্রভাব তার ওপর পড়বেই যে, সে নিজ গৃহে ইসলামী নৈতিকতা ও ইসলামী কৃষ্টির এক একটি অংশ প্রতিনিয়ত বিনষ্ট হতে স্বচক্ষে দেখবে এবং তা বরদাশত করে যাবে। রাজনৈতিক দিক দিয়েও এ ধরনের বিয়ে ক্ষয়ক্ষতি থেকে মুক্ত নয়। ষড়যন্ত্র, গোয়েন্দাগিরি ও ইসলামী রাষ্ট্রের শিকড় উপড়ানোর কাজে মুসলিম পরিবারের অমুসলিম স্ত্রী সহজেই ব্যবহৃত হতে পারে। সে যদি খুব চালাক ও ধুরন্ধর হয়,তাহলে এ কাজে তার স্বামীকেও হাতিয়ার বানাতে সক্ষম ।এ জাতীয় ক্ষতি আগেও হতে দেখা গেছে, এখনও হতে দেখা যায়। ভারতে আমাদের সমাজ কাঠামোকে পৌত্তলিক ও জাহেলী রীতি-প্রথা দ্বারা কলুষিত কে করেছে? এই সকল নারীরাই করেছে,যারা নাম মাত্র মুসলমান হয়ে এবং পৌত্তলিক চাল-চলন ও ধ্যান-ধারণা বজায় রেখে মুসলিম পরিবারগুলোতে ঢুকেছে। মুসলিম বংশধরগুলোকে ধর্ম ও নৈতিকতার দিক দিয়ে কারা ধ্বংস করেছে? এই মায়েরাই করেছে,যাদের বুক থেকে মুসলমান শিশুরা শিরক ও জাহেলিয়াতের দুধ খেয়ে খেয়ে বড় হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রগুলো কিসের জন্য ধ্বংস হয়েছে? বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঐ সব কাফির নারীদের প্রেমের কারণেই ধ্বংশ হয়েছে,যারা মুসলিম শাসকদের মন-মগজের ওপর জেঁকে বসেছিল। আজও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ ধ্বসিয়ে দিচ্ছে কিসে? আমাদের সমাজের বিত্তশালী ও প্রভাবশালী লোকদের ঘাড়ে চড়াও হয়ে বসা পশ্চিমা নারীদের কর্তৃত্বই প্রধানত এ অপকর্মটি করে চলেছে।

ইসলামী বিয়ে আইনের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা

উপরোক্ত বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, অমুসলিম নারীদেরকে বিয়ে করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত

ছিল। শরীয়ত কি কারণে একে বৈধ রেখেছে? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব পেতে হলে আমাদেরকে বিষয়টার অপরাপর দিকের প্রতি নজর দিতে হবে। কারণ এ দিকগুলোর ওপর নজর বুলালেই মহান শরীয়ত প্রণেতার শ্রেষ্ঠতম প্রজ্ঞা ও অতুলনীয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং আইন রচনার ক্ষেত্রে তাঁর চূড়ান্ত ভারসাম্যবোধ ও ন্যায়বিচার প্রীতি চোখে পড়ে।

মানুষ যখন কোন আইন রচনা করে, তখন সাধারণতঃ সে কোন একটি দিকের প্রতি এত বেশী ঝুঁকে পড়ে যে, অন্যান্য দিকের প্রতি সে মনোযোগ দিতেই পারে না। কখনো সে সামষ্টিক কল্যাণকে বেশী গুরুত্ব দেয় এবং ব্যক্তিগত কল্যাণের দিকটার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। আবার কখনো ব্যক্তিগত সুবিধার প্রতি এত মনোযোগ দেয় যে, সামষ্টিক সুখ–সুবিধা বাঞ্চাল হয়ে যায়। কিন্তু ইসলামী বিধানের রচয়িতা এত সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী যে, তিনি প্রতিটি স্বার্থ, সুবিধা ও কল্যাণের প্রতি নজর রাখেন এবং প্রত্যেকটার প্রতি যথোপযুক্ত পরিমাণে মনোযোগ দেন। আমার পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, মুসলিম পুরুষদের বিয়ে মুসলিম নারীদের সাথে হোক এবং সেখানেও উভয়ের মধ্যে সমতা ও সাদৃশ্য বজায় রাখা হোক– এটাই ছিল সামষ্টিক স্বার্থ এবং অনেকাংশে ব্যক্তিগত স্বার্থেরও দাবী। এ জন্য কুফু (সমতা) বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। হযরত আয়িশা (রাঃ) আনাস ও ওমরের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْاَكْفَاءَ
"তোমাদের বীর্য রাখার জন্য সর্বোত্তম পাত্র অনুসন্ধান কর এবং নিজেদের সমতুল্য লোকদের মধ্যে বিয়ে কর"। সেই সাথে এ কথাও স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সমতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগণ্য এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো দীনদারীঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ
يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ (التوبة: ٧١)

"ঈমানদার নারী ও পুরুষগণ পরস্পরের সহায়। তারা পরস্পরকে ভালো কাজের আদেশ দেয় ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে, নামায কয়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করে।" (তওবা–৭১)।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا - (التحريم: ٦)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে আগুন থেকে বাঁচাও।" (তাহরীম–৬)।

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن
مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ (النساء: ٢٥)

"তোমাদের মধ্যে যারা সতীসাধ্বী মুমিন নারীদেরকে বিয়ে করতে অক্ষম, তারা যেন ঈমানদার দাসীদের মধ্য থেকে নিজেদের সঙ্গিনী নির্বাচন করে। তোমাদের ঈমানদারীর মান কেমন তা আল্লাহর ভালো জানা আছে। তোমরা (ঈমানদাররা) পরস্পরের আপন জন।"(নিসা–২৫)

تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ فَلَأَمَةٌ خَرْقَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ
أَفْضَلُ (الحديث)

"নারীদেরকে দীনদারীর ভিত্তিতে বিয়ে কর। মনে রেখো, একটি কালো, কদাকার ও কমবুদ্ধিমতী দাসীও যদি দীনদার হয়, তবে সে অন্যান্য নারী অপেক্ষা ভাল।" (হাদীস)

পক্ষান্তরে, কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থের দাবী ছিল এই যে, ভিন্ন জাতিতে বিয়ে করার সুযোগ সম্পূর্ণরূপে বাতিল যেন না করা হয়। এমন হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি কোন অমুসলিম মহিলার প্রেমাসক্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু তাকে বিয়ে করার সকল পথ রুদ্ধ দেখে অবৈধ পন্থার দিকে ঝুঁকে পড়লো। এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে, কোন ব্যক্তি এমন জায়গায় বাস করে, যেখানে কোন মুসলিম নারী পাওয়া যায় না। অথচ অবিবাহিত থাকলে তার চরিত্র নষ্ট ও পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। এ ধরনের

ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতির জন্য কিছুটা ছাড় দেয়ার প্রয়োজন ছিল। এ জন্য শরীয়ত এই অনুমতি দেয়। কিন্তু এই অনুমতি দিতে গিয়েও ব্যক্তিগত পরিস্থিতি বিবেচনা করার পাশাপাশি সামাজিক স্বার্থ যেন ন্যূনতম পরিমাপের বেশী ক্ষুণ্ন না হয়, সে ব্যাপারে যত্ন নিয়েছে।

মুসলিম নারীর সাথে

অমুসলিম পুরুষের বিয়ে নিষিদ্ধকরণ

সর্ব প্রথম এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, অমুসলিম সমাজে বিয়ে করার অধিকার একমাত্র পুরুষদেরকেই দেয়া যেতে পারে। নারীদের জন্য এ পথ চিরতরে রুদ্ধ। لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ "মুসলিম নারীও কাফির পুরুষদের জন্য বৈধ নয়, আবার কাফির পুরুষও মুসলিম নারীদের জন্য হালাল নয়।" (মুমতাহানা–১০)

এ পার্থক্য রাখা হয়েছে এ জন্য যে, নারীর স্বভাব সুলভ বৈশিষ্ট হলো নমনীয়তা ও চাপের সামনে নতি স্বীকার। পরিস্থিতিকে জয় করার চেয়ে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতাই তার বেশী। পুরুষের ও পরিবেশের প্রভাবে সে প্রচন্ডভাবে প্রভাবিত হয়। পারিবারিক অঙ্গনে সে পুরুষের কাছে পরাজিতই থাকে। একজন অমুসলিম পুরুষের সাথে তার বিয়ে হলে কমের পক্ষে ৯০ ভাগ আশংকা থাকে যে, ইসলাম ও ইসলামী রীতি–নীতির সাথে তার চিরতরে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটবে। আর তার পেটে যে সন্তান জন্মাবে তার কুফরী মতাদর্শে দীক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শতকরা একশ ভাগ। সুতরাং যে কোন যুক্তি ও স্বার্থের বিচারে মুসলিম নারীর জন্য অমুসলিম পুরুষকে স্বামীত্বে বরণ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হওয়া সর্বতোভাবে বিজ্ঞান সম্মত ছিল। ভিন্ন ধর্মে বিয়ে করার অনুমতি যদি দেয়াও হয় তবে সেটা কেবল পুরুষকে দেয়াই যুক্তিযুক্ত হতো।

মুসলিম পুরুষ ও অমুসলিম নারীর বিয়ের শর্ত

তথাপি পুরুষের জন্যও এ অনুমতি অবাধ ও শর্তহীন নয়। বিয়ের প্রশ্নে মুসলিমদেরকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথমত, যাদের ইসলাম ও তার সংস্কৃতির সাথে দূরতম সম্পর্কও নেই, যাদের আকীদা-বিশ্বাস , জীবন যাপনের মৌলিক আদর্শ ও নীতিমালা এবং নৈতিক ও সামাজিক আইন বিধানের কোন দিক দিয়েই মুসলমানদের সাথে মিল খায় না।

দ্বিতীয়ত, যারা সকল অমুসলিম জাতির মধ্যে ইসলামের নিকটতম,যারা ওহি ও নবুয়তকে কিছু না কিছু মানে। যারা আল্লাহ ও আখিরাতের বিশ্বাসেও কিছুটা ইসলামের কাছাকাছি, চারিত্রিক নীতিমালা ও সামাজিক বিধিরও বেশ কিছু জিনিস তাদের কাছে এখন পর্যন্ত এমন রয়েছে,যা ওহির উৎস থেকে নির্গত।

উল্লিখিত দুই শ্রেণীর প্রথমটির সাথে বিয়ে-শাদী করা মুসলমানদের জন্য চিরতরে ও সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। সূরা বাকারার ২২১ নং আয়াতে এই নিষেধাজ্ঞা ঘোষিতঃ

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ-

"মুশরিক নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তাদেরকে বিয়ে করো না। মনে রেখো একটি মুমিন দাসীও একজন মুশরিক নারীর চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে থাকে। মুশরিক পুরুষরা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাদেরকেও বিয়ে করো না। মনে রেখো, একজন মুমিন গোলামও মুশরিক পুরুষের চেয়ে ভাল, যদিও তাকে তোমাদের খুবই ভালো লেগে থাকে। মুশরিকরা তোমাদেরকে আগুনের দিকে ডাকে। আর আল্লাহ তাঁর ইচ্ছাক্রমে আহ্বান করেন বেহেশত ও ক্ষমার দিকে।"

কিতাবী নারীকে বিয়ের অনুমতি

এর পর আসে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রসঙ্গ। এ শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত মেয়েদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে সাথে সাথে

এই মর্মে সতর্কও করা হয়েছে যে, এ ধরনের বিয়ে বিপদমুক্ত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুমতিটা দেয়া হয়েছে কেবল ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দূর করার জন্য। আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا
اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِىْ
اَخْدَانٍ ، وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِى
الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ - (المائدہ:٥)

"তোমাদের পূর্বে যাদেরকে আসমানী কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের মেয়েদেরকেও বিয়ে করার অনুমতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে এই শর্তে যে, তোমরা তাদের মোহরানা দিয়ে যথারীতি স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে এবং গোপনে অথবা প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না। (মনে রেখো) যে ব্যক্তি আপন ঈমান থেকে ফিরে যাবে তার সমস্ত কৃতকর্ম বৃথা হয়ে যাবে এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"

(মায়েদা—৫)

উপরোক্ত আয়াতের শেষ বাক্যটি লক্ষণীয়। এখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে হুশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে যে, অমুসলিম নারীকে বিয়ে করায় ঈমানের ক্ষতির আশংকা রয়েছে। এর পরও এমন বিপজ্জনক কাজের অনুমতি যে কেবল অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়োজনের খাতিরেই দেয়া হয়েছে,তা সহজেই বোধগম্য।

কিতাবী মেয়েদেরকে বিয়ে করা অবাঞ্ছিত কাজ

যাঁরা ইসলামী শরীয়তের নিগূঢ় মর্ম উপলব্ধি করেছেন তারা উল্লিখিত বিপদাশংকার কারণেই এ অনুমতিকে সব সময় একটা অনন্যোপায় অবস্থায় প্রদত্ত জরুরী অনুমতি হিসেবেই বিবেচনা করেছেন এবং মুসলমানদের মধ্যে ইহুদী—খৃস্টান মেয়েদেরকে বিয়ে করার রেওয়াজ ব্যাপকভাবে চালু হোক তা পছন্দ করেননি। হযরত ওমর (রাঃ) সমসাময়িককালে ইসলামী শরীয়তের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম

বিষয়ে সবচেয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হযরত হুজায়ফাকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা শরীয়তের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথাযথ আলোকপাত করে। তখন ইসলামের বিজয় যুগ। সিরীয় অঞ্চলে মুসলমানরা বিজেতা ও শাসকের বেশে বিরাজমান। নবুয়তের প্রদীপ থেকে প্রত্যক্ষভাবে ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত একজন অসাধারণ মর্যাদাবান মুসলমান হযরত হুজায়ফা (রাঃ)। তাঁকে ঘিরেই সৃষ্টি হয়েছে এক জটিল পরিস্থিতির। ইসলামের নৈতিক আদর্শ ও সাংস্কৃতিক মানের বিচারে তাঁর চেয়ে পরিণত ও পরিপক্ক মানুষ আর কে হতে পারে? তবুও হযরত ওমর (রাঃ) হযরত হুযায়ফাকে নিষেধ করে দিলেন কিতাবী স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখতে। তিনি এ কথাও বললেন না যে, কিতাবী নারী বিয়ে করা হারাম। বরং বললেন, এ দ্বারা মুসলিম পরিবারে আহলি কিতাবের চরিত্রহীনা মেয়েদের অনুপ্রবেশের আশংকা রয়েছে। কাজেই এ অনুমতির সুযোগ গ্রহণ না করাই উত্তম।

চিন্তার বিষয় এই যে, বিজয় যুগে যখন কিতাবী নারী সম্পর্কে ইসলামের কর্মপদ্ধতি এ রকম, এখন যে মুসলমান কাফিরদের হাতে পরাজিত, তাদের দাপটের সামনে দিশাহারা এবং চারিদিক থেকে তাদের সমাজ দ্বারা পরিবেষ্টিত, তার ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিত। স্বভাবতই এরূপ ক্ষেত্রে কিতাবী নারীকে বিয়ে করা আরো বেশী অবাঞ্ছনীয় ও ঘৃণ্য হওয়ার কথা। কেননা একটা কাফির শাসিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এর আরো বহু গুণ বেশী ক্ষতি দেখা দেয়ার আশংকা রয়েছে। এ জন্যই মুসলিম ইমামগণ ইহুদী ও খৃষ্টান মেয়েদেরকে বিয়ে করা সাধারণভাবে মাকরূহ এবং কাফির শাসিত সমাজে অধিকতর মাকরূহ তথা ঘৃণ্যতম ও নিকৃষ্টতম কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। শামসুল আইম্মা (ইমামদের সূর্য) উপাধিতে ভূষিত প্রখ্যাত ফেকাহ বিশারদ ইমাম সারাখসী স্বীয় গ্রন্থ 'আল মাবসুতে' লিখেছেনঃ

يَجُوْزُ لِلْمُسْلِمِ اَنْ يَتَزَوَّجَ كِتَابِيَّةً فِىْ دَارِ الْحَرْبِ وَلٰكِنَّهُ
يُكْرَهُ لِاَنَّهُ اِذَا تَزَوَّجَهَا ثَمَّةَ رُبَمَا يَخْتَارُ الْمُقَامَ فِيْهِمْ

...... وَإِذَا وَلَدَتْ تَخَلَّقَ الْوَلَدُ بِأَخْلَاقِ الْكُفَّارِ وَفِيهِ بَعْضُ الْفِتْنَةِ فَيُكْرَهُ بِهٰذَا...... وَسُئِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ مُنَاكَحَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ فَكَرِهَ ذَالِكَ (ج ٥ - ص ٥٠)

"অমুসলিম শাসিত দেশের কিতাবী নারীকে বিয়ে করা জায়েজ বটে, তবে তা বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা সে যদি ঐ দেশে গিয়ে বিয়ে করে তা হলে সেখানেই তার থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।----আর যখন কিতাবী নারীর পেট থেকে সন্তান ভূমিষ্ট হবে, তখন তার অমুসলিম সুলভ চরিত্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে আরো অনেক ক্ষতির আশংকা রয়েছে। তাই এটা মাকরূহ। হযরত আলীর (রাঃ) কাছে কাফির শাসিত অঞ্চলের ইহুদী-খৃষ্টান রমণীকে বিয়ে করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এটাকে অবাঞ্ছিত বলে রায় দেন।" (৫ম খন্ড, পৃঃ ৫৩)

ইমাম ইবনে জারারী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"মুসলিম দেশের নাগরিক ও অমুসলিম দেশের নাগরিক অমুসলিম মহিলাকে বিয়ে করা এই শর্তে জায়েয যে, স্বামীর আবাসস্থল এমন জায়গায় না হওয়া চাই, যেখানে তার সন্তানদের কুফরীর পথে চালিত হতে বাধ্য হওয়ার আশংকা থাকে।" (৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৬১)

হেদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْكِتَابِيَّاتِ وَالْأَوْلٰى أَنْ لَّا يَفْعَلَ وَلَا يَأْكُلَ ذَبِيحَتَهُمْ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ وَتُكْرَهُ الْكِتَابِيَّةُ الْحَرْبِيَّةُ إِجْمَاعًا لِانْفِتَاحِ بَابِ الْفِتْنَةِ مِنْ إِمْكَانِ التَّعَلُّقِ الْمُسْتَدْعِي لِلْمُقَامِ مَعَهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَتَعْرِيضِ الْوَلَدِ عَلَى التَّخَلُّقِ بِأَخْلَاقِ أَهْلِ الْكُفْرِ (كتاب النكاح)

"কিতাবী নারীদেরকে বিয়ে করা জায়েয বটে, তবে না করাই ভাল এবং তাদের যবাই করা জন্তুও খাওয়া অনুচিত। অবশ্য অনিবার্য পরিস্থিতির কথা স্বতন্ত্র। আর যে কিতাবী মহিলা বৈরী ভাবাপন্ন অমুসলিম দেশের অধিবাসী, তাকে বিয়ে করা সর্বসম্মতভাবে মাকরূহ। কেননা এতে গোমরাহীর পথ খুলে যায়। যেমন মহিলার প্রতি এমন গভীর প্রণয়াসক্তির সৃষ্টি হতে পারে, যার দরুন মুসলিম স্বামী স্ত্রীর সাথেই কাফিরদের দেশে বসবাস করা শুরু করতে পারে এবং তার সন্তানরা সেখানকার অমুসলিমদের চরিত্র ধারণ করতে পারে।" (বিয়ে সক্রান্ত অধ্যায়)

এ আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টান নারীদের বিয়ে করাকে হারাম ও অবৈধ তো বলা যাবে না। তবে ইসলামী আইনের অন্তর্নিহিত ভাবধারা ও মর্মার্থের আলোকে এবং মুসলিম ইমামগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে তা মাকরূহ।বিশেষত অমুসলিম শাসিত দেশে এবং কুফরীর জয়জয়াকার পরিস্থিতিতে এটা চরম ঘৃণিত ও অবাঞ্ছিত কাজ। এই সাথে এ কথাও বলে রাখা দরকার যে, হযরত ওমরের (রাঃ) দৃষ্টান্ত থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিধির সন্ধান পাওয়া যায়। সেটি এই যে, শুধুমাত্র কিতাবী মেয়ে বিয়ে করার ব্যাপারেই নয় বরং শরীয়তের যে কোন অনুমোদিত কাজের ক্ষেত্রে যখন এরূপ আশংকা দেখা দেবে যে, শরীয়তের অনুমতির অবৈধ সুযোগ গ্রহণ ও তার অপপ্রয়োগ হতে পারে, তখন মুসলিম নেতা ও শাসকরা তার বিরুদ্ধে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারেন এ ধরনের অস্থায়ী নিবর্তনমূলক নিষেধাজ্ঞা জায়েযকে নাজায়েয করা এবং হালালকে হারাম করার প্রক্রিয়া ছাড়াই চালু করা সম্ভব। তবে এ ধরনের নির্দেশ যারা জারি করবেন তাদের মধ্যে ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে এতটা গভীর তাত্বিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে করে তারা শরীয়ত বিধির ভারসাম্য বিনষ্ট করে না বসেন।

(তরজমানুল কুরআন, মুহাররম ১৩৫৬ হিঃ)

হাত কাটা এবং শরীয়ত প্রবর্তিত অন্যান্য দন্ডবিধি

(উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত শীরোনামের অধীন এটা কোন স্বতন্ত্র প্রবন্ধ নয় বরং অন্য এক ভদ্রলোকের লেখা একটা প্রবন্ধের ওপর টীকা হিসেবে এটা লেখা হয়েছে)।

(১) ইসলামী দন্ডবিধির ব্যাপারে সর্বপ্রথম এই মূলনীতিটা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে, হাত কাটার শাস্তি এবং শরীয়ত প্রবর্তিত অন্যান্য দন্ডবিধি শুধুমাত্র সেই জায়গায় কার্যকর করার জন্য রচিত হয়েছে যেখানে রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে ইসলামী আদর্শ ও মূলনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় সমাজ ব্যবস্থা ও নাগরিক জীবন সংগঠিত ও বিন্যস্ত থাকে। ইসলামের নীতিমালা ও আইনকানুন বিভাজ্য বা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কিছু নীতিমালা ও আইন-কানুন কার্যকর করা হবে আর কিছু বাদ থাকবে এটা ঠিক নয়।

উদাহরণ স্বরূপ ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ রটনা সংক্রান্ত দন্ডবিধির কথাই ধরা যাক। বিয়ে, তালাক ও পর্দা সংক্রান্ত ইসলামী আইন-বিধি এবং নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণ সংক্রান্ত ইসলামের নৈতিক শিক্ষার সাথে এই দন্ডবিধির অত্যন্ত গভীর ও অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ব্যভিচারকারী ও ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীর জন্য এমন কঠোর সাজা নির্ধারণ করেছেন একটা বিশেষ সমাজে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে। যে সমাজে মহিলারা সেজেগুজে অবাধে ও খোলাখুলীভাবে বিচরণ করে না, নগ্ন ও অর্ধনগ্ন ছবি, প্রেম-ভালোবাসা সম্বলিত কিচ্ছা-কাহিনী, যৌন আবেগে ক্রমাগত

সুড়সুড়ি দেয়া অনুষ্ঠান ও উৎসবাদির প্রচলন থাকে না, যে সমাজে বিয়ে করা সহজসাধ্য এবং বিয়ে বিচ্ছেদের ইসলামী বিধিসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয় কেবলমাত্র সেই সমাজেই এই দন্ডবিধি প্রযোজ্য। এ ধরনের সমাজ স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্তভাবেই এ দাবী জানাতে থাকে যে, সামাজিক আচরণের জন্য যে ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ম-শৃঙ্খলা সে ধারণ করছে, তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কঠোর দন্ড প্রবর্তন করা হোক। বস্তুত যেখানে বৈধ উপায়ে যৌন লালসা চরিতার্থ করার সহজ ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সামাজিক পরিবেশকে ব্যভিচারের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ও অস্বাভাবিক উত্তেজনা সৃষ্টির উপকরণাদি থেকে পবিত্র ও মুক্ত করা হয়েছে, সেখানে এ ধরনের কঠোর সাজা প্রবর্তন মোটেই অন্যায় নয়। এ ধরনের নির্মল পরিবেশেও যৌন অপরাধে লিপ্ত হওয়া কেবলামাত্র জঘণ্যতম অসচ্চরিত্রের লোকদের পক্ষেই সম্ভব, যাদের অনাচার থেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে রক্ষা করার জন্য ভয়ংকর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

কিন্তু যে সমাজে এ ধরনের পবিত্র পরিবেশ বিরাজ করে না, যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা রীতিসম্মত, যেখানে বিদ্যালয়ে, অফিস-আদালতে, ক্লাবে ও প্রমোদ কেন্দ্রে, গোপন ও প্রকাশ্য অঙ্গনে সর্বত্র এ সব উদ্দাম ও উচ্ছৃংখল স্বভাবের পুরুষ ও বিচিত্র সাজে সজ্জিত নারীদের লাগামহীন মেলা মেশা ও একত্রে ওঠা-বসার সুযোগ রয়েছে, যেখানে চারিদিকে অগণিত কামোদ্দীপক উপকরণ ছড়ানো রয়েছে এবং বৈবাহিক বন্ধন ব্যতিরেকে কামবাসনা চরিতার্থ করার সব রকমের ব্যবস্থা রয়েছে এবং যেখানে মানুষের নৈতিক মানের এত অধোপতন ঘটেছে যে, অবৈধ সম্পর্ক মোটেই দূষণীয় মনে করা হয় না। এ ধরনের সমাজে ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ রটানোর শাস্তি প্রয়োগ করা নিঃসন্দেহে জুলুমের শামিল হবে। কেননা এ ধরনের পরিবেশে একজন সাধারণ মানের (Normal type) মধ্যম স্বভাবের ও সুস্থ মানসিকতার অধিকারী মানুষের পক্ষেও ব্যভিচার থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কারো পাপে লিপ্ত হওয়া

এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় যে, ঐ লোকটা অস্বাভাবিক ধরণের নৈতিক অপরাধী। প্রকৃত পক্ষে পাথর মেরে হত্যা ও বেত মারার শাস্তি এমন নোংরা ও ঘৃণ্য পরিস্থিতির জন্য আল্লাহ নির্ধারণই করেননি।

চুরির শাস্তিও একইভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন। যে সমাজে ইসলামের অর্থনৈতিক মূলনীতি, মতাদর্শ ও আইন-কানুন পুরোপুরিভাবে চালু থাকবে, কেবল সেখানেই এ দন্ড প্রয়োগ করা হবে। হাত কাটা ও ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে অটুট যোগসূত্র বিদ্যমান। যেখানে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু থাকবে, সেখানে চোরের হাত কাটাই হবে ন্যায় বিচারের দাবী এবং পুরোপুরি স্বাভাবিক ব্যাপার। আর যেখানে এই অর্থ ব্যবস্থা চালু থাকবে না, সেখানে হাত কাটা সাংঘাতিক জুলুম বলে বিবেচিত হবে। বস্তুত যে সমাজে সুদ বৈধ ব্যবস্থা হিসেবে চালু, যাকাত পরিত্যক্ত, ন্যায়বিচার টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়, ট্যাক্সের বাড়াবাড়িতে জীবন যাপনের অপরিহার্য উপকরণের চরম মূল্য বৃদ্ধি ঘটে এবং সমস্ত ট্যাক্স কতিপয় বিশেষ শ্রেণীর লোকদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ সংগ্রহ করতেই ব্যয় হয়ে যায়, সেই অত্যাচারী সমাজের জন্য হাত কাটার দন্ড বিধান করাই হয়নি। এ ধরনের সমাজে তো চুরির জন্য হাত কাটা দূরে থাক, জেল-জরিমানাও ক্ষেত্র বিশেষে জুলুম বিবেচিত হতে বাধ্য।

ইসলামের ফৌজদারী দন্ডবিধি বুঝতে সচরাচর মানুষ যে জটিলতার সম্মুখীন হয়, তার প্রকৃত কারণ এই যে, দুনিয়ার বর্তমান সভ্য দেশগুলোতে যে ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত, সেটাই তাদের সামনে থাকে, অতপর তারা চুরি, ব্যভিচার ,মদখোরি, ব্যভিচারের অপবাদ রটনা প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক অপরাধগুলোকে হাত কাটা, পাথর মারা এবং বেত মারার মত দন্ডগুলোর সাথে তুলনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জানা কথা যে, এ ধরনের তুলনামূলক বিচারে তাদের কাছে ইসলামের দন্ডগুলো অত্যন্ত ভয়ংকরই মনে হবে। কেননা অবচেতনভাবে তারা মনে করে যে, প্রচলিত জীবন পদ্ধতির ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তাতে

চুরি একটা মামুলি নিত্যকার ব্যাপার হওয়ার কথা। ব্যভিচারে ব্যাপকভাবে নর-নারীর এমনকি শিশু ও বৃদ্ধদের পর্যন্ত লিপ্ত হওয়ার কথা। সন্দেহজনকভাবে মেলা-মেশায় রত যুবক-যুবতীদের ব্যাপারে প্রতিনিয়ত খারাপ খবর রাষ্ট্র হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক এবং অসৎ সংসর্গে তরুণ বংশধরের নানা রকমের কদর্য অভ্যাসে লিপ্ত না হয়ে গত্যন্তর নেই। তাই এ কথা ভেবে তাদের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে যে, এহেন পরিস্থিতিতে যদি ইসলামের ফৌজদারী আইন চালু করা হয়, তা হলে কারুর পিঠই হয়তো বেতের আঘাতে জর্জরিত না হয়ে পারবে না। প্রতিদিন হয়তোবা হাজার হাজার মানুষের হাত কাটা হতে থাকবে এবং প্রতিদিন হয়তো শত শত মানুষের পাথরের আঘাতে মরতে হবে।

তাদের এ আশংকা নিসন্দেহে যুক্তিসঙ্গত। এই বেয়াড়া সমাজের বেলেল্লা রীতিনীতিকে অবিকলভাবে বহাল রেখে ইসলামের অন্য সমস্ত আইন-কানুন বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ফৌজদারী আইনকে সেখানে চালু করে দেয়াকে তারা যেমন জুলুম মনে করে,আমরাও তেমনি জুলুম মনে করি। কিন্তু নিজেদের যে ভুলটা তারা ধরতে পারছে না তা এইযে, সমাজের এই বাজে জীবন ধারাকে নিজেদের একান্ত পরিচিত জিনিস ধরে নিয়ে তাকে স্বাভাবিক অবস্থা মনে করে নিয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। বরং শয়তানের দোর্দন্ড প্রতাপ এই অস্বাভাবিক অবস্থাকে মানব জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে এবং মূলত এ অবস্থাকে বহাল থাকতে দেয়াটাই একটা নিদারুণ ও অসহনীয় জুলুম। ইসলামের সমাজব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করে আমরা এ জুলুমের মূলোৎপাটন করতে পারি। আর সেটা করার পর আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে যে, ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ, চুরি, মদখোরি মানুষের সাধারণ ও স্বাভাবিক কার্যকলাপ নয় এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ এতে জড়িয়ে পড়বে এটাও আশংকা করা চলেনা। ইসলাম মানব সমাজে যে ধরনের সামষ্টিক পরিবেশ গড়ে তোলে,তার আওতায় কেবল মাত্র অস্বাভাবিক ধরনের মুষ্ঠিমেয় কিছু লোকই এ সব ঘৃণ্য

কাজে লিপ্ত হতে পারে এবং এর সফল প্রতিকারের উপায় পাথর মারা, বেত মারা এবং হাতকাটা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

(২) দ্বিতীয় যে বিষয়টা এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় তা হলো এই যে, ইসলামের বিধান অত্যান্ত বিজ্ঞান সম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ। ইসলামী বিধানের এই সব বৈশিষ্ট্য জানা না থাকলে ইসলামী দন্ডবিধিকে উপলব্ধি করা কারো পক্ষে সম্ভবই নয়।

এখানে এক দিকে অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণসমূহ ও প্ররোচক উপকরণসমূহ এক এক করে খুঁজে বের করে তার উচ্ছেদ সাধন করা হয়, যাতে করে আল্লাহর কোন বান্দার এমন পরিস্থিতির শিকার হওয়ার অবকাশই না থাকে যে, নিজের জৈবিক ও স্বাভাবিক প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করতে অন্যায় পন্থা অবলম্বন করেত বাধ্য হতে হয়। অপরদিকে অপরাধের জন্য এমন দন্ড বিধান করা হয়, যা শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই অপরাধের পুনরাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত রাখে না, বরং অন্যান্য অপরাধ প্রবণ লোকদেরকেও ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে।

একদিকে মানুষকে যতদূর সম্ভব শাস্তি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়। এ জন্য অপরাধ প্রমাণিত করার জন্য সাক্ষ্যের ব্যাপারে অত্যধিক কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। দন্ড কার্যকর করার আগে একটা অনুসন্ধানমূলক মেয়াদ রাখা হয় যে, হয়তোবা এই সময়ে সাক্ষ্যের কোনো ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ে যাবে। বিচারকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, মানুষকে যথাসম্ভব শাস্তি থেকে নিস্তার দাও। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ اِدْرَءُوْا الْحُدُوْدَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "যতদূর সম্ভব শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাক।" فَاِنَّ الْاِمَامَ اَنْ يُخْطِئَ فِى الْعَفْوِ خَيْرٌ اَنْ يُخْطِئَ فِى الْعُقُوْبَةِ "কেননা নেতার ক্ষমার সিদ্ধান্তে ভুল করা, শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত ভুল করার চেয়ে ভাল।"

অপরদিকে অপরাধ যখন প্রমাণিত হয়ে যাবে তখন অপরাধীর প্রতি দয়াবিগলিত হওয়া অথবা তার পক্ষে কোনো রকমের তদবীর বা সুপারিশ করা অথবা তার মর্যাদা ও আভিজাত্যের কথা বিবেচনা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কুরআনের হুশিয়ারি এই যে-

وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (النور:٢)

"তোমরা যদি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর আইনের (প্রয়োজন) ব্যাপারে তোমরা যেন অপরাধীদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতির আবেগে উদ্বেলিত না হও।" (সূরা নূর-২)।

হাদীসের এ ঘটনা সর্বজন বিদিত যে, বনী মাখযুমের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ফাতেমা নাম্নী এক মহিলা মানুষের কাছ থেকে অলংকার ও অন্যান্য আসবাবপত্র সাময়িক ব্যবহারের জন্য চেয়ে আনতো এবং পরে তা অস্বীকার করে আত্মসাৎ করতো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে অভিযোগ আনা হলো এবং অপরাধ প্রমাণিত হলো। কোরেশরা ভয়ে প্রমাদ গুণলো যে, পাছে তারও হাত কাটা না যায়; কিন্তু হযরতের সামনে সুপারিশ নিয়ে যাবার সাহস কারোরই ছিল না। অবশেষে পরামর্শক্রমে স্থির হলো যে, রসূল (সাঃ)-এর স্বাধীন করা গোলাম জায়েদের ছেলে উসামাকে দিয়ে সুপারিশ করাতে হবে। কেননা উসামাকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন। উসামা উপস্থিত হয়ে সুপারিশ করলেন। শোনা মাত্রই রসূল (সাঃ)-এর চেহারা রাগে লাল হয়ে গেল। তিনি বললেনঃ "তুমি কি আল্লাহর দণ্ডবিধি সম্পর্কে সুপারিশ করতে এসেছ?" উসামা চুপসে গেলেন এবং ক্ষমা চাইলেন। এরপর তিনি জনগণকে সমবেত করে বললেনঃ "তোমাদের পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর রীতি ছিল এই যে, তাদের মধ্যে কোনো অভিজাত লোক অপরাধ করলে তাকে ছেড়ে দিত। আর কোনো নিম্ন শ্রেণীর লোক অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দিত। যে আল্লাহর হাতে আমার জীবন, তার শপথ করে বলছি, যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করতো, তবে আমি তার হাতও না কেটে ছাড়তাম না।"

(৩) উপরোক্ত দুটো বিষয় বুঝে নেয়ার পর ইসলামের মূলতত্ত্ব সম্পর্কেও সচেতন হওয়া আবশ্যক। কেননা ওটাই ইসলামের সকল

আইনের প্রাণ। ইসলামে শাস্তির ধারণাই তার প্রতি হিতকামনার প্রেরণা থেকে উদগত। ইসলাম মানুষের অমঙ্গল কামনা করে না। সে কাউকে ক্রোধ ও আক্রোশের বশে মারে না। তার কোনো আইনে শত্রুতার মনোভাব প্রতিফলিত হয়নি। ইসলামের দন্ডবিধি "পবিত্রকরণের" মহৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত। অপরাধ করার কারণে মুমিনের আত্মায় ও মনে যে ময়লা ও কলুষতা লাগে, তা ধুয়ে ফেলার জন্যই তাকে শাস্তি দেয়া হয়। সে যাতে আখিরাতের শাস্তি থেকে রক্ষা পায় সে জন্য তাকে গুণাহ থেকে পবিত্র করা হয়। স্বয়ং অপরাধীর মনে ইসলাম এই চেতনা জাগিয়ে তোলে যে, আসল শাসক হচ্ছেন আল্লাহ, যার চোখ থেকে তুমি তোমার কর্মকান্ডকে লুকাতে পারনা। আর আসল আদালত হলো আখিরাতের আদালত। সেখানে তোমাকে হাজির হতেই হবে এবং সেখানকার শাস্তি বড়ই অবমাননাকর হবে। তুমি যদি দুনিয়াতে নিজের অপরাধকে লুকিয়ে রাখ, তাহলে এই অপবিত্রতা নিয়েই তুমি আল্লাহর আদালতে উপস্থিত হবে। কিন্তু তুমি যদি এখানে নিজেকে শাস্তির জন্য এগিয়ে দাও, তাহলে এ শাস্তি তোমাকে পবিত্র করে দেবে এবং তুমি নিষ্পাপ অবস্থায় আল্লাহর কাছে পৌঁছবে।[১] হাদীসে এ বিষয়টা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

اِنَّ مَنْ اَصَابَ مِنْ هٰذَا الْمَعَاصِىْ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَمَنْ اَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ
فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَاِنْ شَاءَ عَاقَبَهٗ ـ

---

১. এখানে এ কথা প্রত্যেকের হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে শাস্তির জন্য এগিয়ে দেয়, তার এ কাজটা স্বয়ং তওবা ও অনুশোচনার অনিবার্য ফলশ্রুতি। তাই এ ধরনের মানুষ শাস্তি ভোগ করার পর দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় পাপমুক্ত হয়ে যায়। আর যে অপরাধী আত্মস্বীকৃত হয়ে স্বেচ্ছায় আসে না বরং ধরা পড়ে গ্রেফতার হয়ে আসে। তার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিয়ম ছিল এই যে, শাস্তি কার্যকর করার পর তাকে তওবা করাতেন।

"এ সব পাপের মধ্য হতে কোনো পাপের কালিমায় যদি কেউ কলুষিত হয় এবং দুনিয়াতেই তার শাস্তিও সে পেয়ে যায়, তবে সেটা তার কাফফারা অর্থাৎ ক্ষমার কারণ হবে। কিন্তু যদি আল্লাহর সুবিজ্ঞ পরিকল্পনার আওতায় তার গুণাহ মানুষের কাছে ধরা না পড়ে, তবে তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করবেন, নচেত শাস্তি দেবেন।"

এ অনুশাসন আমাদেরই মত রক্ত-মাংশের তৈরী মানুষগুলোর মধ্যে এক বিস্ময়কর নৈতিক চেতনার সঞ্চার করেছিল এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করুন। এই দৃষ্টান্তগুলোর মধ্য দিয়ে আপনি ইসলামী ন্যায়বিচার, ইসলামী চরিত্র এবং ইসলামের অতুলনীয় ও নজিরবিহীন বৈপ্লবিক আদর্শের এমন মহিমা দেখতে পাবেন যে, হয়তো আপনি অবাক হয়ে ভাবতে থাকবেন যে, মানুষ কখনো এত মহত হতে পারে!

একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক চোরকে ধরে আনা হলো। সে একটা আলখেল্লা চুরি করেছিল। তিনি তাকে দেখে বললেন! "আমার মনে হয় না সে চুরি করেছে।" আসামী সামনে এগিয়ে গিয়ে বললোঃ "ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি সত্যিই চুরি করেছি।" তিনি তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করে নির্দেশ দিলেনঃ "যাও, এর হাত কেটে দাও। তারপর আমার কাছে নিয়ে এস।" হাত কাটার পর তাকে রসূলের (সাঃ) কাছে আনা হলো। হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "এবার তুমি আল্লাহর কাছে তওবা কর।" সে বললো! "আমি তওবা করলাম।" তিনি বললেনঃ যাও। আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করেছেন।

আর একবার আমর বিন সামুরা নামক এক ব্যক্তি হাজির হয়ে রসূল (সঃ)কে বললোঃ "আমি অমুক গোত্রের উট চুরি করেছি।" আপনি আমাকে পবিত্র করে দিন।" হুজুর (সাঃ) সেই গোত্রে লোক পাঠিয়ে প্রকৃত ঘটনা তদন্ত করালেন। জানা গেল, সত্যিই উট নিখোঁজ হয়েছে। তখন তিনি হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। যখন শাস্তি কার্যকর করা হলো তখন সে বললোঃ সেই আল্লাহর

শোকর, যিনি আমাকে পবিত্র করে দিলেন।" তারপর সে নিজের কাটা হাতকে সম্বোধন করে বললোঃ "তুই আমাকে দোজখে নিয়ে যেতে চেয়েছিলি। 'আল্লাহ আমাকে তোর কবল থেকে রক্ষা করেছেন।"

উপরে বনী মাখযুমের যে মহিলার ঘটনা বর্ণনা করা হলো, তার মকদ্দমায় যখন রসূল (সাঃ) রায় ঘোষণা করলেন, তখন তার গোত্রের লোকেরা বললোঃ "ইয়া রসূলুল্লাহ! আমরা তার জরিমানা দিতে রাজী আছি।" রসূল (সাঃ) বললেনঃ "ওর হাত কেটে দাও।" তারা বললোঃ "আমরা পাঁচশ' দিনার তার হাতের বদলায় দিচ্ছি।" রসূল (সাঃ) বললেনঃ "ওর হাত কেটে দাও।" যখন তার হাত কেটে ফেলা হলো, তখন সেই মহিলা হাজির হয়ে বললোঃ "ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহর আজাব থেকে আমার নিষ্কৃতি পাবার কোনো উপায় আছে কি? "তিনি বললেনঃ "হা," এখন তুমি সদ্য প্রসূত শিশুর মত নিষ্পাপ।"

মাগের আসলামীর ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ। সে মসজিদে হাজির হয়ে বললোঃ "ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি ব্যভিচার করেছি। আমাকে পবিত্র করে দিন।" তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেনঃ "যাও, তওবা কর এবং আল্লাহর কাছে মাফ চাও।" সে আবার সামনে এল এবং একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো। তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবার সামনে এসে একই কথা বললো। এভাবে চারবার স্বীকারোক্তি করার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তুমি কি পাগল? "সে বললোঃ "না, আমি পাগল নই।" আবার জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তুমি কি মদ খেয়েছ? "সে বললোঃ "না।" পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তুমি কি বিবাহিত?" সে বললোঃ হাঁ! তখন রসূল (সাঃ) বললেনঃ হয়তো শুধু চুমু খেয়েছ ও আলিঙ্গন করেছ।" সে বললোঃ না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তুমি কি তার সাথে এক বিছানায় শুয়েছ?" সে বললোঃ জ্বি! জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি সঙ্গম করেছ? সে জবাব দিলঃ হাঁ। এভাবে সঙ্গমের সমার্থক আরো কয়েকটা শব্দ বলে বারবার তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন এবং সে ইতিবাচক জবাব দিতে লাগলো। অবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তুমি কি জান ব্যভিচার কাকে বলে?" সে বললোঃ "হাঁ,

একজন স্বামী বৈধভাবে তার স্ত্রীর সাথে যে কাজ করে, আমি তার সাথে সেই কাজ অবৈধভাবে করেছি।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার এ বিবরণের উদ্দেশ্য কি? সে বললোঃ "আমি পবিত্র হতে চাই।" তখন তিনি আদেশ দিলেনঃ "যাও, একে পাথর মেরে হত্যা কর।" এ ঘটনার দু'তিন দিন পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের বৈঠকে বললেনঃ "তোমরা মাগের বিন মালেকের জন্য দোয়া কর। সে এমন তওবা করেছে যে, তা যদি সমগ্র জাতিকে বন্টন করে দেয়া হয় তবে সকলের গুণাহ মাফ হবার জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যাবে।"

গামেদী গোত্রীয় মহিলার ঘটনাটাও হাদীসের একটা অন্যতম প্রসিদ্ধ ঘটনা। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর কাছে হাজির হয়ে বললোঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি ব্যভিচার করেছি। আমাকে পবিত্র করে দিন। হযরত (সাঃ) বললেনঃ "যাও তওবা কর এবং আল্লাহর কাছে মাফ চাও।" সে বললো "আপনি বুঝি আমাকে মাগেরের মত ফিরিয়ে দিতে চান?" আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমি ব্যভিচার দ্বারা গর্ভবতী।" তিনি বললেনঃ "যাও সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।" সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মহিলা আবার এল এবং বললোঃ "সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এখন আপনার নির্দেশ কি?" বললেনঃ "যাও, শিশুকে দুধ খাওয়াও। দুধ খাওয়ানোর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দেখা যাবে।" যখন দুধ খাওয়ানো মেয়াদ শেষ হলো, তখন সে আবার শিশুকে নিয়ে হাজির হলো। বললোঃ "আমি এ কাজও শেষ করেছি।" তখন তিনি শিশুকে লালন–পালনের দায়িত্ব একজন মুসলমানের ওপর ন্যস্ত করলেন এবং ঐ মহিলাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ জারি করলেন। এ ঘটনার পর হযরত খালিদ বিন ওলিদের মুখ দিয়ে ঐ মহিলা সম্পর্কে একটা খারাপ মন্তব্য বেরিয়ে যায়। হুজুর (সাঃ) সে কথা শুনে বললেনঃ "খবরদার! খালিদ, আমার প্রাণ যে আল্লাহর হাতে, তার শপথ করে বলছি, এই মহিলা এমন তওবা করেছে যে, অবৈধ কর আদায়কারীও যদি সে রকম তওবা করে তবে তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" অতপর তিনি নিজেই তার জানাযা পড়ালেন।

কাদেসিয়ার যুদ্ধে আবূ মাহজান সাফাফী মদ খাওয়ার দায়ে গ্রেফতার হন। যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো, তখন আবূ মাহজান জেলখানায় বসে ছটফট করতে লাগলেন এবং সেনাপতি হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের স্ত্রীকে অনুরোধ করলেন যে, ''আমাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য ছেড়ে দিন। আমি যদি মারা যাই, তা হলে আর শাস্তির দরকার হবে না। আর যদি বেঁচে থাকি তবে নিজেই এসে আবার জেলে ঢুকবো।'' একজন মুসলমান অপরাধী হলেও তার অঙ্গীকার এত মূল্যবান ছিল যে, হযরত সা'দের স্ত্রী তা বিশ্বাস না করার কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। তিনি তাকে শুধু মুক্তি দিলেন না, বরং হযরত সা'দের শ্রেষ্ঠ ঘোড়াটাও তাকে দিলেন। ৮০ দো'রার সাজা ঘোষিত এই ব্যক্তি যুদ্ধে ইসলাম ও ইসলামী সরকারের জন্য এমন বীরত্ব দেখালেন যে, তা দেখে হযরত সা'দ (রাঃ) পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। যুদ্ধ শেষে আল্লাহর সেই বান্দা পুনরায় নিজে এসে কয়েদ খানায় ঢুকলেন। হযরত সাদ (রাঃ) তার মোজাহিদ সুলভ প্রাণপণ লড়াই-এর বিনিময়ে মুক্ত করে দিলেন এবং বললেনঃ ''যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে এমন বীরত্বপূর্ণ লড়াই করে, তার পিঠে আমি বেত মারবো না।'' আবূ মাহজান জবাব দিলেন!'' আমিও এখন আর মদ খাবো না। কেননা আশা করেছিলাম যে, শাস্তি কার্যকর করে আপনি আমাকে পবিত্র করবেন। কিন্তু সে আশা আমার পূর্ণ হলো না।''

এ সব ঘটনা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এ সব ঘটনা থেকে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায়, যে, ইসলামের শাস্তির প্রকৃত মর্ম কি, ইসলাম অপনাধের প্রতিকারের সাথে সাথে অপরাধীর মধ্যে কি ধরনের সুমহান নৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলে এবং কিভাবে ইসলামে অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার পর নতুনভাবে সমাজের সম্মানিত সদস্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যারা এ আইনকে অসভ্যজনোচিত আইন বলে তারা নিজেরাই অসভ্য। এ আইন আদম সন্তানকে আত্মশুদ্ধি ও উন্নত মনুষ্যত্বের যে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করায়। তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায়না।

(৪) দন্ড কার্যকর করলে বিরাজমান পরিস্থিতি ও অভিযুক্তের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। যুদ্ধাবস্থায় দন্ড মওকুফ রাখা হয়। দুর্ভিক্ষের সময় চোরের হাত কাটা হয় না। আসামীর অবস্থা তদন্ত করে যদি জানা যায় যে, আসলে সে চুরি করতে বাধ্য হয়েছিল, তা হলেও তার প্রতি কৃপা করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ হাতেব ইবনে আবি বালতায়ার গোলামদের ঘটনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তারা মোযানিয়া গোত্রের এক ব্যক্তির উট চুরি করে। ঐ ব্যক্তি এসে হযরত ওমরের (রাঃ) কাছে নালিশ দেয়। তিনি অভিযোগ তদন্ত করার পর তাদের হাত কাটার আদেশ দেন। এরপর সহসা গোলামদের দুরবস্থার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি গোলামদের মনিব হযরত হাতেবকে ডেকে বলেনঃ তুমি এই দরিদ্র লোকগুলোকে কাজে খাটিয়েছ। অথচ তাদেরকে উপোস করিয়ে মেরেছ। ফলে তাদেরকে এমন অবস্থায় নিয়ে ঠেকিয়েছ যে, সে অবস্থায় কেউ হারাম খেলেও তা তার জন্য বৈধ হয়ে যায়। ''এ কথা বলে তিনি গোলামদেরকে ছেড়ে দিলেন এবং তাদের মনিবের কাছ থেকে ক্ষতিপূণ আদায় করে উটের মালিককে দিলেন। এ ধরনের আরো বহু উদাহরণ রয়েছে, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলামের আইন কোন অবিবেচক নিষ্ঠুর আইন নয়। কে প্রকৃত পক্ষে অনন্যোপায় হয়ে অপরাধ করেছে এবং কে স্বাভাবিক অবস্থায় অপরাধ করেছে উভয়ের মধ্যে এ আইন পার্থক্য নির্ণয় করে। এ জন্যই অবিবাহিত ব্যভিচারী এবং বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তিতে তারতম্য করা হয়েছে। আর এ জন্যই একজন দুর্ভিক্ষপীড়িত লোক এবং একজন স্বচ্ছল স্বাভাবিক লোকের চুরিকে এক পর্যায়ে রাখা হয়নি।

তরজমানুল কুরআন, মুহাররম ১৩৫৮ হিঃ, মার্চ ১৯৩৯
(আরো দেখুন, তরজমানুল কুরআন ভলুম ৪৫, সংখ্যা ৩)

দাসপ্রথা বনাম ইসলাম

এটা একটা বিতর্কিকা। দেশের একজন প্রখ্যাত গ্রন্থকারের লেখা বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে তরজমানুল কুরআনে এটা ছাপা হয়েছিল। এই বিতর্কে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্তঃ

১. তরজমানুল কুরআনের সমালোচনা
২. গ্রন্থকারের জবাব
৩. তরজমানুল কুরআনের পাল্টা জবাব
৪. জনৈক প্রখ্যাত লেখকের পক্ষ থেকে গ্রন্থকারের পক্ষ সমর্থন
৫. তরজমানুল কুরআনের চূড়ান্ত জবাব

যেহেতু এ বিতর্কিকার পুনর্মুদ্রণের উদ্দেশ্য পুরানো কাসুন্দি ঘাটা নয়। তাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

১

১। বিজ্ঞ গ্রন্থকার স্বীয় পুস্তকে দাস প্রথা সম্পর্কে নিজের গবেষণা লব্ধ তত্ত্ব ও তথ্য নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন।

"একজন মানুষ কর্তৃক আরেকজন মানুষেকে দাস বা গোলাম বানানো একটা স্বভাব বিরোধী কাজ। কিন্তু পৃথিবীতে গোলামী বা দাসত্ব প্রথা চালু হয়ে গিয়েছিল এবং কুরআন নাযিল হওয়ার সময় আরবদের অনেক দাস-দাসী ছিল। যারা প্রথাসিদ্ধভাবে দাস-দাসী হিসেবে বর্তমান, কুরআন জনসাধারণের সুবিধার খাতিরে তাদের গোলামী বহাল রেখেছে।

এরপর তিনি টীকাতে লিখেনঃ

"পবিত্র কুরআনে যেখানেই দাস-দাসীর প্রসঙ্গ এসেছে, অতীতকাল বাচক ক্রিয়াপদ দ্বারাই তার উলেখ করা হয়েছে। যথা

ما ملكت أيمانكم (যারা তোমাদের করতলগত হয়েছে) ভবিষ্যত কাল বাচক ক্রিয়া দ্বারা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে আরবরা আগে থেকেই যে দাস-দাসীর মালিকানা লাভ করেছে কেবল তাদের ওপরই মালিকানা বহাল রাখা হয়েছে।”

গ্রন্থকারের উল্লিখিত মূল বক্তব্য এবং টীকা দুটোই পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে। এ কথা সত্য যে, কুরআন মানবীয় দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য রেখে সংশোধনের পর্যায় ক্রমিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। তবে কোন ব্যাপারে এই পর্যায়ক্রমিক সংশোধন প্রক্রিয়াকে কুরআন অসম্পূর্ণ রেখে দিয়েছে এবং ওহী নাযিল হওয়ার সময়ের মধ্যেই সর্ব শেষ সংশোধনমূলক নির্দেশ দেয়নি, এমন কোন উদাহরণ কুরআনে আমরা দেখতে পাই না। এই সাধারণ মূলনীতি যদি সঠিক হয়ে থাকে তা হলে দাসত্ব সম্পর্কে কি কুরআনের এমন কোন নির্দেশ দেখানো যাবে যার মাধ্যমে সে সকল ধরনের দাসত্বকে সম্পূর্ণরূপে ও চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে? আরবে দাস প্রথার প্রচলন ছিল এবং অনেকেরই দাস-দাসী ছিল বিধায় জনসাধারণের সুবিধার্থে দাসত্বকে বহাল রাখা হয়েছে এই মর্মে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়, এ যুক্তি কতখানি ধোপে টেকে ভেবে দেখা দরকার। এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায় যে, মানুষের সুবিধা ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্ আইন রচনা করেন-এ কথা বলা আসলে আল্লাহকে দুর্বল মনে করারই নামান্তর। যে আল্লাহ্ মদ হারাম করার সময় মানুষের ইচ্ছা-আকাংখার তোয়াক্কা করেননি, ব্যভিচার নিষিদ্ধ করতে গিয়েও আরবে ও অন্যান্য দেশে তা কি পরিমাণে বিস্তার লাভ করেছে, সেটা ভেবে দ্বিধান্বিত হননি, তাকে সর্বপ্রকারের গোলামী নিষিদ্ধ করা থেকে কিসে ঠেকিয়ে রাখতে পারতো?

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সে সময়ে দুই ধরনের দাস প্রথা পৃথিবীতে চালু ছিল। প্রথমত, কোন কোন দেশের স্বাধীন নাগরিকদেরকে ধরে নিয়ে তাদের বেচা-কেনা করা হতো।

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস–দাসী বানিয়ে রেখে দেয়া হতো।

উল্লিখিত দুই ধরনের গোলামীর প্রথমটা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় সম্পূর্ণরূপে ও চিরতরে নিষিদ্ধ করে দেন। তিনি বলেন যে, যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মানুষকে ধরে নিয়ে বিক্রি করবে, তার বিরুদ্ধে আমি স্বয়ং কিয়ামতের দিন বাদী হবো (বোখারী ,বেচা–কেনা সংক্রান্ত অধ্যায়)। আর দ্বিতীয়টা সম্পর্কে ইসলামের আইন এভাবে রচিত হয় যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে হয় মহানুভবতা দেখিয়ে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে, নতুবা মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দেয়া হবে অথবা শত্রু পক্ষের কাছে রক্ষিত মুসলমান যুদ্ধবন্দীদের সাথে বিনিময় করা হবে। কিন্তু যদি এমনি ছেড়ে দেয়া রণকৌশলের দিক থেকে অসুবিধাজনক বা স্বার্থহানিকর হয়, মুক্তিপণ আদায়েরও ব্যবস্থা না হয় এবং শত্রুপক্ষ বন্দী বিনিময়েও রাজী না হয়, তা হলে যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস–দাসী করে রাখার অধিকার মুসলমানদের রয়েছে। তবে এ ধরনের গোলামের সাথেও সর্বোচ্চ পরিমাণ সৌজন্য, সদাচার ,সদয় ও সহৃদয় ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের শিক্ষা–দীক্ষার বন্দোবস্ত করে সমাজের উৎকৃষ্ট নাগরিকে পরিণত করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, এবং তাদের মুক্তির বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সঠিক ইসলামী বিধি জানার জন্য কুরআনের নির্দেশাবলীর পাশাপাশি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজ এবং সাহাবায়ে কিরামের কার্যধারাও লক্ষ্য করতে হবে। গ্রন্থকারের পদস্খলনের আসল কারণ এই যে, তিনি শুধু মাত্র কুরআন থেকে গোলামী সংক্রান্ত আইন অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন।

ماملكت ايمانكم (যারা তোমাদের করায়ত্ত হয়েছে) এই উক্তি থেকে গ্রন্থকার যে সূক্ষ্মতত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন, সেটা ঠিক নয়। কেননা কুরআন নাযিল হওয়ার পরও সাহাবায়ে কিরামের আমলে যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস–দাসী হিসেবে রাখা হয়েছে এবং স্বয়ং রসূলের স্বজনভুক্ত পরিবারগুলোতেও যুদ্ধবন্দী গোলাম ও বিজিত দেশ থেকে আগত বাঁদীরা ছিল। প্রশ্ন এই যে, এই সমস্ত

লোক কি তাহলে জেনে শুনে কুরআন বিরোধী কাজ করেছেন? অথবা তারা সবাই কি কুরআনের হুকুম কি তা জানতেন না?

তাছাড়া আপনি যদি এটা একটা সাধারণ মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন যে, কুরআনে যেখানেই অতীত কালবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার দ্বারা কেবল অতীতের ব্যাপারই বুঝানো হবে, বর্তমান ও ভবিষ্যত বুঝানো হবে না, তা হলে ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক হবে বৈকি। কেননা اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ এ আয়াতের ব্যাখ্যা আপনি স্বয়ং আপনার বইতে এভাবে করেছেন! "যখন কিয়ামত আসবে তখন চাঁদ বিদীর্ণ হয়ে যাবে" (সূরা ক্বামার–১)। আর كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ এর অনুবাদ আপনি করেছেনঃ "তাঁর আরশ পানির ওপরে রয়েছে।"

পরবর্তী আর এক জায়গায় গ্রন্থকার সূরা মুহাম্মাদের ৪নং আয়াত–

حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً (محمد: ٤)

(রণাঙ্গনে কাফিরদেরকে আচ্ছামত মার দেয়ার পর পাকড়াও অভিযান জোরদার কর। অতপর হয় কৃপামূলকভাবে নচেৎ পণের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দাও।)

উদ্ধৃত করেছেন। অতপর এ আয়াত থেকে এই বলে প্রমাণ দর্শিয়েছেন যে– "গোলামীর একটাই মাত্র পথ ছিল আর তা ছিল যুদ্ধবন্দীদের সংরক্ষণ। কুরআন যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্ত করার নির্দেশ দিয়ে চিরতরে এই পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।"

কিন্তু গ্রন্থকার এ কথা ভেবে দেখলেন না যে, কাফিররা যদি মুক্তিপণ এবং বন্দী বিনিময়–এ দুটোর কোনটাই করতে সম্মত না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রেও কি যুদ্ধ বন্দীদেরকে সৌজন্যমূলকভাবে ছেড়ে দেয়ার জন্য মুসলমানদেরকে আদেশ করা হয়েছে? যুদ্ধবন্দীদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়াতে যদি শত্রুপক্ষের আরো শক্তিশালী হবার এবং তারা মুক্ত হয়ে আবার মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে চলে আসবে এই আশংকা থাকলেও কি তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ রয়েছে? অন্ততপক্ষে আয়াতের শাব্দিক বিন্যাস

থেকে তো এ ধরনের অকাট্য ও বাধ্যতামূলক নির্দেশ প্রতিফলিত হয় না। আয়াতের শব্দটির অর্থ হলো কৃপা করা, সৌজন্য ও মহানুভবতা প্রদর্শন করা। কুরআনের কোথাও মহানুভবতা দেখানোর হুকুম দেয়া হয়নি। অবশ্য এ কাজটিকে মহত ও শ্রেয় আখ্যায়িত করে তা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাই আয়াতের বক্তব্য হলো, সৌজন্যমূলক মুক্তিদান অধিকতর মহত কাজ। কিন্তু এর দ্বারা এটা কখনো বুঝানো হয়নি যে, ইসলামী স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হলেও মহানুভবতা দেখাতেই হবে এবং অনুকম্পা প্রদর্শন করা ছাড়া আর কিছু করা যাবে না।

(তরজমানুল কুরআন, রবিউল আউয়াল, ১৩৫৩ হিঃ)

২

গ্রন্থকারের পক্ষ থেকে উপরোক্ত সমালোচনার জবাব

প্রত্যেক আদম সন্তান পৃথিবীর বাদশাহ। আদম সম্পর্কে সূরা বাকারার ৩০নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (আমি পৃথিবীতে খলীফা পাঠাবো।) আর আদমের বংশধর সম্পর্কে সূরা আনয়ামের ১৬৬ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ (তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর খলীফা বানিয়েছেন।) তাদের মর্যাদা সম্পর্কে সূরা বনি ইসরাঈলের ৭০নং আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছেঃ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (بنی اسرائیل: ٧٠) (আমি আদমের বংশধরকে সম্মানিত করেছি। যে আদম সন্তানকে পৃথিবীর বাদশাহ বানানো হয়েছে, বরঞ্চ আপনার তাফসীর অনুসারে সত্যের প্রতিনিধি বানানো হয়েছে, তাকে গোলাম বানানো কি প্রকৃতি বিরোধী নয়? আর যে জিনিস প্রকৃতি বিরোধী, সেটা কুরআন অব্যাহত রাখবে, এটা কিভাবে সম্ভব? আপনি এতটুকুতো স্বীকার করেছেন যেঃ

"সে সময় পর্যন্ত দুই ধরনের দাসত্ব পৃথিবীতে চালু ছিল। একটি এই যে, কোন কোন দেশের অধিবাসীদেরকে ধরে নিয়ে কেনা-বেচা করা হতো। দ্বিতীয়টি এই যে, যুদ্ধে আটক

লোকজনকে দাস-দাসী করে রাখা হতো। এই দুই ধরনের দাসত্বের প্রথমটাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মানুষকে ধরে নিয়ে বিক্রি করবে, কিয়ামতের দিন আমি স্বয়ং তার বিরুদ্ধে বাদী হবো (বুখারী, বেচা-কেনা সংক্রান্ত অধ্যায়)। আর দ্বিতীয়টা সম্পর্কে ইসলামের আইন এভাবে নির্ধারিত হয় যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে হয় কৃপা দেখিয়ে মুক্তি দিতে হবে, নচেত মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে অথবা শত্রুপক্ষের হাতে আটক মুসলমান যুদ্ধবন্দীদের সাথে বিনিময় করা হবে। কিন্তু যদি কৃপা করে ছেড়ে দেয়া রণকৌশলগত দিক যুদ্ধবন্দীর বিনিময়েও রাজী না হয়, তা হলে তাদেরকে দাস-দাসী করে রাখার অধিকার মুসলমানদের রয়েছে।"

এ কথা তো মেনেই নেয়া হলো যে স্বাধীন মানুষকে গোলাম বানানো এমন জঘণ্য অপরাধ যে, কিয়ামতের দিন স্বয়ং রসূল (সাঃ) তার বিরুদ্ধে বাদী হবেন। এর পর আসে যুদ্ধবন্দীদের প্রসঙ্গ। তাদের সম্পর্কে কুরআনের অকাট্য নির্দেশ এই যে, فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً (محمد:٤) (অতপর হয় তাদেরকে মহানুভবতা প্রদর্শন করে নতুবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে।) মুক্তিপণ চাই টাকাকড়ি বা দ্রব্যাদির আকারে হোক অথবা যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের আকারে হোক,তাদেরকে যে ছেড়ে দিতেই হবে, এটা অকাট্য বিধান। এ কথা ঠিক যে, যতক্ষণ তাদের মুক্তি দিলে ইসলামের স্বার্থের ক্ষতি হওয়ার আশংকা বিরাজ করবে, ততক্ষণ তাদেরকে আটক রাখা যাবে। কিন্তু তাদেরকে গোলাম বানানো চলবে না। সরকারকে কুরআন এ অধিকার দেয়নি যে, তাদেরকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি কিংবা সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেবে। বরং তারা সরকারী বন্দী হিসেবে সসম্মানে থাকবে। অথচ আপনার বক্তব্য এই যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিজেদের সম্পত্তি বানিয়ে ভোগ ব্যবহার করতে পারবে অথবা ছাগল-ভেড়ার মত এক হাত থেকে আর এক হাতে বিক্রি করা যাবে এবং মনিব কর্তৃক মুক্তি দেয়া না হলে তারা কিয়ামত পর্যন্ত বংশানুক্রমিকভাবে

গোলাম এবং সর্ব প্রকারের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। একটি পয়সারও বা, এক দানা পরিমাণ সম্পত্তিরও মালিক হতে পারবে না। এমনকি তারা মুসলমান হয়ে গেলেও মানবাধিকার লাভের যোগ্য হবে না।

এই কি কুরআনের শিক্ষা? কুরআনের কোন আয়াত, কোন শব্দ বা কোন অক্ষর দ্বারা কি আপনি এ বক্তব্য প্রমাণ করতে পারেবন? তা যখন পারবেন না, তখন আর আমার ওপর আপত্তি কেন? আমি তো কুরআনের শিক্ষাই লিখেছি।

আপনার যুক্তি হলোঃ

"সাহাবীদের আমলে বহু যুদ্ধবন্দীকে দাস-দাসী করে রাখা হয়েছে। স্বয়ং রসূল (সাঃ)-এর স্বজনভুক্ত পরিবারগুলোতে যুদ্ধবন্দী হয়ে আসা গোলাম এবং বিজিত দেশ থেকে আসা দাসী ছিল।"

আপনি সাহাবী এবং রসূলের (সাঃ) বংশোদ্ভূতদের প্রতিটি কাজকে কুরআনের নির্দেশিত কাজ মনে করেন। কিন্তু আমি মনে করি, তাদের যে কাজের স্বপক্ষে কুরআনের সমর্থন পাওয়া যায় কেবলমাত্র সেই কাজই ইসলাম সম্মত। অবশ্য আপনি যদি ইতিহাসের চৌহদ্দীতে এসে আলোচনা করেন তা হলে আমি আপনাকে তৃপ্তিকর জবাব দিতে পারবো। কি কি কারণে ও কি কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ সাহাবীগণ ও রসূলের বংশোদ্ভূত অন্যান্য সাহাবীগণ গোলাম বাদী গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন, তা পর্যাপ্ত যুক্তি সহকারে দেখিয়ে দিতে পারবো। কিন্তু এটি বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সংঘটিত তাদের এ কাজকে কোন প্রমাণ ছাড়া কুরআনের নির্দেশিত কাজ বলে অভিহিত করা আমি সঠিক মনে করি না। প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে কুরআন রয়েছে। যতবার খুশী তা পড়ে দেখুন। প্রকৃতি বিরোধী এই গোলামীর স্বপক্ষে কোন দলীল যদি খুঁজে পান তবে আমাকে দেখান।

আমি লিখেছিলাম যে, আরবে যেহেতু দাসপ্রথা চালু ছিল এবং ঘরে ঘরে দাস-দাসী ছিল, তাই কুরআন শুধু তাদেরই গোলাম হিসেবে বহাল রাখার অনুমতি দিয়েছে, অধিকন্তু তাদের

মুক্তির জন্যও বহু সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। আর ভবিষ্যতের জন্য এ পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দিয়েছে। এর জবাবে আপনি লিখেছেনঃ

"এভাবে মানুষের সুবিধা ও স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে আল্লাহ আইন রচনা করেন এ কথা বলা আসলে আল্লাহকে দুর্বল মনে করারই নামান্তর। যিনি মদ হারাম করার সময় মানুষের ইচ্ছা আকাংখার তোয়াক্কা করেননি, ব্যভিচার নিষিদ্ধ করতে গিয়েও আরবে ও অন্যান্য দেশে তা কি পরিমাণে বিস্তার লাভ করেছে, তা ভেবে দ্বিধান্বিত হননি, সেই আল্লাহকে গোলামী নিষিদ্ধ করা থেকে কিসে বিরত রাখতে পারতো?"

কিন্তু আপনি ভেবে দেখলেন না যে, মদখোরি, ব্যভিচার, জুয়া প্রভৃতি নৈতিক অপরাধ। এগুলোকে তাৎক্ষণিক ভাবে রোধ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দাস-দাসীর ব্যাপারটা আলাদা। তারা আরবের অর্থনীতির অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল। শত শত পরিবার এবং গোত্র তাদের উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতো। তাদেরকে রাতারাতি মুক্ত করার নির্দেশ দিলে বহু সংখ্যক গোত্রের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ও বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার আশংকা ছিল। এ জন্য এ আপদটি ক্রমান্বয়ে উচ্ছেদ করাই সমিচিন ছিল এবং সেই মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী সত্তা সেটাই করেছিলেন।

(তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল উলা, ১৩৫৩ হিঃ)

৩

তরজমানুল কুরআনের পাল্টা জবাব

গোলামী সংক্রান্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা কুরআন মুসলমানদের ওপর ন্যস্ত করেছে। তারা মুক্তিপণ ছাড়াই কোন সহৃদয়তা ও মহানুভবতা দেখিয়ে যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্ত করে দেবে, না মুক্তিপণ আদায় করে (যা নগদ অর্থের আকারেও হতে পারে, আবার বন্দী বিনিময়ের আকারেও হতে পারে) ছেড়ে দেবে, সেটা তাদেরই এখতিয়ারাধীন। কোথাও এমন হুকুম দেয়া হয়নি যে, নগদ মুক্তিপণ বা বন্দী বিনিময়ের সুযোগ না থাকলে

বাধ্যতামূলকভাবে সৌজন্য দেখিয়ে বিনা মুক্তিপনেই ছেড়ে দিতে হবে। এর কারণ এই যে, আল্লাহ মানবীয় স্বভাব সম্পর্কে ভালোভাবেই ওয়াকিফহাল। তাঁর জানা আছে যে, দু'চারজন বা পাঁচ-দশজন কয়েদীর ব্যাপার হলে মুসলমানরা খুশীমনেই সৌজন্যমূলকভাবে তাদেরকে ছেড়ে দিতে সক্ষম। রসূল (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরামের আমলে সেটা তারা বহুবার করেছেনও। কিন্তু ব্যাপার যদি শত শত এবং হাজার হাজার বন্দীর হয়, একই সময়ে কাফিরদের কাছেও তাদের শত শত এবং হাজার হাজার মুসলিম বন্দী থাকে আর তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখা হয়ে থাকে,তা হলে কাফিরদের যুদ্ধবন্দীদেরকে নিছক মহানুভবতার ভিত্তিতে ছেড়ে দেয়া তাদের পক্ষে খুবই কঠিন হবে। উভয় তরফে যখন বিপুল সংখ্যক যুদ্ধবন্দী থাকে, সে অবস্থায় মুসলমানদের হাতে আটক যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির জন্য একটা পথই খোলা। হয় তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে নগদ মুক্তিপণ দিয়ে নিষ্কৃতি পাবে, নচেত তাদের স্বদেশী সরকারের সাথে বন্দী বিনিময়ের ব্যবস্থা হবে। এখন যুদ্ধবন্দীরা যদি নগদ অর্থ না দিতে পারে এবং সরকারের সাথেও বন্দী বিনিময়ের ব্যাপারে কোন মীমাংসা না হয়। অথচ শত্রু দেশে মুসলিম বন্দীরা গোলামের মত জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে, যেমন হাজার বছর ধরে বরং তার চেয়েও বেশী সময় ধরে বাস্তবিক পক্ষেই মুসলমানরা রয়েছে,তাহলে কোন্ কারণে মুসলমানদেরও অধিকার থাকবে না অমুসলিম বন্দীদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখার? আপনি বিষয়টা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন বর্তমান যুগের পরিস্থিতির আলোকে যখন অমুসলিম জাতিগুলোর মধ্যে যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করার প্রথা রহিত হয়ে গেছে। যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের রীতি দুনিয়ায় চালু হয়ে গেছে এবং যে অবস্থায় মুসলমানরা যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলাম করে রাখতে বাধ্য হতো,তার অবসান ঘটেছে। এ জন্যই গোলামী সংক্রান্ত ইসলামী বিধান মেনে নিতে আপনি দ্বিধা-দ্বন্দে ভুগছেন। কিন্তু এখন থেকে মাত্র দেড়শ' দুশ'বছর আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে যে পরিস্থিতি বিরাজ করতো, সেটা যদি আপনি বিবেচনা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন

যে, ইসলামী আইনে গোলামীর যে অবকাশ রাখা হয়েছে,তা নিরর্থক নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা কুরআনের সর্বোচ্চ মানের প্রজ্ঞারই নিদর্শন যে, সে গোলামীর ব্যাপারে এমন বিধান দিয়েছে,যাতে সমসাময়িক পরিস্থিতির দাবীও মেটানো হয়েছে,আবার ভবিষ্যতের জন্য একটি সংস্কারমূলক বিধিও দেয়া হয়েছে, যাতে ক্রমে পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে আপনা আপনি নয়া বিধি ব্যবস্থা চালু হয়ে যায়।

আপনি গোলামীর প্রশ্নে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন,তাতে একদিকে অপনি বলেন যে, কুরআনের আলোকে গোলামী অবৈধ,অপরদিকে আপনি এও স্বীকার করেন যে,সাহাবায়ে কিরাম ও রসূলের (সাঃ) বংশোদ্ভূত ব্যক্তিবর্গ যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলাম করে রাখতেন। এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে,সাহাবা ও আহলিবাইত যে কাজ করতেন তা কুরআনের বিরুদ্ধে ছিল। আপনি ইতিহাসের গন্ডিতে যেয়ে এবং পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতা বিশ্লেষণ করে যতই তৃপ্তিদায়ক জবাব দিন না কেন, আপনার দেয়া যুক্তি অনিবার্যভাবে যে সিদ্ধান্তের দিকে টেনে নিয়ে যায় ,সেটা আপনি কোন রকমেই ধামা-চাপা দিতে পারেন না। সে যুক্তি অনুসারে আপনার পক্ষে এ কথা স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে, খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কিরাম এবং আহলি বাইত (রাঃ)-এর দাস-দাসী রাখার কাজটা কুরআন বিরোধী ও অবৈধ ছিল। এমন কি আপনাকে এ কথাও মেনে নিতে হবে যে, (নাউজুবিল্লাহ!) কুরআন অসময়োচিতভাবে এমন একটা অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক আইন দিয়েছিল যা বিরাজমান পরিস্থিতির দাবী বিবেচনা করেনি এবং যাকে বাস্তবায়িত করা বারো শ' বছর পর্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল। সে আইন এত অবাস্তব যে তাকে সেই উৎকৃষ্টতম মানের মুসলমানরাও কার্যে পরিণত করতে পারেননি, যাদেরকে রসূল (সাঃ) প্রত্যক্ষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং যারা নিজেদের জীবনকে ইসলামের আদর্শ মোতাবেক গড়ে তোলার জন্য মানবীয় ক্ষমতার আওতায় সর্বোচ্চ চেষ্টা-সাধনা করেছেন।

এটা শুধু নীতিশাস্ত্রীয় যুক্তির মারপ্যাচ নয় বরং আপনি যদি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন তা হলে এ কথার যৌক্তিকতা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً

এ আয়াতের আপনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেটাই যদি ইসলামী আইন বলে বিবেচিত হয়, তাহলে এ আইন কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং সম্পূর্ণ অকার্যোপযোগী হয়ে পড়তে পারে। আপনার ব্যাখ্যা অনুসারে এ আয়াত থেকে যে আইন বেরিয়ে আসে, তা বাস্তবায়নের অর্থ দাড়াবে এই যে, নগদ মুক্তিপণ ও বন্দী বিনিময় দুটোতেই কাফিররা অনিচ্ছুক হলেও মুসলমানরা বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য। মুসলমানদের অনুসৃত আইন যদি এ রকমই হতো, তা হলে কোন অমুসলিম জাতি এত বেকুফ ছিল না যে, নগদ মুক্তিপন দিয়ে দিতে কিংবা মুসলিম বন্দীদের মুক্তি দিতে রাজী হতো। সে ক্ষেত্রে লাখ লাখ মুসলমান কাফিরদের হাতে একবার বন্দী হলে আর কোন কালেও মুক্তি পেত না। চির দিনের জন্য গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকতো। অথচ কাফিরদের বন্দীরা প্রত্যেক যুদ্ধের পর মুক্ত হয়ে যেত। আপনিই বলুন, এ ধরণের আইনকে কি ন্যায়সঙ্গত বলা যায়? কোন যুগেও কি এ আইনের বাস্তবায়ন মানুষের পক্ষে সম্ভব?

(তরজমানুল কুরআন, ভলুম-৫, সংখ্যা-৪)

৪

অনেক খ্যাতনামা লেখকের পক্ষ থেকে গ্রন্থকারের বক্তব্য সমর্থন

ব্যাপারটা এ পর্যন্ত সর্বসম্মত ছিল যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে হয় অনুকম্পা ও অনুগ্রহ স্বরূপ মুক্তি দিতে হবে, নচেত মুক্তিপণ (নগদ অর্থের আকারে অথবা বন্দী বিনিময়ের আকারে) নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু যদি এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, অনুগ্রহ সরূপ ছেড়ে দেয়া অমঙ্গলজনক ও ক্ষতিকর সাব্যস্ত হয় এবং শত্রু পক্ষ পণ দিতেও রাজী নয়, তাহলে কি করা হবে, সেইটে নিয়েই গোল বেঁধেছে। তালীমাত গ্রন্থের লেখক বলেন যে, এ ক্ষেত্রে তারা

রাজকীয় বন্দী হবে এবং তাদের সাথে সেই ধরনের আচরণই করা হবে। কিন্তু আপনি বলেন যে, এমতাবস্থায় তাদেরকে গোলাম বানানো হবে। গ্রন্থকার আপনার এই বক্তব্যের স্বপক্ষে কুরআন থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ চেয়েছিলেন। কিন্তু আপনি জবাব দেয়ার সময় সে দিকে লক্ষ্য করেননি এবং যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলাম বানানোর বৈধতা কুরআন থেকে প্রমাণ করেননি। অবশ্য দু'টো যুক্তি আপনি দিয়েছেন। প্রথমত শত্রুরা যখন মুসলমান যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখবে, তখন মুসলমানরা তাদের বন্দীদেরকে গোলাম বানাবে না কেন? কথাটা তো মনে ধরার মত। কিন্তু দুশমন তোমাদের সাথে খারাপ আচরণ করলে তোমরাও তাদের সাথে অশোভন আচরণ কর এ কথা তো কুরআন বলে না। কুরআন তো মুসলমানদেরকে এর চেয়ে উচ্চতর মানে নিয়ে যেতে চায়। এর জবাব কি? মুসলমানদেরকে তো মুশরিকদের মাটির মূর্তিকে গালি দেয়ার অনুমতিও দেয়া হয়নি। আপনি নিজেই বলছেন যে, এই গোলামদের সাথে অত্যন্ত সদয় ও বিনম্র ব্যবহার করার হুকুম দেয়া হয়েছে। এ কথা আপনার নিজের নির্ধারিত মূলনীতির বিপরীত। কাফিররা মুসলিম কয়েদীদের সাথে চরম অমানুষিক আচরণ করবে। আর আমরা তাদেরকে আমাদের সমাজের সম্রান্ত লোকদের মধ্যে স্থান দেব, এটা কি করে সম্ভব? আপনার মূলনীতি যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে আপনি কি অনুমতি দেবেন যে, শত্রুরা যদি মুসলিম বন্দীদের সাথে কোন অশোভন আচরণ করে, তা হলে তার বদলায় মুসলমানরাও তাদের নারী বন্দীনীদের সাথে অনুরূপ আচরণ করতে পারবে? আপনার কথায় ইসলামের নীতি তো সম্পূর্ণরূপে তার নিজস্ব এবং দুনিয়ার অন্যান্য মানুষ যাই করুক, সে তার নিজস্ব নীতি অনুসারেই ফায়সালা করবে।

দ্বিতীয় যুক্তি সাহাবা ও আহলি বাইতের কর্মপদ্ধতি থেকে সংগৃহীত। আমার জন্য তো এ যুক্তি যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু আপত্তি উত্থাপনকারী যদি বলে যে, আপনি তো কুরআনের বাইরে যাবেন না বলে ওয়াদা করেছেন, তা হলে কুরআন থেকেই প্রমাণ দেন না কেন, তাহলে তার কথা কি অন্যায় হবে?

আপনি বলেছেন যে, সৌজন্যমূলকভাবে বন্দীমুক্তি মুসলমান-দের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কেননা সে ক্ষেত্রে এত বেকুফ কেউ ছিল না যে, নগদ পণ দিয়ে দেবে। কিন্তু আমি তো দেখতেই পাই যে, সৌজন্যমূলকভাবে মুক্তি দেয়াতে যে সুফল পাওয়া গেছে, নগদ পণের দিরহাম ও দিনারের সাথে তার তুলনা হয় না। এর ফলে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনোভাব পাল্টে গেছে। রসূল (সাঃ) হাজার হাজার যুদ্ধবন্দীদের পণ না নিয়েই ছেড়ে দিয়েছেন এবং এই মহানুভবতার কি সুফল পাওয়া গেছে, আকাশ ও পৃথিবী তার সাক্ষী। প্রশ্ন তো হলো গোলাম বানানো ও তাদের কেনা-বেচা সম্পর্কে। এ প্রশ্নে কুরআনের বিধান কি বলুন। আজ যদি কোন অমুসলিম জাতি মুক্তিপণ না দেয় এবং মুসলমানরা তাদের যুদ্ধবন্দীদেরকে মহানুভবতার নিদর্শন স্বরূপ মুক্তি দিতে চায়, তা হলে তাদের সাথে তারা কিরূপ আচরণ করবে। ما ملكت ايمانكم (করায়ত্ত লোকজন) ও যুদ্ধবন্দীদের প্রশ্ন বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ প্রশ্নের মীমাংসা অবশ্যই করবেন।

(তরজমানুল কুরআন, জিলহজ্জ ১৩৫৩ হিঃ)

৫

তরজমানুল কুরআনের চূড়ান্ত জবাব

যুদ্ধবন্দীদের গোলাম বানানোর বিপক্ষে গ্রন্থকারের সমগ্র যুক্তি-তর্কের ভিত্তি সূরা মুহাম্মাদের নিম্নোক্ত আয়াতের (৪নং আয়াত) ওপর প্রতিষ্ঠিতঃ

حَتّٰىٓ اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّاۢ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً (محمد:٤)

"যখন তোমরা তাদের (কাফিরদের) শক্তি চূর্ণ করে দেবে, তখন হয় অনুগ্রহপূর্বক নচেত মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দাও" [১]

---

১. উল্লেখ্য যে, এটা গ্রন্থকারের নিজস্ব অনুবাদ। এখানে "ছেড়ে দাও" শব্দটা তার নিজের সংযোজন। আয়াতে এ অর্থ বহন করে এমন কোন শব্দ নেই।

এ আয়াত থেকে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে কুরআন দুটো কর্মপন্থাই নির্দেশ করেছে। হয় কোন পণ ছাড়াই তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে, নচেত পণ নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু ছেড়ে যে দিতেই হবে, সেটা অপরিহার্য এবং অকাট্য নির্দেশ। গোলাম বানিয়ে রাখা কোন অবস্থায়ই জায়েয নয়।

এখন আমাদের এ আয়াতটির ওপর তিন দিক থেকে নজর দিতে হবেঃ

আয়াতের শাব্দিক অর্থ কি?

কুরআনের অন্যান্য আয়াতের আলোকে এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা কি?

রসূল (সাঃ) এ আয়াতের কি অর্থ উপলব্ধি করেছেন এবং কিভাবে তার বাস্তবায়ন করেছেন?

আয়াতের শাব্দিক মর্ম

আয়াতটিতে যে مَنًّا এবং فِدَاءً শব্দ দুটো রয়েছে, (যার অর্থ যথাক্রমে অনুগ্রহ ও মুক্তিপণ) এই উভয় শব্দের পূর্বে اِمَّا অব্যয়টি যুক্ত হয়েছে, যার অর্থ দাঁড়ায় দুটোর যে কোন একটির ক্ষমতা বা অনুমতি প্রদান। অর্থাৎ আয়াতের মর্ম দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়ঃ (১) চাই তোমরা অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, চাই মুক্তিপণ আদায় কর, দুটোই তোমাদের ইচ্ছাধীন অথবা (২) তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রদর্শন করারও অনুমতি রয়েছে, মুক্তিপণ আদায় করারও অনুমতি রয়েছে। এ থেকে কোনভাবেই এরূপ মর্ম উদ্ধার করার অবকাশ নেই যে, তোমরা এই দুই কর্ম পন্থার যে কোন একটি অবলম্বন করতে বাধ্য। অকাট্য ও বাধ্যতামূলক নির্দেশ শুধু এ পর্যন্তই ছিল যে,

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ-

অর্থাৎ যখন কাফিরদের সাথে তোমাদের সংঘর্ষ হয় তখন তাদেরকে হত্যা কর। যখন তাদেরকে হত্যা করতে করতে একেবারেই পর্যুদস্ত করে দেবে এবং তাদের মধ্যে আর যুদ্ধ করার ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকবে না, তখন অবশিষ্ট জীবিতদেরকে আটক কর। এ নির্দেশ দেয়ার পর এখন فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً বলে মুসলমানদেরকে অনুমতি দেয়া হচ্ছে যে, ইচ্ছা হলে বন্দীদের প্রতি অনুকম্পা দেখাতে পার, ইচ্ছা হলে মুক্তিপণও নিতে পার।

প্রথম শব্দ مَنًّا এর অর্থ অনুকম্পা, অনুগ্রহ বা মহানুভবতা প্রদর্শন। অনুগ্রহ প্রদর্শন করে ছেড়ে দেয়া" গ্রন্থকারের নিজস্ব সংযোজন। যদিও বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়াও অনুগ্রহের একটা রূপ। কিন্তু বন্দীদের সাথে বন্দী অবস্থায় ভালো ও সদয় ব্যবহার করাও যে অনুগ্রহের একটা রূপ সে কথাও তো অস্বীকার করার মত নয়। অনুগ্রহের এ রূপটাকে অস্বীকার করা এবং শুধুমাত্র মুক্তির মধ্যেই অনুগ্রহ ও অনুকম্পাকে সীমিত রাখা কুরআনের কোন আয়াত দ্বারা সমর্থিত? কুরআনে এমন কোন শব্দ বা ইংগিত যদি থেকে থাকে, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, অনুগ্রহ বা অনুকম্পা দ্বারা কেবল মুক্তি দেয়াই বুঝায়, তাহলে অনুগ্রহ করে সেটা বর্ণনা করা হোক।

কুরআনের অন্যান্য আয়াত

এবার অনুসন্ধান করুন যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণ ছাড়া অথবা মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দেয়া ছাড়া তৃতীয় কোন পন্থায় অনুগ্রহ করা বৈধ নয় এবং তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখা হারাম, এমন বিধি সম্বলিত আয়াত কুরআনের কোথায় আছে? এমন কোন আয়াত দেখানো নিশ্চিতভাবেই অসম্ভব। বরঞ্চ দাস-দাসীদের সম্পর্কে কুরআনে বহু নির্দেশ রয়েছে এবং সেগুলো সূরা মুহাম্মাদের উপরোক্ত আয়াতের পরে নাযিল হয়েছে। ঐ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেকার নির্দেশাবলী সম্পর্কে আপনি বলতে পারেন যে, তখনও পর্যন্ত তো বন্দীদেরকে মুক্তি দেয়ার সুনির্দিষ্ট ও অকাট্য কোন হুকুম আসেনি, তাই তখন দাস-দাসী রাখা বৈধ ছিল এবং

তাদের সম্পর্কে নির্দেশাবলীও এসেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ের আয়াতগুলো সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? সূরা মুহাম্মাদের এ আয়াতটির যে মর্ম আপনি গ্রহণ করছেন, সে অনুসারে তো এ আয়াত নাযিল হওয়া মাত্রই সমস্ত দাস-দাসীর মুক্ত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরবর্তী আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, তারা মুক্ত হয়নি এবং তাদের সম্পর্কে আগের মতই নির্দেশাবলী আসা অব্যাহত থেকেছে।

আলোচ্য আয়াতটি সূরা মুহাম্মাদের। এ সূরার কিছু অংশ মক্কার এবং কিছু অংশ মদীনার প্রাথমিক আমলে নাযিল হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন যে, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا (যখন তোমরা কাফিরদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে) এ উক্তি দ্বারা বদরযুদ্ধের দিনে সংঘটিত কাফিরদের সাথে সংঘর্ষকে বুঝানো হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল যে, এ আয়াত বদর যুদ্ধের আগে নাযিল হয়েছিল। সূরা আন-ফালের ৬৭·নং আয়াতের নিম্মোক্ত অংশ দ্বারা উক্ত বক্তব্যের সমর্থন মেলেঃ

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ (الى آخر الآية - انفال:٦٧)

"পৃথিবীতে কাফিরদেরকে পুরোপুরি পর্যুদস্থ না করা পর্যন্ত বন্দী পোষণ করা কোন নবীর পক্ষে সমিচিন নয়।......"

এ আয়াত বদর যুদ্ধের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে নাযিল হয়। এ থেকে সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে যে, সূরা মুহাম্মাদের আয়াতে বন্দী আটক করার আগে শত্রুকে চূড়ান্তভাবে জব্দ করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তা পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত না করার কারণে এ আয়াতে ভৎসনা করা হয়েছে। অতএব, সুনির্দিষ্টভাবে বুঝা গেল যে, সূরা মুহাম্মাদের এ আয়াত বদর যুদ্ধের আগে অবতীর্ণ।

এবার লক্ষ্য করুন যে, যুদ্ধে গ্রেফতার হয়ে আসা মেয়েদেরকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বৈধ করা হয়েছেঃ

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ
وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ (احزاب : ٥٠)

"হে রসূল! তোমার যে স্ত্রীদেরকে মোহ্‌রানা দিয়েছ তাদেরকে এবং আল্লাহ যুদ্ধলব্ধ হিসেবে যে সব দাসীকে তোমার করায়ত্ত করে দিয়েছেন তাদেরকে তোমার জন্য বৈধ করে দিয়েছি।" (আহযাব-৫০)

এ আয়াতে مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (যারা তোমার করতলগত হয়েছে) কথাটা দ্বারা দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং দাসীদের সংঘা দিয়েছেন مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ (আল্লাহ যাদেরকে যুদ্ধে পাওয়া গণিমত হিসেবে দিয়েছেন) বলে। এটা সবার জানা যে, বদর যুদ্ধের আগে আল্লাহ রসূল (সঃ)কে কোন গণিমত দেননি। সুতরাং বদরের পরের লড়াইগুলোতে যে-সব নারী মুসলমানদের কাছে বন্দিনী হয়ে এসেছে, কুরআন তাদেরকেই দাসী হিসেবে রাখার অনুমতি দিয়েছে। এর পর পুনরায় বলা হয়েছেঃ

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (احزاب : ٥٢)

"এর পর তোমার জন্য আর কোন স্ত্রী গ্রহণ করা বৈধ নয় এবং তাদের বদলে অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করাও বৈধ নয়, তা তাদের সৌন্দর্যে তুমি যতই মুগ্ধ হও না কেন। তবে দাসী গ্রহণ করা বৈধ।" (আহযাব-৫৩)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীর সংখ্যা এগারোতে উপনীত হলে এ আয়াত নাযিল হয়। হযরতের (সাঃ) শেষ বিয়ে ৭ম হিজরীতে হযরত মায়মুনার সাথে হয়। সুতরাং এ আয়াতের নাযিলের সময় ৮ম হিজরী ধরে নিতে হবে। এখানে পুনরায় দাসী গ্রহণকে বৈধ করা হয়েছে।

৮ম হিজরীর শেষের দিকে আওতাস যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বহু মহিলা যুদ্ধবন্দী হয়ে আসে। তাদের মধ্যে অনেক

বিবাহিতা মহিলাও ছিল। মুসলমানরা তাদের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হলো। এই দ্বিধা নিরসন করে আয়াত নাযিল হলোঃ

وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء:٢٤)

"তোমাদের জন্য অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীরা হারাম। তবে যুদ্ধবন্দিনী হয়ে আসা স্ত্রীরা এর ব্যতিক্রম " (নিসা–২৪)।

সূরা নিসার প্রথম রুকূতে এরশাদ করা হয়েছেঃ

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء:٣)

"যদি তোমরা আশংকা বোধ কর যে, এতিমদের প্রতি সুবিচার করতে সমর্থ হবে না, তা হলে পছন্দসই মেয়েদের মধ্য থেকে দুটো করে, তিনটি করে বা চারটি করে বিয়ে কর। আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না তা হলে একটাই বিয়ে কর অথবা হাতে যে দাসী আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাক " (নিসা–৩)।

এ নির্দেশ নিসন্দেহে ওহুদ যুদ্ধের পরবর্তী সময়কার। এসব নির্দেশ থেকে বুঝা যায় যে, যুদ্ধবন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন অথবা মুক্তিপণ গ্রহণ করে মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে সূরা মুহাম্মাদের ৪নং আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে, তার মর্ম কিন্তু গ্রন্থকার যা বুঝেছেন তা নয়। নইলে এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর দাস–দাসী রাখা একেবারেই নিষিদ্ধ হয়ে যেত এবং তাদের সম্পর্কে এত সব বিধি জারি করার প্রয়োজন হতো না।

একটা সুক্ষ্ম তত্ত্ব

এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার একটা সুক্ষ্ম তত্ত্বও বর্ণনা করেছেন। সেটি এই যে, "কুরআনে যেখানে যেখানে দাস–দাসীর উল্লেখ রয়েছে, সেখানে কথাটা অতীতকাল বোধক ক্রিয়া পদ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে, ভবিষ্যত কাল বোধক ক্রিয়া দ্বারা কোথাও উল্লেখ করা

হয়নি। যেমন مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (যারা তোমাদের হস্তগত হয়েছে।) এ থেকে বুঝা যায় যে, যে সব দাস-দাসীর মালিকানা তারা অতীতে লাভ করেছেন, কেবল তাদের ওপরই মালিকানা বহাল থাকবে।" অর্থাৎ কিনা কুরআনে যে সব আইন-বিধি অতীত কাল বাচক ক্রিয়া দ্বারা বর্ণিত হয়েছে তা ভবিষ্যতের জন্য নয়। উদাহরণ স্বরূপ, যে আয়াতে সৎ পিতাদের জন্য সৎ মেয়েদেরকে হারাম করা হয়েছে, তার শব্দ বিন্যাস এ রকমঃ

وَرَبَائِبُكُمُ الّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ (النساء:٢٣)

"তোমাদের যে স্ত্রীদের সাথে তোমরা সহবাস করেছ, তাদের কোলের পালিত কন্যারাও তোমাদের জন্য হারাম" (নিসা-২৩)। এ

আয়াতটি دَخَلْتُم (সহবাস করেছ) একটা অতীত ক্রিয়াবাদ। সুতরাং গ্রন্থকারের মতানুসারে শুধুমাত্র এ আয়াত নাযিলের আগে বিয়ে করা স্ত্রীদের মেয়েরাই হারাম ছিল। ভবিষ্যতে যাদেরকে বিয়ে করা হবে তাদের মেয়েরা হারাম হবে না। অনুরূপভাবে-

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ (انفال:٤١) (জেনে রাখ, তোমরা যুদ্ধে যে সম্পদ গণিমত হিসেবে পেয়েছ তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর।) এ আয়াতেও এক পঞ্চমাংশ সংক্রান্ত নির্দেশ কেবল অতীতের জন্য হবে। ভবিষ্যতের কোন গণিমতে এক পঞ্চমাংশ ধার্য হবে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ (سورة جمعه:٩)

"যারা ঈমান এনেছ তারা শোন, যখন জুময়ার দিন নামাযের ডাক দেয়া হয়,তৎক্ষণাত ছুটে যাও.... (জুময়া-৯)।

এ আয়াতে জুময়ার নামাযের হুকুমও কেবল তাদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে, যারা এ আয়াত নাযিলের সময় ঈমান এনে ফেলেছিল।

পরবর্তীকালের মুসলমানরা এ হুকুম থেকে বেঁচে গেল। মোট কথা, জনাব মাওলানা সাহেব এমন এক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, যা আজ পর্যন্ত আর কারো মাথায় আসেনি। অন্যথায় যে সব নির্দেশ অতীত কাল বোধক ক্রিয়াপদ দ্বারা জারি করা হয়েছে এবং যাতে (সম্ভবত নাউজুবিল্লাহ অসাবধানতা বশত) আল্লাহ ভবিষ্যত কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেননি, সে সব নির্দেশ থেকে মুসলমানরা এত দিন মুক্ত হয়ে যেত। সত্য বলতে কি, এভাবে তো কাফিররা এবং আল্লাহর ওহীর বাণী প্রত্যাখ্যানকারীরাও দোজখের আগুন থেকে রেহাই পেয়ে যেত। কেননা–

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ (যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা দোজখবাসী) এ আয়াতে যে দুটো অপরাধের জন্য দোজখের শাস্তি ঘোষিত হয়েছে তা অতীত কাল বাচক ক্রিয়া পদ দ্বারা বর্ণিত। কাজেই পরবর্তীকালের তাবত কাফির ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী এই কঠোর শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে গেল! এ ধরনের উদ্ভট তত্ত্ব আবিষ্কারের বাতিক আসলে কুরআনের বিকৃতি ঘটানোর পর্যায়ভুক্ত। কুরআনের বক্তব্যকে এভাবে বিকৃত করতে গিয়ে যে কোন মুসলমানের ঈমানী চেতনা শিউরে ওঠার কথা।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের বাস্তব কর্মনীতি

এবার আমাদের দেখতে হবে যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً এবং مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ এর তাৎপর্য কি বুঝেছিলেন এবং কিভাবে তা বাস্তবায়িত করেছিলেন।

বনু কুরায়যা সম্পর্কে হযরত সাদ' বিন মায়ায (বিচারক নিযুক্ত হয়ে) রায় দিলেন যে, তাদের সকল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষকে হত্যা করা এবং শিশু ও নারীদেরকে গোলাম বানানো হোক। রসূল সাল্লাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই রায় কার্যকর করেন।

খয়বরের যুদ্ধে বহু সংখ্যক মহিলা বন্দিনী হয়ে আসে এবং তাদেরকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া (রাঃ) তাদেরই একজন ছিলেন।

হুনায়ের যুদ্ধে ৬ হাজার শিশু ও নারী বন্দী হয়। পরে হাওয়াযেন গোত্রের প্রতিনিধি দল এসে তাদের মুক্তির আবেদন জানায়। রসূল (সাঃ) বলেনঃ যারা আমার ও বনু আবদুল মুত্তালিব গোত্রের দখলে রয়েছে তাদেরকে আমি অনুগ্রহ স্বরূপ ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু অন্যদের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়ার আমার অধিকার নেই। কেবল অনুরোধ করতে পারি। পরে তাঁর অনুরোধে আনসার ও মুহাজিরগণ নিজ নিজ মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদেরকে মুক্ত করে দেন। কিন্তু বনু তামীম, বনু ফাযারা ও বনু সুলায়িম গোত্রের প্রতিনিধিরা অসম্মতি জানায়। রসূল (সাঃ) তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, পরবর্তী যুদ্ধে যেসব বন্দী হাতে আসবে, তা থেকে তোমাদেরকে একটার বদলে ছয়টা করে দেব। তখন তারা বন্দীদেরকে মুক্তি দিতে রাজী হয়। আওতাসের বন্দীদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে সূরা নিসার ২৪ নং আয়াত وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ নাযিল হয়।

এ কথা ঠিক যে, রসূল (সাঃ) কোন কোন সময় মহানুভবতার বশে বন্দীদেরকে মুক্তিও দিয়েছেন। কখনো বন্দী বিনিময়ও করেছেন, আবার কখনো পণ্য নিয়েও মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁর আমলে বহু বন্দীকে গোলাম বানিয়েও রাখা হয়েছে এবং তাদেরকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। প্রশ্ন এই যে, কুরআনের নির্দেশাবলীকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চেয়ে বেশী বুঝা এবং তা বাস্তবায়ন করা আর কারো পক্ষে সম্ভব কি? কেউ যদি নিজেকে সে রকম মনে করে তবে তা করুক। তার ব্যাপার আমরা আল্লাহর ওপর সোপর্দ করছি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস তা নয়। আল্লাহর রসূল নিজের কথা ও কাজ দ্বারা যে আইন বানিয়ে দিয়ে গেছেন, মুসলমানরা তাকেই সত্য ও সঠিক মনে করে।

(তরজমানুল কুরআন, জিলহজ্জ, ১৩৫৩ হিঃ মে, ১৯৩৪)

গোলাম-বাঁদী সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন

(ইসলামের যে কয়টি আইনগত বিধি সম্পর্কে বর্তমান যুগের মানুষের মনে সবচেয়ে বেশী সন্দেহ-সংশয় জাগে, তার মধ্যে গোলামীর বিধি অন্যতম। এ ব্যাপারে একাধিকবার আমার কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকবার তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমে তার বিস্তারিত জবাব দেয়া হয়েছে। নিম্নে সেই সব প্রশ্ন ও উত্তর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।)

১

১। প্রশ্নঃ সূরা মুমিনূনের ৬নং আয়াত اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ (المؤمنون:٦) "কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা দাসীদের সাথে (যৌন সঙ্গম করলে দোষ নেই) দ্বারা অধিকাংশ আলিম দাসীদের সাথে বিনা বিয়েতে সহবাস করার বৈধতা প্রমাণ করেন। এ ব্যাপারে নিম্নের প্রশ্নগুলো জাগে। এর জবাব কি?

(ক) দাসীদের সাথে বিয়ে ছাড়া কাম চরিতার্থ করা নিছক প্রকৃতির লালসা মেটানো ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলাম একে সমর্থন করে না। সূরা নিসার ২৪ নং আয়াতের (مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ 'বিয়ের মাধ্যমে সৎভাবে ভোগ কর- ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়' এ উক্তি থেকে বুঝা যায়, এ কাজ ইসলাম সম্মত নয়।

(খ) যদি শুধু মালিকানা স্বত্বের ভিত্তিতে মনিবের সংগমের অধিকার স্বীকৃত হয়, তা হলে একজন অবিবাহিত মহিলারও নিজের পুরুষ গোলামকে উপভোগ করার অধিকার থাকা উচিত। এ ক্ষেত্রে মিশ্র প্রজনন রোধ করার জন্য সে গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

(গ) যুদ্ধরত অমুসলিম জাতিগুলো যদি মুসলিম যুদ্ধবন্দিনী-দের সাথে এই আচরণ করে তা হলে যুক্তির বিচারে

তার বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিবাদ করার কি অধিকার আছে?

(ঘ) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র ও নির্মল জীবন বিশেষত যৌবনকালের নিষ্কলুষ আচরণ পারিবারিক জীবনের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। তা সত্ত্বেও শেষ জীবনে একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তিনিও দাসীদেরকে উপভোগ করেছেন, এ কথা কতদূর সত্য?

(ঙ) মালিকানা স্বত্বের ভিত্তিতেই যদি যৌন সঙ্গমের অধিকার লাভ করা যায় তা হলে সূরা নিসার ২৪ নং আয়াতের فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ "দাসীদেরকে তাদের মনিবদের অনুমতি সাপেক্ষে বিয়ে কর" এ উক্তি অনুসারে যখন কোন দাসীকে কোন ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেয়া হবে, তখন কি একই সাথে দুই ব্যক্তি স্বামী ও মনিব ঐ দাসীর সাথে সহবাস করার অধিকারী হবে? স্বামীর অধিকার বৈবাহিক সূত্রে এবং মনিবের অধিকার মালিকানা সূত্রে। যদি না হয় তবে কেন?

জবাবঃ এ প্রশ্নগুলোর জবাবে সর্ব প্রথম এ কথাটা জানা দরকার যে, মালিকানা সত্ত্বের ভিত্তিতে দাসীদেরকে উপভোগ করার অনুমতি কুরআনের একাধিক আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দেয়া হয়েছে। অনেকে এটাকে নিছক "মৌলবীদের" মনগড়া ব্যাপার মনে করে খুবই ধৃষ্টতার সাথে আপত্তি তুলে থাকে। হাদীস বিরোধীদের কেউ কেউ এটাকে স্বকল্পিত "হাদীসের বানোয়াট তথ্য" দরে নিয়ে আবোল তাবোল বলতে আরম্ভ করে। এ ধরনের সকলের অবগতির জন্য বলছি যে, এ জিনিসটা "মৌলবীদের" ফিকাহ এবং হাদীস বিশারদদের রেওয়ায়েতের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সরাসরি আল্লাহর কিতাবে সন্নিবেশিত। এ জন্য নিম্নলিখিত আয়াতগুলো প্রণিধানযোগ্যঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ (النساء)

"যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, একাধিক স্ত্রীর প্রতি ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তা হলে একজন স্ত্রীই রাখ অথবা তোমাদের দখলে যে দাসী আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাক।" (নিসা–৩)।

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ (النساء-٢٤)

"আর বিবাহিত মেয়েদেরকেও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। কেবল (যুদ্ধের মাধ্যমে) তোমাদের দখলে আসা নারীরা ছাড়া" (নিসা–২৪)।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ

مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ (المؤمنون-٥،٦)

"আর যারা আপন লজ্জাস্থানগুলোকে সংযত রাখে কেবল নিজেদের স্ত্রীদের এবং মালিকানাভুক্ত নারীদের সাথে ছাড়া (অর্থাৎ দাসীদের সাথে)। কেননা এ ক্ষেত্রে তারা তিরস্কারযোগ্য নয়।" (মুমিনুন–৫,৬)

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا

مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ (الاحزاب: ٥٠)

"হে নবী! আমি তোমার জন্য তোমার সেই সব স্ত্রীকে হালাল করেছি যাদেরকে তুমি মোহরানা দিয়েছ এবং তোমার অধিকারভুক্ত সেই সব নারীকেও হালাল করেছি যাদেরকে আল্লাহ গণিমতলব্ধ দাসী হিসেবে তোমাকে দিয়েছেন"

পরবর্তী আর এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ

اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ - (احزاب-٥٢)

"এখন আর তোমার জন্য নতুন কোন স্ত্রী গ্রহণ করা বৈধ নয়, আর বর্তমান স্ত্রীদের বদলে নতুন স্ত্রী গ্রহণ করাও বৈধ নয়–চাই তাদের সৌন্দর্য তোমার কাছে যতই ভালো লাগুক। তবে তোমার অধিকার ভুক্ত দাসীরা বৈধ।" (আহযাব–৫২)

এ আয়াতগুলো থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের আলোকে মালিকানা সত্বের ভিত্তিতে নারীকে উপভোগ করা জায়েয। এখন এই অনুমতি কি পরিস্থিতিতে দেয়া হয়েছে, কি উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে এবং এ অনুমতির সুযোগ গ্রহণের কি কি পদ্ধতি শরীয়ত কর্তৃক বিধিবদ্ধ হয়েছে, সেটাই অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।

যুদ্ধবন্দী দাস–দাসীদের ব্যাপারে ইসলাম যে বিধান দিয়েছে, তা বুঝতে এ যুগের মানুষ যে জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে, তার কারণ এই যে, যে পরিস্থিতির জন্য এ আইন তৈরী হয়েছিল, সে পরিস্থিতি এখন নেই। অথচ আদিম কাল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস–দাসী বানিয়ে রাখার প্রথা সারা দুনিয়ায় প্রচলিত ছিল। এ সব দাস দাসীর কেনা–বেচাও চলতো। যুদ্ধরত সরকারগুলোর মধ্যে সন্ধির পর পরস্পরে যুদ্ধবন্দী বিনিময় অথবা মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করার ঘটনা তখনকার দিনে খুব কমই ঘটতো। যে দেশের সেনাবাহিনী বন্দীদের গ্রেফতার করে নিয়ে যেত, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বন্দীরা তাদের দখলেই থাকতো। এভাবে এক এক দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ গ্রেফতার হয়ে অন্য দেশে চলে যেত। কোন দেশের সরকারের পক্ষেই এত বিপুল সংখ্যক বন্দীকে আটক রেখে তার খোরপোশ বহন করা সম্ভব ছিল না। এ জন্য সরকারগুলো প্রয়োজনীয় সংখ্যক বন্দী নিজ দখলে রেখে বাদবাকী বন্দীদেরকে সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিত এবং তারা তাদের কাছে গোলাম–বাদী হয়ে থাকতো।

ইসলামের অভ্যুদয়কালেও এই পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। ইসলাম এ পরিস্থিতিতে দুনিয়ার সামনে এক সংস্কারমূলক নীতি উপস্থাপন করলো। সে বললোঃ যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও, যুদ্ধবন্দীদের সাথে বিনিময় কর অথবা অনুকম্পা প্রদর্শন করে এমনিতে মুক্তি দাও। কিন্তু এই সংস্কারমূলক নীতি কেবল মুসলমানদের একতরফা পদক্ষেপে কার্যকর হতে পারে না। এ জন্য যে সব অমুসলিম জাতির সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ চলতো, তাদের সম্মতিও প্রয়োজন ছিল। অথচ অমুসলিম জাতিগুলো এই সংস্কার

মেনে নিতে তখনও প্রস্তুত ছিল না, তার পরে ১২ শতাব্দী পর্যন্তও প্রস্তুত হয়নি। এ জন্য ইসলাম সর্বশেষ পন্থা হিসেবে অনুমতি দিয়েছে যে, অন্যান্য জাতি যেমন মুসলিম যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখে, মুসলমানরাও শত্রুপক্ষের যুদ্ধবন্দীদেরকে সেইভাবে গোলাম বানিয়ে রাখতে পারে।

কিন্তু এই অনুমতির ফলে মুসলামানদের সমাজ–কাঠামোতে একটা অবদমিত নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটার আশংকা ছিল, ঠিক যেমন ভিন্ন জাতিকে পরাভূতকারী প্রত্যেক জাতির সমাজ কাঠামোতে তা ঘটেছিল। যুদ্ধবন্দীদেরকে এভাবে মানবেতর শ্রেণীতে পর্যবসিত করা যে একটা অমানবিক কাজ, সে কথা বাদ দিলেও যে কোন সমাজ ব্যবস্থায় এ ধরনের একটা মানবেতর শ্রেণী সৃষ্টির অনিবার্য পরিণতি হিসেবে যে সব সাংস্কৃতিক ও নৈতিক বিকৃতি ও অনাচার দেখা দিয়ে থাকে, মুসলিম সমাজেও তা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা ছিল। এ জন্য ইসলাম অনিবার্য অবস্থার তাগিদে যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখার অনুমতি দিয়েছে বটে। তবে সেই সাথে গোলামীর অবস্থায়ও তাদের সাথে যতদূর সম্ভব ভালো ব্যবহার করা এবং তাদের ক্রমান্বয়ে মুসলিম সমাজে মিলে–মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে আইনও তৈরী করেছে।

দাসীদেরকে উপভোগ করার যে অনুমতি দেয়া হয়েছে সেটা এ উদ্দেশ্যেই। কিছুক্ষণের জন্য কল্পনার চক্ষুকে এখন থেকে কয়েক শো'বছর পূর্বের দিকে প্রসারিত করুন। ধরে নিন, একটি অমুসলিম জাতির সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এতে হাজার হাজার নারী বন্দিনী হয়ে তাদের হাতে এলো। তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক সুন্দরী যুবতী রমণীও রয়েছে। শত্রুপক্ষ মুক্তিপন দিয়েও তাদেরকে মুক্ত করছে না। তাদের হাতে যে মুসলিম বন্দিনীরা রয়েছে তাদের দ্বারা তাদের বিনিময়ও করছে না। মুসলমানরা ঐ নারীদেরকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেও ছাড়াতে পারে না। কেননা এতে করে তাদের নিজেদের নারীদের মুক্তির আশা করা যায় না। অগত্যা তারা তাদেরকে নিজ দখলে রেখে দিল। এখন বলুন, মুসলিম দেশে

আসা এত বিপুল সংখ্যক নারীকে কি করা যায়। তাদেরকে চিরতরে আটক রাখাও জুলুম। আবার দেশের ভেতরে তাদেরকে মুক্ত ছেড়ে দেয়া অনাচার ও ব্যভিচারের জীবাণু ছড়িয়ে দেয়ার শামিল। তাদেরকে যেখানে যেখানে রাখা হবে তাদেরকে কেন্দ্র করে নৈতিক অনাচার ছড়াবে। এক দিকে সমাজ নষ্ট হবে। অপর দিকে এই নারীদের ললাটে লেগে যাবে চির দিনের জন্য অবমাননার দুরপণেয় কলংক। ইসলাম এ সমস্যার এভাবে সমাধান করে যে, তাদেরকে সমাজের লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেয় এবং লোকদেরকে নির্দেশ দেয় যে, সাবধান, এদেরকে গণিকা বানিয়ে ব্যাভিচারে লিপ্ত করো না এবং আয়-উপার্জনের উপকরণ বানিও না। বরঞ্চ হয় তাদেরকে নিজেদের ব্যবহারে লাগাও নচেত তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দাও, যাতে তারা যত্রতত্র ব্যভিচার ও প্রণয় করে না বেড়ায়। এ আইনের বিভিন্ন ধারা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। [১] সূরা নূরের চতুর্থ রুকূতে আছে।

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ (النور: ٣٣)

"তোমাদের যেসব দাসী পবিত্র জীবন যাপন করতে আগ্রহী, পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের খাতিরে তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। [২] (সূরা নূর-৩৩)

---

১. এখানে মনে রাখতে হবে যে, যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে কোন নারীর কারো ভোগ-দখলে আসার শর্ত এই যে, সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ও বিধিসম্মতভাবে তাকে কোন ব্যক্তির মালিকানায় সোপর্দ করা চাই। এর পর একমাত্র ঐ ব্যক্তিই তার সাথে সহবাস করার অধিকার লাভ করবে, অন্য কেউ নয়। এভাবে সরকারী ব্যবস্থাধীন বিলি-বন্টন হওয়ার আগে কোন বন্দিনীকে উপভোগ করা ব্যভিচারের শামিল। অনুরূপভাবে বন্টনের পর একমাত্র মালিক ব্যতীত অন্য কারোর পক্ষে এ কাজ করা ব্যভিচার হবে। আর ব্যভিচার যে ইসলামে একটা অপরাধ তা সবার জানা আছে।

২. জাহেলী যুগে আরবে অনেকেই দাসীদের দিয়ে রীতিমত গণিকালয়

এটা হলো ঐ আইনের প্রথম ধারা। এ ধারা দাসীদেরকে একটা খারাপ কাজে নিয়োগের পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

তবে এ ধারাটা যারা পবিত্র জীবন যাপনে আগ্রহী তাদের জন্য। কিন্তু যারা স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার মনোভাব পোষণ করে তাদের সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেঃ

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (النساء: ٢٥)

"তারা যদি কোন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, তা হলে অভিজাত নারীদের ক্ষেত্রে যে শাস্তি প্রযোজ্য তার অর্ধেক তাদেরকে দেয়া হবে।" (নিসা–২৫)

এভাবে দাসীদের ব্যভিচারের পথ তো রুদ্ধ করা হলো –চাই তা বাধ্যতামূলক হোক অথবা স্বেচ্ছা প্রনোদিত। কিন্তু তাদেরও যে প্রবৃত্তি রয়েছে এবং স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করার সুযোগ দেয়া জরুরী। নচেত জুলুম হবে এবং নৈতিক অনাচারের প্রসার গোপন পথে হবে। এ জন্য তাদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার দুটো সম্মানজনক উপায় নির্দেশ করা হয়।

১. একটি উপায় এই যে, মনিব তাদেরকে বিয়ে দেবে।

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (النور: ٣٢)

"তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদেরকে বিয়ে দাও। আর তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা সৎ লোক তাদেরকেও বিয়ে দাও।" (সূরা নূর–৩২)

অনুরূপভাবে যে সব দরিদ্র লোক মোটা দাগের মোহরানা দিয়ে অভিজাত পরিবারে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে না, তাদেরকে

খুলে দিয়েছিল। তারা তাদের উপার্জিত অর্থ ভোগ করতো এবং তাদের অবৈধ সন্তানকে লালন পালন করে নিজেদের চাকর বাকরের সংখ্যা বাড়াতো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিযরত করে মদীনায় যান, তখন সেখানে মুনাফিক সরদার নামে খ্যাত আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের একটা বেশ্যালয় ছিল। সেখানে ছয়জন দাসীকে সে এই পেশায় নিয়োজিত রেখেছিল। আলোচ্য আয়াতে এই কাজটি নিষিদ্ধ হয়েছে।

উৎসাহিত করা হয়েছে যে, অল্প স্বল্প মোহরানা দিয়ে দাসীদেরকে বিয়ে করে নাও।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ
مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ - (النساء-٢٥)

"তোমাদের মধ্যে যারা অভিজাত পরিবারের ঈমানদার নারীদেরকে বিয়ে করতে অক্ষম তারা তোমাদের ঈমানদার দাসীদেরকে বিয়ে করুক।"

দাসীকে যখন মনিব অন্য কারো সাথে বিয়ে দেয় তখন সেই মনিবের আর ঐ দাসীর সাথে সঙ্গম করার অধিকার থাকে না। কেননা সে স্বেচ্ছায় তার এই অধিকার মোহরানার বিনিময়ে অন্য ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করেছে। এ কারণে এ ধরনের দাসীও সতী নারী পদবাচ্য। কুরআন স্বামী ব্যতীত আর সবার জন্য এদেরকে নিষিদ্ধ করেছে। উপরোক্ত আয়াতের পরবর্তী অংশে এ বিধি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ
غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ
بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ (النساء)

"অতএব তাদের মনিবদের অনুমতি স্বাপেক্ষে তাদেরকে (দাসীদেরকে) বিয়ে কর এবং রীতি অনুসারে তাদের মোহরানা দাও। এভাবে তাদেরকে বিয়ে দিয়ে গোপন ও প্রকাশ্য ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়। অতপর যখন তাদের বিয়ে দেয়া হবে, তার পর যদি তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে অভিজাত নারীদের তুলনায় তাদেরকে অর্ধেক শাস্তি দিতে হবে।" (নিসা–২৫)

২. দ্বিতীয় উপায়টা হলো, মনিব নিজেই তাদেরকে ভোগ করবে। এর তিনটে পন্থা বাতলানো হয়েছে। একটি হলো, মালিকানা স্বত্বকেই বৈবাহিক চুক্তি ধরে নিয়ে তাকে ভোগ করা যাবে। দ্বিতীয়টি হলো, মনিব দাসীকে মুক্ত করে তাকে বিয়ে করবে।

এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতাই তার মোহরানারূপে গণ্য হবে। তৃতীয় পন্থা হলো, তাকে স্বাধীন করার পর সম্পূর্ণ নতুন মোহরানায় তাকে আবার বিয়ে করা হবে। রসূল (সাঃ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এর ফযিলত সম্পর্কে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছেঃ

أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ

"যে ব্যক্তির কাছে কোন দাসী থাকে, সে তাকে ভালো শিক্ষা দেয়, ভালো চালচলন শিখায়, অতপর তাকে স্বাধীন করে দেয় এবং তারপর নিজেই তাকে বিয়ে করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে।" (বুখারী, বিয়ে সংক্রান্ত অধ্যায়)।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ عتقها ثم اصدقها। অর্থাৎ তাকে স্বাধীন করে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করে। আবূ দাউদ তায়ালিসী অন্য একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। এতে রসূল (সাঃ) বলেনঃ

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ أَمْهَرَهَا مَهْرًا جَدِيدًا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ۔

"যখন কোন ব্যক্তি তার দাসীকে মুক্ত করে, অতপর তাকে নতুন মোহরানা দিয়ে বিয়ে করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে।"

স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সফিয়া ও হযরত জুয়াইরিয়াকে এভাবেই বিয়ে করেন। প্রথমে তাদেরকে স্বাধীন করেন। তারপর তাদেরকে বিয়ে করেন। তিনি পৃথকভাবে মোহরানা দিয়েছিলেন, না স্বাধীনতাকেই মোহরানারূপে গণ্য করেছিলেন, সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মত এই যে, তিনি দুটো পদ্ধতিকেই জায়েয বলে প্রমাণ করার জন্য উভয় পদ্ধতিতেই কাজ করেছেন। একজনকে নতুন মোহরানা দিয়েছেন আর একজনের বেলায় স্বাধীনতাকেই মোহরানারূপে গণ্য করেছেন। [১]

১. রসূল (সাঃ) কর্তৃক জীবনের শেষাংশে দাসীদেরকে বিয়ে করে স্ত্রীর

এখন প্রথম পন্থাটা অর্থাৎ মালিকানার সুবাদে ভোগ করার অধিকার প্রসঙ্গে আসা যাক। আসলে এটাও বৈধ । কেননা কুরআনে মালিকানার ভিত্তিতে সহবাসের সুস্পষ্ট অনুমতি দেয়া হয়েছে। এতে সে কোন শর্ত বা বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি। এটা বাহ্যত যেটুকু দৃষ্টিকটু লাগে, সেটা কেবল কাল্পনিক খুতখুতেপনা। যেহেতু বিয়ের প্রচলিত ও প্রথাসিদ্ধ নিয়মই দেখতে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাই তারা মনে করে যে, নারী ও পুরুষের সেই সম্পর্কটাই কেবল বৈধ, যাতে কাজী সাহেব আসেন, দু'জন সাক্ষী থাকে, ইজাব কবুল হয় এবং বিয়ের খুতবা পড়ানো হয়। এ ছাড়া অন্য যে সব পদ্ধতি রয়েছে, তা কেবল যৌনতা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম কোন গতানুগতিক (Conventional) ধর্ম নয় বরং একটা যুক্তিসিদ্ধ (Rational) ধর্ম। রীতি-প্রথা নয় বরং বাস্তবতাই তার কাছে বিবেচ্য। বিয়ের মাধ্যমে যে একটা মেয়ে একটা পুরুষের জন্য বৈধ হয়, সেটা আল্লাহর আইন বৈধ করেছে বলেই। একইভাবে যদি আল্লাহর আইন একটি মেয়েকে মালিকানা অধিকারের ভিত্তিতে বৈধ করে তা হলে তাতে খারাপ মনে করার কি আছে? বিয়ের উদ্দেশ্য হলো, মানুষের যৌন আবেগ চরিতার্থ করাকে একটা নির্দিষ্ট গন্ডীতে সীমাবদ্ধ করা, একটা নিয়ম-বিধির আওতায় শৃংখলাবদ্ধ করা এবং নারী পুরুষের সম্পর্ককে একটা নিয়মতান্ত্রিক সামাজিক বন্ধনের আকারে প্রতিষ্ঠিত করা। এ জন্যই ব্যপক প্রচারের শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যাতে সমাজে জানাজানি হয়ে যায় যে, অমুক

মর্যাদা দেয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী সমাজে দাসীদেরকে সম্মানজনক স্থান দেয়াই তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নিজের বাস্তব কাজ দ্বারা মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে, মানবজাতির এই ভাগ্য বিড়ম্বিত শ্রেণীটির সাথে মুসলমানদের কি রকম আচরণ করা উচিত। কিন্তু ইসলামের দুশমনরা এত নিকৃষ্ট মানসিকতার অধিকারী যে, তার এমন অতুলনীয় মহত্ব ও মহানুভবতার কাজের ওপরও স্বার্থপরতার কলংক লেপনের চেষ্টা করেছে। আসল কথা হলো, মানুষ যদি কেবল খুত ধরার মতলবেই থাকে, তা হলে দুনিয়ার যত ভালো ও মহৎ কাজই হোক না কেন, তাতে খুত বের করার সুযোগ থাকবেই।

নারী অমুক পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, তার পেট থেকে যে সন্তান জন্ম নেবে তা অমুকের হবে এবং ঐ নারীর সাথে আর কোন মানুষের দাম্পত্য সম্পর্ক থাকবে না। মালিকানা সত্বের ক্ষেত্রেও এ সব উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে থাকে। সমাজে এটা জানাজানি হয়ে যায় যে, অমুক মেয়ে অমুকের দাসী। সেই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো পক্ষে ঐ মেয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ নয়। যতক্ষণ মনিব স্বেচ্ছায় তাকে বিয়ে না দেয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও বিয়ের মতই একজন নারীর একজন পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট হওয়াটা ব্যাপকভাবে জানাজানি হয় এবং তাতে সন্দেহের লেশমাত্র থাকে না। মনিবের সম্পর্কের আওতায় আসার পর একজন দাসীর যদি সন্তানাদি হয়, তবে সে ঐ পরিবারের একজন সদস্য হয়ে যায়। তখন তাকে বলা হয় উম্মে ওয়ালাদ্। মনিবের মৃত্যুর পর সে আপনা আপনি স্বাধীন হয়ে যায়। তার সন্তানরা বৈধ সন্তান রূপে স্বীকৃত হয় এবং পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। কাজেই এটিকে বিয়ের মত বিধিবদ্ধ ও রীতিসম্মত দাম্পত্য সম্পর্ক মনে না করার কোন হেতু থাকতে পারেনা।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এতে একটা জিনিস আপত্তিকর আছে। সেটি এই যে, মালিকানা স্বত্বের ভিত্তিতে যে দাসীর সাথে বিয়ে ছাড়া যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয় সে মূলত দাসীই থেকে যায়। বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদা সে পায় না। আর তার সন্তানরাও গোলামের সন্তান হিসেবে চিহ্নিত থেকে যায়। এ জন্যই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগে তাকে মুক্ত করে অভিজাত মেয়েদের সমমর্যাদায় এনে যথারীতি বিয়ে করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যাতে করে তার মধ্যে অভিজাত মেয়েদের মত আত্ম-মর্যাদাবোধ জন্মে এবং সে সমান মর্যাদা নিয়ে মুসলমানদের সমাজে প্রবেশ করতে পারে। এতে করে তার ওপর দাসীগিরি এবং তার সন্তানদের ওপর দাস বংশধর হওয়ার কালিমা লেগে থাকতে পারবে না।

এখন আপনার আর মাত্র দুটো প্রশ্নের জবাব বাকী আছে। প্রথমটা এই যে, মালিকানা স্বত্বের ভিত্তিতে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের

অধিকার যদি পুরুষের থেকে থাকে তবে মেয়েদের নেই কেন? দ্বিতীয়টা এইযে, অমুসলিম যুদ্ধরত জাতি যদি মুসলিম বন্দিনীদের সাথেও এ ধরনের আচরণ করে তা হলে আমাদের প্রতিবাদ করার কি অধিকার আছে? এবার এই দুটো প্রশ্নের জবাব ধারাবাহিকভাবে দিচ্ছিঃ

প্রথম প্রশ্নের জবাব এই যে, কুরআনে মালিকানা স্বত্বের ভিত্তিতে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার কেবল পুরুষকে দেয়া হয়েছে,নারীকে দেয়া হয়নি। সূরা মুমিনুনের ৫ ও ৬ নং আয়াতে এবং অন্য সকল আয়াতেও কেবলমাত্র পুরুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

এর একটা কারণ এই যে, দাম্পত্য সম্পর্কের ব্যাপারে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য করা মানব জাতির আবহমান কালের রীতি এবং এটা তার স্বভাব সুলভ বৈশিষ্ট। ১) মেয়েদের মধ্যে সতীত্বের অনুভূতি পুরুষের তুলনায় প্রবলতর। সমাজেও পুরুষের তুলনায় স্ত্রীর কাছ থেকেই সতীত্বের আশা বেশী করা হয়। পুরুষ যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তা হলে তাকে এত খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয় না যতটা নারীর ব্যভিচারকে দেখা হয়। কুমারীত্বের অবসান ঘটার পর নারীর মূল্য ও মর্যাদা অর্ধেক থেকে যায়। অথচ পুরুষ দশটা বিয়ে করার পরও তার মান-মর্যাদা হ্রাস পায় না। নারী যদি বিয়ে ছাড়াই পর পুরুষের কাছে চলে যায় তবে তার গোটা গোত্র সে জন্য অপমান বোধ করে। অথচ পুরুষের ক্ষেত্রে সেটা তেমন দুষণীয় মনে করা হয় না। এটা মানুষের স্বভাবগত ব্যপার এবং একে ইসলাম একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু যখন এই বৈষম্য জাহেলিয়াতের পর্যায়ে নেমে যায়, তখন ইসলাম একে পদদলিত করতে দ্বিধা করেনা। উদাহরণ সরূপ ইসলাম পুরুষকে কিতাবী নারীকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়। কিন্তু নারীদেরকে কিতাবী পুরুষকে বিয়ে করার অনুমতি দেয় না। এটুকু বৈষম্যকে সে মানবীয় স্বভাব প্রকৃতির দাবী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু কোন ইহুদী বা খৃষ্টান যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে ইসলাম নির্দ্বিধায় তার সাথে যে কোন মুসলিম নারীর বিয়ে অনুমোদন করে-চাই সে যতই

অভিজাত পরিবারের মেয়ে হোক না কেন। নিছক নওমুসলিম হওয়ার কারণে তার সাথে বিয়ে হওয়াকে ঘৃণা করা যায় না। ইসলামের দৃষ্টিতে এটাই একটা ঘৃণীত কাজ। এই মূল নীতিটা যদি আপনি বুঝে নেন তা হলে আপনি সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন, কি কারণে ইসলাম নারীকে স্বীয় পুরুষ গোলামের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার অনুমতি দেয় না। কারণ এ রকম করা হলে সমাজে এ ধরনের নারীর কোন মর্যাদা থাকবে না। পরে সে যদি ভৃত্যের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করতে চায়, তা হলে তার সমমর্যাদার কোন পুরুষের পক্ষে তাকে গ্রহন করা কঠিন হবে। এমন কি নারী যদি তার ভৃত্যের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে তবে তার স্বীয় পরিবারের কাছেই হেয় হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। কেননা নারী পারিবারিক জীবনে যে মর্যাদা পায় সেটা তার স্বামীর সুবাদেই পায় । এখানে স্বামী নিজেই গোলাম। সে কোন স্বাধীন পুরুষের সমকক্ষ নয়। এ পর্যন্ত ইসলাম মানবীয় প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখেছে। কিন্তু কোন মুক্ত গোলামের সাথে যে কোন অভিজাত মেয়ের বিয়ে অবাধে হতে পারে। এমনকি স্বয়ং রসূল (সাঃ) স্বীয় মুক্ত গোলামের সাথে আপন ফুফাতো বোনকে বিয়ে দিয়েছেন।

নারীকে গোলামের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি না দেয়ার আরো গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে, মালিকানা অধিকার পুরুষের জন্য বিয়ের সমপর্যায়ের হলেও স্ত্রীর জন্য নয়। ইসলাম দাম্পত্য জীবনের জন্য যে আইন দিয়েছে তার মূল কথা এই যে, নারীর ওপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকা চাই। এ কারণেই পুরুষের ওপর নারীর মোহরানা ধার্য করা হয়েছে এবং নারীর ওপর পুরুষকে খানিকটা শাসকসুলভ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। যাতে সে স্ত্রীর তত্ত্বাবধান ও হিফাজত করতে পারে এবং দাম্পত্য জীবনের শৃংখলা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করা জরুরী তা প্রয়োগ করতে পারে। গোলামকে যৌন সম্পর্কের অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করাতে এই বৃহত্তর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কোন নারীর স্বীয় গোলামের সাথে সম্পর্ক থাকাতে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ

করার উদ্দেশ্য হয়তো সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু নারী ও পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্কের অন্যান্য যে সব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা ইসলাম জরুরী মনে করে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার আওতাধীন সেগুলো পূরণ হওয়া অসম্ভব। কেননা এ ক্ষেত্রে পুরুষ গোলাম হওয়ার কারণে নারীর আজ্ঞাবহ হবে। পারিবারিক অঙ্গনে নৈতিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে তদারকী করা এবং পারিবারিক শৃংখলা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য পুরুষ হিসেবে তার যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করা দরকার, তা তার হস্তগত হবে না।

এখন আপনার শেষ প্রশ্নে আসা যাক। মনে হয় যেন এ প্রশ্ন করার সময় আপনি ধরেই নিয়েছিলেন যে, যে সব মুসলিম নারী শত্রুর করতলগত হয় তাদেরকে তারা আপন মেয়ের মত আদরে রাখে। আপনার এমন ধারণা পোষণ করা কি যুক্তিযুক্ত? আপনি বলছেন, আমাদের প্রতিবাদ করার কি অধিকার রয়েছে? এর জবাবে বলবো যে, আমরা নারীদের তো দূরের কথা, পুরুষদেরকেও গোলাম বানিয়ে রাখতে চাইনি। শত্রুরা যদি যুদ্ধবন্দী বিনিময়ে রাজী হতো তাহলে আমরা তাদের একজন পুরুষ বা স্ত্রীকেও গোলাম বানিয়ে রাখার জন্য জেদ ধরতাম না। শত শত বছরব্যাপী যে সারা দুনিয়ায় গোলামীর প্রথা চালু থেকেছে এবং একটি জাতির অভিজাত নারীরা যে দাসী হয়ে অন্যান্য জাতির ভোগদখলের শিকার হয়েছে, সেটা আমাদের কোন ত্রুটির কারণে হয়নি। যারা শত শত বছর ধরে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে কোন যুক্তিসম্মত ও ভদ্রজনোচিত নীতি অবলম্বনে রাজী হয়নি, একমাত্র তারাই এই মানবিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী।

(তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল ওলা, ১৩৫৪ হিঃ আগষ্ট, ১৯৩৫)

২

প্রশ্নঃ ইসলামী শরীয়তে বিয়ের সংখ্যা চারটার মধ্যে সীমিত করা হয়েছে। এক সাথে কেউ চারজনের বেশী স্ত্রী রাখতে পারে না। কিন্তু দাসীর ব্যাপারে আদৌ কোন সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এর কারণ কি? আপাতঃ দৃষ্টিতে তো মনে হয় যে, এই সীমাহীন

অনুমতি বিয়ের সংখ্যা চারে সীমিত করার সমস্ত উপকারিতা নষ্ট করে দিয়েছে। এতে করে বিত্তশালী লোকদের জন্য দেদার ভোগ-বিলাসের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। ধনাঢ্য ও ক্ষমতাশালী লোকদের জন্য অসংখ্য নারীকে খরিদ করে হেরেমে ঢুকানো এবং খুব করে আমোদ-ফূর্তিতে গা ভাসিয়ে দেয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। এটা শুধু আন্দাজ-অনুমান নয়। মুসলমানদের অতীত ইতিহাসে বাস্তবিক পক্ষে এটাই হয়েছে। আপনি কি এর কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারেন?

জবাবঃ আপনার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব এই যে, দাসীদের সাথে যৌন সম্ভোগের অনুমতি যে সামাজিক স্বার্থের খাতিরে দেয়া হয়েছিল, সংখ্যা নির্দিষ্ট করলে তা পণ্ড হয়ে যেত। কোন যুগে কোন লড়াইতে কত সংখ্যক নারী বন্দীনী হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে আসবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে মুসলিম জনসংখ্যার তুলনায় যুদ্ধবন্দীনীদের সংখ্যানুপাত কি রকম দাঁড়াবে, তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। নারীদের অস্বাভাবিক সংখ্যা স্ফীতিতে সামাজিক অনাচারের আশংকা রয়েছে এ কথা সবার জানা। সেই অনাচার রোধ করাই দাসীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি দেয়ার উদ্দেশ্য। তা হলে আপনি নিজেই চিন্তা করুন যে সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমান না জানা পর্যন্ত যৌন সম্পর্ক কত জনের সাথে স্থাপন করা যাবে তা কি করে নির্ধারণ করা সম্ভব। যে বিচক্ষণ কুশলী খোদা এ আইন তৈরী করেছেন; তিনি এক চোখা নন যে, একই সময়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল দিকের ওপর দৃষ্টি দিতে পারবেন না। তার সর্বব্যাপী দৃষ্টি একই সময়ে সকল দিকের ওপর পড়ে। তাই আইন রচনা করার সময় তিনি কোন প্রকার ভারসাম্যহীনতার প্রশ্রয় দেননি, যদিও মানুষ অধিকাংশ সময় তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগই করেছে যে, তিনি কেন ভারসাম্যহীনতার প্রশ্রয় দিলেন না।

আপনার ধারণা এই যে, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের কোন সংখ্যা নির্ধারণ না করায় যৌন উশৃংখলতার পথ উন্মুক্ত হয়ে থাকে। তাছাড়া দাসীদের কেনা-বেচার অবাধ সুযোগ থাকায় বিত্তশালীরা দাসী কিনে কিনে নারীদের একটা বাহিনী গড়ে তুলবে এবং নিজ

নিজ বাড়ীকে এক একটা প্রমোদ কেন্দ্র বানিয়ে ফেলবে। এ ধরনের ধারণা সচরাচর এ জন্যই সৃষ্টি হয় যে, বিষয়টার একটা দিকই শুধু দৃষ্টি পথে থাকে আর অপর দিক থাকে দৃষ্টির আড়ালে। এ কথা ভালো করে বুঝে নিন যে, ইসলামী শরীয়তের প্রতিটি আইন মানুষের কল্যাণের জন্যই রচিত। এই আইনে যে, সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তা মানুষের বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদেই রাখা হয়েছে। সে প্রয়োজন সচরাচর দেখা দিয়ে থাকে কিংবা দেখা দেয়ার অবকাশ রয়েছে। এখন কেউ যদি এই সব সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার করে, তবে সে জন্য তার নিজের নির্বুদ্ধিতা অথবা অপরাধপ্রবণ মানসিকতাই দায়ী। তবে তাই বলে এ ধরনের ব্যক্তিগত ত্রুটি সংঘটিত হতে পারে বা হবে এই আশংকায় আইনে এমন কোন সংকীর্ণতার সৃষ্টি করা, যাতে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন পূরণে জটিলতা দেখা দেয়, কোন বিচক্ষণ আইন প্রণেতার কাজ হতে পারে না।

শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক অপরিমিত সংখ্যক দাসীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি এ জন্য দেয়া হয়নি যে, এক একজন মুসলমান ঘরোয়া জীবনে রাজা ইন্দ্র হয়ে যাবে এবং বিপুল সংখ্যক নারীর উপস্থিতিতে রাত-দিন কেবল আমোদ-ফূর্তি করেই কাটাতে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কখনো যদি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার কারণে সমাজে বহিরাগত নারীর সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যায় তা হলে এই উপায়ে তাদেরকে অনায়াসে সমাজে আত্মস্থ করা যাবে এবং এই আকস্মিক বৃদ্ধির কারণে সমাজে নৈতিক অনাচারের প্রাদুর্ভাব ঘটবে না। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কয়েকটা পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। যথাঃ দাসদের সাথে দাসীদের বিয়ে দেয়া। দরিদ্র মানুষদের সাথে দাসীদের বিয়ে দেয়া। দাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে স্বয়ং মনিবের তাদেরকে বিয়ে করা এবং যাদের কাছে দাসী রয়েছে, তাদেরকে মুক্তি না দিয়েই তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন।

দাসীদের বেচা-কেনা বৈধ করার উদ্দেশ্যও এটা ছিল না যে, কামোন্মাদ লোকেরা নিছক আমোদ-ফূর্তির খাতিরে বিপুল সংখ্যক

দাসী কিনে কিনে জমা করবে, আর যখন স্বাদ মিটে যাবে তখন সেগুলো বিক্রি করে আর একটা বাহিনীর সমাবেশ ঘটাবে। বস্তুতঃ বেচা-কেনার সুযোগটা দেয়া হয়েছিল কেবল মানুষের কতকগুলো নৈমিত্তিক প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে। যেমন এক ব্যক্তি সহসা অভাবী হয়ে পড়লো এবং দাস-দাসী পোষার সামর্থ্য তার রইলো না, অথবা কারো কাছে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী দাস-দাসীর সমাবেশ ঘটেছে, অথবা যেগুলো এসে পড়েছে তার কোনটাই তার মনোপুত নয়। কিছু লোক সুযোগের অসদ্ব্যবহার করতে পারে, এই আশংকায় এই সব বাস্তব প্রয়োজন উপেক্ষা করে দাস-দাসীর কেনা-বেচা বন্ধ করে দেয়া কি যুক্তিসঙ্গত হতো, এই ধরনের অপব্যবহারের আশংকা তো বিয়ে-তালাকের বিধির বেলায়ও রয়েছে। কেউ যদি "বিধিসম্মত ব্যভিচার" করার জন্যই বদ্ধপরিকর হয়, তাহলে সে প্রতিদিন কয়েক টাকার মোহরানা দিয়ে এক একজন নতুন স্ত্রী ঘরে আনতে পারে এবং পরদিন তাকে তালাক দিয়ে আর একজন নারীর সন্ধান করতে পারে। এ ধরনের ব্যক্তিগত দুর্বৃত্তপনার ভয়ে বিয়ে-তালাকের আইনে নতুন কোন কড়াকড়ি আরোপ করে জনসাধারণের জীবন দুর্বিসহ করে তোলা কি ঠিক হবে?

(তরজমানুল কুরআন, মে-জুন, ১৯৪০, রবিউল আউয়াল, রবিউসসানী, ১৩৫৯ হিঃ)

৩

প্রশ্নঃ ১। ইসলামী আইন চালু হলে যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলাম-বাদী বানানোর অনুমতি থাকবে কি? এইসব গোলাম-বাদীকে কি কেনা-বেচাও করা যাবে? এইসব দাসীকে কি স্ত্রীর মত উপভোগ করার অধিকার থাকবে এবং তাতে সংখ্যার দিক দিয়ে কোন কড়াকড়ি কি থাকবে না?

২। ইসলামী আইনে কি (যুদ্ধবন্দী ছাড়াও) কোন দাস-দাসীর কেনা-বেচা পাকিস্তানে বৈধ হবে যেমন আজকাল হেজাযে চলছে?

জবাবঃ ইসলামী আইনে যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলাম-বাদী করে রাখার অনুমতি কেবল তখনই থাকবে যখন আমাদের সাথে যুদ্ধরত জাতি বন্দী বিনিময়েও রাজী হবে না, মুক্তিপণ নিয়েও আমাদের বন্দীদেরকে ছাড়বে না এবং মুক্তিপণ দিয়ে তাদের বন্দীও ছাড়িয়ে নেবে না। আপনি নিজে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে যে সরকারের কাছে যুদ্ধবন্দী থাকবে সে হয় তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে, নচেত আজীবন "শ্রম শিবিরে" (Concentration Camp) রেখে সকল মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করে বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় করবে। বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের আচরণ একদিকে যেমন নিষ্ঠুরতাপূর্ণ, অপরদিকে যে দেশে এ ধরনের কয়েদীদের একটা বিরাট গোষ্ঠী চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করে সে দেশের জন্যও তা তেমন কল্যাণ বয়ে আনে না। ইসলাম এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য যে নীতি নির্ধারণ করেছে তা এই যে, এই বন্দীদের ব্যক্তিগতভাবে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয় এবং তাদের একটা আইনগত মর্যাদাও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। কিন্তু এভাবে এক একজন বন্দীর এক একটি মুসলিম পরিবারের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে উঠবে, তাতে এ সম্ভাবনাই বেশী যে, তাদের সাথে হয়তো মানবতা ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করা হবে এবং তাদের একটা বিরাট অংশ হয়তো ক্রমান্বয়ে মুসলিম সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যাবে।

যে সব মুসলমান এ ধরনের যুদ্ধবন্দীর মালিক ও মনিব হয়, তাদের ওপর শরীয়ত এরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে যে, কোন দাস বা দাসী যদি মনিবের কাছে এই মর্মে আবেদন জানায় যে, আমি মেহনত-মজুরি খেটে মুক্তিপণের টাকা সংগ্রহ করতে চাই, তবে মনিব তার সে আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারবে না। আইন অনুসারে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাকে সময় দিতেই হবে। এই সময়ের মধ্যে সে যদি পনের টাকা দিয়ে দেয় তবে তাকে মুক্ত করে দিতে হবে। ১

---

১. সূরা নূরের ৪র্থ রুকূতে আছেঃ

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا

এ ধরনের দাস–দাসীকে বিক্রি করার অনুমতি দেয়ার অর্থ এই যে, মুক্তিপণ না পাওয়া পর্যন্ত তার কাছ থেকে শ্রম গ্রহণের যে অধিকার মনিবের রয়েছে, সে অধিকারটাই সে অর্থের বিনিময়ে অন্যের কাছে হস্তান্তর করেছে। শত্রু পক্ষের কোন সৈন্যকে কখনো বন্দী হিসাবে রাখার অভিজ্ঞতা যদি আপনার থেকে থাকে, তা হলে দাসদাসীর মালিকানা হস্তান্তরের এই আইনানুগ অনুমতির ফায়দা কি তা আপনি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারবেন। লড়াকু সৈন্যকে কাজে খাটানো সহজ ব্যাপার নয়। অনুরূপভাবে শত্রুপক্ষের কোন মহিলাকে ঘরে আটক রাখাও খেলা নয়। যে বন্দী বা বন্দিনীকে সামাল দেয়া সম্ভব হয় না। তাকে অন্যের মালিকানায় হস্তান্তর করার সুযোগ যদি না দেয়া হতো তা হলে এ ধরনের বেয়াড়া বন্দী বা বন্দিনী যার হাতেই পড়তো, তার জন্য সে জানের আপদ হয়ে দাঁড়াতো।

যুদ্ধে গ্রেফতার হওয়া নারীদের (যখন তাদের বিনিময় বা মুক্তিপণ কোনটারই ব্যবস্থা হয় না) সমস্যার এর চেয়ে ভালো সমাধান আর কিছুই হতে পারে না যে, সরকার তাকে যার হাতে ন্যস্ত করে, তাকে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের আইনগত অধিকার দেয়া হোক। এটা যদি না করা হতো তা হলে এসব নারী দেশে ব্যভিচারের প্রসার ঘটানোর একটা স্থায়ী উৎসে পরিণত হতো। আইনগতভাবে মালিকানা অধিকার এবং বিয়েতে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। বরঞ্চ এ ক্ষেত্রে তো স্বয়ং সরকার বিধিসম্মতভাবে একজন নারীকে একজন পুরুষের কাছে সোপর্দ করে থাকে। তাছাড়া শরীয়তে তাদেরকে যে সামাজিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে তা এই যে, কোন ব্যক্তির মালিকানায় যাওয়ার পর এই নারীর সাথে অন্য কোন পুরুষের যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার নেই। তার যে সন্তান হবে, তা ঐ ব্যক্তির বংশধর হিসেবেই পরিগণিত হবে এবং স্বাধীন স্ত্রীর সন্তানদের মতই পিতার সম্পত্তির

"তোমাদের দাস–দাসীদের মধ্যে যারা অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে মুক্তিপণ দিয়ে স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে, তাদেরকে যদি বিশ্বাসযোগ্য মনে কর তবে সে জন্য সুযোগ দাও।" (আয়াত–৩৩)

উত্তরাধিকারী হবে। আর যে দাসীর সন্তান হবে, তাকে বিক্রি করার অধিকার মনিবের থাকে না। মনিব মারা যাওয়ার পর সে আপনা-আপনি স্বাধীন হয়ে যায়।

দাসীদের সাথে যৌন সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে সংখ্যার কড়াকড়ি আরোপ না করার কারণ এই যে, সম্ভাব্য যুদ্ধবন্দীনীদের সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। যদি তাদের সংখ্যা অত্যধিক হয় তা হলে সমাজে তাদের পুনর্বাসিত করার কোন উপায়ই থাকবে না যদি যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আগে থেকেই সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

পরবর্তী কালে শাসক ও বিত্তশালী লোকেরা এই আইনগত সুযোগকে যেভাবে ভোগ-বিলাসের ছুতা বানিয়ে নিয়েছে, সেটা স্পষ্টতই শরীয়তের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ছিল। কিন্তু কোন বিত্তবান যদি ভোগ-বিলাসে মত্ত হতেই চায় এবং আইনের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে আইনের সুযোগের অপব্যবহার করার মতলব আটে, তাহলে বিয়ের বিধিই বা তার পথ আটকাবে কিভাবে? সে প্রতিদিন এক একজন নতুন নারীকে বিয়ে করে পরের দিন তাকে তালাক দিতে পারে।

হেজাযে আজকাল যে গোলাম-বাদী বিকিকিনি চলছে, তা আমার বিশদভাবে জানা নেই। তবে নীতিগতভাবে আমি এ কথা বলতে পারি যে, যুদ্ধ ছাড়া আর কোনভাবে স্বাধীন মানুষকে আটক করা এবং কেনা-বেচা করা শরীয়তে হারাম।[১]

(তরজমানুল কুরআন, জিলকদ, ১৩৬৭ হিঃ, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮)

---

১. দাস প্রথা সম্পর্কে আরো বিশদভাবে জানার জন্য আমার লেখা রাসায়েল ও মাসায়েল এবং তাফহীমুল কুরআন দ্রষ্টব্য।

দাইতা রাজ্য থেকে এক ব্যক্তি আমাদের কাছে এক দীর্ঘ চিঠি পাঠিয়ে একটি ফতোয়া তলব করেছেন। এতে তিনি নিম্ন লিখিত প্রশ্ন তুলে ধরেছেন [১] ঃ (১) এটা কি সত্য যে, ইমাম আযম আবূ হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইযতিহাদের মাধ্যমে আরবী ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় নামায পড়া জায়েয বলে রায় দিয়েছিলেন? এটা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে শরীয়ত অভিজ্ঞ আজকের আলিম সমাজ কি উক্ত ইযতিহাদী রায় পুনর্বিবেচনা করে যে কোন অনারব ভাষায় নামায পড়ার বৈধতা কিংবা অবৈধতা সম্পর্কে ফতওয়া দেবেন?

(২) সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে- لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ (النساء: ٤٣) নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিশেধ করা হয়েছে। আর এর কারণ বলা হয়েছে এই যে, এ এ অবস্থায় মানুষ যা বলে তা বুঝতে পারে না। এ কথা থেকে প্রমাণিত হলো যে, নামাযে যা কিছু পড়া হয়, পাঠকের তা বুঝতে পারাও নামায শুদ্ধ হওয়ার অপরিহার্য শর্ত। তাই কোন ব্যক্তি যদি নিজ মাতৃভাষায় নামায পড়ে তাহলে সে যেহেতু নামাযে যা কিছু পড়ে তার প্রতিটা শব্দ বুঝতে পারে, কাজেই এ ধরনের নামায জায়েয ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?

(৩) দুই ঈদ এবং জুময়ার নামাযের খুতবা শ্রোতাদের মাতৃভাষায় দেয়াকে আলিম সমাজ জায়েয মনে করেন কিনা? যদি নাজায়েয মনে করেন তবে তার কারণ কি? হয়তো এই মর্মে যুক্তি

১. উল্লেখ্য যে, ইনি সেই খানবাহাদুর সাহেব, যার সাথে "হযরত ইউসুফ ও অনৈসলামিক সরকারে অন্তর্ভুক্তি" প্রশ্নে আমাদের বিতর্কের বিবরণ ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে।

দেয়া হবে যে, দুই ঈদ ও জুময়ার খুতবা আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় দেয়া রসূল (সাঃ)-এর সুন্নত (প্রবর্তিত রীতি) এর পরিপন্থী। তাই ওটা না জায়েয। কিন্তু রসূল (সাঃ)-এর সুন্নত তো এই ছিল যে, তার মুখ থেকে বেরুনো কথাগুলো শ্রোতাদের শুনতে ও বুঝতে হবে। এতে যে সব আদেশ নিষেধ থাকবে তা বাস্তবায়িত করতে হবে এবং যে সব উপদেশ ও জ্ঞানের কথা থাকবে তা দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। যে খুৎবার একটা শব্দও শতকরা ৯৯ জন শ্রোতা বুঝতে পারেনা, সে খুৎবায় বর্ণিত আদেশ-নিষেধ দ্বারা কিভাবে শ্রোতারা উপকৃত হবে? এ ধরনের খুতবাকে কিভাবেইবা সুন্নত মোতাবেক বলা যায়?

সর্বস্তরের মুসলিম জনতার কাছে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ পৌঁছে দেয়ার জন্য খুতবার মাধ্যমে যে সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে, ঈদ ও জুময়ার খুতবাকে আরবী ভাষার মধ্যে সীমিত রাখাতে সে সুযোগ কি নস্যাৎ হয়ে যায় না? শ্রোতাদের সকলে কিংবা অধিকাংশ যখন খুতবার মর্ম বোঝে না, তখন এ ধরনের খুতবা দেয়া কি একটা পণ্ড শ্রমে পর্যবসিত হয় না? আমি জানি যে, কোথাও কোথাও খুতবায় উর্দু কবিতা পড়া হয়। তবে আমার মনে হয়, ওটা আলিম সমাজের অনুমোদিত রীতির বিরোধী। কাজেই আলিমগণ এই বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়ে জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত হয় এমনভাবে ফতওয়া দিন-এটাই এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

উপরোক্ত চিঠিটি আসলে একটা ফতওয়ার আবেদন। উলামায়ে কিরামকে লক্ষ্য করেই এ আবেদন জানানো হয়েছে। আমি কোন মুফতিও নই, আর আমার শরীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে ফতওয়া দেয়ার দায়িত্ব বহন করার মত যোগ্যতাও নেই। তবে যেহেতু সম্মানিত প্রশ্নকর্তা উচ্চ ধারণা পোষণ করে আমার কাছেও জানতে চেয়েছেন যে, এ ব্যাপারে আমি গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তাই উল্লিখিত প্রশ্নাবলীর নিরিখে শরীয়তের সংশ্লিষ্ট বিধি বিশ্লেষণের প্রয়াস পাচ্ছি। আমার বিশ্লেষণ কোন মতেই ফতওয়ার পর্যায়ের নয়। ওলামায়ে কিরাম

বিচার-বিবেচনা করবেন এবং সঠিক মনে করলে গ্রহণ করবেন-এ উদ্দেশ্যেই আমার এ বক্তব্য পেশ করছি।

কয়েকটি জরুরী প্রাথমিক কথা

মূল আলোচ্য বিষয়ে কিছু বলার আগে কয়েকটি প্রাথমিক কথা মনে বদ্ধমূল করে নিন। এতে আমার পরবর্তী আলোচনা বুঝা সহজ হবেঃ

১-ইসলামী শরীয়তের ভিত্তি যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও মানব কল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে কথা সর্ববাদী সম্মত। মহাবিজ্ঞানী শরিয়ত প্রণেতা কোন হুকুম অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে দেননি। কোন হুকুম তামিল করার পদ্ধতি নির্দেশ করতে গিয়েও কোথাও বিজ্ঞানসম্মত ও কল্যাণধর্মী পন্থা এড়িয়ে যাননি। এ কথা যখন সর্ববাদী সম্মত, তখন অনিবার্যভাবে এ কথাও মানতে হবে যে, শরীয়তকে নিখুঁতভাবে অনুসরণ করা শরীয়তের গভীর উপলব্ধি অর্জন করা ছাড়া সম্ভব নয়। কোন কাজের নির্দেশ দান বা কোন কাজ থেকে নিষেধ করার পেছনে আল্লাহর কি উদ্দেশ্য বা কি কল্যাণ চিন্তা নিহিত রয়েছে, কোন নির্দেশ কার্যকর করার যে বাস্তব কর্মপ্রণালী নির্দেশ করা হয়েছে, সেই বিশেষ কর্মপ্রণালীতে কি গুঢ় উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে এবং মূল লক্ষ্য অর্জনে কোন কোন সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম নিয়ম-নীতি কিভাবে সহায়ক হয়, তা যে ব্যক্তি জানে না, তার পক্ষে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শরীয়তের সঠিক আনুগত্য করা অত্যন্ত দুরূহ এমন কি অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তার কাছে শুধু শরীয়তের দেহকাঠামো থাকবে, তার প্রাণসত্তা থাকবে না। সে শুধু শরীয়তের হাড়গোড় বয়ে বেড়াবে, মগজ কখনো পাবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে এমনভাবে কাজ করবে যে, বাহ্য দৃষ্টিতে সে শরীয়তের হুকুম তামিল করছে বলেই মনে হবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শরীয়তের আসল উদ্দেশ্য বিফল হয়ে যাবে। কেননা তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে কেবল বিধিসমূহের বাহ্যিক প্রক্রিয়া ও তার খুঁটিনাটির ওপর। সেই বিধিমালার আসল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তার দৃষ্টির

আড়ালেই থেকে যাবে। সে ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের আলোকে খুঁটিনাটি বিষয়ে রদবদল করার কোন ক্ষমতাই তার থাকবে না।

২. এ কথা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য যে, শরীয়ত প্রণেতা (আল্লাহ) সর্বোচ্চ বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমতা এবং উৎকৃষ্টতম জ্ঞানের আলোকে তার হুকুম বাস্তবায়নের জন্য সাধারণতঃ এমন কর্মপদ্ধতিই নির্দেশ করেছেন, যা স্থান কাল ও পরিবেশ পরিস্থিতি নির্বিশেষে সর্বাবস্থায় তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পূর্ণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু সংখ্যক খুঁটিনাটি বিধি এমন রয়েছে, যা পরিস্থিতির পরিবর্তন সাপেক্ষে পরিবর্তনযোগ্য। নবুয়ত যুগে এবং সাহাবায়ে কিরামের আমলে আরব এবং মুসলিম বিশ্বে যে পরিস্থিতি বিরাজ করতো, সকল যুগে সকল দেশে সেই পরিস্থিতিই বিরাজ করবে এমন কোন কথা নেই। কাজেই ইসলামী বিধিমালার বাস্তবায়নের যে পদ্ধতি ও প্রণালী তৎকালে গৃহীত হয়েছিল, তাকে সকল যুগে ও সকল পরিস্থিতিতে হুবহু বহাল রাখা এবং উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের আলোকে তার খুঁটিনাটিতে কোন পরিবর্তন না করা এক ধরনের গোঁড়ামী। ইসলামের মৌল ভাবধারার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। একটা স্থূল উদাহরণ নিন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্যের গতিধারার ভিত্তিতে নামাযের সময় নির্ধারণ করেছেন। কেননা আরব ও প্রধান জনঅধ্যুসিত এলাকার জন্য এই পদ্ধতিই যথোপযুক্ত। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি উত্তর মেরুর নিকটে বসবাসকারীদের জন্যও নামাযের সময় স্থির করার ব্যাপারে সূর্যের উদয়াস্ত এবং ছায়ার ওঠানামাকেই হিসাবে ধরে, তাহলে এ কাজটা দৃশ্যতঃ শরীয়তের সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত বিধির আক্ষরিক আনুগত্য হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে শরীয়ত প্রণেতার মূল উদ্দেশ্য নস্যাৎ হয়ে যাবে এবং কার্যতঃ এটা শরীয়ত বিধি অমান্য করারই শামিল হবে। কেননা এর অনিবার্য ফল দাঁড়াবে নামায তরক এবং ফরয কাজ বাদ দেয়া। সুতরাং বুঝা গেল যে, খুঁটিনাটি বিধিতে অকাট্যভাবে বর্ণিত নির্দেশের উদ্দেশ্য, কারণ ও প্রেক্ষাপট তো দূরের কথা, তার সুস্পষ্ট মর্ম অনুসরণ করাও সংশ্লিষ্ট বিধির মর্ম ও তাৎপর্যের গভীর উপলব্ধি ছাড়া সম্ভব নয়। মানুষ যদি প্রত্যেক

বিধিতে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য ও কল্যাণ চিন্তার প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং সেই প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে খুঁটিনাটি বিধিতে এমন পরিবর্তন আনতে থাকে, যা শরীয়ত প্রণেতার আইন প্রণয়ন প্রণালীর অনুসারী এবং তার কর্মপ্রক্রিয়ার নিকটতম হয়, তাহলেই শরীয়ত বিধির যথার্থ মর্মোপলব্ধির দাবী পূরণ হতে পারে।

৩. কিন্তু শরীয়তের বিধির মর্মোপলব্ধির অর্থ এ নয় যে, মানুষ নিরেট নিজের বিবেক বুদ্ধিরই অনুসরণ করে চলবে এবং তার অনুসরণে যে দিক খুশী, যতদূর খুশী চলে যাবে, চাই শরীয়তের সীমা আতিক্রম করেই হোক না কেন। এ ধরনের বিবেক বুদ্ধির অনুসরণকে ইসলামী পরিভাষায় 'তাফাক্কুহ' তথা শরীয়তের নিগূঢ় মর্মোপলব্ধি বলা হয়নি বরং একে কুরআনে 'প্রবৃত্তির অনুসরণ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রবৃত্তির অনুসরণের অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তার ফলে মানুষ চরমপন্থী ধ্যান ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে 'ইসলামী তাফাক্কুহ' তথা মর্মোপলব্ধি অর্জনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যম পন্থীসুলভ মতামত। প্রবৃত্তি পূজারী প্রত্যেক ব্যাপারে কোন একটা বিশেষ স্বার্থ বা কল্যাণ চিন্তার প্রতি এমনভাবে ঝুঁকে পড়ে যে, তার খাতিরে অন্যান্য স্বার্থ ও কল্যাণ চিন্তার দিকে ভ্রুক্ষেপই করে না। কিন্তু ইসলামী তাফাক্কুহ অর্জিত হলে সকল স্বার্থ ও কল্যাণের দিকের প্রতি সমানুপাতিক দৃষ্টি দেয়া হয় এবং কোন স্বার্থকে উপেক্ষা করলেও কেবল বৃহত্তর স্বার্থ যখন সেই ক্ষুদ্রতর স্বার্থের কুরবানী দাবী করে তখনই তা উপেক্ষা করে। তাছাড়া স্বার্থ রক্ষা বা স্বার্থহানির ব্যাপারেও ইসলামী তাফাক্কুহ তথা মর্মোপলব্ধি এবং প্রবৃত্তি পূজায় মতের পার্থক্য ঘটে। প্রবৃত্তি পূজারী ইসলামের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নয়, বরং নিজের মনের ঝোঁক ও খেয়ালের মাপকাঠিতে যাচাই করে কল্যাণ ও অকল্যাণ নিরূপণ করে এবং একটি স্বার্থকে গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করে। পক্ষান্তরে ইসলামী মর্মোপলব্ধির দাবী এই যে, আপনার দৃষ্টি অবিকল ইসলামী দৃষ্টি হবে, ইসলাম যাকে কল্যাণকর মনে করে আপনিও তাকেই কল্যাণকর মনে করবেন। এবং ইসলাম যাকে

ক্ষতিকর মনে করে আপনিও তাকেই ক্ষতিকর মনে করবেন। আর বিভিন্ন কল্যাণ ও ক্ষতিকর মান নির্ণয়ে ইসলামের মানদন্ড প্রয়োগ করবেন। সুতরাং কারুর এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত হওয়া চাই না যে, নিছক বিবেক বুদ্ধির অনুসরণকেই তাফাক্কুহ বলা হয় এবং নিজের বিবেক বুদ্ধি অনুসারে শরীয়তের যে কোন বিধি পরিবর্তন করা যায়। সেটা কখখনো নয় এবং নিশ্চিতভাবেই নয়। ইসলামী তাফাক্কুহ এটা নয় যে, আপনি নিজের বিবেচনায় যেটা কল্যাণকর মনে করেন, তার খাতিরে আল্লাহ তার আদেশ- নিষেধের পেছনে যে কল্যাণ-চিন্তা নজরে রেখেছিলেন, তাকে বিসর্জন দেবেন অথবা আপনি নিজের বিবেচনায় যে ক্ষতিকে গুরুতর মনে করেন তা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ যে সব ক্ষতি থেকে আপনাকে বাঁচাতে চান, তাকে গ্রহণ করবেন। ইসলামী বিধানের প্রকৃত মর্মোপলব্ধির দাবী এই যে, শরীয়ত প্রণেতা আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে কল্যাণ - চিন্তায় প্রণোদিত হয়ে স্বীয় আদেশ-নিষেধ জারি করেছেন তা বুঝতে হবে, তার প্রত্যেকটিকে স্বয়ং আল্লাহ যতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন ততখানি গুরুত্ব দিতে হবে এবং খুঁটিনাটি বিধিতে পরিবর্তন সাধন করতে হলে এমনভাবে করতে হবে যেন আল্লাহ যে ভারসাম্য বজায় রেখেছেন, তা ক্ষুন্ন না হয়। মনে রাখতে হবে যে, শরীয়ত প্রনেতা যে বাস্তব কর্মপ্রণালী নির্দেশ করেছেন তাতে পরিবর্তন আনা কেবল তখনই জায়েয হবে, যখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঐ বিধি অনুসরণে আপনার ব্যক্তিগত ঝোঁকের নিরীখে নয়, বরং স্বয়ং শরীয়ত প্রনেতার দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্য নস্যাত হয়ে যায়। আর সে অবস্থায় কেবল মাত্র এতটুকুই খুঁটিনাটি পরিবর্তন করা চলে, যতটুকু করলে ঐ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ শরীয়ত সম্মত স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার সাথে সাথে অন্যান্য শরীয়ত সম্মত স্বার্থ ক্ষুন্ন না হয়, অথবা ক্ষুন্ন হলেও তা যেন শরীয়ত প্রনেতার দৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ কোন স্বার্থ না হয়।"

৪. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত মহান সাহাবীগনের আমল থেকে শরীয়তের বিধি

প্রণয়নে একটা মূলনীতি অনুসরণ করা জরুরী। সেটি এই যে, 'শরীয়ত সংক্রান্ত কাজ' এবং 'স্বভাবগত বা প্রথাসিদ্ধ কাজের' পার্থক্য করতে হবে। শরীয়তের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় পূর্ণ হবে জেনে যে কাজ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে শরীয়ত সংক্রান্ত কাজ। আর যে কাজ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সহচরবৃন্দ নিজস্ব ব্যক্তিগত ও স্বভাবসুলভ ইচ্ছা বা ঝোঁকের বশে অথবা নিজস্ব বিশেষ যুগ বা দেশের সামাজিক পরিস্থিতির তাগিদে করতেন, তা হচ্ছে 'স্বভাবগত' বা প্রথাসিদ্ধ কাজ। শেষোক্ত ধরনের কর্মকাণ্ড বিভিন্ন দিক দিয়ে আমাদের জন্য শিক্ষামূলক ও হেদায়াতের আদর্শ হতে পারে। তবে তা থেকে শরীয়তের বিধি রচনা করা ঠিক নয়। শরীয়তের দলিল বা উৎস কেবল প্রথম ধরনের কর্মকাণ্ডই হতে পারে। কোন কোন ব্যাপারে এই দুই ধরনের ধরনের কর্মকাণ্ডের পার্থক্য দিবালোকের মত স্পষ্ট থাকে। এমনকি প্রথম দৃষ্টিতেই তা যে কোন মানুষের চোখে ধরা পড়ে। কিন্তু কোন কোন ব্যাপারে এই দুই ধরনের কর্মকাণ্ড একটা মিশ্র হয়ে যায় যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করাই কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তুত এরূপ ক্ষেত্রেই বেশীর ভাগ এক ধরনের কর্মকাণ্ডকে আর এক ধরনের কর্মকাণ্ড বলে গ্রহণ করার ভ্রান্তি সংঘটিত হয়েছে এবং অনেক বড় বড় মনীষীও এরূপ ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছেন। রসূল (সাঃ) একই সময়ে একজন রসূলও ছিলেন আবার একজন মানুষও ছিলেন। আবার একজন আরবও ছিলেন। একটি বিশেষ যুগ এবং বিশেষ সামাজিক পরিবেশের অধিবাসীও ছিলেন। তাঁর প্রত্যেক কাজে, তা সে ধর্মীয় কাজই হোক বৈষয়িক কাজই হোক, এই সকল আনুসঙ্গিক অবস্থার একত্র সমাবেশ ঘটেছিল। ঐ সব অবস্থা একত্রে মিশ্রিত হওয়ার কারণে অনেক সময় এটা বেছে বের করা খুবই কঠিন হয়ে যায় যে, একটি কাজের কোন অংশ তিনি রসূল হিসেবে করেছেন, যাতে তাকে শরীয়তের দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যায়, আর কোন অংশ অন্য হিসেবে করেছেন, যা শরীয়তের দলিল হওয়ার যোগ্য নয়। সাহাবাদের কাজে এ সব বিভিন্ন অবস্থার মিশ্রণ ঘটেছে আরো বেশী। তাদের কার্যকলাপে আমাদের জন্য পথনির্দেশ

শুধু এই হিসেবে রয়েছে যে, তারা প্রত্যক্ষভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে সরাসরিভাবে শরীয়তের বিধি শিখেছেন। এই অবস্থা ছাড়া তাদের আর যত অবস্থাই থাক না কেন, তা যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, তা কোনক্রমেই শরীয়তের পথনির্দেশের উৎস নয়। আজ তাদের কার্যকলাপে বিশেষত ধর্মীয় কর্মকান্ডে এটা চিহ্নিত করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে যে, কোন্ জিনিসটির রসূল (সাঃ)–এর শরীয়ত সংক্রান্ত নির্দেশ থেকে গৃহীত। কোনটি তাদের নিজস্ব মতামত ও চিন্তা–গবেষণা প্রসূত এবং কোনটি তাদের বিশেষ ব্যক্তিগত, সাময়িক ও স্থানীয় পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এখানে ছাটাই–বাছাই এর একটি মাত্র উপায় আমাদের হাতে রয়েছে। সেটি এই যে, কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাপক ও নিবিষ্ট অধ্যায়ন সুন্নাহর ব্যাপক ও নিবিষ্ট অধ্যায়ন দ্বারা মানুষের ভিতর যে ইসলামী অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা জন্মে, তা দ্বারা যে শরীয়ত সংক্রান্ত কাজ এবং স্বাভাবিক ও প্রথাসিদ্ধ কাজের সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম। তার রুচিই তাকে বলে দেয় কোন্ জিনিস ইসলামী প্রকৃতির এবং কোন্ জিনিস ইসলামের সাথে সংশ্রবহীন। কোনটি ইসলামী স্বার্থ ও কল্যাণের অধিকারী এবং কোনটি তা নয় আর কোন্ জিনিস ইসলামী জীবন পদ্ধতির অংশ এবং কোনটি তা নয়। এ ক্ষেত্রে মতভেদের ও চিন্তার অবকাশ রয়েছে। কেননা একজনের প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি ও রুচি হুবহু অন্যের প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি ও রুচির অনুরূপ হতে পারে না। যদিও উভয়েরই উৎস এক। কাজেই এ কথা বলার অধিকার কারোর নেই যে, আমার ইসলামী প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি যেটাকে 'শরীয়ত সংক্রান্ত' বলছে সেটাই শরীয়ত সংক্রান্ত, আর একজনের প্রজ্ঞা যেটাকে শরীয়ত সংক্রান্ত বলছে, তা নিশ্চিতভাবে এবং অকাট্যভাবে ভ্রান্ত।

এই প্রাথমিক কথাকয়টি অন্তরে বদ্ধমূল করে নেয়ার পর নামায ও জুময়ার খুতবার প্রশ্নে আলাদা আলাদাভাবে চিন্তাভাবনা করুন। কেননা এই দুটো বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। বাহ্যত যদিও তা একই রকমের মনে হয়।

নামাযের ভাষা

নামাযের ভাষা নিয়ে প্রশ্নকর্তা যে আয়াতের বরাত দিয়েছেন, আজকাল সচরাচর এ আয়াত দ্বারাই প্রমাণ দর্শানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতঃ لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ "নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যতক্ষণ তোমরা মুখে কি বলছ তা টের পাওনা, ততক্ষণ নামাযের কাছে যেও না।" কিন্তু আসলে এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ দর্শানো ঠিক নয়। আল্লাহ তায়ালা حَتّٰى تَعْلَمُوْا "যতক্ষণ তোমরা টের পাওনা" বলেছেন, حَتّٰى تَفْقَهُوْا অথবা حَتّٰى تَفْهَمُوْا "যতক্ষণ তোমরা বুঝতে পারনা" বলেননি। জানা এবং বুঝাতে যে সুক্ষ্মপার্থক্য রয়েছে সেটা লক্ষ্য না করার কারণে লোকেরা ধরে নিয়েছে যে, নামাযের মধ্যে পঠিত প্রতিটি শব্দ ও প্রতিটি বাক্যের অর্থ ও মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা এবং প্রতিটি শব্দের অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখা জরুরী, অন্যথায় নামায শুদ্ধ হয় না। অথচ এ ধারণা স্পষ্টতই ভ্রান্ত। একজন আরবী না জানা লোক নামাযে পঠিত সূরা কালামের অর্থ বোঝেনা বলে যদি তার নামায না হয়, তা হলে একজন আরবী জানা লোক যখন সূরা কালাম বুঝে বুঝে না পড়ে এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো নামাযে পড়া প্রতিটি শব্দের অর্থের দিকে মনোনিবিষ্ঠ না থাকে, তা হলে তার নামাযও শুদ্ধ হওয়ার কথা নয়। এত কড়া শর্ত আরোপ করা হলে কোন একজন মানুষও হয়তো প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায শুদ্ধভাবে পড়তে পারবেনা। জীবনে মানুষের ওপর সব ধরনের অবস্থা অতিবাহিত হয়ে থাকে। কখনো মন দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকে, কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কখনো মন কোন কাজের চিন্তায় বিভোর থাকে, কখনো অজ্ঞাতসারে নানা ধরনের চিন্তা ভাবনা ও প্ররোচনা তার মনে ঢুকে পড়ে এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে টেরও পায় না যে তার মন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। নামাযের জন্য যদি এরূপ শর্ত আরোপিত হয় যে, মন-মগজকে এই সমস্ত ভাবান্তর থেকে একেবারে মুক্ত করে পূর্ণ একাগ্রতা নিবিষ্টতা ও সচেতনতা নিয়ে নামাযে দাঁড়াতে হবে, তা হলে নামায পড়াই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে পড়বে।

এ ধরনের কড়াকড়ি মানুষ নিজের বুদ্ধি বিবেক দ্বারাই নিজের ওপর আরোপ করে থাকে। আল্লাহ তার ওপর এমন কড়াকড়ি আরোপ করেননি। কেননা তিনি তার জন্মগত দুর্বলতা ও অক্ষমতার কথা ভালোভাবেই জানেন। বুঝে বুঝে পড়া, নিবিষ্টতা ও একাগ্রতাকে তিনি নামাযের পূর্ণতা ও সৌন্দর্যের উপাদান অবশ্যই গণ্য করেছেন এবং মানুষের নামায এ রকম পূর্ণাঙ্গ ও সৌন্দর্য মন্ডিত হোক, তা তিনি কামনাও করেন। কিন্তু তিনি এ জিনিসগুলোকে নামাযের শর্ত হিসেবে গণ্য করেননি যে, এগুলো ছাড়া নামায শুদ্ধই হবে না।

আয়াতের প্রকৃত মর্মার্থ

এবার আয়াতটির শাব্দিক বিন্যাসের দিকে লক্ষ্য করুন। যদি বুঝে বুঝে পড়া এবং অর্থের দিকে মনোনিবেশ বজায় রাখাই নামাযের বিশুদ্ধতার জন্য আপরিহার্য হতো আর এ কারণেই যদি নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামায থেকে দূরে থাকতে বলা হয়ে থাকে, তা হলে শুধু মাত্র নেশার মধ্যেই কি এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে? তা হলে তো এটাও বলা উচিত ছিল যে, যখন তোমরা চিন্তাগ্রস্ত থাক তখন নামায থেকে দূরে থাক, যখন তোমরা মনোকষ্ট, অস্থিরতা অথবা কোন রকমের মানসিক ভাবনায় ভারাক্রান্ত থাক, তখনও নামাযের কাছে এসোনা, যখন তোমাদের মনে হয় যে, নামাযের ভিতরে তোমাদের একাগ্রতা নষ্ট হয়েছে তখনও নামায ভেঙ্গে দাও এবং পুনরায় শুরু কর। কিন্তু আল্লাহ এসব কড়াকড়ির কোনটাই আরোপ করেননি। বরং শুধুমাত্র নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। এর যে কারণ ব্যাখ্যা করেছেন তা এই যে, এ সময়ে তোমরা কি বলছ তা তোমরা নিজেরাই জাননা। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অচেতনতা বিরাজ করে। পঠিত সূরা কিরাত না বুঝা বা সে দিকে মনোনিবেশ না করা থেকে এটা ভিন্ন ধরনের ব্যাপার। একজন মানুষ ইবাদতের জন্য দাঁড়াচ্ছে, না অন্য কোন কাজের জন্য। কুরআন পড়ছে না অন্য কিছু আওড়াচ্ছে, কেবলামুখী হয়েছে না

অন্য কোন দিকে মুখ করেছে, মাতাল অবস্থায় তাও সে ঠাওর করতে পারে না। তখন সে এমন একটা অচেতন অবস্থায় থাকে যে, সে নিজের অস্তিত্বই টের পায় না। এমনও হতে পারে যে, কুরআন পড়তে পড়তে সে কোন কবিতা আওড়াতে আরম্ভ করে দিল, আল্লাহর নামে তসবিহ্ পড়তে পড়তে আবোল তাবোল বকা শুরু করে দিল, কেবলার দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ অন্য দিকে চলে পড়লো। নামায পড়তে পড়তে ভুলেই গেল যে, সে নামায পড়ছে এবং আধাআধি নামায পড়তে পড়তে অন্য কারোর সাথে কথা বলা শুরু করে দিল, অথবা নামাযের জায়গা ছেড়ে অন্য কোন দিকে চলতে আরম্ভ করলো। আল্লাহতায়ালা আসলে ''যতক্ষণ তোমরা কি বলছ তা টের না পাও'' এ কথাটা দ্বারা ও ধরনের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার দিকেই ইংগিত করতে চেয়েছেন। কথাটার মর্ম এই যে, যখন তোমরা নির্বুদ্ধিতা বশত এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি করে ফেল, যখন তোমাদের কথা ও মন-মগজ তোমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না তখন আমার দরবারে হাজির হওয়ার ধৃষ্টতা দেখিও না।

এই ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, উল্লিখিত আয়াতে নামাযের ভাষা সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি। কাজেই এর ভিত্তিতে এ কথা বলা যুক্তিসিদ্ধ নয় যে, নামাযী যে ভাষা বোঝে সেই ভাষায়ই নামায পড়তে হবে।

মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে মতভেদ

এখন যে প্রশ্নটার সমাধান বাকী তা হলো, নামায কি আরবী ভাষায় পড়াই জরুরী এবং আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কি নামায পড়া জায়েয নয়? এ প্রশ্নের যে সমাধান আমার মনোপুত তা বলার আগে এ ব্যাপারে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে যে মতভেদ সংঘটিত হয়েছে, তার বর্ণনা দিচ্ছি। এতে শরীয়তের দৃষ্টিতে বিষয়টার প্রকৃত মর্যাদা কি তা বুঝা সহজ হবে।

ইমাম আবূ হানিফার অভিমত

ইমাম আবূ হানিফা রহমা তুল্লাহি আলাইহির অভিমত এই যে, ফারসীতে (শুধু ফারসী নয়, যে কোন ভাষায়)[১] নামায পড়া অথবা আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করা অথবা আযান দেয়া (তবে শর্ত এই যে, সেই অনারবীয় ভাষার আযান যেন মানুষের কাছে পরিচিত হয় এবং তা শুনে লোকে বুঝতে পারে যে এটা আযান) জায়েয চাই নামাযী আবরী পড়তে সমর্থ হোক বা না হোক। তার যুক্তি এই যে, কুরআনে এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেনঃ

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ "এ গ্রন্থ পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও রয়েছে" (সূরা শুয়ারা, ১৯৬) এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কুরআন অবিকল বর্তমান শাব্দিক রূপ নিয়ে অতীতের গ্রন্থসমূহেও ছিল না। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে, ঐ সব গ্রন্থে কুরআন কেবল ভাবগত রূপ নিয়ে বিদ্যমান ছিল। আর সেটা যখন ভাবগত রূপ হওয়া সত্ত্বেও কুরআনই ছিল, তখন এ কথা স্বীকার করায় দোষের কি আছে যে, কুরআনের ফারসী বা অন্য কোন ভাষার অনূদিত রূপও ভাব ও অর্থের দিক দিয়ে কুরআন এবং তা নামযে পড়া জায়েয। আর এক জায়গায় আল্লাহ বলেনঃ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا

"আমি যদি একে অনারবীয় কুরআন বানাতাম... "(সূরা হামিম সিজদা-৪৪) এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কোন অনারবীয় ভাষায়ও যদি অবিকল এইসব বক্তব্য প্রকাশ করা হতো তবে তাও কুরআনই হতো। এছাড়া এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, ইরানের নব্য মুসলমানরা হযরত সালমান ফারসীকে অনুরোধ করেছিল যে, আমাদেরকে ফারসীতে সূরা ফাতিহা লিখে দিন। তিনি

---

১. আবূ সাঈদ আল বারয়ী উল্লেখ করেছেন যে, ফারসী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় পড়াকে ইমাম সাহেব জায়েয মনে করতেন না। কিন্তু কারখী লিখেছেন যে, ইমাম আযমের সঠিক অভিমত এই যে, যে কোন ভাষায় পড়া জায়েয। হেদায়া গ্রন্থেও কারখীর বক্তব্যকেই সঠিক বলা হয়েছে। তিনি লিখেছেনঃ

يَجُوزُ بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ سِوَى الْفَارِسِيَّةِ هُوَ الصَّحِيحُ

লিখে দেন এবং তারা নামাযে তা পড়তে থাকে। অবশেষে যখন তাদের মুখ কিছুটা নমনীয় হলো এবং আরবী পড়তে তারা সক্ষম হলো, তখন তারা আরবীতে পড়তে আরম্ভ করে। এ সব প্রমাণের ভিত্তিতে ইমাম সাহেব এই মত পোষণ করেন যে, অনারবীয় ভাষায় নামায পড়লে নামায শুদ্ধ হবে। তবে এটা তিনি মাকরূহ মনে করেন। কেননা এটা প্রচলিত সুন্নাতের বিপরীত। এমনকি আবূ বকর রাজির বর্ণনা অনুসারে ইমাম সাহেব শেষটায় নিজের এই মত প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এবং ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মত গ্রহণ করেছিলেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের অভিমত

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের অভিমত এই যে, যে ব্যক্তি আরবী পড়তে সক্ষম তার পক্ষে অনারবীয় ভাষায় নামায পড়া শুদ্ধ হবে না। আরবী উচ্চারণে অক্ষম হলে অনারবীয় ভাষা পড়া যাবে। তাদের যুক্তি এই যে, সূরা মুজ্জাম্মিলের ২০নং আয়াতে কুরআন নামাযে পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ অথচ এ কথা সর্ব জন স্বীকৃত যে, কুরআনের অনুবাদকে কুরআন বলা হয় না। কাজেই নামাযে কুরআন না পড়ে তার অনুবাদ পড়লে সে নামাযই হবে না। তবে যে ব্যক্তি আরবী উচ্চারণে অক্ষম সে নিরুপায়। কেননা আল্লাহ্ কাউকে তার ক্ষমতার অসাধ্য কিছু করার নির্দেশ দেন না। রুকূ সিজদা করতে অক্ষম হলে যেমন ইশারায় নামায পড়া চলে, এই ব্যক্তির নামাযও সেভাবেই শুদ্ধ হবে।

ইমাম শাফেয়ীর অভিমত

এক বর্ণনামতে ইমাম শাফেয়ী ইমাম আবূইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের অনুরূপ মত পোষণ করতেন। অন্য বর্ণনামতে ইমাম শাফেয়ীর অভিমত এই যে, যে ব্যক্তি আরবী উচ্চারণ করতে পারে না, সে কিরাত বাদ দিয়েই নামায পড়বে। অন্য ভাষায় অনুবাদ পড়লে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহর কালামের অনুবাদ

আল্লাহর কালাম নয়। সেটা মানুষের কথা। আল্লাহর কথা শুধু আরবী কুরআন। যেমন তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا - আমি এটি আরবী কুরআন আকারে নাজিল করেছি"।[১] (সূরা ইউসুফ-২)

বিষয়টির বিস্তারিত বিশ্লেষণ

উপরোক্ত বিবরণ থেকে বুঝা গেল যে, প্রাচীন ইমামগণের দৃষ্টিতে প্রশ্নের ধরনটা ছিল এরূপ যে, অনারবীয় ভাষায় নামায পড়লে নামায হবে কি না। কেউ বলেছেনঃ নামায হয়ে যাবে,তবে মাকরূহ হবে। কেউ বলেছেনঃ নামায আদৌ শুদ্ধ হবে না। কেউ বলেছেনঃ অক্ষম ব্যক্তির নামায যেমন ইশারায় হয়ে যায়, আরবী পড়তে যে অক্ষম তার নমাযও অনারবীয় ভাষায় হবে। কিন্তু হাল যামানার তথাকথিত মুজতাহিদদের সামনে প্রশ্নের ধরনটা একেবারেই অন্য রকম হয়ে গেছে। তারা প্রশ্নটিকে এভাবে দেখছেন যে, যে ব্যক্তি আরবীর অর্থ বুঝে না, তার নামায আরবীতে শুদ্ধ হবে কি না? অনারবের নামায আরবীতে পড়া উত্তম না মাতৃভাষায়? এখন যেহেতু প্রশ্নের রূপ পাল্টে গেছে, তাই এর জবাবও ভিন্ন ভাবেই দেয়া বাঞ্ছনীয়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে নামাযের উপকারিতা

নামাযের জন্য কোন্ ভাষা উত্তম এবং অধিকতর সঙ্গত-এ প্রশ্নের সঠিক সমাধান নির্ভর করে আর একটি প্রশ্নের সঠিক জবাবের ওপর। সে প্রশ্নটি এই যে, ইসলামে নামাযের মর্যাদা কি এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে নামাযের ফায়দা বা উপকারিতা কি কি?

আমি ইতিপূর্বে একটি তত্ত্ব বারবার উল্লেখ করেছি। সেটি এই যে, শুধুমাত্র ব্যক্তির পবিত্রতা ও তার প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধিই

---

১. এ বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য পড়ুন ইমাম সারাখসী প্রণীত আল মাবসুত, প্রথম খন্ড পৃ,৩৭ এবং ফাতহুল কাদীর ও শরহুল এনায়া,হেদায়ার টীকা-প্রথম খন্ড পৃঃ ১৯৯ থেকে ২০১

ইসলামের আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং সে ব্যক্তিগতভাবে সকলকে পবিত্র ও পরহেযগার বানানোর পর তাদেরকে একত্রিত করে এমন একটি উৎকৃষ্ট মানের সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ দল গড়ে তুলতে চায়, যা পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত কায়েম করার দায়িত্ব পালন করবে। এই লক্ষ্যে সে সকল ইবাদাত এমনভাবে ফরয করেছে,যাতে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনের মানসিকতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাকওয়ার প্রেরণা জাগ্রত হয় এবং সেই সাথে তাদের সমবায়ে সৎ লোকদের একটি সংগঠনও ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠতে থাকে। এই ইবাদাতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নামায। এ ইবাদাত একদিকে যেমন মানুষকে পরিশীলিত করে এবং কুরআনের হিদায়াতের বিস্তার ঘটায়, তেমনি তা কুরআনের সংরক্ষণও করে এবং মুসলমানদের একটি দলও তৈরী করে। নামাযের এই সব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামের এই সব বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিবেচনা করলে বুঝা যায় যে, নামায শুধু একজন বান্দার আল্লাহর সাথে ব্যক্তিগত কাকুতি, মিনতিই নয় এবং শুধুমাত্র প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে আলাদা আলাদাভাবে খোদাভীতির প্রেরণা সৃষ্টির মাধ্যমই নয়, বরং তা ইসলামের জীবনী শক্তির যোগানদাতাও এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উপকারিতার চেয়ে অনেক বড় ও মহত্তর স্বার্থের সংরক্ষকও।

এবার দেখুন যে, ব্যক্তিগত স্বার্থের বিচারে মানুষ নামাযে যা কিছু পড়ে তা তার উপলব্ধি করাও প্রয়োজন,যাতে করে প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধি ও আত্মার পবিত্রতা সাধনের লক্ষ্য পুরোপুরিভাবে অর্জিত হয়। এ উদ্দেশ্যে নামাযী যে ভাষা জানে ও বোঝে,সেই ভাষাতেই নামায পড়া উপকারী। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কল্যাণের তুলনায় শরীয়তের দৃষ্টিতে যে স্বার্থ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও ইপ্সিত, আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় নামায পড়ায় সে স্বার্থের ক্ষতি হবে।

প্রথমত, কুরআনের রক্ষাণাবেক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটা এতে ব্যর্থ হয়ে যাবে। যখন মানুষ কুরআনের অনুবাদকে কুরআন মনে করতে আরম্ভ করবে এবং এ ধারণা সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে যে, আসল কুরআন না পড়ে তার অনুবাদ পড়লেও

ইবাদাত ও তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তখন মূল কুরআনের গুরুত্ব হালকা হয়ে যাবে, কুরআন মুখস্থ করার প্রতিও আগ্রহ থাকবে না এবং অনুবাদকেই কার্যত আসল কুরআন হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর মূল কিতাবের প্রতি অনিহা ও অনাগ্রহ এবং অনুবাদের প্রতি ক্রমবর্ধমান ঝোঁকের পরিণাম ইসলামের বিকৃতি ও ধ্বংস ডেকে আনা ছাড়া আর কিছু হবে না। কেননা বিভিন্ন দল ও জাতির কাছে ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী অনুবাদ গৃহীত হওয়ার ফলে ইসলামের পরিণতি ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের মত শোচনীয় হবে।

তৃতীয়ত, এর ফলে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য নষ্ট হয়ে যাবে এবং ইসলামে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা দানা বাঁধবে। প্রত্যেক ভাষাভাষীদের নামায ও জামায়াত আলাদা আলাদা হয়ে যাবে। ইরানীরাও আরবদের পিছনে নামায পড়বে না তুর্কীরাও ভারতীয়দের জামায়াতে শরীক হবে না। একই অঞ্চলে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী ও মাদ্রাজীদের জামায়াত ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে আলাদা হয়ে যাবে। এভাবে নামাযের টুকরো টুকরো হওয়ার সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহও ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে।

এসব বৃহত্তর সামগ্রিক ক্ষতি থেকে অব্যাহতি পেতে হলে নামাযের জন্য একটি মাত্র আন্তর্জাতিক ভাষা নির্দিষ্ট হওয়া অপরিহার্য এবং সে ভাষা একমাত্র কুরআন নাযিল হওয়ার ভাষাই হওয়া উচিত। এতে ব্যক্তিগত ক্ষতি যে টুকু হবে, তা পুরণ করা তেমন বেশী কঠিন কাজ নয়। নামাযের বেশীর ভাগ অংশ এমন যে, তার জন্য একই ইবাদাত ও দোয়া-দরুদ নির্ধারিত। তাকবীর, তাসবীহ, আউজুবিল্লাহ ...বিসমিল্লাহ...সূরা ফাতিহা, আত্তাহিয়াতু ..এ সবের অনুবাদ মুখস্থ করতে বড় জোর দুই এক ঘন্টা লাগে। সাধারণভাবে যে সূরাগুলো নামাযে পড়া হয় তাও দশ বারোটার বেশী নয় এবং তাও খুবই ছোট ছোট। এগুলোর অর্থ শেখা কঠিন [illegible] [illegible]। বড় বড় লম্বা সূরাগুলো কোন কোন সময় সূরা

ফাতিহার সাথে মিলিয়ে পড়া হয়। কিছু নামাযী বা বেশীর ভাগ নামাযী যদি সেগুলো না বুঝতে পারে, তবে তাতে এমন কি ক্ষতি যে, তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সমস্ত সামষ্টিক ফায়দা থেকে বঞ্চিত হওয়াকে মেনে নিতে হবে?

শরীয়ত ভিত্তিক যুক্তি প্রমাণ

শরীয়তের দৃষ্টিতে নামাযের উপকারিতা, কল্যাণকারিতা ও যৌক্তিকতার যে বিবরণ উপরে দেয়া হলো, সেটা বাদ দিয়েও যখন আমরা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী বিবেচনা করি, তখন ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের অভিমতই অপেক্ষাকৃত নির্ভুল বলে মনে হয় এবং অনুমিত হয় যে, ইমাম আবূ হানিফা (রঃ) হয়তো শেষ পর্যন্ত এই মতই সমর্থন করেছিলেন।

১. পবিত্র কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে, নামাযে কুরআন তেলাওয়াত কর।

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا
أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (١-٤)

"হে কম্বলে আবৃত শয়নকারী। রাতে নামাযে দাঁড়াও, তবে অল্প কিছু অংশ –রাতের অর্ধেক অথবা তার চেয়েও কিছুটা কম অথবা কিছু বেশী কর । আর কুরআন থেমে থেমে পড় (সূরা মুজ্জাম্মিল, ১–৪)।

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَ
ثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ...... تَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا
مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ - (مزمل: ٢٠)

"হে নবী! তোমার প্রতিপালকের জানা আছে যে, তুমি কখনো রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ সময়, কখনো অর্ধেক রাত এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাক। আর

তোমার সহচরদের মধ্যেও একটি দল এই কাজ করে থাকে। ....অতএব, এখন যতটা কুরআন তোমরা সহজে পড়তে পার, ততটাই পড়তে থাক। (মুজ্জাম্মিল–২০)

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ

اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا - (بنى اسرائيل ٧٨)

"সূর্য ঢলে পড়া থেকে রাতের অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত নামায কায়েম কর। আর ফযরের সময় কুরআন পাঠের স্থায়ী নীতি অবলম্বন কর। কেননা ফযরের কুরআন পাঠে উপস্থিত থাকা হয়।" (বনী ইসরাইল–৭৮)।

এই সব ক'টি আয়াত নামাযে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছে। এ আয়াতগুলোতে "কুরআন" শব্দটাকে আলিফ–লাম সহযোগে "আলকুরআন" বলা হয়েছে, যা দ্বারা সুনির্দিষ্ট গ্রন্থকে বুঝানো হয় এবং সেই "আল কুরআনই" পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অভিধান অথবা প্রচলিত পরিভাষা কোনটার বিচারেই কুরআনের অনুবাদকে 'আল কুরআন ' নামে আখ্যায়িত করা যায় না।

২. কুরআনের একাধিক জায়গায় সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, "কুরআন" শুধু আরবী কুরআনেরই নাম এবং আল্লাহ আরবী ভাষায় যে কালাম নাযিল করেছেন সেটাই আল্লাহর কালাম। মানুষের ভাষায় তার যে ব্যাখ্যা বা অনুবাদ করা হয়েছে, চাই তা আরবী ভাষাতেই করা হোক না কেন, তা কুরআন তো হবেই না, এমনকি কুরআনের সমকক্ষও হবে না। কাজেই তা কুরআনের স্থলাভিষিক্ত কখনো হতে পারে না।

كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا - (طٰهٰ ١١٣)

"এভাবেই আমি এ গ্রন্থকে আরবী কুরআন আকারে নাযেল করেছে।" (তোয়াহা–১১৩)।

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا - (يوسف ٢)

"নিশ্চয়ই আমি এ গ্রন্থকে আরবী কুরআন আকারে নাযেল করেছি।" (ইউসুফ–২)

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ -

বক্রতামুক্ত আরবী কুরআন।" (সুরা যুমার –২৮)।

تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا - (حم سجده: ٢-٣)

এটা রহমান–রহীম খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব, যার আয়াতগুলোকে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,যা আরবী কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ।" (হামিম সিজদা ২–৩)

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ - (مريم: ٩٧)

এ গ্রন্থকে আমি তোমার ভাষাতেই সহজ করে দিয়েছি।"

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ - (بنی اسرائیل: ٨٨)

হেনবী! আপনি বলুন যে, সমগ্র মানুষ ও জিন জাতি একত্রিত হয়েও যদি এই কুরআনের মত গ্রন্থ রচনা করতে চেষ্টা করে তবে এর মত গ্রন্থ রচনা করতে পারবে না।"

(বনী ইসরাইল–৮৮)।

৩. এ কথা কুরআনেই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযেল হয়েছে, বিকৃতি থেকে মুক্ত রাখার প্রতিশ্রুতি একমাত্র সেই কিতাব সম্পর্কেই করা হয়েছে, মানুষের কৃত অনুবাদ সম্পর্কে নয়। অনুবাদে সর্ব প্রকারের বিকৃতির অবকাশ রয়েছে, চাই তা সম্পাদনার বিকৃতি হোক অথবা অনুবাদকের জ্ঞান, বুঝ ও দক্ষতার অভাবজনিত বিকৃতি হোক।

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (حم سجده ٤١-٤٢)

"এটা নিসন্দেহে এমন প্রতাপশালী গ্রন্থ যে অসত্য তার কাছে, তার সামনে দিয়েও আসতে পারে না, পেছন দিয়েও আসতে পারে না। মহাবিজ্ঞানী চির প্রশংসিত খোদার পক্ষ থেকে তা অবতীর্ণ।" (হামিম সিজদা ৪১–৪২)

যে ব্যক্তি নামাযে কুরআনের তরজমা পড়ে, সে এ কথাও নিশ্চয় করে বলতে পারে না যে, সে কুরআনের নির্ভুল অনুবাদ আবৃত্তি করছে।

৪. আল্লাহর প্রতি অনুরাগ, আত্মনিবেদন ও আল্লাহর ভয় হলো নামাযের প্রাণ। এটা সৃষ্টি করার ক্ষমতা যেরূপ হুবহু আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ কুরআনের রয়েছে, তেমনটি অন্য কোন কালামে থাকতেই পারে না। স্বয়ং কুরআন এ ব্যাপারেও সাক্ষ্য দিয়েছে। যেমনঃ

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

"আল্লাহ সর্বোত্তম বানী নাজিল করেছেন। এটা এমন এক কিতাব, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, যাকে বারবার আবৃত্তি করা হয় এবং যার প্রভাবে খোদাভীরু লোকদের শরীর প্রকম্পিত ও শিহরিত হয়, অতপর তাদের শরীর ও মন নরম হয়ে আল্লাহর স্মরণের দিকে আকৃষ্ট হয়।" (যুমার –২৩)

এমন দ্ব্যর্থহীন ও মজবুত প্রমাণাদি দেখার পর কুরআনের অনুবাদ আবৃত্তি করে নামায আদায় করলে নামায শুদ্ধ হবে বলা খুবই কঠিন। একে মাকরূহ বলাই বা কিভাবে সম্ভব? আমাদের মতে, এতে নামাযের ফরয কোন ভাবেই সমাধা হয় না। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের এ কথা ঠিক যে, যে ব্যক্তি আরবী উচ্চারণেই সক্ষম নয়, সে যতক্ষণ আরবী উচ্চরণের যোগ্যতা যোগ্যতা অর্জন না করে ততক্ষণ অনারবীয় ভাষায় তার নামায হয়ে যাবে। কেননা তার ব্যাপারটা নিরূপায় অবস্থার আওতাভুক্ত।

জুময়ার খুৎবার ভাষা

এবার আমরা প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের প্রতি মনোনিবেশ করতে চাই। এ প্রশ্নটা জুমআর খুতবার ভাষা সংক্রান্ত। এ ক্ষেত্রে একটা সাধারণ ভ্রান্তি চালু রয়েছে যে, খুৎবার ভাষা সংক্রান্ত প্রশ্নকে

নামাযের ভাষা সংক্রান্ত প্রশ্নের সাথে একাকার করে ফেলা হয়। এতে দুটি বিষয়েরই আলোচনায় জট পাকিয়ে যায়। তাই প্রথমে আমরা এ বিষয়টাই ব্যাখ্যা করবো যে, নামায ও খুতবার মানগত পার্থক্য কি।

খুতবা জুময়ার নামাযের অংশ নয়

কেউ কেউ মনে করেন, খুতবা জুময়ার নামাযের অংশ। এর প্রমাণ হিসেবে তারা বলেন যে, যোহরের চার রাকায়াত থেকে দু'রাকাত কমানো হয়েছে খুতবার জন্যই। এ ব্যাপারে হযরত উমর ও হযরত আয়েশার (রাঃ) এই উক্তির বরাত দেয়া হয় যে إنما قصرت الصلوة لأجل الخطبة- খুতবার জন্যই জুময়ার নামাযকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এ উক্তির আলোকে তারা বলেন যে, যেহেতু খুতবা নামাযের দু'রাকায়াতের স্থলাভিষিক্ত, তাই তার মর্যাদা নামাযেরই সমান। আর নামায যখন আরবীতে ছাড়া বৈধ নয়, তখন খুতবাও আরবীতে ছাড়া পড়া চলবেনা। কিন্তু এটা একটা স্থূল যুক্তি। নামায ও খুতবার বিস্তারিত বিধিমালা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নামাযের জন্য যা শর্ত, খুতবার জন্য তা শর্ত নয়।

নামাযের জন্য পবিত্রতা শর্ত। কিন্তু খুতবার জন্য তা শর্ত নয়। এমনকি যদি কেউ ভুলবশত ফরয ও ওয়াযেব গোছল বাকী থাকতে খুতবা দিয়ে ফেলে, তবে তা পুনরায় দেয়ার দরকার নেই।

নামাযের জন্য কেবলামুখী হওয়া জরুরী। কিন্তু খুতবার জন্য তা জরুরী তো নয়ই বরং কেবলার দিকে পিঠ দিয়ে মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে খুতবা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

নামাযের মধ্যে কথা বললে নামায নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু খুতবার সময় কথা বার্তা বলা জায়েয। স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের কর্মকান্ডে এর নজির বিদ্যমান। এ ব্যাপারে পরে আলোচনা করা হবে।

নামাযের জন্য নামাযের ওয়াক্ত হওয়াও শর্ত। কিন্তু খুতবা যদি সময় হওয়ার আগে শুরু করা হয় তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

হানাফী মযহাব অনুসারে জুময়ার নামাযের জন্য কমের পক্ষে তিন জন মানুষ থাকা জরুরী। কিন্তু খুতবায় ইমাম বাদে একজন থাকাও যথেষ্ট।

জুময়ার নামায বাতিল হয়ে গেলে তা আবার পড়তে হয়। কিন্তু খুতবা আবার পড়তে হয় না।

এ সব বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, খুতবা জুময়ার নামাযের অংশ নয়। আল্লামা সারাখসী 'আল মাবসূত' গ্রন্থের জুময়া সংক্রান্ত অধ্যায়ে লিখেছেনঃ

قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا اَلْخُطْبَةُ تَقُوْمُ مَقَامَ رَكْعَتَيْنِ وَلِهٰذَا لَا تَجُوْزُ اِلَّا بَعْدَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ وَالْاَصَحُّ اِنَّهَا لَا تَقُوْمُ مَقَامَ شَطْرِ الصَّلٰوةِ۔ (المبسوط ج -۔ كتاب الجمعة)

"আমাদের মাশায়িখদের কেউ কেউ বলেন যে, খুতবা যেহেতু দু'রাকায়াতের স্থলাভিষিক্ত, তাই যোহরের ওয়াক্ত শুরুর আগে খুতবা পড়া জায়েয নয়। তবে বিশুদ্ধ মত এই যে, খুতবা নামাযের এক অংশের সমকক্ষ নয়।"

হিদায়ার ব্যাখ্যা এনায়াতে বলা হয়েছেঃ

اِنَّهَا لَيْسَتْ بِرُكْنٍ لِاَنَّ رُكْنَ الشَّيْءِ مَا يَقُوْمُ بِهِ ذَالِكَ الشَّيْءُ وَصَلٰوةُ الْجُمُعَةِ لَا تَقُوْمُ بِالْخُطْبَةِ وَاِنَّمَا تَقُوْمُ بِاَرْكَانِهَا فَكَانَتْ شَرْطًا۔

"খুতবা নামাযের স্তম্ভ নয়। কেননা কোন জিনিসের স্তম্ভতাকেই বলা যায়, যার ওপর ঐ জিনিস প্রতিষ্ঠিত হয়। খুতবার ওপর জুময়ার নামায পতিষ্ঠিত নয় বরং এ নামায তার রুকনসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত । সুতরাং খুতবা জুময়ার নামাযের রুকন নয়, তবে তার শর্ত বটে।"

নামায ও খুতবার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন

এ কথা সত্য যে, খুতবাও নামাযের মত একটি ইবাদত। তবে উভয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলাদা আলাদা। নামাযে যা পড়া হয়

তার অর্থ না বুঝলেও নামাযের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কেননা সে যদি আল্লাহর ফরযকৃত ইবাদতকে ফরয বলে মানে, নামাযের সময় হলে ফরয কাজ সমাধা করার জন্য প্রস্তুতি নেয়, আর প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব দেয় ও যত্ন নেয়, অতপর সমস্ত শর্ত ও রুকন সহকারে নামায এমনভাবে আদায় করে যে, আল্লাহ তার গোপন কথাও শুনতে পান এবং নামাযের কোন জরুরী অংশ বাদ দিলে আল্লাহ তা জানতে পারবেন, এ ব্যাপারে সে পুরো সচেতন এবং সে যদি এ কথা অনুধাবন করে যে, রুকু সিজদা ওঠা, বসা ও দাঁড়ানো–যা কিছুই আমি করছি, কেবল আল্লাহর জন্যই করছি, আল্লাহ ছাড়া আর কারুর ইবাদত আমি করি না, তা হলে নামায ফরয করার উদ্দেশ্য সফল হয়। কিন্তু খুতবার যা উদ্দেশ্য, শ্রোতারা খুতবা না বুঝলে সে উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। কেননা খুতবার উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর স্মরণ এবং তার প্রতি প্রত্যাবর্তন, আত্মনিবেদন ও তার ভয় সৃষ্টি করাই নয়, বরং ইসলামের নির্দেশাবলী জানানো, শেখানো, স্মরণ করানো এবং উপদেশ দেয়াও তার উদ্দেশ্য। লোকেরা যতক্ষণ খুতবায় বর্ণিত এই সব উপদেশ ও হুকুম না বুঝবে ততক্ষণ উক্ত উদ্দেশ্য সফল হওয়া অসম্ভব।

খুতবার উদ্দেশ্য

ইসলামী বিধানের প্রচার, উপদেশ দান ও স্মরণ করানো যে খুতবার উদ্দেশ্য, কেউ কেউ তা স্বীকার করে না। তারা বলে যে, কুরআনে আল্লাহ খুতবাকে আল্লাহর স্মরণ বা জিকির বলে অভিহিত করেছেন। যথা– فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ "জুমুয়ার দিনে নামাযের ডাক এলে তৎক্ষণাত আল্লাহর স্মরণের দিকে ছুটে যাও।" সুতরাং তাদের মতে খুতবাও নামাযের মত ইবাদত এবং তা শ্রোতাদের বুঝা জরুরী নয়। এর সমর্থনে তারা ইমাম আবু হানিফার এই উক্তির বরাত দেয় যে, খুতবার শর্ত পুরণের জন্য কেবল আল্লাহর প্রশংসাই যথেষ্ট এবং প্রচলিত ভাষায় খুতবা বলতে যা বুঝা যায়, তা জুমুয়ার নামাযের জন্য শর্ত নয়। তারা এ মতের স্বপক্ষে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি ঘটনা থেকেও

যুক্তি প্রদর্শন করে। তিনি যখন খলীফা হলেন এবং খুতবা দিতে দাঁড়ালেন তখন সমবেত জনতাকে দেখে তিনি এতটা ঘাবড়ে গেলেন যে, শুধুমাত্র আলহামদুলিল্লাহ বলেই বসে পড়লেন। এতে সাহাবায়ে কিরাম কোন আপত্তি করেননি।

কিন্তু এই যুক্তি একাধিক কারণে অচল।

প্রথমত, فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ এ আয়াতে আল্লাহর জিকির অর্থ যে খুতবাই, সেটা নিশ্চিত নয়। এর অর্থ নামাযও হতে পারে। বরঞ্চ কুরআনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ শব্দ দ্বারা নামাযই বুঝানো হয়েছে। তাফসীরকারগণ এবং ফিকাহ বিদগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, এ আয়াতে উল্লিখিত জিকির দ্বারা শুধু খুতবা, বুঝানো হয়েছে না শুধু নামায অথবা উভয়টা। তবে আয়াতটি প্রথম থেকে নিবিষ্ট চিত্তে পড়ে দেখলে মনে হয়, জিকির দ্বারা নামাযের মর্ম গ্রহণ করাই অধিকতর সঙ্গত।[১] যেমন প্রথমে বলা হয়েছে যে, "যখন জুমআর দিনে নামাযের ডাক দেয়া হবে" অতপর বলা হয়েছে, "সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর জিকিরের দিকে ছুটে যাও।" এ থেকে বুঝা যায় যে, জিকির অর্থ নামায। আর খুতবা

---

১. ইবনে হুমাম বলেনঃ

فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ فَكَانَ الظَّاهِرُ أَنَّ الذِّكْرَ الصَّلَاةُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ
الْمُرَادُ بِهِ الْخُطْبَةَ ۔ فتح القدير

"এ আয়াতে জিকির এর অর্থ বাহ্যত নামায। তবে এর অর্থ খুতবাও হতে পারে।" (ফাতহুল কাদীর) তাফসীর গ্রন্থ রূহুল মায়ানীতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর জিকির অর্থ খুতবা ও নামায দুটোই। তবে অচিরেই প্রকাশ পাবে যে, জিকির অর্থ নামায। আবার এর অর্থ খুতবাও হতে পারে। "সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবের মতে জিকির অর্থ এখানে ইমামের ওয়ায নসিহত। (আহকামুল কুরআন) আল্লামা আবূ বকর জাসসাসের মতে জিকির অর্থ একমাত্র খুতবা।

وَيَدُلُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّكْرِ هٰهُنَا الْخُطْبَةُ أَنَّ الْخُطْبَةَ هِيَ الَّتِي تَلِي النِّدَاءَ
وَقَدْ أَمَرَ بِالسَّعْيِ إِلَيْهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْخُطْبَةُ ۔ [illegible]

নিছক আনুসঙ্গিক বিষয় হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। জিকির অর্থ যদি শুধু খুতবা হতো, তা হলে বলা হতোঃ "ছুটে যাও , আল্লাহর জিকির ও নামাযের দিকে।"

দ্বিতীয়ত. 'আল্লাহর জিকির'কে যদি নামায অর্থে গ্রহণ করা না হয়, তা হলে এটা কোন্ যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর স্মরণ কেবল আরবী ভাষাতেই হওয়া উচিত। আল্লাহর স্মরণকে আরবী ভাষায় সীমিত করা কুরআন ও হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় না, যুক্তি দ্বারাও সাব্যস্ত হয়না। কুরআন ও হাদীসে কোথাও বলা হয়নি যে,আল্লাহকে স্মরণ করতে চাও তো কেবলমাত্র আরবীতেই কর। এ জন্য ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন যে, যে জিকির দ্বারা আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা করা কাম্য, তা আরবী ভাষায় 'আল্লাহু আকবর' বলা অথবা অন্য কোনো ভাষায় 'আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ট' বলা— উভয়ভাবেই করা যায়। ইমাম মুহাম্মদ এই মতের সমর্থনে বলেন যে - الذكر يحصل بكل لسان "প্রত্যেক ভাষাতেই জিকিরের উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে।"

তৃতীয়ত, খুতবার শর্ত পূরণের জন্য যদি হানাফী মাযহাব শুধুমাত্র আল্লাহর প্রশংসাকে যথেষ্ট মনে করে থাকে তবে তার অর্থ এ নয় যে, খুতবার উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহর প্রশংসা দ্বারাই সফল হয় এবং এছাড়া অন্যান্য জিনিস নিছক অতিরিক্ত ও গুরুত্বহীন।[১]

---

১. এ ব্যাপারে হযরত ওসমানের (রাঃ) ঘটনাকে প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করানো ঠিক নয়। প্রথমত, এই ঘটনাতেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করেননি, বিশাল জনসমাবেশ দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার কারণে তার বাকশক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি তার ভাষণকে সংক্ষিপ্ত করেন। তাছাড়া এ কথাও ঠিক নয় যে, তিনি আল্লাহর প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই বলেননি। আসল ঘটনা এই যে, তিনি যখন দেখলেন তার মুখে কথা আসছে না, তখন তিনি এই কথাটুকু বলে বসে পড়লেন।

إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا وأنتم إلى إمام فعال أحوج
منكم إلى إمام قوال وستأتيكم الخطب بعد وأستغفر الله لي ولكم

হানাফীগণ তো এ কথাও বলেন যে, জুময়ার নামাযের জন্য জামায়াতের যে শর্ত, তা মাত্র তিনজন হলেই পূর্ণ হয়। তাই বলে কি জুময়ার নামাযের উদ্দেশ্য এই ক্ষুদ্র জামায়াত দ্বারাই অর্জিত হয় এবং বড় জামায়াতের কোন গুরুত্ব নেই?

চতুর্থত, হানাফী মাযহারের শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ এ কথা স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, খুতবার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর স্মরণ এবং উপদেশ দান। হিদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

وَلَوْ خَطَبَ قَاعِدًا أَوْ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ جَازَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ

"ইমাম যদি বসে বসে খুতবা দেয় কিংবা অপবিত্র অবস্থায় দেয়, তা হলেও জায়েয হবে। কেননা তাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।" আল্লামা ইবনে হুমাম খুতবার উদ্দেশ্য এই বলে ব্যাখ্যা করেছেন যে, ذِكْرُ اللّٰهِ وَالْمَوْعِظَةُ "খুতবা হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ ও নসিহত।" শুধু হানাফী মাযহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রাচীন আলিমদের সকলেই খুতবার উদ্দেশ্য এটাই বুঝতেন আর এজন্য তারা প্রায়ই "موعظة الإمام" অর্থাৎ 'ইমামের ওয়ায নসিহত' শব্দটিই খুতবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন। আল্লামা ইবন হাযার 'ফাতহুল বারী'তে একটি হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেনঃ

وَمِنْ حِكْمَةِ اسْتِقْبَالِهِمُ الْإِمَامَ التَّهَيُّؤُ لِسَمَاعِ كَلَامِهِ وَسُلُوكُ الْأَدَبِ مَعَهُ فِي اسْتِمَاعِ كَلَامِهِ فَإِذَا اسْتَقْبَلَهُ بِوَجْهِهِ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِجَسَدِهِ وَبِقَلْبِهِ وَحُضُورِ ذِهْنِهِ كَانَ أَدْعَى لِتَفَهُّمِ مَوْعِظَتِهِ وَمُوَافَقَتِهِ فِيمَا شُرِعَ لَهُ الْقِيَامُ لِأَجْلِهِ-

'শ্রোতাদেরকে যে ইমামের দিকে মুখ করে বসতে বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেন তার কথা শুনতে

"আবু বকর ও ওমর এ ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য ভাষণ প্রস্তুত করে নিয়ে আসতেন। আজ তোমাদের আসল প্রয়োজন একজন কর্মঠ নেতার-বাকপটু নেতার নয়। অবশ্য পরবর্তী সময়ে তোমাদেরকে ভাষণাদিও শোনানো হবে। আপাতত আমি নিজের ও তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফের দোয়া করছি।"

মানসিকভাবে তৈরী হয় এবং কথা শ্রবণের ব্যাপারে তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে। শ্রোতা যখন তার দিকে মুখ করে বসবে, দেহ ও মন নিয়ে তার দিকে নিবিষ্ট হবে এবং একাগ্রতার সাথে শুনবে, তখন ইমামের উপদেশ খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে। আর ইমামকে যে উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে উদ্দেশ্য হাসিলের এটা সহায়ক হবে।" (দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ২৭৩)

পঞ্চমতঃ, এটা ভেবে দেখার মত যে, খুতবার প্রথা প্রবর্তন করায় শরীয়তের উদ্দেশ্য যদি কেবল আল্লাহর জিকিরের ব্যবস্থা করাই হতো, তা হলে সে জন্য কি নামায যথেষ্ট ছিল না? নামাযই তো উৎকৃষ্টতম পন্থায় জিকিরের উদ্দেশ্য পুরণ করে। নামাযের মত পূর্ণাঙ্গ ও উৎকৃষ্টতম ইবাদতকে সংক্ষিপ্ত করে তার সময়ের একাংশ খুতবার জন্য বরাদ্দ করা এবং সেই খুতবাকে নামাযের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত করার কি কারণ থাকতে পারে?"

ষষ্ঠতঃ, জুমআর নামাযের জন্য খুতবাকে শর্তরূপে গণ্য করার ব্যাপারে যে জিনিসটিকে ফিকাহ বিশারদগণ প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন তা এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে এ কাজ করে গেছেন। তিনি এবং তাঁর খলীফাগণ ও সাহাবাগণ কখনো খুতবা ছাড়া জুমআর নামায পড়েননি। এ জন্যই খুতবাকে জুমআর নামাযের শর্তরূপে গণ্য করে বিধি প্রণীত হয়েছে। একই পন্থায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের নিয়মিত ও অব্যাহত কার্যধারা থেকে আমরা এটাও জানতে পারি যে, খুতবা নিছক আল্লাহর প্রশংসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো না, বরঞ্চ তাতে মানুষকে খোদাভীতিরও তাগিদ দেয়া হতো, শরীয়তের আদেশ নিষেধও বর্ণনা করা হতো, চরিত্র ও কর্মের সংশোধন ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য উপদেশাবলীও দেয়া হতো এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যাবলীর ব্যাপারেও পরামর্শ ও হিদায়েত দেয়া হতো। এমন কি, খুতবা দেয়ার সময়ও যদি ইমাম সাহেব কাউকে কোন ভুল কাজ করতে দেখতেন তবে তা শুধরে দিতেন। কোন বিলম্ব লোককে

দেখতে পেলে তার সাহায্যের জন্য শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন এবং শ্রোতাদের মধ্যে কারুর কোন অভিযোগ থাকলে সে ইমামের সামনে তা পেশ করতো, আর ইমামও তা শুনতেন। বস্তুতঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশিদীন কখনো খুতবা ছাড়া জুময়ার নামায পড়েননি–একথা যেমন সত্য, তেমনি এ কথাও সত্য যে, তিনি ও তার সাহাবাগণ কখনো এমন খুতবাও দেননি, যাতে উপরোক্ত বিষয়গুলোর সমাবেশ ঘটতো না।

রসূল (সাঃ) ও সাহাবাগণের খুতবার কয়েকটি নমুনা

আমাদের উপরোক্ত বক্তব্য স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য নমুনা স্বরূপ রসুল (সাঃ)–এর কয়েকটি খুতবা এখানে উদ্ধৃত করছি। শরীয়তের দৃষ্টিতে খুতবার প্রকৃত মান কি ছিল, তা খুতবাগুলো দেখলে বুঝা যায়।

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنَّ هٰذَا
يَوْمٌ جَعَلَهُ اللّٰهُ عِيْدًا فَاغْتَسِلُوْا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيْبٌ فَلَا
يَضُرُّهُ اَنْ يَمَسَّ مِنْهُ عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ (موطا - ابن ماجه)

উবাইদ বিন সাব্বাক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল (সাঃ) একবার জুময়ার খুতবায় বলেনঃ "হে মুসলমানগণ! আজকের এ দিনটিকে আল্লাহ ঈদরূপে নির্ধারণ করেছে। কাজেই এ দিনে তোমরা গোসল করবে। যার কাছে কোন সুগন্ধী দ্রব্য আছে, সে যদি তা ব্যবহার করে তা হলেও মন্দ হয় না। আর শোনো, তোমরা অবশ্যই মেসওয়াক করবে।"

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দেয়ার সময় বলেনঃ "তোমাদের ব্যাপারে যে জিনিসকে আমি সবচাইতে বেশী ভয় পাই, তা হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচুর্য্য।" একজন জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া

রসূলুল্লাহ! পৃথিবীর প্রাচুর্য অর্থ কি? তিনি বললেনঃ "দুনিয়ার ঐশ্বর্য ও জাকজমক।" একজন বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ! ভালো জিনিস থেকেও কি অকল্যাণ আসে? এ কথা শুনে রসূল (সাঃ) কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। লোকেরা ভাবলো রসূল (সাঃ)-এর ওপর বোধ হয় কোন ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। অতপর তিনি নিজের কপাল থেকে ঘাম মুছলেন। এরপর জিজ্ঞাসা করলেনঃ প্রশ্নকর্তা কোথায়? লোকটি বললোঃ আমি উপস্থিত। তিনি বললেনঃ "কল্যাণ শুধু কল্যাণকর জিনিস থেকেই আসে। এই দুনিয়ার ধনসম্পদ খুবই মনোহর ও মিষ্টি। বসন্তকালে যখন পৃথিবীতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়, তখন যে পশু তা অতিমাত্রায় পেট ভরে খায়, সে অজীর্ণতায় ভুগে মারা যায়, কিংবা মরণাপন্ন হয়। তবে যে পশু খেতে খেতে পেট ভারী হলেই খাওয়া বন্ধ করে, রৌদ্রে বিচরণ করে, কিছুক্ষণ জাবর কাটে, কিছু পেশাব-পায়খানা করে বের করে দেয় এবং পেট খালি হয়ে গেলে পুনরায় খেতে যায়, সে নিরাপদে থাকে। এই ধন-সম্পদ যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত উপায়ে উপার্জন করবে এবং ন্যায় পথে ব্যয় করবে, তার জন্য এ সম্পদ উত্তম সহায়ক। আর যে অন্যায়ভাবে উপার্জন করে, সে ঐ ব্যক্তির সাথে তুলনীয়, যে কেবল খেতেই থাকে এবং কোনক্রমেই তার পেট ভরে না।" (বুখারী, রিফাক ও যাকাত অধ্যায়)

আমর বিন তাগলাব বর্ণনা করেন যে, একবার রসূল (সাঃ)-এর কাছে কিছু ধনরত্ন এলো। তিনি সেগুলো কতক লোককে বন্টন করে দিলেন এবং কতককে বাদ দিলেন। পরে তিনি জানতে পারলেন যে, যাদেরকে দেয়া হয়নি তারা দুঃখ পেয়েছে। এ সম্পর্কে তিনি খুতবায় বললেনঃ আমি কাউকে দেই, কাউকে দেই না। যাকে দেইনা সে যাকে দেই তার চেয়ে আমার বেশী প্রিয়। যাদের মধ্যে অস্থিরতা ও উদ্বেগ টের পাই তাদেরকে দেই। আর যাদের মধ্যে আল্লাহ ত্যাগের মনোভাব ও সদিচ্ছার জন্ম দিয়েছেন, তাদেরকে আমি তাদের ত্যাগের মনোভাব ও সদিচ্ছার কাজেই ন্যস্ত করি।" (বুখারী)

একটা প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি জুমুয়ার নামাযে হাজির হলো। রসূল (সাঃ) তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি তাকে ডেকে বললেনঃ "ওহে বাপু, তুমি কি নামায পড়েছ? সে বললোঃ না। তখন রসূল (সাঃ) বললেনঃ "ওঠ, নামায পড়।" আসলে এই লোকটি ছিল অত্যন্ত জীর্ণ দশাগ্রস্ত। হযরতের উদ্দেশ্য ছিল, লোকে তার দুরবস্থা দেখুক। সে যখন নামায শেষ করলো, তখন রসূল (সাঃ) শ্রোতাদেরকে সদকার উপদেশ দিলেন। প্রায় সব ক'টি হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটির বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম আহমদের বর্ণিত হাদীসে রসূল (সাঃ)-এর এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছেঃ "এই ব্যক্তি যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন আমি দেখলাম সে অত্যন্ত জীর্ণ দশাগ্রস্ত। তাই তাকে আমি দু'রাকায়াত নামায পড়ার নির্দেশ দিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কেউ তার অবস্থা দেখুক এবং তাকে কিছু সদকা দিক।"

আর এক হাদীসে আছে যে, হুজুর (সাঃ) খুতবা দিচ্ছিলেন। দেখলেন যে, এক ব্যক্তি মানুষের ঘাড়ের ওপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে সামনে এগুচ্ছে। তিনি তাকে ডেকে বললেনঃ "বসে পড়। তুমি মানুষকে কষ্ট দিয়েছ।" (আবূ দাউদ নাসায়ী)।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদিন রসূল (সাঃ) খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন দুর্ভিক্ষের সময় ছিল। এক ব্যক্তি ফরিয়াদ করলো যে, ইয়া রসূলুল্লাহ! পশুগুলো মরে গেছে এবং শিশুরা উপবাস করছে। আপনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন।

তিনি তৎক্ষণাৎ দোয়া করলেন। আল্লাহর রহমতে বৃষ্টি শুরু হলো এবং পরবর্তী জুমুয়া পর্যন্ত একাধারে বৃষ্টি হলো। পরবর্তী জুমুয়ায় তিনি খুতবা দিতে দাঁড়ালে সেই লোকটি আবার ফরিয়াদ করলো যে, ইয়া রসূলুল্লাহ! ঘর ধসে গেছে এবং মালপত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি আবার দোয়া করলেন।

প্রসিদ্ধ ঘটনা যে, একবার হযরত ওমর (রাঃ) খুতবা দিচ্ছিলেন। এ সময়ে হযরত ওসমান (রাঃ) এলেন। হযরত ওমর

(রাঃ) বললেনঃ "মানুষের কি হলো যে, জুমআর আযানের পর নামাযের জন্য আসতে এত দেরী করে?" অতপর হযরত ওসমানকে (রাঃ) লক্ষ্য করে বললেনঃ "এটা কোন সময়?" তিনি জবাব দিলেন যে, "আমি কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আযানের শব্দ শুনে আর বাড়ীতে যাইনি। ওযু করে সোজা এখানে চলে এলাম।" হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ "বেশ! আসতে তো দেরী করেছেনই। এখন আরো জানা গেল যে, শুধু ওযুটা করেই এসেছেন। আপনি কি জানেননা যে, রসূল (সাঃ) জুমআর দিন গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন।" (বুখারী ,মুয়াত্তা, মুসলিম)

রসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের বহু সংখ্যক খুতবা নির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো। এগুলো পড়লে জানা যায় যে, যাঁদের নিয়মিত ও অব্যাহত কার্যধারা দেখে খুতবাকে শরীয়তে অপরিহার্য মনে করা হয়েছে, তারা খুতবা অর্থ শুধু আল্লাহর জিকির মনে করতেন না বরং তাঁরা এ দ্বারা ইসলামী আদর্শের প্রচার, শিক্ষা দান, সংশোধন, পথ প্রদর্শন এবং জাতীয় ও ব্যক্তিগত বহু কাজ সম্পন্ন করতেন। আসলে শরীয়ত খুতবার ব্যবস্থা এ জন্য প্রবর্তন করেনি যে, খৃষ্টানদের গীর্জায় যেমন শ্লোক পড়ে শোনানো হয়, মুসলমানরাও সপ্তাহে একবার ঠিক তেমনি একটা জিনিস শুনে আসবে। প্রকৃত পক্ষে খুতবাকে মুসলমানদের সামষ্টিক জীবনের একটা সচল ও সক্রিয় যন্ত্রের আকারে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, সপ্তাহে একবার বাধ্যতামূলকভাবে একটি নির্দিষ্ট এলাকার সকল মুসলমানকে জমায়েত করে আল্লাহর হুকুম ও ইসলামের বিধিসমূহ শিক্ষা দেয়া হবে। তাদের দলে কিংবা ব্যক্তিবর্গের জীবনে কোন বিকৃতি বা গোমরাহী এসে থাকলে তা শুধরানো হবে এবং জাতীয় কল্যাণ ও সমৃদ্ধির কাজের প্রতি তাদের মধ্যে আকর্ষণ, আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সৃষ্টি করতে হবে। তাছাড়া রাজধানীর কেন্দ্রে দেশের ইমাম (Head of the state) বা শাসক বা রাষ্ট্রপতি সরাসরিভাবে নিজ সরকারের নীতি ও কর্মসূচী জনগনের সামনে পেশ করতে থাকবেন এবং জনগণের মধ্যে তাঁর

প্রত্যেকে তার কাছে প্রশ্ন করা এবং তার কাছে নিজের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পাবে। এটাও ছিল খুতবার অন্যতম লক্ষ্য।

নামায এবং খুতবার আরো একটা পার্থক্য

নামায ও জুময়ার খুতবার মধ্যে আরো একটা পার্থক্য রয়েছে। সেটি এই যে, নামাযে যে সব জিনিস পড়তে হয়, তার সবই শব্দে শব্দের নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি আরবী জানেন, সে সামান্য একটু সময় ব্যয় করে সহজেই তার অনুবাদ মুখস্ত কিংবা এর মর্মার্থ মনে বদ্ধমূল করে নিতে পারে। এ জন্য নামায আরবীতে পড়া হলে এ আশংকা নেই যে, যারা আরবী জানে না তারা নামাযে পড়া দোয়া দরুদ ও সূরার অর্থ বুঝার ফায়দা থেকে একেবারেই বঞ্চিত থেকে যাবে। খুতবার ব্যাপারটা ঠিক এর বিপরীত। এর কোন শাব্দিক রূপ নির্দেশ নেই। প্রত্যেক জুমায়ায় একটা নতুন খুতবা দিতে হয় এবং তার অনুবাদ আগে থেকে মুখস্ত করে নেয়া বা তার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করে আসা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং খুতবার জন্য আরবীকে বাধ্যতামূলক করার সুনিশ্চিত ফল এই হবে যে, আরবী না জানা লোকদের জন্য তা নিছক একটা নিরর্থক জিনিস এবং একটা নিষ্প্রাণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হবে। এতে করে খুতবা প্রবর্তনে শরীয়তের যে সব মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, সে সব নস্যাৎ হয়ে যাবে। একজন সাধারণ কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষও এটা বুঝতে পারে যে, তুর্কী ভাষাভাষীর সামনে সংস্কৃত ভাষায় এবং ফার্সী ভাষা-ভাষীদের সামনে জার্মান ভাষায় বক্তৃতা করা একটা অর্থহীন অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়। যে মহাবিজ্ঞানী খোদা শরীয়তের বিধান প্রণয়ন করেছেন তাঁর সম্পর্কে কিভাবে এরূপ ধারণা করা চলে যে, ইসলামের নির্দেশাবলী বুঝানো এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য তিনি শ্রোতারা আদৌ বুঝতে পারেনা এমন ভাষায় বক্তৃতা দেয়ার নির্দেশ দেবেন?

পূর্বোক্ত আলোচনার সার নির্যাস

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হলো তা থেকে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছেঃ প্রথমত, খুতবা জুময়ার নামাযের অংশ নয়।

কাজেই নামাযের জন্য আরবী ভাষা বাধ্যতামূলক হলেই খুতবার জন্যও আরবী ভাষা বাধ্যতামূলক হয় না।

দ্বিতীয়ত, খুতবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার পেছনে শরীয়তের যে সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিহিত রয়েছে, শ্রোতাদের বোধগম্য নয় এমন কোন ভাষায় খুতবা পড়া হলে সেসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নস্যাৎ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে নামায যে উদ্দেশ্যে ফরয করা হয়েছে, মুসল্লীদের না বুঝার কারণে সে উদ্দেশ্য বিফল হয় না। অন্য কথায় বলা যায়, না বুঝার দরুন নামাযে কেবল আংশিক ক্ষতি হয়। কিন্তু খুতবা না বুঝলে সার্বিক ক্ষতি সাধিত হয়।

তৃতীয়ত, অর্থ না বুঝার কারণে নামাযে যে আংশিক ক্ষতি সাধিত হয়। তাও নামাযের দোয়া দরুদ ও সূরা কালামের অনুবাদ মুখস্ত করে সহজেই রোধ করা সম্ভব। কিন্তু খুতবা না বুঝার কারণে যে সার্বিক ক্ষতি অনিবার্য হয়ে ওঠে, তা দূর করার কোন উপায় নেই।

আরবী ছাড়া খুতবা অবৈধ হওয়ার যুক্তি

এবার আমাদের বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় খুতবা পড়ার বিপক্ষে কোন শরীয়তসম্মত যুক্তি-প্রমাণ আছে কিনা। এ প্রশ্নে যখন আমরা কুরআন ও সুন্নাহ পর্যালোচনা করি, তখন খুতবার জন্য আরবী ভাষা বাধ্যতামূলক মনে করা যায় এমন কোন বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় তো নয়ই, ইশারা-ইংগীতেও পরিলক্ষিত হয় না। যারা আরবীকে বাধ্যতামূলক মনে করেন তারাও এর প্রমাণ হিসেবে কোন হাদীস বা আয়াত পেশ করেননি। তাদের একমাত্র যুক্তি এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম ও প্রাচীন মুসলিম মনিষীগণ সব সময় আরবীতে খুতবা পড়েছেন এবং কখনো খুতবায় আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করেননি। তারা বলেন যে, রসূল (সাঃ)-এর বৈঠকে কখনো কখনো অনারব ব্যক্তিরাও উপস্থিত থাকতো। কিন্তু কোন রেওয়ায়েত থেকেই জানা যায় না যে, তিনি তাদেরকে বুঝানোর জন্য আরবী ছাড়া অন্য কোন

ভাষায় ভাষণ দিয়েছেন অথবা অনারবীয় ভাষায় অভিজ্ঞ সাহাবীদেরকে ঐ সব ব্যক্তিকে বুঝানোর কাজে নিয়োগ করেছেন। ইসলামের প্রচার ও দাওয়াতের কাজের প্রতি আগ্রহ ও উদ্দীপনা রসূল (সাঃ)-এর পর সাহাবীদের মধ্যেই সব চেয়ে বেশী ছিল এবং তাদের আমলে প্রচুর পরিমাণ অনারব দেশ বিজিত হয়েছিল, যার অধিবাসীরা আরবী জানতো না। অথচ তা সত্ত্বেও তারা আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কখনো খুতবা দিতেন না। এ কারণেই প্রাচীন ও আধুনিক যুগের বিপুল সংখ্যক শরীয়ত বিশারদ খুতবার বিশুদ্ধতা ও সুন্নাত আদায়ের স্বার্থে আরবীতে খুতবা দেয়া জরুরী বলে মত পোষণ করেছেন। একমাত্র ইমাম আবু হানিফাই আরবী ছাড়া অন্যান্য ভাষায় খুতবা দেয়াকে শর্তহীনভাবে বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। তিনি ছাড়া প্রাচীন আলেমগণের মধ্যে আর কেউ এর বৈধতার পক্ষপাতী নন। ১

উল্লিখিত যুক্তির সমালোচনা

আমাদের মতে উল্লিখিত যুক্তিতে একাধিক মৌলিক গলদ রয়েছে। পয়লা গলদ এই যে, যারা এই যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তারা শরীয়ত সম্মত কর্মকান্ড এবং প্রথাসিদ্ধ ও স্বাভাব-সুলভ কর্মকান্ডের মধ্যে পার্থক্য করেন না। এ আলোচনার শুরুতে আমরা ''কয়েকটি জরুরী প্রাথমিক কথা'' শীরোনামে চার নম্বর সূত্রের আওতায় এ বিষয়ে বক্তব্য রেখে এসেছি। এটা সবার জানা যে, রসূল (সাঃ) এর ভাষা আরবী ছিল। যাদের সাথে তাঁর কথা বলার সম্পর্ক ছিল তারা সকলে হয় আরব ছিল, নতুবা এমন অনাবর যারা আরবেই বসবাস করতো এবং আরবী ভাষা রফত করে ফেলেছিল। যেমন সালমান ফারসী। তাদের সামনে তিনি আরবী ছাড়া আর কোন ভাষায় খুতবা দেবেন?

---

১. ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ সম্পর্কে কোন কোন রেওয়ায়েতের সূত্রে জানা যায় যে, তাঁরা উভয়ে ইমাম আবু হানিফার সমমতাবলম্বী ছিলেন। অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের মতে শুধুমাত্র আরবী খুতবা দিতে অপারগ ব্যক্তির পক্ষেই অন্যান্য ভাষায় খুতবা দেয়া জায়েয।

আরবী ভাষাভাষী নবী আরব জনগণের সামনে আরবীতে বক্তৃতা দেবেন-এটা তো একটা স্বভাবসুলভ কাজ। এটাকে শরীয়তের ব্যাপারে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা কিভাবে সঙ্গত হতে পারে? তিনি যদি বলতেন যে, খুতবা আরবীতেই দিতে হবে এবং অন্য কোন ভাষায় দেয়া যাবে না, তাহলে সেটা অবশ্যই শরীয়তের ব্যাপারে দলিল হতো। কিন্তু তিনি যখন সে ধরনের কিছু বলেননি, তখন রসূল (সাঃ) সব সময় আরবীতে খুতবা দিয়েছেন একমাত্র এই যুক্তিতে আরবী খুতবাকে "সুন্নাত" বলে অভিহিত করা যায় না। এ ধরনের প্রথাসিদ্ধ ও স্বভাবসুলভ কাজকে শরীয়তের পরিভাষায় সুন্নাত আখ্যায়িত করার অর্থ দাড়াবে এই যে, আরবী ভাষায় কথা বলাকেও সুন্নাত মানতে হবে। কেননা রসূল (সাঃ) সারাজীবন আরবীতেই কথা বলেছেন এবং অন্য কোন ভাষায় তার কথা বলার কোন প্রমাণ নেই। এর জবাবে কেউ হয়তো বলবে যে, আরবীতে নামায পড়াও তো তাঁর একটা স্বভাবসুলভ কাজ ছিল। তা সত্ত্বেও আপনি এটাকে শরীয়ত সম্মত কাজ মনে করেন কেন? এর জবাবে আমি বলবো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় আরবীতে নামায পড়েছেন একমাত্র এই যুক্তিতেই নামাযের জন্য আরবী বাধ্যতামূলক হয়নি। এটা স্বভাবসুলভ কাজ হলেও এর সাথে শরীয়তের হুকুমও রয়েছে। তাছাড়া আগেই বলেছি যে, এর সাথে একাধিক শরিয়ত সংক্রান্ত স্বার্থ জড়িত রয়েছে। এ জন্য আরবীতে নামায পড়া বাধ্যতামূলক সাব্যস্ত হয়েছে। অপরদিকে আরবী না জানা লোকদের সামনে আরবীতে খুতবা দেয়াতে কোন শরীয়ত সংক্রান্ত স্বার্থ নিহিত নেই। বরঞ্চ এতে উল্টো শরীয়তের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। আরবী ভাষাভাষী রসূল (সাঃ) আরবীভাষী মানুষের সামনে সব সময় আরবীতে খুতবা দিতেন-কেবলমাত্র এ যুক্তিতে এটাকে বাধ্যতামূলক করা যায় না।

উল্লিখিত যুক্তির দ্বিতীয় ত্রুটি এই যে, এতে সময় ও পরিবেশের পার্থক্যটা উপেক্ষা করা হয়েছে। রসূল (সাঃ)-এর আমলে যে সব অনারব লোকজন রসূল (সাঃ)-এর বৈঠকাদিতে উপস্থিত হতো, তাদের বেশীর ভাগই আরবী জানতো। দু'একজন

আরবী না জানা লোক তাদের মধ্যে থাকলেও আরবী ভাষাভাষী বিপুল সংখ্যক জনতাকে বাদ দিয়ে সেই এক বা দু'চারজন লোকের জন্য বক্তৃতার ভাষা পাল্টানো সম্ভব ছিল না। [১] তা ছাড়া রসূল (সাঃ)-এর আমলের পর যখন সাহাবায়ে কিরাম বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে অনারব দেশগুলোতে উপনীত হলেন, তখন তারা একটা শাসক জাতির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল তাদের হাতে। তারা বিজয়ী ছিলেন–বিজিত নয়। অনারবদেরকে বুঝানোর প্রয়োজন তাদের ছিল না, বরং অনারবদেরই প্রয়োজন ছিল তাদের কথা বুঝে নেয়ার। নিজেদের ভাষা ভিন্ন দেশে চালু করা ও বিস্তার করার মত ক্ষমতা ও দাপট তাদের ছিল এবং বাস্তবিক পক্ষেই তারা বুখারা থেকে স্পেন পর্যন্ত সে ভাষাকে চালু করেই ছেড়েছিলো। এমনকি তাদের বিজিত অনেক দেশের নিজস্ব ভাষা আরবীর মোকাবিলায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় নিজেদের ভাষা বাদ দিয়ে বিজিত জাতিগুলোর ভাষায় ভাষণ দেওয়ার তাদের কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু আজ সে অবস্থা নেই। আরবী ভাষার কর্তৃত্ব অনেক আগেই অবসান ঘটেছে। মুসলিম জগতের অধিকাংশ দেশে এখন শত শত বছর অবধি আরবীর কোন চর্চা নেই। অধিকন্তু রাজনৈতিক ও জ্ঞানগত দুর্বলতার দরুন ক্রমেই তার চর্চা হ্রাস পেয়ে চলেছে। অন্যান ভাষার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং দিক–দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে এমন ক্ষমতাই তার এখন নেই। যে কর্মপদ্ধতি সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁদের নিকট যুগের লোকেরা বিজয় ও সবলতার যুগে অবলম্বন করেছিলেন, সে কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের জন্য জিদ ধরা এই হীনবলতার যুগে কিভাবে সঙ্গত হতে পারে।

---

১. প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রসূল (সাঃ) অনারব লোকদের সাথে পত্র যোগাযোগের জন্য স্বীয় সচিব হযরত যায়েদ বিন সাবেতকে (রাঃ) সুরীয়ানী ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন (দেখুন, আল্লামা ইবন আব্দুল বার লিখিত আল ইস্তিয়াব প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৮৯)। অনুরূপভাবে অন্য কয়েকজন সাহাবী সম্পর্কে জানা যায় যে, তাঁরা বিদেশী ভাষা শিখেছিলেন।

তৃতীয় ত্রুটি এই যে, প্রাচীন মনীষীগণ একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে যে মতামত অবলম্বন করেছিলেন, তাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'ইজমা' তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। আমরা আগেই বলেছি যে, হিজরী প্রথম শতাব্দীর মনীষীগণ সকলেই বিজয়ী ও পরাক্রান্ত জাতির লোক ছিলেন। যদিও ইসলামের কল্যাণে তারা ভৌগলিক, বংশীয় ও ভাষাগত বিভেদ ও বৈষম্য থেকে পবিত্র হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রত্যেক বিজয়ী জাতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যে মনস্তাত্বিক অবস্থার উদ্ভব হয়ে থাকে তাদের মধ্যে তার উদ্ভব না হয়ে পারে কিভাবে? বিজিত জাতিগুলোর ভাষা এড়িয়ে চলা, নিজেদেরকে তাদের বোলচাল থেকে মুক্ত রাখা এবং তাদের মধ্যে নিজেদের ভাষাকে চালু করার প্রবণতা-তাদের জন্য একটা স্বভাবসুলভ ব্যাপার ছিল। তাদের মধ্যে এ প্রবণতা জন্ম লাভ করাটা ছিল বিজয় ও পরাক্রমের সহজাত দাবী। অধিকন্তু কুরআন ও হাদীসের ভাষাই ছিল তাদের মাতৃভাষা। ইসলামের সমস্ত তাত্বিক সম্পদ এ ভাষাতেই সংরক্ষিত ছিল। খাটি আরবী ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার ওপরই নির্ভর করতো ইসলামের মূল প্রেরনা ও প্রাণশক্তিকে জীবন্ত রাখা। এ উপাদানটি তাদের মধ্যে ভাষার পর্যায়ে আরবীর আভিজাত্য বোধ আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। এ কারণেই প্রাচীন মুসলিম মণীষীগণ কোন অবস্থাতেই অনারবীয় ভাষায় কথা বলা পছন্দ করতেন না। এমনকি অনারবীয় ভাষার বিক্ষিপ্ত শব্দাবলী ব্যবহার করাও তাদের পছন্দ হতো না। হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন لاتعلموا رطانة الاعاجم "তোমরা আজমী বোলচাল শিখ না।" একবার হযরত আলীকে (রাঃ) ইরানী জাতীয় উৎসব নওরোজের উপহার দেওয়া হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? বলা হলো যে, আজ নওরোজ। তিনি নওরোজ শব্দটা শুনেই বিরক্তি প্রকাশ করেন। মুহাম্মদ বিন সাঈদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এক দল মুসলমানকে ফারসী ভাষায় কথা বলতে শুনে বললেন, ما بال المجوسية بعد "অগ্নি উপাসকদের এ ভাষা মুসলমানদের মধ্যে কোথেকে ঢুকলো?" ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, অনারবীয় ভাষায় দোয়া করা কেমন? তিনি বললেন, لسان سوء "এটা খারাপ ভাষা।" ইমাম

মালেক বলতেন, "আজমী (অনারবীয়) ভাষায় দোয়াও করো না, কসমও খেয়ো না।" ইমাম শাফেয়ী আরবী ছাড়া অন্য যে কোন ভাষায় কথা বলা মাকরূহ মনে করতেন। সে যুগের অধিকাংশ ফিকাহবিদ এ ধরনেরই মত পোষণ করতেন। তারা আজমী ভাষার ব্যবহার সাধারণভাবে এবং দোয়া ও জিকিরে তার ব্যবহার বিশেষভাবে খারাপ মনে করতেন। এই মনীষীদের এ ধরনের মনোভাব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায় যে, এটা শরীয়তভিত্তিক ব্যাপার ছিল না বরং অনেকাংশে স্বভাবসুলভ ছিল এবং পরিস্থিতির চাপেই তারা এরূপ করতে বাধ্য হতেন। অন্যথায় এটা কারোর অজানা নয় যে, ভৌগলিক ও ভাষাগত বিভেদ-বৈষম্যের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম কোন বিশেষ জাতির জন্য আসেনি। একটা বিশেষ ভাষার পক্ষপাতিত্ব করতেও একটি মাত্র ভাষাভাষীদের ধর্ম হিসেবে পরিচিত হওয়ার জন্যও তার আবির্ভাব হয়নি।

প্রাচীন মুসলিম নেতৃবৃন্দ অনারবীয় ভাষার প্রতি অপছন্দ ও অনিহা, তা এড়িয়ে চলা এবং ধর্মীয় ও বৈষয়িক ব্যাপারে তার ব্যবহার রোধ করতে যে এত বেশী জোর দিয়েছিলেন, তার আরো একটা কারণ ছিল। হিজরী প্রথম শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তৎকালে আরবরা ছাড়া অন্যান্য জাতি সাধারণত অমুসলিম ছিল। প্রধানত আরবদের মধ্যে ইসলাম সীমাবদ্ধ ছিল। এই বাস্তব পরিস্থিতির কারণে তখন আরবী ভাষা ইসলামের এবং আযমী ভাষা কুফরীর সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনারব জাতিগুলোর মধ্য থেকে যে সকল ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতো, তাদেরকে কুফরী জাতীয়তার সংস্রবমুক্ত করা এবং ইসলামী জাতীয়তার মধ্যে তাদেরকে মিশিয়ে দেয়ার জন্য তাদেরকে আরবী ভাষা ও সংস্কৃতির রঙে রঞ্জিত করা এবং তাদের রীতি-প্রথা, পোশাক, আচার-আচরণ, বোলচাল-সব কিছু পাল্টে দেয়া তখন অপরিহার্য ছিল। কেননা বাহ্যিক পরিবর্তন ছাড়া অভ্যন্তরীন পরিবর্তনকে পূর্ণতা দেয়া সম্ভবপর নয়। তাদেরকে শুধু যদি আদর্শগতভাবে মুসলমান বানিয়ে ছেড়ে দেয়া হতো এবং ভাষা,

সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তারা যদি যথারীতি কাফের জাতির অঙ্গীভূত হয়ে থেকে যেত, তা হলে কুফরীর বিশাল সমুদ্রে ইসলামের এই সব ছোট ছোট দ্বীপ দীর্ঘস্থায়ী হতো না। এগুলো আবির্ভূত হওয়ার সাথে সাথেই আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।' এ অবস্থাটা দীর্ঘদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পরবর্তীকালে যখন অন্যান্য দেশের বড় বড় জাতি মুসলমান হয়ে গেল তখন হিজরী প্রথম শতকের মত আরবী ভাষা ও ইসলাম সমার্থক থাকেনি। তাই আজ তুর্কী, ফারসী, উর্দু ও অন্যান্য মুসলিম জাতির ভাষা কাফেরদের ভাষা রূপে পরিগণিত হয় না। এ সব এখন মুসলমানদের ভাষা। এখন আরবীয় পোশাক ও আরবীয় চালচলনও ইসলামের বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য হয় না। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের যে সাধারণ পোশাক চালু রয়েছে, সেটাও এখন আরবীয় পোশাকের মতই ইসলামী পোশাক। একইভাবে অন্যান্য মুসলিম দেশে যে পোশাক ও যে আচরণ-পদ্ধতি দ্বারা মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের মোকাবিলায় পৃথক করে চিনে নেয়া যায়, তা নিঃসন্দেহে ইসলামী জাতীয়তার প্রতিক। সুতরাং হিজরী প্রথম শতকের ইসলামী আইন বিশারদগণ একটা ভিন্নতর পরিস্থিতিতে যেভাবে আরবী ভাষার ওপর জোর দিতেন, আজ পরিস্থিতি পাল্টে যাওয়ার পরও সেভাবে আরবীর ওপর জোর দেয়া ঠিক নয়। আমার মতে, পরবর্তীকালের ফিকাহবিদদের এটা একটা মৌলিক ও নীতিগত ত্রুটি যে, তারা পূর্বতন ফেকাহবিদদের যুগ ও পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি দেন না এবং চোখ বন্ধ করে তাদের উক্তিকে যুক্তি হিসেবে গ্রহণ করেন।

আর একটি যুক্তি

আরবীতে খুৎবা দেয়াকে বাধ্যতামূলক সাব্যস্ত করার স্বপক্ষে অন্য যে যুক্তিটা পেশ করা হয়ে থাকে তা এই যে, আল্লাহর কালাম এবং ইসলামের যাবতীয় নির্দেশাবলী আরবীতে বিধিবদ্ধ রয়েছে। এ জন্য প্রত্যেক মুসলমানের আরবী শিক্ষা করা অপরিহার্য কর্তব্য। মানুষ যদি আরবী শিখতে অবহেলা করে এবং আরবী খুৎবা না বুঝে, তবে সে জন্য সে নিজেই দায়ী। তার জন্য খুৎবার ভাষা পরিবর্তন করার দরকার কি?

আমরা স্বীকার করি যে, মুসলমানদের জন্য আরবী ভাষা জানা অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া তাদের পক্ষে ইসলামকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। আমরা এ কথাও স্বীকার করি যে, মুসলমানদের মধ্যে নানা রকমের বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ার একটা প্রধান কারণ এটাই যে, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস তাদের নাগালের বাইরে। এ কারণেই আমরা বহুবার এর প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছি। আমাদের দৃঢ় অভিমত এই যে, মুসলমানদের পাঠ্যসূচীতে বাধ্যতামূলকভাবে আরবী অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু যা "হওয়া উচিত" এবং যা "বাস্তবে আছে" উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। যা হওয়া উচিত তার জন্য চেষ্টা করুন। কিন্তু বাস্তবে যা আছে, তার দিক থেকে চোখ বন্ধ করবেন না। শরীয়ত আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয়নি যে, কেবল "উচিত"-এর পেছনে পড়ে থাকতে হবে এবং বাস্তব অবস্থার তোয়াক্কা করতে হবে না। আমাদের এখানকার অবস্থা এই যে, এখানে মুসলমানদের জন্য আরবী তো দূরের কথা, ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত বাধ্যতামূলক নয়। তা সত্ত্বেও আপনি এতদূর খামখেয়ালীপনা দেখাচ্ছেন যে, মুসলমানরা যদি আরবী না বুঝে, তাহলে আপনি বলতে চান যে, তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। আমরা আরবীতেই খুৎবা দেবো। আরবী খুৎবা দিতে আপনার এই জিদ ধরার ফলে মুসলমানরা শুধু খুৎবা বুঝবার জন্য আরবী শিখতে উঠে পড়ে লেগে যাবে এমন আশা কি করা যায়?

তৃতীয় যুক্তি

তৃতীয় যে যুক্তিটা দেখানো হয়, সেটা অবশ্য অপেক্ষাকৃত ভারী। সেটি এই যে, আরবী ছাড়া অন্যান্য ভাষায় খুৎবা চালু হলে ইসলামে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা দানা বাধার সম্ভাবনা রয়েছে। ভাষা, বংশ, বর্ণ ও দেশ নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে এক জায়গায় সমবেত করাই যেখানে জুময়ার উদ্দেশ্য, সেখানে আরবী ছাড়া অন্যান্য ভাষায় খুৎবা দেয়াতে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং বিভিন্ন ভাষাভাষীদের জুময়া আলাদা আলাদা হয়ে যেতে বাধ্য হবে।

এ আশংকা অবশ্যই গুরুত্ববহ। তবে এর প্রতিকার খুব একটা কঠিক কিছু নয়। খুৎবা দেয়ার ব্যাপারে এরূপ কর্মপন্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় যে, এর একটা অংশ বাধ্যতামূলকভাবে আরবীতে দেওয়া হবে। এ অংশটিকে রসূল (সাঃ) এবং তাঁর পরিজন ও সাহাবাদের জন্য দরূদ ও সালাম এবং কুরআনের আয়াত তেলাওয়াতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। এরপর দ্বিতীয় যে অংশটাতে ইসলামরে আইনগত বিধি, উপদেশাবলী ও ইসলামী শিক্ষার বিবরণ থাকবে, তা শ্রোতাদের সকলের অথবা অধিকাংশের বোধগম্য ভাষায় দেয়া হবে। আর এ উদ্দেশ্যেও বেশীর ক্ষেত্রে এমন ভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়, যা মুসলমানদের মধ্যে আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা রাখে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে প্রধানত উর্দু ভাষায় খুৎবা দেয়া উচিত। কেননা এ ভাষা প্রায় সকল প্রদেশের মুসলমানরা বুঝতে পারে। অবশ্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানে উর্দু বুঝতে পারা মানুষের সংখ্যা খুবই কম, স্থানীয় ভাষাগুলোকে খুৎবার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে যেখানে মুসলমানদের আন্তর্জাতিক সমাবেশ হবে, সেখানে আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় খুৎবা দেয়া অনুচিত।

কতিপয় বাস্তব সমস্যা

এ পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করলাম, তা ছিল প্রধানত শরীয়তের বিধি সংক্রান্ত। অর্থাৎ আইনগতভাবে আমাদের দৃষ্টিতে অনারবীয় ভাষায় খুৎবা দেয়া নাজায়েজ নয়। যারা এটাকে নামাজে মাকরূহ তাহরিমী অথবা সুন্নাতের বরখেলাপ বলে, তারা আমাদের মতে ভুল বলে। কিন্তু ঐ বিষয়টার আরো একটা দিক রয়েছে। সে দিকটা শরিয়তের বিধির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং বাস্তব সমস্যা ও অশোভনীয়তার সাথে সংশ্লিষ্ট।

জনসাধারণের বোধগম্য খুৎবা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা তো শুধু এ জন্যই ব্যক্ত করা হয়ে থাকে যে, জনসাধারণ খুৎবা বুঝতে পারলে উপকৃত হবে। অন্য কথায় বলা যায়, বুঝতে পারা আসল উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হলো উপকৃত হওয়া। কিন্তু অবস্থা যদি

এ রকম হয় যে, বুঝতে পারলে ফায়দার পরিবর্তে ক্ষতি হবে, তা হলে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সম্ভবত এ কথাই বলবে যে, অমন বুঝার চাইতে না বুঝাই ভাল। এবারে দেশের সাধারণ মুসলমানদের অবস্থাটা একটু পর্যালোচনা করে দেখুন।

মুসলমানদের মধ্যে আজকাল ইমামতির মান অত্যধিক নীচে নেমে গেছে। মুসলিম জাতির সামষ্টিক জীবনে যে পদটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা এখন সব চেয়ে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। যে পদের জন্য সবচেয়ে ভালো মানুষ নিযুক্ত করার নির্দেশ ছিল, সে পদের জন্য আজকাল সবচেয়ে খারাপ মানুষ বাছাই করা হয়। মুসলমানদের মনে বর্তমানে ইমাম সম্পর্কে ধারণা এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার আর কোন কাজের যোগ্য নয়, তার মসজিদের ইমাম হওয়া উচিত। দশ-পাঁচ টাকা বেতন এবং দু'বেলার খাবার ঠিক করে একজন আধা শিক্ষিত মোল্লা মুনশী রেখে নিলেই ব্যাস্ মসজিদের ইমামতির ব্যবস্থা হয়ে গেল। ইমামতির মান এত নীচে নামিয়ে দেয়ার পরিণতি দাঁড়িয়েছে এই যে, আমাদের এই মসজিদ, যা কিনা একদিন আমাদের জাতির গগণচুম্বী প্রাসাদ তৈরী করেছিল। তা আজ একেবারেই অজ্ঞ মুর্খ, সংকীর্ণমনা, নীচাশয় হীন চরিত্রের লোকদের দখলে চলে গেছে। তাদের কাছ থেকে কি আপনি আশা করেন যে, মাতৃভাষায় খুতবা দিয়ে তারা আপনাদের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের নেতৃত্ব দিতে পারবে? এই গোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে আপনি যদি জুমায়ার নামাযের ইমামতির জন্য অন্য কোন গোষ্ঠীর লোক বাছাই করতে চান, তা হলে অনিবার্যভাবে আপনাকে আলেম সমাজের দ্বারস্থ হতে হবে। দু'একজনকে বাদ দিলে এই শ্রেণীর অধিকাংশের যে দশা হয়েছে, সেটা বর্ণনা করতে গেলে নিজেকেই লজ্জায় মরে যেতে হয়। এদেরকে যদি জনগণের বোধগম্য ভাষায় নিজেদের খেয়াল-খুশীমত খুৎবা দেয়ার সুযোগ করে দেয়া হয় তাহলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, অচিরেই মসজিদে মাথা ফাটাফাটি হয়ে যাবে। কেননা এদের প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব ভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। আর নিজের মতামত ও ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে প্রত্যেকেই এমন অনমনীয় যে, ভিন্ন মতাবলম্বীদের

প্রতি কোন রকমের সহনশীলতা বা নমনীয়তা দেখানো তার কাছে গুনাহর কাজ। তাছাড়া আল্লাহ তাদের মুখে এমন সাংঘাতিক একটা অস্ত্র রেখে দিয়েছেন যে, মানুষের মনে কষ্ট না দিয়ে তারা কথাই বলতে পারে না। যে পরিবেশ থেকে তারা শিক্ষা লাভ করে আসে এবং যে পরিবেশে তারা জীবনযাপন করে, সেখানে ইসলামের প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং জাতির প্রধানতম সমস্যা ও স্বার্থ প্রবেশাধিকার পায় না। সব কিছু বাদ দিয়ে কেবল গুটিকয় বিতর্কমূলক বিষয়েই যাবতীয় কৌতূহল ও আবেগ-উদ্দীপনা কেন্দ্রীভূত। তাই যখনই তারা মুখ খুলবে এ সব বিষয়েই খুলতে বাধ্য হবে। এর ফল দাঁড়াবে এই যে, আল্লাহর ঘরে গালাগালি ও জুতো মারামারি শুরু হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক মত ও পথের অনুসারী মুসলমানরা নিজেদের আলাদা আলাদা জুমার ব্যবস্থা করে নেবে। ধর্মীয় মন–মানসিকতার অধিকারী লোকদের তো এই অবস্থা দাঁড়াবে। আর যারা আধুনিক শিক্ষিত লোক, যাদের এ সব ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা নেই তাদের ওপর আরেকটা মুসিবত নেমে আসবে। তারা প্রতি জুময়ায় রসূল (স) এর মিম্বার থেকে এমন সব মনগড়া ও দুর্বল হাদীস, উদ্ভট কল্পকাহিনী এবং ইসলামী আইন–বিধির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা শুনবে যে, সে সব জিনিস শুনে অমুসলমানদের মুসলমান হওয়া দূরে থাক, সচেতন মুসলমানদের মুসলমান থাকাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।

ধর্মীয় ফের্কাবন্দী ছাড়াও আজকাল মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক দলাদলীও প্রবল হয়ে উঠছে। যেখানেই ধর্মীয় ভাবাপন্ন আধুনিক শিক্ষিতরা অথবা আধুনিকতাবাদী মৌলবী সাহেবরা ইমামতি ও খতিবগিরি করার সুযোগ পেয়েছে, সেখানে তারা অত্যন্ত অরুচিকর ও লাগামহীন ভাষায় নিজ নিজ রাজনৈতিক মতের পক্ষে বক্তব্য দিতে এবং বিপরীত মতাবলম্বী দেরকে অপমানজনক ভাষায় আক্রমণ, ঠাট্টা–বিদ্রুপ ও ফাসেক ফতোওয়া দিতে আরম্ভ করেছে। এটা একটা আলাদা ফেৎনা ও উপদ্রবের রূপ ধারণ করেছে। এ উপদ্রপের মাত্রা যদি আরো বেড়ে যায় তা হলে মুসলমানদের এক সাথে নামায পড়াও দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

সচরাচর ভোট কেন্দ্রে যে ধরনের প্রচারণা চলে, আজকাল মসজিদে তাই চলছে। এভাবে চলতে থাকলে একদিন প্রত্যেক রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মসজিদ আলাদা হয়ে যাবে।

অনারবীয় ভাষায় খুৎবা চালু করার আগে আপনাদের ভাবা উচিত কিভাবে এ সব অনাচারের প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা যায়। আমার মতে, এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় এই যে, আলেম সমাজের মধ্য থেকে একটি মধ্যপন্থী দলের হাতে জুমার খুৎবা রচনার ভার অর্পিত হবে এবং তারা সব ধরনের বিতর্কিত বিষয় থেকে মুক্ত এবং মুসলমানদের মধ্যে সত্যিকার ইসলামী প্রেরণা ও ভাবধারা গড়ে তুলতে পারে এমন খুৎবা লিখবেন। তার পর সারা ভারতের সর্বত্র সুস্থ চিন্তাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী লোকেরা আলেমদের সেই কেন্দ্রীয় দলটির প্রণীত খুৎবা জুময়ার নামাযে চালু করার চেষ্টা চালাবে। এ ধরনের একটা সংগঠন যদি গড়ে ওঠে, (আপাতত তার আশা খুব কম বলেই মনে হয়) তা হলে আমি যত দূর তত্ত্বানুসন্ধান চালিয়েছি তাতে অনারবীয় ভাষার খুৎবা চালু করাতে শরিয়তের দিক থেকে কোন বাধা নেই। কিন্তু এ ধরনের কোন সংগঠন যদি তৈরী করা সম্ভব না হয়, তাহলে প্রচলিত প্রাচীন খুৎবাগুলোকে চালু থাকতে দেয়াই মঙ্গলজনক। কেননা এগুলো দ্বারা কোন উপকার না হোক, ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য সৌভাগ্যবশত এমন কোন মানানসই খতীব যদি পাওয়া যায়, যিনি এ কাজটিকে খুব ভালোভাবে সমাধা করতে পারেন, তা হলে তাকে কাজে লাগানোতেও দ্বিধা করা চাই না।

(তরজমানুল কুরআন, সফর ও রবিউল আউয়াল, ১৩৫৬ হিঃ
মোতাবেক মার্চ–এপ্রিল, ১৯৩৭)

জুমুয়ার খুতবার ভাষা নিয়ে আরো আলোচনা

দাক্ষিনাত্য হায়দারাবাদের নিযামাবাদ থেকে এক সুধি লিখেছেন, "জুময়ার খুৎবার ভাষা সমস্যা নিয়ে আপনি শরীয়ত ভিত্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছেন এবং পরিস্থিতি ও পরিবেশের বিচারে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা যে, আরবী ভাষাতো দূরের কথা, মুসলমানরা প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষাকেও যখন বাধ্যতামূলক করাতে পারেনি, তখন আরবী খুৎবা নিয়ে অনমনীয় মনোভাব পোষণ করার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু এই পর্যালোচনায় আপনি যে, নীতিগত বক্তব্য রেখেছেন, তা বিবেচনার দাবী রাখে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের কর্মকান্ডকে আপনি শরীয়ত সংক্রান্ত কাজ না বলে নিছক স্বভাবসুলভ কাজ বলে আখ্যায়িত করে তার স্বপক্ষে যে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন, তা সন্তোষজনক নয়। এ কথা নিসন্দেহে সত্য যে, জন্মস্থানগত ও ভাষাগত বৈষম্যের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। বরঞ্চ ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছেই এ উদ্দেশ্যে যে, মানব জাতির ভেতরে দেশ, ভাষা ও প্রজন্মগত ভ্রান্ত-চিন্তার ভিতরে যে বিভক্তি ও বৈষম্য বিরাজ করে, তার বিলোপ ঘটিয়ে সে বিভিন্ন জাতির পরিবর্তে একটি মাত্র জাতি গড়ে তুলবে। এই একক জাতীয়তার নাম হলো ইসলাম। সূরা আলে-ইমরানের ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ আর সূরা হজ্বের ৭৮ নং আয়াতে এই জাতির মুসলিম নামকরণের কথা ঘোষণা করা হয়েছে سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ । দুনিয়াতে যেমন বিভিন্ন জাতি বসবাস করেছে এবং করছে, আর প্রত্যেক জাতির একটা না একটা ভাষা থেকেছে তেমনি স্বাভাবিকভাবেই এই 'মুসলিম' জাতিরও একটা না একটা

ভাষা থাকা চাই। যে ফলাফল স্বাভাবিকভাবে ও অনিবার্যভাবে দেখা দেয়, তা অর্জনের জন্য হুকুম দিতে হয় না। চিকিৎসক কখনো রোগীকে বলবেনা যে, তুমি রোগ হটাও। সে বরং এমন কতকগুলো নির্দেশ দেবে ও তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে, যা বাস্তবায়ীত করার ফলে সুস্থ হওয়া যায়। একটা শাসক জাতি শাসিত জাতিকে তার ভাষা পাল্টানোর নির্দেশ দেয় না। স্বাভাবিকভাবেই শাসিতরা শাসকের ভাষা অবলম্বন করবে। তা হলে স্বাভাবিক ফল স্বরূপ যে জিনিসের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী, জগত স্রষ্টা ও তার রসূল কেন তার নির্দেশ দেবেন। কুরআন নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য এটাই যে, মানব জাতির উপর আল্লাহর শাসন চালু করতে হবে। এই সরকারের ভাষা আরবী। এই সরকারের কার্য নির্বাহকারীদের এবং তার শাসনাধীন জনতার ভাষাও অনিবার্যভাবেই একই ভাষা হবে। কুরআন যে আরবী গ্রন্থ, সে সম্পর্কে যে সব আয়াত রয়েছে তা লক্ষ্য করুনঃ

إِنَّا أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ - (يوسف:٢)

"আমি এই কুরআনকে আরবীতে অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পার" (ইউসুফ–২)

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا - (مريم:٩٧)

"আমি এই কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি তার মাধ্যমে খোদাভীরুদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং একটা হঠকারী জাতিকে আযাব সম্পর্কে সাবধান করতে পার" (মরিয়ম–৯৭)

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا - (طه:١١٣)

"এভাবে আমি এই কিতাবকে আরবী কুরআন হিসেবে নাযিল করেছি" (তায়াহা–১১৩)

قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ - (الزمر:٢٨)

"এটা আরবী কুরআন, যাতে কোন জটিলতা নেই, যাতে করে মানুষ বুঝতে পেরে আল্লাহকে ভয় করে।" (যুমার–২৮)।

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ - (حٰم السجدہ: ٣)

"জ্ঞানবান লোকদের জন্য আরবী কুরআন" (হামীম সিজদা–৩)।

এ আয়াতগুলোর তাৎপর্য যদি শুধু এতটুকুই হয়ে থাকে যে, রসূল (সাঃ) একজন আরব ছিলেন এবং ইসলামের দাওয়াত প্রাথমিক পর্যায়ে আরবদেরকে দেয়া হয়েছে, এ জন্যই কুরআন আরবীতে নাযিল হয়েছে, তা হলে এতে এমন কি "বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতা" ছিল, যা একজন বিচক্ষণ ও মহাবিজ্ঞানী খোদা বলেছেন? এ কথা না বললেও তো এটাই বুঝা যেত। রসূলুল্লাহ এবং পুরো কুরআন যদি আরবী ভাষাভাষীদের জন্য না হতো, তা হলে শুধুমাত্র উপরোক্ত আয়াতগুলো আরবদের জন্য এবং বাদ বাকী সমস্ত আয়াত সমগ্র মানব জাতির জন্য এরূপ ধারণা করার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কুরআন যদি কেবল তার শ্রোতাদের ভাষার দিকে লক্ষ্য করেই আরবীতে নাযিল হয়ে থাকে, তা হলে বলা যেতে পারে যে, তার অধিকাংশ নির্দেশাবলীও আরবদের স্বভাবগত ও দেশজ পরিস্থিতির আলোকেই নাযিল হয়েছে, যেমন কোন কোন মতিভ্রান্ত লোকে বলে থাকে। যে কুরআন "বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ হতে নাজিল হয়েছে" (ওয়াকেয়া–৮৩), যে কুরআন "মহাপরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানীর পক্ষ হতে নাজিল হয়েছে" (যুমার–১), যে কুরআন "মানুষের হিদায়েতের জন্য" (বাকারা–১৮৫) এবং "সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য স্মরণিকা" (তাকভীর–২৭) হয়ে এসেছে, যাতে সমগ্র মানব জাতির জন্য সরল ও সঠিক পথ বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে, যে মানব জাতি অগণিত ভাষায় কথা বলে তাকে এই সমস্ত মানুষের জন্য আরবী কুরআন আকারে নাযিল করার মধ্যে কোন "নিগুঢ় রহস্য" নিহিত রয়েছে? যে খোদা স্বীয় রসূলের (সাঃ) নাম বলন্দ করেছেন, (ইনশিরাহ–৪), যিনি তাকে সারা বিশ্বের জন্য করুণা ও অনুগ্রহ হিসেবে পাঠিয়েছেন, (আম্বিয়া–১০৭), যিনি

তাকে কিতাব ও ইসলামের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষাদাতা হিসেবে সমগ্র মানব জাতির পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত পাঠিয়েছেন, তিনি কি পারতেন না এমন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রসূলকে (সাঃ) সকল ভাষায় অভিজ্ঞ বানাতে? বিশেষত তিনি যখন চাননা যে, তাঁর দীন একটি মাত্র ভাষাভাষী জাতির দীন হয়ে থেকে যাক?

রসূল (সাঃ) এর আরবী ভাষায় খুতবা দেয়াতে যদি কোন শরীয়ত সংক্রান্ত, স্বার্থকতা নিহিত না থেকে থাকে, তাহলে অনারবদের জন্য আরবী কুরআন নাযিল করা এবং তার প্রচারের জন্য শুধুমাত্র আরবী ভাষা-ভাষীদেরকে নির্বাচন করাতে কি কুরআন অবতারণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় না? এ কথা অনস্বীকার্য যে, রসূল (সাঃ) এর শ্রোতারা ছিল আরবী ভাষী। রসূল (সাঃ) এর বৈঠকে উপস্থিত লোকদের মধ্যে অনারবদের সংখ্যা কম থাকতো তাও সত্য। কিন্তু তিনি রোম ও ইরানের সম্রাটদ্বয়ের কাছে যে দাওয়াতী চিঠি পাঠান, তা কেন আরবীতে লেখা হয়েছিল? ইসলামের প্রচার এক ভাষাতেই হোক এটা যদি শরীয়তের অভিপ্রেত না হয়ে থাকে, তা হলে তিনি সেই নীতি অবলম্বন করলেন কেন? যিনি কিতাব ও ইসলামের নিগূঢ় তত্ত্বের শিক্ষক হয়ে এসেছেন, তার রিসালত সংক্রান্ত কোন কাজতো তাৎপর্যহীন হতে পারে না। সারা দুনিয়ার জন্য আরবী কুরআন নাযিল করার মধ্যে এ রহস্যই নিহিত রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় যে, এই দীন থেকে যে জাতির উদ্ভব হবে, সে জাতির লোকেরা একই ভাষাভাষী হবে। এটা বিভেদের ভিত্তি নয় বরং ঐক্যের ফল। এটা অস্বাভাবিক নয় বরং পুরোপুরি স্বাভাবিক। আল্লাহর দীন যখন কায়েম হবে তখন এ উদ্দেশ্য আপনা থেকেই সফল হবে। যে কোন জাতির কথাই ভাবুন না কেন, জাতির সকল লোকের একই ভাষা হওয়া চাই। আজ ভারতে বহু ভাষা চালু থাকলেও একক ভাষা চালু করার চিন্তা-ভাবনা চলছে। ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করে। ভাষার বিভিন্নতা পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখে এবং তা ভ্রাতৃত্বের পরিপন্থী। একজন আরব, একজন ইংরেজ, একজন ভারতীয়, একজন তুর্কী, একজন জাপানী.

একজন চীনা এই ছ'জন মুসলমান একত্রিত হলে তারা নিজ নিজ ভাষায় পারস্পরিক মত বিনিময় তো দূরের কথা, ইসলামী পদ্ধতিতে সালামও করতে পারে না।

এক জায়গায় আপনি বলেন যে, আরবী ভাষার সংরক্ষণ ছাড়া প্রকৃত ইসলামী ভাবধারা সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিল না। পরক্ষণেই আপনি আবার বলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আলীর (রাঃ) মধ্যে এই ইসলামী ভাবধারাই অধিকতর আরবীয় আভিজাত্যবোধ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। মওলানা সাহেব! কথাটা বারবার ভেবে দেখা দরকার। মুসলিম জগতে যাদের সমতুল্য মানুষ আজ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি, যারা হিদায়াতের মশাল হাতে নিয়ে সর্বোত্তম জ্ঞান ও চরিত্রে সজ্জিত হয়ে জাহেলী আভিজাত্য ও বৈষম্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কিনা ইসলাম সেই আভিজাত্যই আবার সৃষ্টি করে দিল! আশ্চার্য কথা! আসল ব্যাপার এই যে, প্রকৃত ইসলামী ভাবধারার সংরক্ষণ আরবী ভাষার সংরক্ষণ ছাড়া সম্ভব ছিল না বলেই ইসলামী আভিজাত্যবোধের জন্য আরবী ভাষাকে টিকিয়ে রাখা অত্যাবশ্যক হয়ে দেখা দিয়েছিল। আরবীয় আভিজাত্যবোধের প্রয়োজনে আরবীকে টিকিয়ে রাখতে হয়নি। অন্যথায় আপনি যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে ইসলামী জিহাদ সম্পর্কে এ অভিযোগ অনেকখানি গুরুত্ববহ হয়ে উঠবে যে, আরবরা আগে থেকেই যে হত্যা ও লুণ্ঠন ইত্যাদিতে অভ্যস্ত ছিল, ইসলাম এসে সেই প্রবণতাকে আরো উস্কিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ কিনা এই মহান ব্যক্তিগণ যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা ইসলামী প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে রাখেননি বরং এসব ছিল তাদের স্বভাবসুলভ ও অভ্যাস তাড়িত কর্মকান্ড! স্বভাবসুলভ ও অভ্যাসজনিত কাজ এবং শরীয়াতসিদ্ধ কাজের পার্থক্য নির্ণয় করা যত কঠিন, তার চেয়েও বেশী কঠিন হলো যে কাজ একই সাথে স্বভাবসুলভ এবং অভ্যাসজনিতও, আবার শরীয়তের চাহিদাও পূরণ করে তা চিহ্নিত করা।

সাহাবাগণ ও প্রাচীন ইমামগণ যদি আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুৎবা বা অনারবদেরকে ইসলামের দাওয়াত না দিয়ে থাকেন কিংবা

অনারবীয় ভাষায় কথা বলাও অপছন্দ করে থাকেন, তবে সেটা নিছক একটা প্রথাসিদ্ধ ও স্বভাবসুলভ ব্যাপার অথবা সমসাময়িক পরিস্থিতির ফল ছিল না। বরং ওটা ছিল খোদা প্রেমের ফল। যেমন সূরা বাকারার ১৬৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ "যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে ভালোবাসে সবচেয়ে বেশী।" আল্লাহর দীন তাদের শীরা-উপশীরায় প্রবাহিত ছিল। তাদের আত্মা ও মন-মগজ ছিল আল্লাহর আজ্ঞাবহ। তারা ছিলেন ইসলামী সরকারের যথার্থ অনুগত। এ সরকার যেমন তাদের কাছে দুনিয়ার সব জিনিসের চেয়ে প্রিয় ছিল, তেমনি এ সরকারের ভাষা (যা আরবদের নয় বরং আল্লাহর সরকারের ভাষা ছিল) তাদের কাছে অন্যান্য ভাষার চেয়ে বেশী প্রিয় ছিল। এটাই মানুষের স্বভাব। আজকাল যারা ফিরিঙ্গী সরকারের তল্পীবাহক, তারা ফিরিঙ্গী কৃষ্টিতে বিলীন হয়ে গেছে। তাদের শয়ন-স্বপনের ভাষা হয়ে গেছে ইংরেজী। অথচ ইংল্যান্ডের রাজা কিংবা বড়লাট তাদের ভাষা বদলানোর নির্দেশ দেয়নি।

অন্বাগত আভিজাত্য ও অহমিকা চূর্ণ করার উদ্দেশ্য ছিল আরব-অনারবের বৈষম্য নির্মূল করা। ইসলামের পূর্বে এই বৈষম্যই বিরাজমান ছিল। একজন অনারব মুসলমান হওয়ার পর তাকে আরব মুসলমানের মতই শ্রদ্ধা ও সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। তারা আরবী ভাষায় অজ্ঞ হলেও তাদেরকে হেয় করা চলবে না। আল্লাহর দীন গ্রহণ ও ইসলামী জাতীয়তায় বিলীন হয়ে যাওয়ার পর অবধারিতভাবে সরকারী ভাষাই তাদের ভাষা হয়ে যাবে। কেননা মুসলিম জাতি আসলে আল্লাহর সরকারেরই প্রজা।

যে জাতির ঈমান এক, আকীদা-বিশ্বাস এক, জীবনের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও অভিলাস অভিন্ন, শিক্ষা, চরিত্র, কায়কারবার ও আদত-অভ্যাস এক রকম, সে জাতির ভাষা এক হওয়া শরীয়তের অভিষ্ঠ হবে না, এটা কেমন কথা? এ তো বিস্ময়ের ব্যাপার। ইসলামের পূর্বে কা'বা যেমন শুধু আরবদের ছিল এবং ইসলামের আবির্ভাবের পর তা প্রত্যেক মুসলমানের কা'বায় পরিণত হলো, ঠিক তেমনি ইসলামের পূর্বে আরবী কেবল আরবদের ভাষা ছিল।

ইসলামের পর তা আর শুধু আরবদের ভাষা নেই। এটা এখন মুসলিম জাতির ভাষা।

জবাব ঃ

মনে হচ্ছে, শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে নীতিগতভাবে চিন্তা-ভাবনা করেননি। এ কারণেই তার আলোচনায় বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন।

বিষয়টার একটা দিক হলো আইনগত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে ব্যাপারটা বিবেচনার দাবী রাখে তা হলো এই যে, খুৎবা আরবী ভাষায় দেয়া শরীয়তের বিধিতে জরুরী কিনা। এ প্রশ্নে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ফায়সালা করা প্রয়োজন। আরবীতেই খুৎবা দিতে হবে এই মর্মে কুরআন ও হাদীসের কোন স্পষ্টোক্তি আছে কি? যদি না থেকে থাকে এবং এটা শুধুমাত্র রসূল (সাঃ)-এর কাজ থেকে গৃহীত হয়ে থাকে, তা হলে তার এ কাজটা কি সুন্নতের সংজ্ঞার আওতায় পড়ে? রসূল (সাঃ)-এর প্রত্যেক কাজই শরীয়তের পরিভাষায় সুন্নত নামে অভিহিত হয়ে থাকে, না এ ক্ষেত্রে শরীয়ত সংক্রান্ত কাজ এবং স্বভাবসুলভ ও দেশাচার জনিত কাজে কোন পার্থক্য করা হয়েছে, যদি পার্থক্য থেকে থাকে, তাহলে রসূল (সাঃ) এর আরবীতে খুৎবা দেয়া কি ধরনের কাজ? শরীয়ত সংক্রান্ত না স্বভাবগত?

বিষয়টার দ্বিতীয় দিক কল্যাণকারিতা ও স্বার্থকতা সংক্রান্ত। এ ব্যাপারে নির্ভুল মতামত অবলম্বন করতে হলে নিম্নোক্ত প্রশ্নাবলীর সুরাহা করা প্রয়োজন! খুৎবার উদ্দেশ্য কি? এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য রসূল (সাঃ) ও হিজরী প্রথম শতকের ইমামগণ যে কর্মপন্থা অনুসরণ করেন, তা অনুসরণ করলে আজ সে উদ্দেশ্য সফল হয় কি? শরীয়তে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের গুরুত্ব বেশী, না উদ্দেশ্য হাসিলের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার গুরুত্ব বেশী? যদি উদ্দেশ্যের গুরুত্ব বেশী হয়ে থাকে এবং কোন অবস্থায় যদি প্রচলিত রীতি অনুসরণ করলে উদ্দেশ্য নস্যাত হওয়ার আশংকা থাকে, অথচ সে অবস্থা পাল্টাতে আমরা সক্ষম না হই, তাহলে আমরা কি

শরীয়তের মূলনীতি অনুসারে প্রচলিত রীতিতে কোন পরিবর্তন আনতে পারি? পরিবর্তন করার অধিকার যদি আমাদের থেকে থাকে, তা হলে পরিস্থিতি আমাদের কিভাবে এবং কতটুকু পরিবর্তন আনা উচিত?

এ প্রশ্নগুলোর সমাধানের উপরই খুৎবার ভাষা সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধান নির্ভরশীল। পত্র লেখক যদি এ প্রশ্নগুলো নজরে রেখে আলোচনা করতেন তা হলে আমরা এটা সহজেই বুঝতে পারতাম যে, তিনি কোন্ কোন্ ব্যাপারে আমাদের সাথে একমত এবং কোন্ কোন্ ব্যাপারে ভিন্ন মতাবলম্বী। এর পর যে বিষয়গুলো নিয়ে মতভেদ থেকে যেত তা নিয়ে আরো আলোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেত। তিনি আলোচনার যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন তা দেখে মনে হয়, আসল বিবেচনাযোগ্য বিষয়গুলো তার সামনে স্পষ্ট নয় বরং তিনি কয়েকটি আনুসঙ্গিক ব্যাপারে মাথা গুলিয়ে ফেলেছেন। যা হোক, তিনি যেহেতু খুৎবার ব্যাপারে কোন পরিবর্তনের পক্ষপাতী নন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, তাই তার পুরো বক্তব্য ছাপিয়ে দিয়ে সংক্ষেপে তার মনে বদ্ধমূল ভুল ধারণাগুলো নিরসনের প্রয়াস পাচ্ছি। কেননা এই ভুল ধারণাগুলোর কারণেই তার এবং তার সমমনাদের এ ব্যাপারে জটিলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

পত্র লেখক খুৎবার ভাষা প্রশ্নে যে ধরনের যুক্তি প্রয়োগ করেছেন, অনেকটা এ ধরনের যুক্তির প্রশ্রয় নিয়েই এক শ্রেণীর লোক ইতিপূর্বে কুরআনের অনুবাদের বিরোধিতা করেছে। এটা সুস্পষ্ট যে, এ সব যুক্তিকে মেনে নিলে অনারবীয় ভাষায় খুৎবা দেয়াকে যেভাবে নাজায়েজ বলা হচ্ছে, কুরআনের অনুবাদ করাও ঠিক সেইভাবে অবৈধ সাব্যস্ত হবে। আপনি সরাসরি জানিয়ে দিন যে, আরবী ভাষা ইসলামের সরকারী ভাষা। যারা ইসলামের অনুগত তাদের জন্য এ ভাষা জানা বাধ্যতামূলক। তারা যদি আরবী না শেখে, তবে সেটা তাদেরই ত্রুটি। কাজেই তাদেরকে বুঝানোর জন্য তাদের মাতৃভাষায় অথবা অন্য কোন বেসরকারী ভাষায় কুরআনের মর্ম ব্যাখ্যা করা হবে না। অনুরূপভাবে আপনি একথাও ঘোষণা

করে দিন যে, তাদের সামনে ইসলামী বিধিসমূহ, ইসলামী আকীদা–বিশ্বাস, ইসলামের নৈতিক শিক্ষা এবং অন্যান্য সরকারী তথা শরীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ও কেবল সরকারী ভাষাতে বর্ণনা করা হবে। বক্তৃতা কিংবা লেখা কোনভাবেই কোন কথা বেসরকারী তথা অনারবীয় ভাষায় বর্ণনা করা হবে না।

এখন বলুন, কেউ যদি এ ধরনের নীতি অবলম্বন করে, তাহলে তা কি আপনারা মেনে নেবেন? মনে হয় মানবেন না। কেননা এটা আপনারা ভালো করেই জানেন যে, বর্তমান অবস্থায় এমন নীতি অবলম্বন করলে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মুসলমান ইসলামের জ্ঞান থেকে একেবারেই বঞ্চিত থেকে যাবে। এ জন্যই আপনারা অন্যান্য ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করাকে শুধু জায়েজ নয়, বরং জরুরী মনে করে থাকেন। আর একই কারণে আপনারা "বেসরকারী" তথা অনারবীয় ভাষায় "সরকারী" তথা ইসলামী বিষয় প্রচার করাকে শুধু জায়েজই নয় বরং উত্তম মনে করে থাকেন, চাই তা বক্তৃতার আকারেই হোক কিংবা লিখিত আকারে। বাস্তব অবস্থা যখন এরূপ তখন কোন কারণে কেবল জুময়ার খুৎবার বেলাতেই যাবতীয় বিতর্কের সৃষ্টি হয়। মসজিদে যদি কেউ নামাযের পরে অথবা খুতবার আগে অনারবীয় ভাষায় ওয়ায করলে তা শুধু জায়েজ নয় বরং উপকারী হবে আর সেই সব বক্তব্যই যদি কেউ চমম্বরের দুটো সিঁড়িতে উঠে জুময়ার খুৎবার আকারে বলতে আরম্ভ করে তা হলেই তা শুধু নাজায়েজ নয় বরং বেদয়াত হয়ে যাবে– এটা কেমন কথা? আপনাদের কথার এমন সুস্পষ্ট অসমতাকে শরীয়তের ঘাড়ে চাপানোর আগে নিজেদের অন্তরে তল্লাশি চালিয়ে দেখা উচিত যে, সেখানে কোন শরীয়ত বিরোধী মনোভাব লুকিয়ে রয়েছে কিনা।

এমন প্রায়ই হতে দেখা যায় যে, লোকেরা প্রাচীন অভ্যাসের প্রতি এত আসক্ত থাকে য, কোন উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন চিন্তাবিদ যদি পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি এবং চলমান যুগের নবতর প্রয়োজন ও দাবী উপলব্ধি করে আগে থেকে চলে আসা রীতি–নীতিতে সাহস করে সংস্কার, সংশোধন ও রদবদলের উদ্যোগ নেয়, তা হলে সেই

নতুন উদ্ভাবিত রীতিটা তাদের চিরাচরিত অভ্যাসের সাথে খাপ খায় না, একমাত্র এই অজুহাতেই তার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করে দেয়। অথবা নয়া রীতি চালু হয়ে গেলে এবং চেনা-জানার অভাবজনিত আড়ষ্টতা দূরীভূত হলেই লোকেরা তাকে বৈধ ও উপকারী ভাবতে শুরু করে। এ কারণেই শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব যখন ফারসী ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করেন তখন তার বিরোধিতা করা হয়েছিল। তার আগে এমন এক যুগও অতিবাহিত হয়েছে যখন আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় দোয়া করা, ওয়ায করা এবং ইসলামী বিষয়ে আলোচনা করাও একটা অভিনব ব্যাপার বলে বিবেচিত হতো এবং জনগণ তাতে আপত্তি তুলতো। তুরস্কে যখন সর্ব প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে সেনা বিন্যাস ও নতুন নতুন যুদ্ধ সরঞ্জাম ব্যবহারের প্রচলনের উদ্যোগ নেয়া হলো, তখন একটি দল তাতে কঠোর আপত্তি তুললো। এর প্রত্যেকটি কাজকেই বিদয়াত ও ইসলামে নতুন জিনিস সংযোজনের নামান্তর বলে অভিহিত করা হলো। কিন্তু আজ এসব জিনিসে আপত্তি তোলার কেউ নেই। আপত্তি তো দূরের কথা, আজ আলেম ও সাধারণ অজ্ঞ মুসলমান-নির্বিশেষে সকলেই এসব কাজকে শুধু জায়েজ নয় বরং পছন্দনীয় বলে মনে করেন। এর কারণ নিয়ে চিন্তা গবেষণা করলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে, আসলে অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণা থেকেই এ জাতীয় আপত্তির উদ্ভব ঘটে থাকে। পরে এগুলোর সমর্থনে শরীয়ত থেকেই যুক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়।

ইসলামে আরবী ভাষার মর্যাদা সম্পর্কে আপনি যে সব কথা লিখেছেন, তাতে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ উভয় রকমের তথ্যের সমাবেশ ও সংমিশ্রণ ঘটেছে। ইসলামের সাথে আরবী ভাষার যে একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, সে কথা আপনি ঠিকই বলেছেন। কুরআন আরবীতে নাযেল হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমুজ্জ্বল আদর্শ ও সাহাবায়ে কেরামের জীবন কাহিনী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যভাণ্ডার আরবীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইসলামের যে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ওপর মানুষের মুসলমান হওয়া নির্ভরশীল, তা আরবী ভাষা জানা ছাড়া সম্ভব নয়। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বজায় রাখার

জন্যও আরবী ভাষা একটা জরুরী ও অপরিহার্য উপায়। এ সব কারণেই প্রত্যেক যুগের আলেমগণ আরবী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর এসব কারণেই প্রত্যেক বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মুসলমান আজও মনে করে যে, মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবী ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এসব কথা পুরোপুরি সত্য ও ন্যায়সঙ্গত এবং এ ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে, যা হওয়া উচিত এবং যা বাস্তবে বিদ্যমান উভয়ে অনেক প্রভেদ। যা হওয়া দরকার তার জন্য অবশ্য চেষ্টা করতে থাকুন। কিন্তু তা যদি বাস্তবে বিদ্যমান না থেকে থাকে তবে নিজের নীতি ও তৎপরতাকে বাস্তবানুগ করতে অস্বীকার করবেন না। বিবেক ও ইসলাম উভয়ের দাবী এই যে, উদ্দেশ্যকে পদ্ধতির ওপর অগ্রগণ্য মনে করতে হবে। একটা পদ্ধতি যদি উৎকৃষ্টতরও হয়ে থাকে অথচ বর্তমানে কার্যকর নয়, তা হলে বর্তমানে কার্যকর আছে এমন একটা ভিন্ন পদ্ধতি উৎকৃষ্টতর না হলেও অবলম্বন করুন। কিন্তু আপনি যদি নির্দিষ্ট পদ্ধতির ওপর জিদ ধরে আসল উদ্দেশ্যই হারিয়ে বসেন তাহলে সেটা বুদ্ধিমত্তার কাজও হবে না, দীনদারীও হবে না

এখন আপনি নিজেই চিন্তা করুন যে, ইসলামের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? আরবী ভাষাকে "সরকারী" ও জাতীয় ভাষা হিসেবে চালু করাই কি ইসলামের আসল লক্ষ্য, না আল্লাহর নির্দেশ ও শিক্ষা তার বান্দাদেরকে অবহিত করা? দ্বিতীয়টাই যে আসল উদ্দেশ্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইসলামের প্রচার ও প্রসারই যখন আসল উদ্দেশ্য এবং অনারব দেশগুলোতে শতকরা দু'জন আরবী বুঝার যোগ্য মানুষও অবশিষ্ট নেই, এটাও যখন চাক্ষুস সত্য, আর হিজরী প্রথম শতকে যে শক্তি ও প্রতাপের জোরে মুসলমানরা আরবী ভাষার জ্ঞান বিস্তার করেছিলেন সে শক্তি থেকেও আমরা বঞ্চিত, এখন আমাদের সঠিক কর্মপদ্ধতি কি হতে পারে তা ভেবে দেখা দরকার। আমরা কি অন্য কোন সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করে মূল উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা চালাবো, না প্রাচীন পদ্ধতি অর্থাৎ আরবী ভাষার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের ওপর জিদ ধরে মূল উদ্দেশ্যটাই অর্থাৎ ইসলাম প্রচারকে বাতিল করে দেবো?

ইসলামের প্রচার একই ভাষায় হওয়া উচিত–এ কথার স্বপক্ষে আপনি যে সব যুক্তির অবতারণা করেছেন তা আসলে অত্যন্ত দুর্বল যুক্তি। আপনি একটু গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করলে এই যুক্তির অসারতা নিজেও বুঝতে পারবেন। ইসলাম একটা বিশ্বজনিন মহাসত্য। মানুষের কোন ভাষার সাথে তার কোন জন্মগত বাধাধরা সম্পর্ক নেই। আল্লাহর আসল উদ্দেশ্য হলো, তার দীনকে বান্দাদের কাছে পৌছে দেয়া। এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তিনি যেমন একজন মানুষকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন, তেমনিভাবে একটি ভাষাকেও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। রসূল (সাঃ) এর পূর্বে এই দীনকেই মানব জাতির কাছে পৌছানোর জন্য তিনি অন্যান্য জাতির মানুষকে এবং অন্যান্য জাতির ভাষাকেও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এখন সর্বশেষ প্রচারাভিযানের বেলায় তিনি যদি আরব জাতিকে ও আরবী ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন, তবে তা থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, তখন শুধু আরবী ভাষার সাথেই ইসলামের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং অন্য কোন ভাষাকে ইসলাম প্রচারের কাজে প্রয়োগ করা না জায়েজ বা মাকরূহ হয়ে গেছে। যদি তাই হতো, তাহলে রসূল (সাঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতেন যে, আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষাকে ইসলাম প্রচারের কাজে কিয়ামত পর্যন্ত ব্যবহার করো না। অথচ হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, তিনি কোন কোন সাহাবীকে অনারবীয় ভাষা শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাহাবা যুগে হযরত সালমান ফারসীর (রাঃ) মত অনারব বংশোদ্ভুত ব্যক্তিগণ অনারবদেরকে তাদের নিজ নিজ ভাষায় ইসলামের শিক্ষা দিতেন।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে, রোম ও পারস্যের সম্রাট দ্বয়ের কাছে যে দাওয়াতী চিঠি দেয়া হয়েছিল তা আরবীতে পাঠানো হলো কেন? এর পয়লা জবাব এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে চিঠি তাদেরকে দিয়েছিলেন তা ছিল এক রাজার কাছে আর এক রাজার চিঠি। এ ধরনের চিঠিতে নিজ দেশের ভাষার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের দেশের ভাষা ব্যবহার করা অপমানজনক। যে দেশের শাসক এভাবে নীচে নেমে চিঠি লিখেন তিনি নিজ দেশের

অবমাননাই করেন। দ্বিতীয় জবাব এই যে, ইসলাম প্রচারের স্বার্থে রাসূল (সাঃ) যদি প্রত্যেক শাসককে তার নিজ ভাষায় চিঠি লিখতেও চাইতেন, তবে সে সময় তার ব্যবস্থা করা দুরূহ ছিল। কেননা আরবী ছাড়া অন্যান্য ভাষা জানা লোক সাহাবীদের মধ্যে খুবই কম ছিল। যারা জানতেন তারাও ঐ সব ভাষার এমন সাহিত্যিক ছিলেন না যে, একজন নবীর মর্যাদার সাথে মানানসই বিশুদ্ধ ও অলংকারসমৃদ্ধ ভাষায় চিঠি লিখতে পারতেন। তা ছাড়া রসূল (সাঃ)-এর এটাও জানা ছিল যে, যে বাদশাহদের কাছে তিনি দাওয়াতী চিঠি পাঠাচ্ছেন তাদের কাছে চিঠির মর্ম বুঝিয়ে দেয়ার মত লোকের অভাব নেই।[১] সুতরাং তিনি যে, আরবীতে ইসলামের দাওয়াত পাঠিয়েছিলেন, সেটা ছিল বাস্তব সমস্যার ফল। এটা তাঁর পানির অভাবের সময় তায়াম্মুম করে নামায পড়া এবং রোগজনিত অক্ষমতার বেলায় বসে নামায পড়ার সাথে তুলনীয়। আল্লাহ চাইলে রসূল (সাঃ)-এর জন্য সর্বত্র একটা করে জলাশয় তৈরী করে রাখতে পারতেন এবং তাকে চিরদিন সব ধরনের রোগ-ব্যধি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত করতে পারতেন। সুতরাং রসূল (সাঃ)-এর অনারব শাসকদের কাছে আরবীতে চিঠি লেখার দৃষ্টান্ত দ্বারা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কিছুতেই ঠিক নয় যে, শরীয়তের বিধান ইসলাম প্রচারের কাজকে আরবী ভাষার মধ্যেই সীমিত রাখতে চায় এবং যারা এ ভাষা জানে না তারা অজ্ঞতা ও গোমরাহীতে লিপ্ত থাকুক এটাই তার কাম্য।

সাহাবায়ে কেরাম ও প্রাচীন ইমামগণের অনারবীয় ভাষার প্রতি অনিহা এবং আরবীর জন্য জিদ ধরার ব্যাপারে আমি যে "আভিজাত্য" শব্দটা প্রয়োগ করেছি তাকে আপনি ভুল বুঝেছেন।

---

১. উল্লেখ্য যে, রোম ও পারস্য উভয় সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় ও তাদের প্রভাবাধীন অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন আরব রাজ্য এবং বড় বড় আরব গোত্র বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাটের দরবারে বহু আরব সরদারের আনাগোনা ছিল। মিসর ও আবিসিনিয়ার সাথেও আরবদের ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল এবং উভয় দেশে সীমানা জুড়ে আরবী ভাষাভাষী জনপদ বিদ্যমান ছিল।

আপনি মনে করেছেন যে, আমি তাদেরকে "অনৈসলামিক আভিজাত্য"-এর জন্য দোষারোপ করছি। অথচ আমার কথার উদ্দেশ্য ছিল অন্য রকম। আভিজাত্য শুধু অনৈসলামিক হয়ে থাকে এ ধারণা ঠিক নয়। এক ধরনের আভিজাত্য আছে যা প্রত্যেক মানুষেরই জন্মগত বৈশিষ্ট্য এবং তাকে দূষণীয় মনে করা চলে না। উদাহরণ সরূপ, একজন ভারতীয় যদি চীন ভ্রমণে যায় তবে সেখানকার ভাষা, চাল-চলন, রীতিনীতি, জীবন যাপন প্রণালী সবকিছুই তার কাছে অজানা অচেনা লাগবে, ওসব দেখে বিরক্তি প্রকাশ করবে এবং তার পরিবার পরিজন চীনা চালচলন অবলম্বন করুক তা সে পছন্দ করবে না। এটা একটা জন্মগত ঘৃণা। প্রত্যেক মানুষ তার অজানা-অচেনা জিনিসের প্রতি স্বভাবতই এ ঘৃণা পোষণ করে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম আর যাই হোন, রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ অবশ্যই ছিলেন। অনেকটা এই স্বাভাবিক অনুভূতির কারণেই অনারবীয় ভাষা ও কৃষ্টিকে তারা কিছুটা ঘৃণার চোখে দেখতেন। তদুপরি অনারব জাতিগুলো তখন সবাই কাফের ছিল বলে এ ঘৃণা আরো তীব্র আকার ধারণ করেছিল। তাদের মধ্য থেকে যারা মুসলমান হতো, তাদেরকে তারা পুরোপুরি আরবীয় আদলে গড়ে তোলা জরুরী মনে করতেন, যাতে তারা কাফেরদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামী সমাজে মিশে যায়। সাহাবাগণ এটাও পছন্দ করতেন না যে, মুসলমানরা (যারা এখনও সকলেই আরব ছিল) অনারব দেশে গিয়ে অনারবদের বোলচাল শিখুক এবং তাদের মত বেশ-ভূষা গ্রহণ করতে আরম্ভ করুক। কেননা এভাবে তারা কাফেরদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার সাথে মিশে একাকার হয়ে যেতে পারে, এ আশংকা ছিল। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন তার পেছনে দুটো কারণ সক্রিয় ছিল। একটা কারণ ছিল স্বভাবজাত। আর একটা ছিল তৎকালীন পরিস্থিতিজনিত। প্রথম কারণটার সাথে শরীয়তের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই ওটাকে যুক্তি বা দলিল হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক নয়। দ্বিতীয় যে কারণ, সে ধরনের পরিস্থিতি এখন নেই। উর্দু, ফার্সী, তুর্কী, ইন্দোনেশীয় এবং এ ধরনের অন্যান্য ভাষাও এখন আরবীর

মত মুসলমানদের ভাষা। কোন রকমের ইসলামী স্বার্থে এ সব ভাষাকে অবজ্ঞা করা বা এড়িয়ে চলার কোন কারণ এখন বর্তমান নেই।

(তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল উখরা ও রজব, ১৩৫৬ হিঃ, আগস্ট–সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)

মুরাদাবাদ থেকে জনৈক ভদ্রলোক লিখেছেনঃ

আপনি অনাবরীয় ভাষায় খুৎবা দান প্রসঙ্গে যা কিছু লিখেছেন তার মোদ্দা কথা দাঁড়ায় এই যে, জুময়ার খুৎবা আরবী ছাড়া অন্যান্য ভাষায় দেয়া শুধু জায়েজ এবং শ্রোতাদের মাতৃভাষায় দেয়া যেতে পারে। এ থেকে বুঝা যায় যে, এটা কোন পর্যায়ের জরুরী কিছু নয়। জায়েজ বলতে যা বুঝানো হয়, মুবাহ, মুস্তাহাব এমনকি মাকরুহও তার আওতায় এসে যায়। এ কারণেই আপনি আলোচনার শেষাংশে যে সব "বাস্তব সমস্যার'' উল্লেখ করেছেন, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রচলিত পদ্ধতিকেই অধিকতর পছন্দীয় এবং আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় খুৎবা চালু না করাই উত্তম বলে সুস্পষ্টভাবে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অথচ আপনি যদি এটাকে জরুরী মনে করতেন তা হলে এই সব সম্ভাব্য অনিষ্টকর দিকগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এরূপ মত না দিয়ে ওগুলোর প্রতিকার ও সংশোধনের উপায় অনুসন্ধানের ওপর জোর দিতেন। এভাবে সাফল্যের আশা থাক বা না থাক, শ্রোতাদের ভাষায় খুৎবা দেয়াকেই জরুরী বলে রায় দেয়া যেত। কেননা একটা জরুরী জিনিস কোন লাভ বা ক্ষতির কারণে পরিত্যক্ত হতে পারে না। অবশ্য মুবাহ বা মুস্তাহাব পর্যায়ের জায়েজ জিনিস লাভ বা ক্ষতির কারণে পরিত্যাজ্য হতে পারে। তবে এ কথা সত্য যে,ফায়দা অর্জন এবং অনিষ্ট প্রতিরোধের কোন উপায় থাকলে তা অবলম্বন করাও একটা স্বতসিদ্ধ জরুরী কাজ। তবে তার অর্থ এ নয় যে, সেই উপায় যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ আমরা ওয়াজেব কাজটা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবো এবং শরীয়ত আমাদের কল্যানার্থে প্রতি সাপ্তাহে একটা সম্মিলনের যে সুযোগ সৃষ্টি করে রেখেছে, তা এ যাবত যেমন হাতছাড়া করে এসেছি ,আগামীতেও তেমনি হাতছাড়া করে যেতে থাকবো।

জুময়ার খুৎবা যে কমেরপক্ষে ওয়াজেব, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ্ নেই। সেই সাথে এ কথাও আপনি স্বীকার করেন যে, আল্লাহ্‌র যিকির এবং আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে ওয়াজ নসিহ্‌ত এবং ইসলামের বিধান প্রচার করা ও শিক্ষাদান করাও খুৎবার অন্যতম উদ্দেশ্য। আর খুৎবা যখন ওয়াজিব তখন তার উদ্দেশ্য সফল করাও ওয়াবিব। আর এ কথা দিবালোকের মত স্বচ্ছ যে, শ্রোতাদের ভাষায় খুৎবা দেয়া ছাড়া এর উদ্দেশ্যের বেশীর ভাগ অর্জন করা অসম্ভব। কাজেই "যে কাজের ওপর একটা ওয়াজিব কাজ সমাধা করা নির্ভরশীল সে কাজটাও ওয়াজিব।" এই সর্বজনবিদিত মূলনীতির ভিত্তিতে শ্রোতাদের ভাষায় খুৎবা দেয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত না হয়ে পারে না।

আর যে জিনিস ওয়াজির সাব্যস্ত হয় তা কোন লাভ ক্ষতির বিচারে পরিত্যাগ করা জায়েজ হতে পারে না। তবে যে সব ক্ষতির আশংকা থাকে তার প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য আলাদাভাবে চেষ্টা করা জরুরী।

আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুৎবা চালু করার সবচেয়ে বড় ক্ষতির আশংকা আপনি যেটা ব্যক্ত করেছেন তা এই যে, বিতর্কিত মসলা-মাসায়েল বর্ণনা করা হবে এবং তার ফলে কলহ কোন্দলের সৃষ্টি হবে। কিন্তু আপনি এই ক্ষতির এবং অন্যান্য ক্ষতির প্রতিরোধের যে পন্থা নির্দেশ করেছেন আমার মতে তাও যথেষ্ট নয়। কেননা একে তো আপনারই কথা মোতাবেক তার আশা খুবই কম। আর আমার মতে তো আজকালকার আলেমদের দ্বারা এমন কাজ সম্পন্ন হওয়া বলতে গেলে অলৌকিক ব্যাপার। এমতাবস্থায় "নয় মণ তেলও জুটবেনা, রাধাও কখনো নাচবে না।" ফলে খুৎবার সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যাবে।

দ্বিতীয়ত, মনে করুন, আলিমদের একটি মধ্যপন্থী দলের তৈরী খুৎবাই চালু করা হলো এবং তাতে কোন বিতর্কিত বিষয়ও সন্নিবেশিত হলো না। তা সত্ত্বেও আপনার উক্তি মোতাবেক যে খতিবের ভাষায় আল্লাহ্ এমন বিষ মিশিয়ে রেখেছেন যে, সে মানুষের মনে আঘাত না দিয়ে কথাই বলতে পারে না এবং যে

নিজের মতের ব্যাপারে এত কট্টর গোঁড়া যে অন্য কোন মতের সাথে আদৌ আপোস করতে পারেনা, সে ঐ মধ্যপন্থী আলেমদের রচিত খুতবা পড়া সত্ত্বেও নিজের মত প্রচারণা করে ও তার বিরোধীদের প্রসঙ্গ না টেনে পারবে কেমন করে? প্রথমত কোন বক্তার পক্ষেই নিজের বক্তৃতার ধারাকে যে দিকে খুশী ঘুরিয়ে দেয়া কোন কঠিন কাজ নয়। তদুপরি মৌলবী বক্তার পক্ষে এটা খুবই সহজ কাজ। একজন মৌলবী যখন নিজের মতামত প্রচার করে তখন তার হাতে থাকে কুরআন। যখন অন্যের মতামত খন্ডন করে তখনও তার মুখে কুরআন উচ্চারিত হয়। কারো প্রশংসা করলেও কুরআন থেকেই তার প্রমাণ হাজির করে, কাউকে গালি দিলেও কুরআন থেকেই তার সাফাই দেয়। মোট কথা, সে যে মতের কট্টর সমর্থক কিংবা কোন কারণে যে মত তার পছন্দনীয়, তাকে সে কুরআনের বরাত দিয়েই শ্রোতাদের মনে বদ্ধমূল করতে চায়, চাই প্রকৃত পক্ষে তার সে মত শরীয়তের দৃষ্টিতে একেবারেই বাতিল হোক না কেন। এমতাবস্থায় তাকে সংযত করতে পারে এমন শক্তি কার আছে?

আর যদি এ কথা মেনেও নেয়া হয় যে, সেই খতিব উক্ত নির্দিষ্ট খুৎবার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেই নিজের বক্তৃতাকে সীমিত রাখবে এবং অন্য কোন বিষয়ে মুখ খুলবে না, তা হলে এতে করে আবার খুৎবার মূল উদ্দেশ্য খানিকটা ব্যাহত হবে। কেননা স্থান, কাল ও পরিস্থিতির দাবী অনুসারে প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা বলাও খুৎবার উদ্দেশ্যের আওতাভুক্ত। তা না হলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে যক্ষা রোগীকে কলেরার ওষুধ দেওয়ার মত। আর এমতাবস্থায় ঐ খুৎবা পুরোপুরি না হলেও খানিকটা বর্তমান প্রচলিত খুৎবার মতই হবে। কেবল ভাষার পার্থক্য হবে, বিষয় বস্তুর ভেতরে যে সীমাবদ্ধতা ও কড়াকড়ি ছিল তা হুবহু বহাল থাকবে। এমনকি একাধিক খুৎবাও যদি এই উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়ে থাকে যে, এর মধ্য থেকে যেটা সময়োপযোগী হয় পড়া হবে,তবু তা যথেষ্ট হবে না। কেননা প্রত্যেক স্থান ও কালের জন্য কিছু নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয় থাকে, যা গদ বাঁধা খুৎবায় উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। কেননা সেগুলো সাধারণ প্রয়োজনের আলোকে রচিত হয়ে থাকে।

আর এসব বিষয় যদি বাদও দেই, তবু এই খুৎবাগুলোতে অন্তত এ কথাগুলো বা এর সমার্থক কথা থাকবেইঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ ۔ الخ
مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ۔ وَاِيَّاكُمْ
وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ، كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ۔ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ
اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ
مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ۔ الخ

"তোমরা আমার ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত মেনে চল। যদি কেউ আমাদের শরীয়তে এমন কোন নতুন জিনিস ঢুকায়, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। সাবধান, নতুন উদ্ভাবিত রীতি–নীতি গ্রহণ করো না। প্রত্যেক ভিত্তিহীন নতুন রীতি গোমরাহীর পর্যায়ভুক্ত। তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর। নিশ্চয় আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করেন না, এর চেয়ে ছোট যত গুনাহ হবে তা যাকে ইচ্ছা মাফ করেন।..." আর না হোক, অন্তত কলেমায়ে শাহাদাত পড়া তো অবধারিত। বিষমুখো মৌলবীর জন্য তো এটুকুই যথেষ্ট। সে নিজের স্বভাব অনুসারে ইচ্ছা করলে এর আওতায় সব কিছুই বলতে পারে এবং নিজের মতামতের নিরীখে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ভাবেই বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করতে পারে।

তাছাড়া এটাও দুর্বোধ্য ব্যাপার যে, বিতর্কিত বিষয় আলোচনা একেবারেই বন্ধ করা জরুরী সাব্যস্ত হলো কেন? এতে যে ক্ষতির কথা বলা হয়েছে তার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না বটে। তবে কেবল একটা সম্ভাব্য জিনিসের জন্য নিশ্চিত ক্ষতি কি গ্রহণ করা চলে?

এ কথা অবশ্য ঠিক যে, কোন বিশেষ প্রয়োজন এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটে এ সব বিষয় আলোচনা করার সাময়িক উপকারিতা ও স্বার্থকতা দেখা না যাওয়া পর্যন্ত এসব বিষয়ে মুখ খোলা অনুচিত।

কিন্তু যখন সত্যিকার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন এগুলোর প্রচার অন্যান্য সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের মতই জরুরী বিবেচিত হওয়া চাই।

এ কথা সবার জানা যে, আমাদের যুগে যে অধিক মাত্রায় বিবাদ বিসম্বাদ ও গোলযোগ সংঘটিত হচ্ছে, সেটা প্রধানত শেরক ও বিদয়াতের নিন্দা ও সমালোচনা এবং তার খুঁটিনাটির বিশদ বিবরণ দেয়ার কারণেই হচ্ছে। অথচ মুসলমানদের সংশোধনের জন্য এ কাজটা এত জরুরী যে, কোন অবস্থাতেই তা বাদ দেয়া বা তার প্রতি শৈথিল্য দেখানোর উপায় নেই। খুৎবায় যদি আকীদা-বিশ্বাসের ত্রুটি শুধরানো, তাওহীদ ও রিসালাতের প্রকৃত মর্ম বিশ্লেষণ, রসূলের (সাঃ) আদর্শকে আঁকড়ে ধরা ও বেদায়াত পরিহার করার ওপর গুরুত্ব আরোপ, শেরকের সমালোচনা এবং বিভিন্ন প্রকারের শেরক সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করাই না হলো, তা হলে আমি বুঝি না যে, মুসলমানদের ইসলামী কর্মকাণ্ডের সংশোধনের সাথে এ বিষয়ের চেয়ে আর কোন বিষয়ের বেশী সম্পর্ক রয়েছে।

সুতরাং আমার মতে একমাত্র এই কর্মপন্থাই সমিচিন মনে হয় যে, খুৎবার যে অংশে ইসলামী বিধিমালা বর্ণনা করা হয়, সেটা অবশ্যই এবং সর্বাবস্থায়ই শ্রোতাদের ভাষায় প্রচারিত হওয়া দরকার। এতে যে অনিষ্টের আশংকা রয়েছে তার প্রতিরোধে অন্যান্য উপায়-উপকরণের সাহায্য নেয়া উচিত। যেমন, খতিবদেরকে লিখিতভাবে ও মৌখিকভাবে বুঝিয়ে বলা দরকার যে, তারা বিনা প্রয়োজনে এ সব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ যেন না দেন। তবে প্রয়োজন মনে করলে অবশ্যই দেবেন। কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখবেন যে, বর্ণনাভঙ্গি যেন আক্রমণাত্মক ও শ্রুতিকটু না হয়। সরল, সাবলীল ও বিনম্র ভাষায় যে মত সত্য ও সঠিক, তা বিশ্লেষণ করবেন। কারোর ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণ চালাবেন না।

বর্তমানেও তো এ ধরনের মৌলবী সাহেবদের বক্তৃতা থেকে দ্বন্দ্ব-কলহের সূত্রপাত হয়ে থাকে। সেগুলোর প্রতিকার ও প্রতিরোধ যেভাবে করা হয়, এ ক্ষেত্রেও সেভাবে করা যেতে পারে।

তাছাড়া এ কথাও লক্ষ্যণীয় যে, এ জাতীয় মতভেদের প্রভাব বর্তমানে জন সাধারণের মনে এত গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এক আকীদা ও মতামতের লোকেরা ভিন্ন মতের লোকদের পেছনে নামায পড়তেই যায় না। প্রত্যেক আকীদা ও মতের লোকদের নামাযের জামায়াত সাধারণভাবে এবং জুময়ার জামায়াত বিশেষভাবে আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। একে অপরের পেছনে নামায পড়া এড়িয়ে চলে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে সকলের মসজিদই আলাদা হয়ে গেছে। নিজ নিজ সমমনা লোকদের মধ্যে এবং নিজ নিজ মসজিদে প্রত্যেক খতিব যেমন খুশী বক্তৃতা করতে পারে এবং করেও থাকে। কেউ বাধা দিতে পারে না এবং প্রায়ই দেয়না।

এ পর্যন্ত যা কিছু বললাম, তা মূলত জনসাধারণের ভাষায় দেওবন্দী ও বেরেলভী এবং ওহাবী ও বিদয়াতী নামে খ্যাত দুই ফেরকার ব্যাপারেই বললাম। কেননা ভারতে এই দুটো ফেরকারই প্রাধান্য বিরাজমান। বাস্তবেও যেখানে যেখানে গোলযোগ হয়, এই দুই ফেরকা ছাড়া অন্যান্য ফেরকার মধ্যে বোধ হয় হয় না। হলেও আমার জানা নেই। যদি হয়ই তবে সেটা খুবই বিরল ঘটনা। সংখ্যাধিক্য বিচারে এই দুই ফেরকাই আমল দেয়ার যোগ্য। সংখ্যা গরিষ্ঠের ক্ষেত্রে যখন আমার মত এ রকম, তখন সংখ্যালঘুদের বেলায়ও এই মতই ধরে নেয়া উচিত।

এরপর যে জিনিসটা বিচার-বিবেচনার দাবী রাখে, তা হলো বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কিস্সা কাহিনী বয়ান করার আশংকা। এটা এভাবে রোধ করা যেতে পারে যে, প্রত্যেক অঞ্চলে প্রভাবশালী লোকদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন অজ্ঞ ও পেশাদার ওয়ায়েজদেরকে কোনক্রমেই খতিব নির্বাচন না করা হয়। পারতপক্ষে সুশিক্ষিত ও বিচক্ষণ আলেমদের হাতেই যেন এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। আর খতিব নিজে যদি তেমন বড় আলেম নাও হয়, তবে কোন নামকরা আলিম যেন তাকে নির্ভরযোগ্য এবং তার বক্তৃতাকে শ্রবণযোগ্য বলে সুপারিশ করেন।

এমন ব্যবস্থাও করা যায় যে, আলেমদের পক্ষ থেকে সকল ইমাম ও খতিবদের জন্য যাবতীয় বিতর্ক ও কলহ এড়িয়ে চলার নিয়ম-বিধি সম্বলিত একটি পুস্তিকা রচনা করে বিলি করা হবে। যেমন, এরূপ বিধি ঘোষণা করা হবে যে, কোন হাদীস বা ঐতিহাসিক ঘটনা তার প্রামাণ্যতা সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান না করে বলা যাবে না। অথবা অমুক কিতাবের অমুক অমুক অধ্যায় থেকে অমুক অমুক শর্তে হাদীস বর্ণনা করা চলবে আর অমুক কিতাবের কোন হাদীসই সূত্র অনুসন্ধান করে নিশ্চিত হওয়ার আগে একেবারেই বর্ণনা করা যাবে না। মোট কথা, এসব বিধি অথবা অন্য যেসব বিধি ভালো মনে হয়, ঐ পুস্তিকার মাধ্যমে ইমাম সাহেবদেরকে জানিয়ে দেয়া যেতে পারে। আমি মনে করি, এভাবে এই সমস্যার কার্যকর সমাধান সম্ভব হবে।

জবাব

বেশ মজার ব্যাপার হয়েছে। এক দল অনারবীয় ভাষার খুৎবাকে মাকরূহ তাহরিমী (ঘোরতর অপছন্দনীয়) প্রমাণ করছেন, যার অর্থ এই যে, এ কাজ করলে গুনাহগার হতে হবে। অপর দল এটাকে ওয়াজিব প্রমাণ করতে গলদঘর্ম হচ্ছেন, যার অর্থ এই যে, এ কাজ না করলে গুনাহগার হতে হবে। অথচ প্রথম দলের কাছে যেমন এর নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে কোন শরীয়ত ভিত্তিক প্রমাণ নেই, তেমনি দ্বিতীয় দলের কাছেও নেই এর ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে কোন যুক্তি। এ ব্যাপারে একটা মূলনীতি সকলের বুঝে নেওয়া দরকারঃ শরীয়তে ফরয, ওয়াযিব এবং হারাম ও অবৈধ কেবল সেই সব জিনিসকেই বলা যাবে, যাকে স্বয়ং শরীয়তপ্রণেতাই নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, অথবা যার সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এ ধরনের কোন বিধি অকাট্যভাবে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র সেই ধরনের কাজ করা বা পরিহার করাকেই গুনাহর কাজ বলে আখ্যায়িত করার অবকাশ রয়েছে। পক্ষান্তরে যে সব ব্যাপারকে আমরা যুক্তি প্রয়োগ ও আন্দাজ-অনুমান দ্বারা কুরআন অথবা হাদীস থেকে বা রসূল (সাঃ)-এর কাজ থেকে শরীয়তের বিধি বলে সাব্যস্ত করি, সেগুলোকে ফরয বা ওয়াজিব বলা অথবা হারাম

ও না–জায়েজ আখ্যায়িত করা এবং তার ভিত্তিতে গুনাহ বা পূন্য হওয়ার পক্ষে রায় দেয়া মূলতই একটা ভুল কাজ। কেননা মানুষের ওপর কোন জিনিস ফরয বা ওয়াজিব করা বা হারাম ও না জায়েয সাব্যস্ত করার আদৌ কোন ক্ষমতা ও অধিকার অন্য মানুষের নেই। আযাব ও সওয়াব মানুষের নয়, আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। এ ব্যাপারে কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা লক্ষ্যণীয় :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا
حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
لَا يُفْلِحُونَ (النحل: ١١٦)

''আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমাদের মুখের বানোয়াট বর্ণনা মোতবেক এটা হালাল, ওটা হারাম বলো না। মনে রেখ, যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে তারা কখনো সফল কাম হয় না। (নাহ্‌ল ১১ ৬)।

কোন ব্যক্তি যত বড় আলেম ও মান্যগণ্য ইমামই হোন, তিনি বড় জোর এতটুকুই বলার অধিকর রাখেন যে, আমি কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ রকম মনে করি, আমার মতে অমুক কাজ করা যেতে পারে বা করা বাঞ্ছনীয়। অথবা অমুক কাজ করা যায় না বা করা বৈধ নয়। অবশ্য মতভেদের অবকাশ এ ক্ষেত্রেও বহাল থাকে। কেননা এক ব্যক্তির বুঝ আর এক ব্যক্তির বুঝের হুবহু অনুরূপ হতে পারে না। তবে এই মতপার্থক্য শরীয়তের বিধিতে নয়, রবং মানুষের চিন্তা–গবেষণা প্রসূত সিদ্ধান্তে দেখা দেবে। আর সে কারণে সেই সব মারাত্মক বিবাদ–বিসম্বাদ সৃষ্টি হতে পারবে না, যা চিন্তা–গবেষণাজনিত মত পার্থক্যের ভিত্তিতে ফরয ও হারামের প্রভেদ সৃষ্টি এবং তার ভিত্তিতে একে অপরকে গুনাহগার ও গোমরাহ আখ্যায়িত করার কারণে হয়ে থাকে।

এই মূলনীতিটাকে ভালো করে উপলব্ধি করুন। এরপর খুৎবার ভাষা নিয়ে ভাবুন। শরীয়তে এমন কোন সুস্পষ্ট বিধি দেওয়া হয়নি যে, অমুক ভাষায় খুৎবা দেয়া ওয়াজিব কিংবা অমুক ভাষায় দেয়া মাকরূহ তাহরিমী। তা ছাড়া কি কি উদ্দেশ্যে খুৎবাকে

জুমআর নামাযের জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে, শরীয়তে তাও সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়নি। এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতের আলেমগণ যত রকমারি বক্তব্য দিয়ে থাকেন, তা শরীয়তের কোন অকাট্য নির্দেশ থেকে উৎসারিত নয়। বরঞ্চ রসূল (সাঃ)-এর বাস্তব কার্যধারা দেখে তারা নিজেদের বুঝ অনুসারে বিভিন্ন মতামত অবলম্বন করেছেন। এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মত সঠিক হতে পারে, কিংবা অন্য আর এক গোষ্ঠীর মত সঠিক হতে পারে। উভয়ের অধিকার রয়েছে নিজ নিজ মতের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার। কিন্তু এ অধিকার কারোর নেই যে, নিজের বুঝ অনুসারে সে যে বিধি প্রণয়ন করছে সেটাকে ওয়াজিব বলে আখ্যায়িত করবে এবং তা বর্জনকারীকে গুনাহগার সাব্যস্ত করবে অথবা তাকে হারাম আখ্যায়িত করে যে ব্যক্তি তা করবে তাকে পাপী সাব্যস্ত করবে। যার যুক্তি-প্রমাণ ও মতামত গ্রহণযোগ্য মনে হবে, তা অনুসরণ করার ব্যাপারে জনগণ পুরোপুরি স্বাধীন। শরীয়তের এ ব্যাপারে স্পষ্টোক্তি না করার অর্থই এই যে, শরীয়ত এ ক্ষেত্রে মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছে। সে ব্যাপারে মানুষের রীতি-নীতি যদি বিভিন্ন রকমের হয়ে যায়, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। যার মতের স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ অধিকতর মজবুত হবে এবং যার মতামত মুসলমানদের সামাজিক বিবেককে অধিকতর সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হবে, শেষ পর্যন্ত সেটার ওপরই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হবে এবং মতবৈষম্যের গন্ডী ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসবে।

অনারবীয় ভাষায় খুৎবা দেয়াকে ওয়াজেব সাব্যস্ত করার পক্ষে পত্র লেখক মহোদয় যুক্তি প্রদর্শনের যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন, সেটা অবিকল এ রকম, যেমন কেউ বললো যে, নামাযের প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন। আর আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন একাগ্রতা ও নিবিষ্টচিত্ততা ছাড়া সম্ভব নয়। আর যে জিনিসের ওপর ফরযের উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া নির্ভরশীল, তাও ফরয হওয়া উচিত। সুতরাং একাগ্রতা ও নিবিষ্টতা নামাযে ফরয গণ্য হওয়া উচিত। এ ধরনের যুক্তি প্রয়োগ

নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে সঠিক হতে পারে, কিন্তু শরীয়তের দিক থেকে সঠিক নয়। কেননা এই যুক্তি প্রয়োগকারী মানুষটি মুসলিম উম্মাহর উপর এমন একটা কাজ ফরয করতে চায়, যা আল্লাহ ফরয করেননি। শরীয়তে কেবল আল্লাহ যা ফরয বা হারাম করেছেন সেটাই ফরয বা হারাম। নীতি শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রয়োগ করে ফরয আর হারামের তালিকায় নতুন ফরয ও হারাম সংযোজনের কোন অধিকার আমাদের নেই। পূর্বতন উম্মতগুলো এভাবেই ভ্রান্তনীতি অবলম্বন করে নিজেদের ওপর অনেক মনগড়া জিনিস ফরয করে নিয়েছিল, যা তাদের ওপর আল্লাহ ফরয করেননি। কুরআনে এগুলোকে বোঝা ও শিকল বলা হয়েছে এবং এগুলো থেকে মানব জাতিকে মুক্ত করার জন্য রসূল (সাঃ)কে পাঠানো হয়েছে। সূরা আরাফের ১৫৭ নং আয়াত দেখুনঃ

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (الاعراف: ١٥٧)

"তিনি তাদের ওপর তাদের বোঝা ও শিকল অপসারণ করবেন।"

সুতরাং খুৎবার ভাষা সম্পর্কে যে মতামত আমি ব্যক্ত করেছি এবং তার বিরুদ্ধে যে মতামত কতিপয় ওলামা ব্যক্ত করেছেন, তার কোনটাই এমন মর্যদা রাখে না যে মানুষের জন্য তা মেনে নেয়া ওয়াজিব হবে এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য তাদের তাদের গুনাহ হবে। কেউ যদি স্বেচ্ছাচারী ভঙ্গিতে নিজের মতই সঠিক বলে ব্যক্ত করে তবে সেটা তার ভুল।

খুৎবার ভাষা পরিবর্তনের আগে যে কয়টি বিষয়ের সংস্কার ও সংশোধনকে আমি জরুরী বলে আখ্যায়িত করেছি, সেটা পত্র লেখক ভালোভাবে বিচার-বিবেচনা করেননি। তিনি যে সব প্রশ্ন তুলেছেন, তা এ কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, শরীয়ত ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ভন্ডুল হয়ে যাওয়ার কারণে ইসলামের কোন বিধি-ব্যবস্থাই আসল অবস্থায় বহাল থাকেনি। জুময়া এবং খুৎবা আমাদের শরীয়ত ভিত্তিক অবকাঠামোর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহের অন্যতম। এ দুটো জিনিস প্রবর্তনের পেছনে একটা মহৎ সামাজিক উদ্দেশ্য কার্যকর ছিল। সে উদ্দেশ্য সফল করার জন্য

অন্যান্য উপাদানের সাথে এ দুটো উপাদানকেও অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত সাযুজ্য বজায় রেখে একটা সমন্বিত অবকাঠামোতে সংযুক্ত করা হয়েছিল। এখন সে অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে, উপাদানগুলো বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সামষ্টিক জীবনে তাদের সার্বিক যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে এবং যে মহৎ উদ্দেশ্যের খাতিরে এই উপাদানগুলোকে সংগ্রহ ও সংযোজন করা হয়েছিল, সেই মহৎ উদ্দেশ্যটাই মানুষের মন থেকে মুছে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতির যথার্থ সংশোধনের একমাত্র উপায় এটাই যে, সেই শারীয়ত ভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামো আবার কায়েম করতে হবে এবং তার বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলোকে আবার আগের মত একত্রিত করে একটা কারখানার যন্ত্রপাতির মত সংস্থাপন করতে হবে, যাতে করে এই যন্ত্রপাতি চালু করে দিলেই তার থেকে যে ফায়দা আশা করা হয়, সে ফায়দা আপনা থেকেই অর্জিত হতে থাকে। কিন্তু এত বড় কাজ যদি সমাধা করা সম্ভব নাও হয় তবু অন্তত এতটুকু হওয়া দরকার যে, মুসলমনদের মধ্যে একটা সাধারণ জনমত সৃষ্টি করে দেয়া হোক, বিরাট আকারে না হোক ছোট আকারেই তাদেরকে নিজেদের সামষ্টিক কার্যকলাপ শৃংখলার সাথে সম্পন্ন করার অভ্যাস গড়ে দেওয়া হোক এবং দায়িত্ব-জ্ঞানহীন লোকদের উচ্ছৃংখল তৎপরতার কারণে যে সামাজিক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়, জনমতের শক্তি দ্বারা তা রোধ করার ব্যবস্থা হোক। কিন্তু এতটুকু যদি করা সম্ভব না হয়, তা হলে আর সংস্কার ও সংশোধনের নাম মুখে এনে কাজ নেই। যেভাবে যা চলছে, সেভাবেই তা হতে দিন। কেননা প্রত্যেকেই সংস্কার ও সংশোধনের যে অর্থ নিজ নিজ মনে বদ্ধমূল করে নিয়েছে, সে যদি সেই মোতাবেক ব্যক্তিগতভাবে কাজ শুরু করে দেয়, তা হলে এমন অসংখ্য সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা পরস্পর বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হবে এবং তাদের তৎপরতার ফলে সংস্কারের পরিবর্তে আরো বিপর্যয় ও বিশৃংখলা দেখা দেবে।

ইসলামী বিধানে খতিব শুধু একজন ওয়াজ-নসিহতকারী নন, বরং একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা। নিজ এলাকার

মুসলমানদের তত্ত্বাবধান করা, তাদের সামষ্টিক জীবনকে অনাচার থেকে রক্ষা করা এবং তাদের সকলকে সার্বিক জাতীয় নীতি অনুসারে পরিচালনা করার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত। দায়িত্ব নিজেই শিক্ষক স্বরূপ। যে ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়, সে নিজেই ঐ দায়িত্ব থেকে শিখে নেয় কিভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। পক্ষান্তরে একজন দায়িত্বহীন ব্যক্তি, যার না আছে কোন সংগঠনের সাথে সম্পর্ক, না আছে কারো সামনে জবাবদিহী করার বাধ্যবাধকতা আর না আছে জনজীবনে তার খুৎবার কি ধরনের প্রভাব পড়বে সে সম্পর্কে কোন ধারণা। এমনকি তার খুৎবার আদৌ প্রভাব আছে কিনা, তাও বুঝতে পারে না, এ ধরনের ব্যক্তি জুমুয়ার খুৎবার দাবী যথাযথভাবে পূরণ করতে পারে না। সমাজের কল্যাণ সাধন করতে হলে তার করণীয় কি কি, সামাজের কি কি দোষত্রুটি ও অনাচার প্রথম সংশোধন করা দরকার, কোন কোন শিক্ষা বিস্তারকে এবং কোন কোন বিধির প্রচারকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন এবং ইপ্সিত ফায়দা হাসিল করার জন্য এ কাজ কিভাবে সমাধা করা আবশ্যক, তা তার পক্ষে উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমাদের জুমুয়ার ইমামগণ যেহেতু আদৌ কোন দায়িত্বশীল পদমর্যদা ভোগই করেন না, তাই তারা খতিবের এ সব দায়িত্ব পালনের অযোগ্য। তারা আলেম হলেও তাদের মর্যদা নিছক ওয়াজ-নসিহতকারী ও প্রচারকের চেয়ে বেশী কিছু হয় না। তারা কেবল নিজস্ব ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা অনুসারেই তাবলীগ ও তালীমের কাজ করবেন এবং তা দ্বারা উল্লেখযোগ্য কোন সামাজিক উপকার সাধিত হবে না, বরঞ্চ তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন ওয়াজ-নসিহত দ্বারা বর্তমানে যেটুকু সামাজিক সংহতি বহাল রয়েছে তাও নস্যাত হয়ে যাবে।

শরীয়তী বিধিব্যবস্থা বহাল করা যদি বর্তমানে সম্ভব না হয়, বস্তুত পরিস্থিতি দেখে মনে হয় যে তা আসলেই সম্ভব নয়-তা হলে আমি যেটা বলেছি সেটাই সর্বশেষ উপায়। আলেমদের একটি পরিষদ-যার ঘাড়ে কিছু না কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবেই, জুমার খুৎবা তৈরী করার কাজে নিয়োজিত হোক। এই পরিষদ যে খুৎবা

তৈরী করবে, তাতে ইসলামের মূলনীতিসমূহ বিতর্কমুক্ত ভাষায় বর্ণনা করা হবে, মুসলমানদের মধ্যে আদর্শভিত্তিক জাতীয় ঐক্যের চেতনা জাগিয়ে তোলা হবে, তাদেরকে সাধারণ নৈতিক অনাচারসমূহ ও সর্ব সম্মত শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক করা হবে এবং এমন বিধিমালা বর্ণণা করা হবে যার সম্পর্কে কোন ফের্কাই দ্বিমত পোষণ করে না। এটাই জুময়ার সমাবেশের উদ্দেশ্য সার্থক ও সফল করার ন্যূনতম উপায়। আমাদেরকে বিভিন্ন ফের্কার আলাদা জুমায়ার জামায়াত প্রতিষ্ঠার প্রবণতা রোধ করার চেষ্টা চালাতে হবে এবং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে না হোক, অন্তত জুময়া সকল ফেরকা অথবা অধিকাংশ ফেরকার লোকেরা একত্রিত হতে পারে। আলাদা আলাদা জুময়া হওয়া মারাত্মক ক্ষতিকর জিনিস। এর অবসান ঘটাতে হবে। এমন কিছু করা যাবে না যাতে এই ব্যাধির আরো বিস্তৃতি ঘটে। ওয়ায়েজদের যদি নিজ নিজ পৃথক মতামত অনুসারে ওয়াজ করার বাসনা থেকে থাকে এবং তারা নিজেদের স্বতন্ত্র মতামত প্রচার করতে চান, তা হলে তারা মসজিদের বাইরে যেখানে ইচ্ছা নিজের বাগ্মীতা জাহির করতে পারেন। মসজিদ একত্রিত হওয়ার জায়গা বিচ্ছিন্ন হওয়ার জায়গা নয়। একে 'মসজিদে যেরার' তথা ঐক্য বিধ্বংসী মসজিদে পরিণত করা জঘন্যতম কাজ–যাকে কোন অবস্থাতেই বরদাশত করা চলে না।

(তরজমানুল কুরআন) আগষ্ট–সেপ্টেম্বর ১৯৩৭)

পাঞ্জাবের জনৈক শিক্ষিত যুবক জিজ্ঞাসা করেছেন যে, নামাযে মাইক ব্যবহার সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি? তিনি লিখেছেনঃ

''আমাদের এখানে ঈদুল ফিতরের সময় ব্যবস্থাপকগণ লাউড স্পীকার লাগিয়েছিলেন। নামাযের পর স্থানীয় আলেমগণ তার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেন এবং বাইরে থেকে ফতওয়া আনিয়ে জনগণকে বলেন যে, তোমাদের নামায হয়নি। এখন জনসাধারণ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ঈদগাহের ব্যবস্থাপকগণ তো ভয় পেয়ে গেছেন যে, পরবর্তী ঈদে আবার মাইক ব্যবহার করলে জনসাধারণ আমাদের ওপর ক্ষেপে যাবে এবং আলেমরা আমাদের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহীতার ফতওয়া জারি করে দেবেন।

আগের বার মাইক ব্যবহারে এই সুবিধা হয়েছিল যে, ইমামের আওয়াজ মুক্তাদীদের কানে সুস্পষ্টভাবে পৌঁছাচ্ছিল এবং নামাযে শৃংখলা বজায় ছিল। অথচ তার আগে নামাযে এমন বিশৃংখলার সৃষ্টি হতো যে, কাতারগুলোতে চরম অব্যবস্থা বিরাজ করতো। মুক্তাদীদের কেউ রুকূতে থাকতো, কেউ সিজদায় থাকতো।

স্থানীয় আলেমদের কাছে এটা নাজায়েয হওয়ার কারণ জানতে চাইলে তারা দুটো যুক্তি দেখানঃ

১। লাউড স্পীকার ব্যবহার খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের পর্যায়ভুক্ত।

২। হানাফী মযহাব মতে মুক্তাদী ইমামের আওয়াজ ছাড়া অন্য কোন আওয়াজে নড়াচড়া করলে নামায বাতিল হয়ে যায়।

কিন্তু এ যুক্তিতে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারছিনে। প্রথম কথাটা তো কোন যুক্তিই নয়। ওটা বরঞ্চ নিজেই একটা প্রমাণ সাপেক্ষ বক্তব্য। দ্বিতীয় যুক্তি থেকে মনে হয়, এই সব আলেম লাউড স্পীকারের গঠন প্রণালী সম্পর্কেই ওয়াকিফহাল নন। এ যন্ত্র দ্বারা যে আওয়াজ সম্প্রচারিত হয় তাকে কোন ক্রমেই ইমামের আওয়াজ ছাড়া অন্য আওয়াজ বলা যায় না। আলেমদের এ রকম মূর্খসুলভ ও অযৌক্তিক কথাবার্তা শুনে শিক্ষিত লোকেরা খুবই বিরূপ মনোভাব পোষণ করছে। এর ফলে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে যে, আমাদের ধর্মীয় নেতারা তুরস্কের কামাল পাশা ও ইরানের রেজা শাহ্‌র মত ভারতের মুসলিম যুব সমাজকেও ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করতে চান। কিন্তু ঐ দু'জন মুসলিম শাসক ইসলামের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গোমরাহীর যে নজির স্থাপন করেছেন, অনুরূপ বিদ্রোহ সংঘটিত হলে আমাদের পরিণতিও তা থেকে ভিন্নতর হবে কি?

এ বিষয়ে আমরা আপনার পথনির্দেশ চাই। কেননা আপনার বিচক্ষনতা ও চিন্তা-গবেষণার ওপর আমাদের আস্থা রয়েছে। এ ধরনের বড় বড় সমাবেশে মাইক ব্যবহারকে আপনি যদি জায়েয মনে করেন, তা হলে তার যুক্তি-প্রমাণ বিশদভাবে জানাবেন, যাতে আমরা ঐ সব আলেমকে সন্তোষজনক জবাব দিতে পারি।। আর যদি আপনার দৃষ্টিতে এমন কিছু ব্যাপার থেকে থাকে, যার কারণে এ যন্ত্রটা ব্যবহার করায় ইসলামী স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে এবং সেই দিক থেকে এটা ক্ষতির আশংকাপূর্ণ মনে করেন, তা হলেও আমাদেরকে সেটা স্পষ্টভাবে জানাবেন, যাতে যুব সমাজকে বুঝানো সম্ভব হয়।"

প্রশ্নকর্তার চিঠিটা পুরোপুরি উদ্ধৃত করা হলো, যাতে মুসলিম ধর্মনেতাগণ চলমান সময়ের ভাবধারা বুঝতে পারেন এবং আমরা যে যুগে বাস করছি , তা কি ধরনের ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রত্যাশা করে, আর এ যুগে কয়েকশ' বছর আগের নেতৃত্ব প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে তার পরিণতি কি হতে পারে, তা ভেবে দেখুন। আজ থেকে দু'তিন বছর আগে হায়দারাবাদেও একই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

ঈদগাহে মাইক ব্যবহার করা হয়েছিল। ফলে মানুষ সুষ্টভাবে নামায পড়তে পেরেছিল এবং সবাই খুব খুশী হয়েছিল। কিন্তু পরে আলেমগণ বিরোধিতা করলেন, কমিটি হলো, অবশেষে রায় দেয়া হলো যে, নামাযে এ যন্ত্র ব্যবহার করা অবৈধ। আমি তখন হায়দারাবাদেই ছিলাম। আমার বেশ মনে আছে যে, আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর ওপর এ ঘটনার কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এবং আলেমদের সম্পর্কে কি কি ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছিল। আমি অবশ্য "শিক্ষিত শ্রেণীর'' খেয়াল-খুশী মোতাবেক ইসলামী বিধি প্রনয়ণ এবং তাকেই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী মনে করার পক্ষপাতী নই। বরঞ্চ আমি এ কথাও জোর গলায় বলতে পারি যে, এই শ্রেণীর লোকদের অনৈসলামিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে কোন কট্টরপন্থী আলেমের চেয়েও আমি পিছপা নই। তবে সেই সাথে আমি এরও ঘোর বিরোধী যে, আলেম সমাজ চলমান যুগের চিন্তাধারার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবেন। তারা যে "হিদায়া'' ও 'বাদায়ে' ধরনের প্রাচীণ গ্রন্থাবলীর রচনাকালে অবস্থান করছেন না, বরং নিত্য নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবন এবং দ্রুত গতিশীল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যুগে বাস করছেন, সেটা তাদের ভুলে যাওয়া চাই না। এ যুগে নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হওয়া অবধারিত। সে সব সমস্যার সমাধান কেবল হিদায়া ও বাদায়ে গ্রন্থের আলোকে করতে চাইলে তরুণ প্রশ্ন কর্তা তার চিঠিতে যে বিপদের আশংকা ব্যক্ত করেছেন, সেটাই হবে তার অনিবার্য পরিণতি। আমাদের নতুন প্রজন্ম সমকালীন পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কোটি কোটি লোকসংখ্যার অধিকারী একটি জাতি যুগের স্বাভাবিক আবর্তন থেকে সৃষ্ট পরিস্থিতি ও সমস্যাবলী থেকে একেবারেই সংশ্রবহীন থাকতে পারেনা। এই নব্য বংশধরদের মধ্যে যদি কোন অনৈসলামিক ভাবধারার সৃষ্টি হয়, তবে তা রোধ করার জন্য মুসলিম আলেম সমাজের কাছে এমন শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ থাকা প্রয়োজন, যা সমকালীন জ্ঞানী জনের মনমগজ দখল করতে সক্ষম। হিজরী ৬ষ্ট শতকে রচিত তর্কশাস্ত্র এখন কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজ যদি এ যুগের

তামাদ্দুনিক জীবনে ইসলামের রাজপথ ধরে অগ্রসর হতে চায়, তা হলে তাদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য আলেম সমাজকে প্রশস্ত দৃষ্টি ও মুজতাহিদ সুলভ উদ্ভাবনী প্রেরণা ও ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। তারা যদি কথায় কথায় ফতওয়ায়ে আলমগিরী ও তাতারখানীর উদ্ধৃতি কপচিয়ে পথ আগলাতে সচেষ্ট হন, তবে তার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হবে যে, নয়া যামানার মুসলমানরা কুরআন হাদীসকেও পেছনে ফেলে যে দিকে চোখ যাবে সে দিকে চলে যাবে, যেমন তুর্কী ও ইরানীরা চলে গেছে।

আলোচ্য প্রশ্নের জবাব অল্প কথায়ও দেওয়া যায়। তবে তার আগে আমি কয়েকটা মূলনীতি বর্ণনা করা জরুরী মনে করি, যাতে করে একই ধরনের অন্যান্য সমস্যার ক্ষেত্রেও শরীয়তের বিধান সহজেই জ্ঞাত হওয়া যায়।

১. সর্বপ্রথম এ কথা অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, খুঁটিনাটি ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট ও অকাট্য বিধি কেবল সেই সব ঘটনায় ও সমস্যায়েই পাওয়া যেতে পারে, যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সংঘটিত হয়েছিল। যে সব ঘটনা ও সমস্যা রসূল (সাঃ)–এর পরে সংঘটিত হয়েছে, তার সম্পর্কে শরীয়তের কোন অকাট্য ও চূড়ান্ত বিধি পাওয়া সম্ভব নয়। বরঞ্চ সে সব ব্যাপারে শরীয়তের মূলনীতি ও সামগ্রিক বিধি থেকেই প্রয়োজনীয় বিধি রচনা করা যেতে পারে। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও মুজতাহিদ ইমামগণ পরবর্তী সমস্যাবলীর ব্যাপারে যত শরীয়তসম্মত বিধিই জারি করে থাকুন না কেন, তার সবই এভাবে মূলনীতি ও সামগ্রিক বিধি থেকেই রচিত। তার কোনটাই কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নির্দেশ নয়। আজ যদি এমন কোন ঘটনা বা সমস্যার উদ্ভব হয়, সাহাবা বা ইমামগণের আমলে যার উদ্ভব হয়নি, অথবা এমন কোন জিনিস আবিষ্কৃত হয় যার অস্তিত্বই তৎকালে ছিল না, তা হলে তার সম্পর্কে প্রাচীন মনীষীদের ইজতিহাদ প্রসূত বিধিমালার মধ্যে কোন বিধি অনুসন্ধান করা স্বতঃসিদ্ধভাবেই ভ্রান্ত। এ ধরনের প্রত্যেক ঘটনা ও সমস্যার জন্য সাহাবায়ে কিরাম ও ইমামগণ যেভাবে নিজ নিজ যুগের

সমস্যাবলী সম্পর্কে মূলনীতি ও সামগ্রিক বিধির মধ্যেই সমাধান খুঁজেছেন, আমারেদকেও তেমনি খুঁজতে হবে।

২. নব্য আবিস্কৃত কোন জিনিসকে শুধু এই যুক্তির ভিত্তিতে মাকরূহ বা নাজায়েয সাব্যস্ত করা চলেনা যে, রসূলের (সাঃ) আমলে, সাহাবাদের আমলে বা ইমামদের আমলে তার প্রচলন ছিল না। শরীয়ত নাজেল করার পেছনে আল্লাহর এ উদ্দেশ্য কখনো ছিল না যে, মানুষের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ক্ষমতা একটা বিশেষ যুগের পর নিঃশেষিত হয়ে যাবে এবং বিভিন্ন উপায়-উপকরণের অনুসন্ধান এবং তার প্রয়োগ ও ব্যবহারের নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া একটা বিশেষ যুগ পর্যন্ত জায়েজ থাকবে, তার পরই তা নাজায়েজ ঘোষিত হবে। যারা এই ফর্মুলার ভিত্তিতে সুন্নত ও বিদয়াতের সংজ্ঞা দেন, তারা ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর সবচেয়ে বড় জুলুম করে থাকেন। কেননা এতে করে ইসলামের শত্রুদের এই অপবাদটাকেই সত্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় যে, ইসলাম কোন শাশ্বত ধর্ম নয় বরং তা এসেছিল একটা নির্দিষ্ট যুগের জন্য এবং বর্তমানে তার অনুসরণ করলে মানব সভ্যতার লালন , বিকাশ ও প্রগতি স্তব্ধ হয়ে যাবে।

৩. শরীয়ত নাজেল করার পেছনে আল্লাহর আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল এমন কতকগুলো মূলনীতি মানুষকে শিক্ষা দেয়া, যার অধীন সে বিশ্বজগতে বিদ্যমান উপকরণাদিকে ভুল কাজে না লাগিয়ে সঠিক কাজে লাগাতে পারে এবং সেগুলোকে অনিষ্টের বদলে যথার্থ উপকার ও কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে পারে। কুরআন ও হাদীসে আমাদেরকে এই মূলনীতিগুলো শুধু শাব্দিকভাবেই শেখানো হয়নি বরং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে যে সকল জাগতিক উপকরণ মানুষের করায়ত্ত ছিল, সেগুলো ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যবহার করে আমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যে সকল উপায় উপকরণ মানুষের করায়ত্ত হবে সেগুলোকে ঐভাবে এবং ঐ সব উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম এবং প্রাচীন ইমামগণ শরীয়তের মূলনীতিগুলোকে এভাবেই বুঝেছেন এবং সভ্যতার

অগ্রগতির সাথে সাথে নতুন ঘটনাবলী এবং নতুন জিনিস গুলোর ওপর ইসলামী মূলনীতিগুলোকে কার্যকর করে তারা শরীয়তের নির্দেশকে আমাদের জন্য আরো বেশী উজ্জ্বল করে দিয়েছেন। এখন আমরা যদি এই মূলনীতিগুলোকে উপলব্ধি করি, তাহলে প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের মধ্যে যে শক্তিই আমরা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবো এবং জাগতিক উপকরনসমূহের মধ্যে যে উপকরণই আমাদের হস্তগত হবে, তা নিয়ে আমাদের কখনো বিব্রত হতে হবে না। সেই অজানা জিনিস নিয়ে আমরা বিব্রতও হবো না, আবার তার সামনে হতবুদ্ধি হয়েও দাড়িয়ে থাকবো না। বরঞ্চ শরীয়তের মূলনীতিসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে আনায়াসে জেনে নোবো যে, ওটা ব্যবহারে আনা যাবে কি যাবে না, আর যদি ব্যবহার করা যায় তবে আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় ব্যবহার প্রণালী কি এবং অপছন্দনীয় ব্যবহার প্রণালীইবা কি প্রত্যেক অভিনব জিনিস নিয়ে বিব্রত বোধ করা এবং সভ্যতার অগ্রগতির পথে পদে পদে থমকে দাঁড়ানোর যে অবস্থা আজকাল সৃষ্টি হচ্ছে, তার একমাত্র কারণ এই যে, আমাদের আলেমগণ শরীয়তের মূলনীতি ও সামগ্রিক বিধিমালাকে বুঝবার চেষ্টা না করে ফেকাহ শাস্ত্রীয় খুঁটিনাটি জানার চেষ্টাই বেশী করে থাকেন।

৪. কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা এই মূলনীতিটা জানতে পারি যে, যাবতীয় জিনিসই মূলত বৈধ যতক্ষণ তার অবৈধ হওয়ার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া না যায়। অর্থাৎ যতক্ষণ কোন জিনিসের পাক বা বা হারাম হওয়ার প্রমাণ হাজির না করা হবে, ততক্ষণ প্রত্যেক জিনিসই হালাল, পবিত্র ও বৈধ মনে করতে হবে। পবিত্র কুরআনে এরশাদ করা হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا - (بقره ۲۹)

"তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সৃষ্টি করেছেন"(বাকারা-২৯)।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ - (الجاثيه ۱۳)

"তিনি তোমাদের জন্য আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই করায়ত্ত করেছেন"(জাসিয়া-১৩)।

এ দুটো আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস মানুষেরই জন্য। সুতবাং মানুষ তাকে কাজে লাগানো ও তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকারী। প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য আলাদা আলাদা অনুমতির প্রয়োজন নেই। বরং যতক্ষণ কোন নির্দিষ্ট জিনিসের ব্যবহার বা প্রচলিত ব্যবহার প্রণালী নিষিদ্ধ হওয়ার কথা বলা হবে না, ততক্ষণ সকল জিনিসকে বৈধ এবং পবিত্রই মনে করা হবে। আবূদাউদ হযরত সালমান ফারসী থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, তাতে এ বিষয়ের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

اَلْحَلَالُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهٖ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهٖ
وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ-

"আল্লাহ স্বীয় কিতাবে যে জিনিস হালাল করেছেন তা হালাল, যা হারাম করেছেন তা হারাম, আর যে জিনিস সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেননি,তা অনুমোদিত।"

৫. কোন জিনিস কোন মৌল বিধি অনুসারে হারাম বা হালাল সাব্যস্ত হবে, সেটাও কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উক্ত হয়েছে। তা হচ্ছেঃ

يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ -(اعراف:١٥٧)

"আমার রসূল তাদের জন্য উপকারী জিনিসকে হালাল করেন এবং ক্ষতিকর জিনিস হারাম করেন"(আরাফ-১৫৭)।

আর এর তাফসীর প্রসঙ্গেই হাদীসে বলা হয়েছেঃ

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْاِسْلَامِ

ইসলামে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত করা-এ দুটোর কোনটারই অবকাশ নেই।" সুতরাং যেসব জিনিসের হারাম হওয়ার সুস্পষ্ট বিধান বর্ণিত হয়নি ,তার ব্যাপারে এই মূলনীতি অনুসারেই বিচার করতে হবে যে, তা মানুষের জন্য ক্ষতিকর না উপকারী। যদি তা ক্ষতিকর প্রমাণিত হয় তবে তা হারাম আর যদি উপকারী সাব্যস্ত হয় তবে তা হালাল। অনুরূপভাবে তার ব্যবহার প্রণালীকেও এই একই মূলনীতি অনুসারে বিচার করতে হবে। যে ব্যবহার

প্রণালী বিকৃতি ও বিপর্যয়ের কারণ হয় তা নিষিদ্ধ, আর যে ব্যবহার প্রণালী কল্যাণকর হয় তা বৈধ।

৬. উপকারিতা ও ক্ষতি এবং কল্যাণকারিতা ও বিকৃতির ব্যাপারেও শরীয়ত আমাদেরকে একটা মাপকাঠি দিয়েছে। আমাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দেয়া হয়নি যে, যেটাকে ইচ্ছা উপকারী এবং যেটাকে ইচ্ছা ক্ষতিকর ঠাওরাবো। আমাদেরকে কয়েকটা নীতি জানিয়ে দেয়া হয়েছে যার আলোকে উপকারিতা ও অনিষ্টকারিতার ফায়সালা করা হবে। এই নীতিমালার একটা নীতি এই যে, যে জিনিস ইসলামের অর্পিত কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অন্তরায় সেটা ক্ষতিকর। তাই সেটা পরিহার করতে হবে। আর যে জিনিস ইসলামী কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সহায়ক তা উপকারী। তাই তা ব্যবহার করা শুধু জায়েজই নয় বরং বাঞ্ছনীয় ও পছন্দনীয়। যেমন চাঁদ দেখার কাজে যদি খালি চোখের তুলনায় দূরবিক্ষণ যন্ত্র ব্যবহারে কাজটা সহজ হয় তা হলে তা ব্যবহার করাকে বাঞ্ছনীয় মনে করতে হবে। রমযানে সেহরির শেষ সময় নির্ধারণ এবং দৈনন্দিন নামাযের সময় নির্ধারণের জন্য ঘড়ি অধিকতর সহায়ক হলে তা ব্যবহার করাও বাঞ্ছনীয় মনে করতে হবে। হজ্জের সফর যদি উটের চেয়ে মোটর গাড়ী অথবা বিমান ব্যবহারে বেশী সহজসাধ্য হয় তবে সেটাও যে বাঞ্ছনীয় হবে, তা অনস্বীকার্য। জেহাদের ফরয আদায় করতে তরবারী, বর্শা, ঘোড়া ও হাতী ব্যবহারের তুলনায় যদি বন্দুক , কামান, যুদ্ধ জাহাজ এবং বিমান ব্যবহার বেশী ফলদায়ক হয়, তা হলে সেটাও যে পছন্দনীয় হবে, সে ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ নেই। এগুলো প্রাচীন মনীষীদের আমলে ব্যবহৃত হয়নি এই অজুহাতে কেউ যদি এগুলোকে হারাম বা মাকরূহ বলে অথবা এ সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বনের নীতি গ্রহণ করে, তা হলে সে নিঃসন্দেহে শরীয়ত সম্পর্কে নিরেট মূর্খ।

৭. যে জিনিস এমন কোন উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছে, যা শরীয়তে হারাম ঘোষিত হয়েছে এবং এই নিষিদ্ধ কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে তা ব্যবহারও করা হয় না, সে জিনিস নিঃসন্দেহে

সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু যে জিনিস ভালো ও মন্দ, উপকার ও ক্ষতি উভয় ধরনের উদ্দেশ্যে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে কেবল এই যুক্তিতে হারাম সাব্যস্ত করা যায় না যে, পাপাচারী লোকদের হাতে তা প্রধানত নিষিদ্ধ কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন গ্রামোফোন নিছকএকটা হাতিয়ার এবং তাকে ভালো ও মন্দ উভয় কাজে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং আমরা গ্রামোফোন নামক যন্ত্রটিকে হারাম বলতে পারি না। বরং তার সেই ব্যবহার প্রাণালীকে হারাম বলা যাবে, যা কাম প্রবৃত্তিকে উস্কে দেয় এবং অশ্লীলতার প্রসার ঘটায়।

উপরোক্ত মূলনীতিসমূহের আলোকে মাইক সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি এ প্রশ্ন নিয়ে যখন আমরা চিন্তা-ভাবনা করি, তখন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো অন্তরায় দেখতে পাই না যে, এ যন্ত্রটার ব্যবহার সম্পূর্ণ বৈধ এবং নামাযে তা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় ও উত্তম। আল্লাহ আমাদের ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত প্রাকৃতিক উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, এটা তারই একটা উপকরণ। স্বাভাবিকভাবে নির্গত শব্দকে আরো বাড়িয়ে দেওয়াই এ যন্ত্রের একমাত্র কাজ। যেহেতু সাম্প্রতিক কালেই আমরা এটা করায়ত্ত করতে পেরেছি, তাই এর সম্পর্কে কোনো বিধান হাদীসে বা পূর্বতন ইমামদের ইজতিহাদে খুঁজতে যাওয়া নীতিগতভাবেই ভুল। অবশ্য শরীয়ত কোনো জিনিস হারাম না হালাল তা নির্ণয়ের জন্য যে মূলনীতি আমাদেরকে দিয়েছে, তার আলোকে এ যন্ত্রটির শর্তহীনভাবে বিধি সম্মত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ব্যবহারের ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। বাতিলের আওয়াজ বুলন্দ করা এবং অশ্লীলতা ছড়ানো কাজে এর ব্যবহার হারাম। ন্যায়ের শব্দকে বুলন্দ করার কাজে এর ব্যবহার বৈধ। আল্লাহর নামকে উর্ধে তুলে ধরার কাজে আল্লাহরই সৃষ্টি করা এই শক্তিকে ব্যবহার করা নিশ্চিতভাবে বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ স্বয়ং যে জিনিসকে মানুষের অনুগত খাদেম বানিয়ে দিয়েছেন, তাকে কাজে লাগিয়ে কাফেররা বাতিলের প্রচার চালাবে, আর আমরা সত্যের প্রচারে তাকে কাজে লাগাতে ইতস্তত করবো এটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার হবে।

এরপর মাত্র একটা ধারণার মীমাংসা বাকী থাকে। সেটি এই যে, নামাযে ইমাম ছাড়া অন্য কারো শব্দ অনুসরণ করে কিছু করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই মাইকের আওয়াজ শুনে মুক্তাদী রুকূ সিজদা করলে তার নামায হবে না। কিন্তু এ ধারণা একাধিক কারণে ভুল।

প্রথম কারণ এই যে, লাউড স্পীকার থেকে যে আওয়াজ নির্গত হয়, তা অন্য কারোর আওয়াজ নয়, বরং হুবুহু ইমামের মুখ থেকে নির্গত আওয়াজ। পার্থক্য শুধু এই যে, বিদ্যুতের শক্তি বলে সেই আওয়াজ আরো বড় হয়ে যায়। এদিক থেকে এটা অনেকটা মসজিদের মেহরাব থেকে ইমামের আওয়াজের যে প্রতিধ্বনি বের হয় তার সাথে তুলনীয়।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, ফেকাহ শাস্ত্রের মৌল বিধি (উসূলে ফেকাহ) সমূহের অন্যতম বিধি এই যে, অনুগত প্রতিনিধি মূল লোকেরই সমপর্যায়ের। এই বিধি অনুসারে বড় বড় জামায়াতে যে সব মুকাব্বির নিয়োগ করা হয়, তাদের আওয়াজে রুকূ-সিজদা করা মুক্তাদীদের জন্য বৈধ। কেননা তারা ইমাম না হলেও ইমামের অনুসারী এবং তারই প্রতিনিধি। তাই তাদের আওয়াজ ইমামের আওয়াজের মতই অনুসরণযোগ্য। কাজেই যদি ধরেও নেয়া হয় যে, মাইকের আওয়াজ ইমামের আওয়াজ নয়। তথাপি সে ইমামের অনুগামী প্রতিনিধি হওয়ার দিক দিয়ে মুকাব্বিরের সমতুল্য। বরং আর একটু ভেবে দেখলে বুঝা যায় যে, এই যন্ত্র মুকাব্বিরের চেয়েও বেশী অনুগত। মুকাব্বির তো নিজেই যে কোন ধরনের আওয়াজ তুলতে পারে। এমনকি জামায়াতে যদি কোনো মুনাফেক থেকে থাকে, তবে সে ইমামের উল্টো তকবীর দিয়ে হাজার হাজার মানুষের নামায পণ্ড করতে পারে। কিন্তু মাইক ইমামের এমন পরিপূর্ণভাবে অনুগত যে, ইমাম কথা না বলা পর্যন্ত সে কথাই বলে না। যে শব্দ ইমামের মুখ থেকে নির্গত হয়, বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন ছাড়া অবিকল সেই শব্দ তার মুখ থেকেও নির্গত হয়। এমনকি ইমামের কণ্ঠস্বর এবং উচ্চারণ পর্যন্ত হুবহু তা থেকে সম্প্রচারিত হয়। যে ব্যক্তি ইমামের কণ্ঠস্বর চেনে, সে মাইকের আওয়াজ শুনেই

চিনতে পারে যে, এটা ইমামের কণ্ঠস্বর। যে যন্ত্র এমন নিখুঁত ও নিপুণভাবে ইমামের অনুসরণ করে, তাকে কিভাবে ইমাম থেকে পৃথক মনে করা চলে এবং তার ব্যাপারে ও ইমামের ব্যাপারে শরীয়তের বিধি কিভাবে দু'রকমের হতে পারে? কেউ যদি বলে যে, মুকাব্বির তো নামাযে শামিল হয়, কিন্তু মাইক নামাযে অংশ গ্রহণ করে না, তা হলে আমি তাকে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাইঃ

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (بنی اسرائیل: ٤٤)

"এমন কোনো জিনিস নেই, যা আল্লাহর প্রশংসা সহকারে গুণকীর্তন করে না, তবে তোমরা তার গুণকীর্তন বুঝতে পার না" (বনী ইসরাইল, ৪৪)।

বস্তুত কুরআনের বক্তব্য অনুসারে কোনো মুসলমান যখন নামায পড়ে তখন সে একাকী পড়ে না, বরং সমগ্র বিশ্বজগত তার সাথে নামাযে অংশ গ্রহণ করে, যদিও অদৃশ্য বিষয়ে অজ্ঞ লোকেরা এ সব বাকশক্তিহীন বস্তুর নামায বুঝতে পারে না।

তৃতীয়ত, যদি কেউ এখানে উল্লিখিত আয়াতের বক্তব্যকে এভাবে ব্যাখ্যা করে যে, নামায এখানে বর্ণিত হাম্দ (প্রশংসা) এবং তাসবীহ (গুণকীর্তন)-এর আওতায় পড়ে না, অতপর এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে মাইককে নামায বহির্ভূত গণ্য করে এবং তাকে ইমামের অনুগামী বলে স্বীকার না করে, তাহলে আমি বলবো যে, নামাযে অ-ইমামের আওয়াজ শুনে কাজ করলেই নামায নষ্ট হবে এ কথা সর্বক্ষেত্রে ঠিক নয়। উদাহরণ স্বরূপঃ

১. নামাযরত অবস্থায় কাউকে সালাম করলে ইশারায় জবাব দেওয়াতে নামায নষ্ট হয় না। তিরমিযিতে হযরত বিলাল থেকে এবং নাসায়ীতে হযরত সোহায়িব থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায পড়ার সময় কেউ সালাম করলে তিনি হাতের ইশারায় জবাব দিতেন।

২. নামায পড়াকালে কাউকে কোনো জরুরী কথা জিজ্ঞাসা করা হলেও ইশারায় জবাব দেয়া যায়। এতে নামায নষ্ট হয় না।

'খুলাসা' গ্রন্থে আছে যে, মুসল্লীকে যদি সালাম করা হয় এবং সে হাত নেড়ে জবাব দেয় অথবা তাকে যদি কোনো খবর দেয়া হয় এবং সে মাথা নেড়ে হাঁ বা না সূচক ইংগিত করে অথবা তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কয় রাকায়াত নামায পড়া হয়েছে এবং সে আংগুল দেখিয়ে জানিয়ে দেয়, তাহলে নামায নষ্ট হয় না (ফাতহুল কাদীর, –প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২১২)।

৩. কেউ যদি নামায পড়তে থাকে এবং সেই অবস্থায় কেউ তাকে ডাকে, আর সে নামাযে আছে বুঝানোর জন্য জোরে 'সুবহানাল্লাহ' বলে তবে তাতে নামাযের কোনো ক্ষতি হয় না (হেদায়া, নামায বিনষ্টকারী ও ক্ষতিকর জিনিসের বিবরণ)।

৪. রসূল (সাঃ) যখন নামাযরত অবস্থায় কোনো শিশুর কান্নার শব্দ শুনতেন, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করে দিতেন, যাতে শিশুর মা জামায়াতে থেকে থাকলে বিচলিত না হয় (বুখারী ও মুসলিমে এই মর্মে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে)।

৫. হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, যখন রসূল (সাঃ)–এর রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করে, তখন তার নির্দেশে হযরত আবু বকর (রাঃ) নামায পড়াতে থাকেন। একদিন তিনি রোগের কিছু উপশম বোধ করলে নামাযে যোগ দিতে মসজিদে যান। হযরত আবু বকর (রাঃ) রসূল (সাঃ)–এর আগমনের শব্দ টের পেয়ে পিছে সরে আসতে লাগলেন। কিন্তু তিনি ইংগিতে তাকে সরতে নিষেধ করলেন। ফলে আবু বকর যথাস্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং রসূল (সাঃ) তার বাম দিকে গিয়ে বসে পড়লেন (বুখারী ও মুসলিম)।

৬. কুবার মসজিদে মুসলমানরা নামাযরত অবস্থায় কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা শুনতে পায় এবং তারা তৎক্ষণাত কাবার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাড়ায়। রসূল (সাঃ) তাদের এ কাজকে শুধু অনুমোদনই করেননি বরং পছন্দ করেছেন। এই ঘটনার আলোকেই ফেকাহবিদগণ এই বিধি রচনা করেছেন যে, কিবলা কোন্ দিকে তা না জেনে কেউ যদি অনুমানের ভিত্তিতে কোনো দিকে মুখ করে নামায পড়তে শুরু করে এবং কিছুক্ষণ পরে কেউ তাকে প্রকৃত

কিবলার দিক জানিয়ে দেয়, তা হলে তার তৎক্ষণাত সঠিক কিবলার দিকে ঘুরে দাড়ানো উচিত (হিদায়া, নামাযের পূর্বশর্তাবলী)।

এ ধরণের আরো বহু সংখ্যক দৃষ্টান্ত হাদীসে ও সাহাবায়ে কেরামের কার্য বিবরণীতে বর্ণিত রয়েছে। সে সব দৃষ্টান্ত থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, নামাযরত নয় এমন কোনো মাধ্যমেও যদি মুক্তাদীরা ইমামের রুকূ সিজদা ও ওঠা বসার তথ্য জানতে পারে এবং সেই মাধ্যমটা যদি নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে তদনুসারে কাজ করলে নামাযের কোনো ক্ষতি হয় না। নামায নষ্ট হয় কেবল এমন ধরনের কাজ দ্বারা, যে কাজেরত থাকাকালে একজন অজানা দর্শক আপনাকে নামাযরত নন বলে মনে করে অথবা সেটা নামাযী ও অনামাযীর মধ্যে কথোপকথন বা শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়ার পর্যায়ে পড়ে। 'মাবসূত' গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

كُلُّ عَمَلٍ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ النَّاظِرُ مِنْ بَعِيْدٍ لَا يَشُكُّ أَنَّهُ فِي
غَيْرِ الصَّلٰوةِ فَهُوَ مُفْسِدٌ لِصَلٰوتِهِ وَكُلُّ عَمَلٍ لَوْ نَظَرَ إِلَيْهِ النَّاظِرُ
فَرُبَّمَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي الصَّلٰوةِ فَذَالِكَ غَيْرُ مُفْسِدٍ -
(جلد اول- ص ١٩٠)

"যে কাজ দূর থেকে দেখলে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে ঐ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি নামায পড়ছে না, তাতে নামায নষ্ট হয়ে যায়। আর যে কাজ দেখেও দর্শক তাকে নামাযরত বলে ধারণা করতে পারে, সে কাজে নামায নষ্ট হয় না"

'মাবসূত' গ্রন্থেই অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

فَأَمَّا فَتْحُ الْمُقْتَدِيْ إِذَا فَتَحَ عَلَى الْمُصَلِّيْ تَفْسُدُ بِهِ صَلٰوةُ
الْمُصَلِّيْ وَكَذَالِكَ الْمُصَلِّيْ إِذَا فَتَحَ غَيْرَ الْمُصَلِّيْ، لِأَنَّهُ تَعْلِيْمٌ
وَتَعَلُّمٌ وَالْقَارِئُ إِذَا اسْتَفْتَحَ غَيْرَهُ فَكَأَنَّهُ يَقُوْلُ بَعْدَ مَا
قَرَأْتُ مَاذَا تُذَكِّرُنِيْ وَالَّذِيْ يَفْتَحُ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ يَقُوْلُ بَعْدَ
مَا قَرَأْتَ كَذَا فَخُذْ مِنِّيْ (ص ١٩٣)

"একই জামায়াতভুক্ত হয়ে নামায পড়ছে না এমন ব্যক্তি (চাই সে আলাদা নামাযরত থাকুক, কিংবা নামাযরত না থাকুক) যদি নামাযীকে ভুল ধরিয়ে দেয় তবে নামাযীর নামায নষ্ট হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি নামাযী কোন অনামাযীকে ভুল ধরিয়ে দেয়, তা হলেও নামায নষ্ট হবে। কেননা এটা শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণের পর্যায়ভুক্ত। নামাযী যখন নামায পড়তে পড়তে অপরের কাছ থেকে ভুল শুধরে দেয়া কামনা করে তখন সে প্রকারান্তরে শ্রোতাকে এ কথাই বলে থাকে যে, "এর পরে কি আমাকে মনে করিয়ে দাও।" আর যে ব্যক্তি ভুল শুধরে দেয়, সে প্রকারান্তরে এ কথাই বলে থাকে যে, "এর পরে কি বলছি এই নাও।" (অর্থাৎ এভাবে ভুল শুধরানো ও তা গ্রহণ করা কথোপকথনের শামিল।)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রসূল (সাঃ) নামায পড়াচ্ছিলেন। হযরত ফারিয়া বিন রাফের হাঁচি এলো এবং তিনি জোরে জোরে এই দোয়া পড়লেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ

("আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা, প্রচুর প্রশংসা, উৎকৃষ্ট প্রশংসা, বরকতপূর্ণ প্রশংসা এমন বরকতপূর্ণ, যেমনটি আমাদের প্রতিপালক পছন্দ করেন এবং যাতে খুশী হন।") নামায শেষে রসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন ব্যক্তি এই দোয়া পড়েছিল? সেই মহান আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমার জীবন–ত্রিশজনেরও বেশী ফেরেশতা এ দোয়াটি নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল।" "(তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী) আর এক হাদীসে আছে যে, একবার রসূল (সাঃ) স্বীয় দৌহিত্রী, উমামা বিনতে আবিল আস (রসূল (সাঃ)–এর মেয়ে যয়নবের শিশুকন্যা) কে ঘাড়ে করে নামায পড়িয়েছিলেন। রুকূতে গিয়ে তাকে নামিয়ে দিচ্ছিলেন এবং দাঁড়িয়ে আবার তাকে ঘাড়ে তুলে নিচ্ছিলেন (বুখারী ও মুসলিম)। এ ঘটনা থেকেই ফিকাহবিদগণ এই বিধি উদ্ভাবন করেছেন যে, নামাযী যদি নামায পড়ার সময় শিশুকে বহন করে তবে তাতে নামায নষ্ট হবে না (ফতওয়ায়ে আলমগিরী) হাদীসে

আরো বর্ণিত হয়েছে যে, একবার নামায পড়ার সময় রসূল (সাঃ) কে এক বিচ্ছু দংশন করে। তিনি তৎক্ষণাত জুতো দিয়ে বিচ্ছুটাকে মেরে ফেলেন। অতপর তিনি বলেন, اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ তোমরা যদি নামাযেও থাক, তথাপি সাপ ও বিচ্ছুকে মেরে ফেলো (আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)।

অতএব, মাইকের আওয়াজে রুকূ সিজদা করা যখন অনামাযীসুলভ কাজ নয় এবং তা শিক্ষা দেয়া, নেয়া বা কথোপকথনেরও সংজ্ঞায় পড়ে না, তখন তার দ্বারা নামায নষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। তাছাড়া নামাযের সাথে আদৌ কোন সম্পর্ক নেই এমন বহু কাজকেও যখন অনুমোদন করা হয়েছে, তখন একটি যন্ত্রের সাহায্যে ইমামের শব্দ শুনতে পেয়ে রুকূ সিজদা করাতে কিভাবে নামায নষ্ট হতে পারে?

উপরোক্ত যুক্তি–প্রমাণের ভিত্তিতে আমি নামাযে মাইক ব্যবহারকে শুধু জায়েয নয় বরং ভালো মনে করি। আমার প্রজ্ঞা সাক্ষ্য দেয় যে, রসূল (সাঃ)–এর আমলে যদি এ যন্ত্রটি থাকতো, তবে নিশ্চয়ই তিনি নামায, আযান ও খুৎবায় তা ব্যবহার করতেন। যেমন তিনি খন্দক যুদ্ধে পরীখা খননের ইরানী কৌশল অবলম্বনে দ্বিধা করেননি। তথাপি যদি কোন আলিম আমার এই অভিমতকে শরীয়তসম্মত যুক্তি–প্রমাণ দ্বারা (প্রাচীন ইমামদের আনুগত্য না করার অপবাদ দ্বারা নয়) ভ্রান্ত প্রমাণ করে দেন, তবে আমি এ মত প্রত্যাহারেও কুণ্ঠিত হব না। এটা আমার ধারণা মাত্র কোন অকাট্য বিশ্বাস নয়।আমি একজন মানুষ ছাড়া কিছুই নই। আমার সিদ্ধান্ত ভুলও হতে পারে। নির্ভুলও হতে পারে। যে কেউ আমার সিদ্ধান্ত যাচাই করে দেখতে পারে। যদি তা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সঙ্গতিশীল হয় তবে গ্রহণ করা যেতে পারে। নচেত প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সকলেরই রয়েছে।

(তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল উখরা, ১৩৫৭ হিঃ আগস্ট ১৯৩৮)

আমার উপরোক্ত আলোচনা পড়ার পর এক ব্যক্তি আমার কাছে মওলানা আশরাফ আলী থানবী মরহুমের একটি ফতওয়া পাঠিয়ে দেন এবং আমাকে এ সম্পর্কে নিজ মতামত ব্যক্ত করার আহ্বান জানান। মওলানা সাহেব তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁর ফতওয়াটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ

"ইদানীং এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যা বক্তার শব্দকে নিকটে যেমন শোনা যায় ঠিক সেইভাবে দূরেও পৌঁছে দেয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে বক্তার আওয়াজকে সকল শ্রোতার কানে পৌঁছানো কি জায়েজ?"

জবাবঃ প্রথমে একটা মূলনীতি বুঝে নেয়া দরকার, যা একাধারে যুক্তিভিত্তিক ও আবার কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিকও। হানাফী ফিকাহবিদগণ এই মূলনীতি থেকে বহু সংখ্যক বিধি রচনা করেছেন। মূলনীতিটা এই যে, যখন কোন মুবাহ (বৈধ জিনিস) অথবা মানদুব (পছন্দনীয় জিনিস) শরীয়তের দৃষ্টিতে অত্যাবশ্যকীয় ও ইপ্সিত পর্যায়ের না হয় এবং তাতে কোন আপত্তিকর বা ক্ষতিকর পরিণতির আশু সম্ভাবনা থাকে, তখন সেই বৈধ ও পছন্দনীয় জিনিস পরিত্যাগ ও প্রতিহত করা জরুরী। এটা যে যুক্তিভিত্তিক সেটা তো সুস্পষ্ট। আর ফিকাহবিদগণ এ মূলনীতিকে মেনে নেয়ার পর কুরআন-সুন্নাহতে বিদ্যমান এর উৎসের উল্লেখ প্রয়োজন ছিল না। তথাপি উল্লেখ করা সুবিধাজনক হবে মনে করছি। আল্লাহ তায়ালা সূরা আনয়ামের ১০৯ নং আয়াতে বলেনঃ

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ "মুশরিকদের উপাস্যদেরকে তোমরা গালি দিও না, তা হলে অজ্ঞতা ও শত্রুতার বশে তারা আল্লাহকে গালি দেবে।" ভুয়া উপাস্যদেরকে গালি দেয়া আসলে তো বৈধ কাজ, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তা পছন্দনীয়ও

বটে। তবে এটা ইসলামের কোন মূল উদ্দেশ্য নয়। কেননা এ উদেশ্যটা অন্যভাবেও অর্জন করা সম্ভব। যেমন বিজ্ঞানসম্মত কলাকৌশল প্রয়োগ, মিষ্ট উপদেশ ও যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক দ্বারা তা অর্জন করা যায়। অধিকন্তু এতে একটা ক্ষতির আশংকা রয়েছে। সেটি এই যে, মুশরিকরা প্রকৃত উপাস্য আল্লাহকে গালি দিতে পারে। এ জন্য ভুয়া উপাস্যদেরকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। ভূমিকায় এই মূলনীতিটা উল্লেখ করার পর জবাব সহজবোধ্য হয়ে গেছে। দূরবর্তী শ্রোতাদের কানে বক্তার আওয়াজ পৌঁছানো শরিয়তের দৃষ্টিতে জরুরী নয়। কেননা তাদেরকাছে অন্যান্য নির্দোষ উপায়ে ইসলামের দাওয়াত পৌছান সম্ভব। অধিকন্তু দূরবর্তী শ্রোতাদের কাণে বক্তার আওয়াজ পৌঁছানোর জন্য এ যন্ত্র ব্যবহারে একটা ক্ষতির আশংকাও রয়েছে যে, এতে জনসাধারণ মনে করবে যে এ যন্ত্রকে বিনোদনমূলক কাজে ব্যবহার করা চলে কিম্বা অন্যান্য বিনোদন যন্ত্র ব্যবহার করাও শরীয়তের দূষণীয় নয়। সুতরাং এটা পরিত্যাগ ও প্রতিহত করা জরুরী। সাধারণ বক্তা বা ওয়াজকারীর ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। আর জুমুয়া ও ঈদের খতিবের বেলায় এ কথা আরো বেশী প্রযোজ্য। কেননা সে ক্ষেত্রে আওয়াজ দূরে পৌঁছানো আরো বেশী নিস্প্রয়োজন। কেননা খুতবায় উপস্থিতিই উদ্দেশ্য শুনতে পাওয়া নয়। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে ক্ষতির আশংকা অধিকতর প্রবল। কেননা এই যন্ত্রটাকে মসজিদে ঢুকাতে হবে, যা মসজিদের পক্ষে অসম্মানজনক। আরো একটা কারণ এখানে বিদ্যমান, সেটি এই যে, এতে শরীয়ত বিরোধী অনুষ্ঠানাদির অনুকরণ ও সাদৃশ্য রয়েছে। এ কারণেই মসজিদে গাছ লাগাতে বারণ করা হয়েছে। কেননা এতে বাতিল ধর্মপন্থীদের উপাসনালয়ে গাছ লাগানোর প্রথার অনুকরণ ও সাদৃশ্য বিদ্যমান। প্রকৃত সত্য আল্লাহই ভালো জানেন।"

উল্লিখিত ফতওয়ার পর্যালোচনা প্রসঙ্গে নিম্নের নিবন্ধটি লেখা হয়ঃ

"এটা এমন একজন মান্যগণ্য আলিমের ফতওয়া, যাঁর অবস্থান বর্তমানে মুসলিম জাহানের সর্বাধিক খ্যাতিমান আলিমদের প্রথম সারিতে। সূর্যের সামনে নগণ্য মোমবাতির অবস্থান যেরূপ,

মওলানা থানবীর জ্ঞানের সামনে আমার জ্ঞানের অবস্থাও তদ্রূপ। এই নিদারুণ অসমতার কথা যদি বিবেচনা করি, তা হলে ফতওয়া নিয়ে আমার কথা বলাই শুধু অসঙ্গত নয়, বরং নিজের জ্ঞান-গবেষণা বাদ দিয়ে তাঁর রায় নির্বিবাদে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু আমি যখন আমাদের পূর্বসূরীদের রীতি ও ঐতিহ্যের দিকে নজর দেই, তখন দেখতে পাই যে, তারা ব্যক্তিত্বকে নয় বরং বক্তব্যকেই প্রাধান্য দিতেন। ওস্তাদের চিন্তা-গবেষণার মোকাবিলায় শিষ্য এবং অগ্রগণ্য ব্যক্তির রায়ের মোকাবিলায় নগণ্য ব্যক্তি অকুণ্ঠ চিত্তে নিজের মতামত ও চিন্তা-গবেষণার ফসল পেশ করতেন। সেটা তারা করতেন বড়দের তুলনায় নিজেদের পাণ্ডিত্য বেশী জাহির করা বা তাদের সমকক্ষতা দাবী করার জন্য নয়-বরং সত্যের অনুসন্ধান চালানো প্রত্যেক বিদ্যার্থীর ওপর ফরয মনে করে। তারা এও জানতেন যে, এই সত্যানুসন্ধান ও তত্ত্বান্বেষণের বেলায় তাদেরকে ব্যক্তি বিশেষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিরপেক্ষ থাকতে হবে। তাদের দৃষ্টিতে এটা জরুরী ছিল না যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সমান বা তার চেয়ে বেশী বিদ্বান হলেই তার সামনে নিজের জ্ঞান-গবেষণা প্রসূত মতামত পেশ করতে পারবে, নচেত তাকে চুপ থাকতে হবে এবং নিজের চিন্তা ও দৃষ্টিকে অচল করে বড়দের মতামত ও গবেষণাকে মেনে নিতে হবে। এই মানসিকতা যদি সে যুগে থাকতো, তা হলে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের মোকাবিলায় ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম শাফেয়ীর মোকাবিলায় ইমাম আহমাদ স্বতন্ত্র কোন মাযহাব অবলম্বন ও চালু করতেন না। বস্তুত তাঁরা ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের পথপ্রদর্শক এবং তাদের দৃষ্টান্ত সর্বকালের শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেষ্ঠতম আলোকবর্তিকা। তাই তাদের পদাংক অনুসরণ করে আমিও হযরত মওলানা থানবীর মোকাবিলায় নিজের জ্ঞানগত দৈন্যের কথা জেনেও এই ফতওয়া সম্পর্কে বক্তব্য নিবেদন করছি।

যে মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ফতওয়াটা দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যই অনস্বীকার্য। শুধু হানাফী ফিকাহবিদগণই নয় বরং ইসলামের অন্যান্য ইমামগণও এটাকে গ্রহণ করেছেন। আর শুধু

একটা আয়াত নয়, বরং কুরআন ও হাদীসের একাধিক মূলনীতি উক্তি এর উৎস। কিন্তু বিবেচনার বিষয় এই যে, এই বিশেষ ব্যাপারটার ক্ষেত্রেও ঐ মূলনীতি কার্যকর হতে পারে কি না।

মাইককে কোন বিচারেই বিনোদন যন্ত্র বলা চলে না। একমাত্র বিনোদন ও প্রমোদের জন্যই যা তৈরী হয়েছে এবং বিনোদনমূলক আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোন কাজে যার ব্যবহার একেবারেই হয় না তাকেই বিনোদন যন্ত্র বলা যায়। যেমন বাঁশী ও হারমোনিয়াম। আর যে যন্ত্র আসলে বিনোদনের উদ্দেশ্যে তৈরী না হয়ে থাকলেও তার বেশীর ভাগ ব্যবহার বিনোদন ও প্রমোদ উৎসবেই হয়ে থাকে, তাকেও আনুসঙ্গিকভাবে বিনোদন যন্ত্র বলা হয়। যেমন গ্রামোফোন। মাইক বা লাউড স্পীকার এই দু'শ্রেণীর কোনটার অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা তৈরীর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ছোট আওয়াজকে বড় করা এবং দূরে পৌছে দেয়া। এটা বিনোদনমূলক ও অবিনোদনমূলক উভয় ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয়। অবিনোদনমূলক কাজেই এর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বেশী। কাঁচের গ্লাসের সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। এতে মদও খাওয়া যায়, হালাল পানীয়ও পান করা যায়। বৈদ্যুতিক পাখা বা বাল্বের সাথেও তার তুলনা চলে। এ জিনিসগুলো নাট্যশালায় নাচ-গানের ক্ষেত্রে এবং গণিকালয়েও ব্যবহৃত হয়ে থাকে আবার পবিত্র অনুষ্ঠানাদিতে ও বৈধ উৎসবাদিতেও হয়ে থাকে। এখন সময় সময় অবৈধ কাজে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এগুলোকে যদি বিনোদনযন্ত্র বা প্রমোদযন্ত্র না বলা যায়, তা হলে মাইককেও ঐ নামে আখ্যায়িত করা যায় না। গ্লাস, পাখা ও বাল্বের ব্যবহারে যদি শরীয়ত বিরোধী অনুষ্ঠানাদির সাদৃশ্য ও অনুকরণ না থেকে থাকে, তা হলে মাইকেও সেটা নেই। কাঁচের গ্লাস ব্যবহারে যদি এ আশংকা না থেকে থাকে যে, মানুষ মদ খাওয়ার কাজে গ্লাস ব্যবহারের ছুঁতা পেয়ে যাবে এবং মসজিদে বৈদ্যুতিক বাল্ব ও পাখা ব্যবহারে যদি এ আশংকা না জন্মে যে, এতে জনগণ নৃত্যশালায় যাওয়ার বাহানা খুঁজে পাবে, তাহলে মাইক ব্যবহারেও এ ধরনের ক্ষতির ভয় নেই। বৈদ্যুতিক বাল্ব ও পাখা লাগানো যদি মসজিদের জন্য অসম্মানজনক না হয়, তা হলে

মাইক লাগানোতে মসজিদের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোন কারণ নেই।

এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, বর্তমান যুগে মাইক ন্যায় ও সত্যের তুলনায় অন্যায় ও অসত্যের সেবাই বেশী করছে। কিন্তু আজ কোন্ জিনিসটা এমন আছে যে, অন্যায় কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না? দোয়াত কলম থেকে শুরু করে মুদ্রণ যন্ত্র, রেল, মোটরগাড়ী, বিমান এবং রেডিও পর্যন্ত সকল জিনিসেরই ব্যবহার অনৈসলামিক, গর্হিত ও অশ্লীল কাজেই বেশী হচ্ছে। সব জিনিসকেই জুলুম ও নাফরমানীর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রত্যেক যন্ত্র, সরঞ্জাম ও শক্তি দ্বারা খোদাবিমুখ ও খোদাদ্রোহী সভ্যতার বিকাশ ও বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, আল্লাহর সৃজিত শক্তিগুলোকে উদ্ভাবন ও প্রয়োগের কাজ বর্তমানে তারাই করছে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান রাখে না। যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী, তারা জাগতিক উপকরণসমূহকে করায়ত্ত করা ও তার সাহায্যে ন্যায় ও সত্যের কাজ সমাধা করা ছেড়ে দিয়েছে। এ কারণে গোটা মানব সভ্যতা অপবিত্র হয়ে গেছে এবং দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস অসত্য ও অপকর্মের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

এখন যদি আমরা—অমুক জিনিস খারাপ কাজের হাতিয়ার হয়ে গেছে, অমুক জিনিস ব্যবহার করা ফাসিক ও জালেমদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য সৃষ্টির সহায়ক,—এই অজুহাতে প্রতিটি জিনিস বাদ দিয়ে যেতে থাকি, তা হলে আমাদের গোটা সমাজ ও সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। এটা হবে আরো মারাত্মক ভুল। এতে করে আল্লাহর মনোনীত সভ্যতা ও সংস্কৃতি আরো বিপর্যস্ত ও পরাভূত এবং নিপীড়নমূলক ও পাপাচারমূলক সমাজ ব্যবস্থা আরো [illegible] ও [illegible]শীল হয়ে যেতে থাকবে। কেননা যে [illegible] যান্ত্রিক শক্তিতে চলে, তার বিরুদ্ধে সেই সভ্যতা কখনো সফল হতে পারে না যা সকল কার্যকর ও শক্তিমান উপায়-উপকরণ থেকে হাত গুটিয়ে বসে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মোটরগাড়ীওয়ালার সাথে প্রতিযোগিতায় গরুগাড়ীওয়ালা এঁটে উঠতে পারে না। যারা রেডিওর সাহায্যে এক সেকেন্ডের মধ্যে

বাতিলের আওয়াজ পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয় এবং প্রতিটি কথা দ্বারাই কোটি কোটি মানুষের চিন্তাধারাকে বিষাক্ত করে দেয়, তাদের মোকাবিলায় সেই সব লোক কিভাবে সফল হতে পারে যারা একটা সমাবেশের শ্রোতাদের কান পর্যন্ত ইসলামের বাণী পৌঁছাতেও আল্লাহর সৃষ্টি করা একটি শক্তিকে কাজে লাগাতে দ্বিধাগ্রস্ত? অসত্যের আওয়াজ ছড়িয়ে দিতে যারা উদগ্রীব, তারাতো একজন মানুষকেও তাদের কথা না শুনিয়ে ছাড়তে চায় না। কিন্তু সত্যের প্রচারকদের চিন্তাধারা এ রকম যে, দূরের শ্রোতাদের কাছে আওয়াজ পৌঁছানো তো শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরীই নয়। কাজেই তার জন্য আর চেষ্টা করা কেন?

এ ধরনের কর্মপন্থা অবলম্বনের পরিণাম যা হবে এবং হচ্ছে তা যে কোন ব্যক্তি অনায়াসেই বুঝতে পারে। এর পরিণাম দাঁড়াবে এই যে, আমরা প্রতিটি হাতিয়ার এই বলে দূরে ছুঁড়ে মারবো যে, ওটা শত্রুর ব্যবহারে নোংরা হয়ে গেছে, আর দুশমন সেই সব হাতিয়ার কুড়িয়ে নিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকবে।

এ কথা নিসন্দেহে ঠিক যে, দূরের শ্রোতাদের পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছানো শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী নয়। কিন্তু এ কথা ঠিক নয় যে, আওয়াজ পৌঁছানো হোক এবং শ্রোতারা তা শুনতে পাক—এটা শরীয়তে একেবারে কাম্যই নয়। নামাযে কুরআন এ জন্যই পড়া হয় যে, শ্রোতারা তা শুনবে। খোদ কুরআনেও এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে যে— وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا "যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা শোন এবং চুপ থাক" (আরাফ ২০৪)। খুতবাও মানুষের শোনার জন্যই দেয়া হয় এবং সে কারণেই শরীয়তে খুতবার সময় কথা বলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুনতে পাওয়া যে উদ্দেশ্য এবং কাম্য, সেটা কুরআন ও হাদীস থেকেও প্রমাণিত, আবার যুক্তির কষ্টিপাথরেও উত্তীর্ণ। মানুষের শোনার জন্যই যে কথা বলা এবং শ্রোতার কানে পৌঁছার জন্যই যে বক্তার মুখ দিয়ে শব্দের উচ্চারণ হয়, এটা একটা স্বতসিদ্ধ ব্যাপার। অবশ্য প্রশ্ন ওঠে যে, শরীয়তে এটাকে জরুরী ও বাধ্যতামূলক করা হয়নি কেন? আমি বলবো যে, এটা শরীয়তের একটা উদার নৈতিক

ব্যবস্থা। যেহেতু তৎকালে দূরে আওয়াজ পৌঁছানোর কোন যন্ত্র ছিল না এবং আজও সব জায়গায় সব সময় তা সহজলভ্য নয়, তাই শ্রবণকে এমন বাধ্যতামূলক করা হয়নি যে, তাছাড়া নামাযই হবে না অথবা খুতবা শুনতে হাজির হওয়ার সওয়াবই লাভ করা যাবে না। কিন্তু এই সুবিধা ও উদারতা কেবল স্বাভাবিক ও পারিপার্শিক বাধার কারণে দেয়া হয়েছে। এটাকে আওয়াজ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করারই দরকার নেই এবং এ জন্য কোন মাধ্যম পাওয়া গেলেও তা ইচ্ছাপূর্বক বর্জন করতে হবে, এরূপ নীতি অবলম্বনের যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো ঠিক নয়।

উপসংহারে আমি এ কথাও স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, এ সমস্যা নিয়ে আমার বারবার লেখার উদ্দেশ্য এ নয় যে, মাইকের প্রতি আমার বিশেষ কোন আকর্ষণ রয়েছে। আসলে আমার উদ্দেশ্য এই যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, উদ্ভাবন এবং নবাগত সভ্যতার সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ সম্পর্কে মুসলমানদের মনোভাব পাল্টানো উচিত। এসব দ্রব্যসামগ্রী মূলত অপবিত্র কিছু নয়। প্রকৃত পক্ষে অপবিত্র হলো পাশ্চাত্যের খোদাদ্রোহী সভ্যতার গৃহীত ও প্রবর্তিত ব্যবহার প্রণালী ও প্রয়োগ পদ্ধতি। বিশ্বজগতের প্রতিপালক যে সব জিনিস মানুষের করায়ত্ত করে দিয়েছেন, তা নিসন্দেহে পাক ও পবিত্র। এসব জিনিসের স্বভাবগত দাবী এই যে, এগুলোকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী কাজে লাগানো হোক। অথচ যাদের কাছে আল্লাহর বিধান রয়েছে তারা এগুলোকে কাজে লাগাচ্ছে না, আর যারা কাজে লাগাচ্ছে তারা শয়তানী আইন-বিধানের অনুসারী। এভাবে এ সব উপকরণের ওপর দ্বিগুণ জুলুম করা হচ্ছে।

(তরজমানুল কুরআন, রজব ১৩৫৭ হিঃ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮)

পাঞ্জাবের জনৈক দীনদার মুরব্বী এক চিঠিতে লিখেছেনঃ "হানাফী আলিমগণ এখনও পর্যন্ত জুময়ার নামাযের জন্য শহরের শর্ত আরোপ করে চলেছেন। অথচ শহরের যা অবস্থা হয়েছে, তাতে গ্রামের মুসলমানদেরকে (যারা এখনো আধুনিক সভ্যতার অন্যায়িক বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে অনেকটা মুক্ত) শহরে যাওয়া থেকে যত বিরত রাখা যায় ততই ভালো। আমি একটা মৌজার মালিক। এখানে আমি একটা মসজিদ ও দীনিয়াতের মকতব প্রতিষ্ঠা করেছি। আশপাশের গ্রামগুলোতে অল্পসংখ্যক কিছু মুসলিম অধিবাসী রয়েছে। তারা জুময়ার দিন এখানে আসে এবং কুরআনের তাফসীর, জুময়ার খুতবা ও আনুসঙ্গিক কিছু ওয়াজ-নসিহত শুনে যায়। মকতবের শিক্ষক তাদেরকে নামায শিখায়। আর যাদের নামায শুদ্ধ হয় না, তাদের বিশুদ্ধ নামাযের তালিম দেয়। রমযানে অনেক লোক সমবেত হয়। কিন্তু আলিমগণ এখানে জুময়ার নামায সঠিক হয় না বলে ফতওয়া দিচ্ছেন। আমি যদি জুময়া বন্ধ করে দেই তবে তারা কখনো শহরে যাবে না। তাদেরকে যদি বলা হয় যে, এখানে জুময়া হয় না, জুময়ার দিন এখানে এসে তোমরা যোহর পড়ে যেয়ো, তবে তা কেউ মানে না। জুময়ার মর্যাদা ও সওয়াবের প্রভাবেই লোকেরা সপ্তাহে একবার এখানে আসে। আমার ভাবনা এই যে, এখানে যদি জুময়ার নামায না হয়, তবে মানুষ এই তালিম ও ওয়াজ থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাবে। এখান থেকে নিকটেই কয়েক মাইল দূরে একটা শহর রয়েছে। সেখানে কয়েকটা মসজিদে জুময়া হয়। কিন্তু সেখানে সুস্থ চিন্তার অধিকারী আলিম নেই, যা দ্বারা কোন উদ্দীপনা সঞ্চারের আশা করা যায়। আর শহরে বাজারে অন্যান্য জায়গায় আজকাল যা কিছু আছে তার সবই বিদ্যমান। আর কিছু না হোক, যেসব গ্রামবাসী সেখানে যাবে, কিছু না কিছু বাজে খরচ তো করে আসবেই। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি এ ব্যাপারে অবশ্যই কিছু না কিছু লিখবেন।"

গ্রামে জুময়ার নামায পড়ার ব্যাপারটা খুবই বিতর্কিত এবং এ ব্যাপারে প্রাচীন আমল থেকেই মতভেদ চলে আসছে। এ ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে এমন কোন আলোচনা তো করা সম্ভব নয়, যা মতবিরোধ পুরোপুরি অবসান ঘটাতে পারে। তবে আমি যে মতটা বিশুদ্ধ মনে করি, তা সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

সর্বপ্রথম শরীয়তের দৃষ্টিতে জুময়ার মর্যাদা এবং জুময়ার নামায প্রবর্তনে শরীয়তের উদ্দেশ্য কি, সেটা ভালোভাবে বুঝা দরকার। এরপর দেখতে হবে, কুরআন ও হাদীসে জুময়া প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কি কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সেই সব নির্দেশের পেছনে কি কি কল্যাণকারিতা ও উপকারিতা নিহিত রয়েছে। সেই সাথে এটাও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন যে, এই সব নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামে জুময়ার নামায চালু করার বৈধতার পক্ষে ও বিপক্ষে বিজ্ঞ ইমামগণের কি কি মতভেদ ঘটেছে এবং তাদের প্রতিটি গোষ্ঠী জুময়ার উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সংক্রান্ত শরীয়তের মৌল চিন্তাধারাকে কতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন। এর পরই এ কথা ভালোভাবে বুঝা যাবে যে, বর্তমানে সেই সব উদ্দেশ্য ও উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে বৈধতা ও অবৈধতা–এ দুটির কোনটি অবলম্বন করা অধিকতর শুদ্ধ ও সঙ্গত হবে।

ইসলামের সামাজিকতা ও সংঘবদ্ধতা

ইসলামী শরীয়তের বিধি-নির্দেশসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে যে তত্বটা আমরা সুস্পষ্টভাবে জানতে পারি তা এই যে, শরীয়ত শুধু ব্যক্তিগত সংস্কার ও পরিশুদ্ধিকেই স্বীয় চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে না। বরং যাদের সংস্কার ও পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়েছে, তাদেরকে সংঘবদ্ধ করে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের এমন একটি দল, সংগঠন বা সমাজ গড়ে তুলতে চায়। যে দল পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করবে এবং এমন একটি সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলবে, যার মধ্যে মানুষের সহজাত সৎ বৃত্তিগুলোর বিকাশ সাধন এবং কুপ্রবৃত্তিগুলোকে দমিত ও সংযত করার ক্ষমতা থাকবে। এটা

শরীয়তের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য। এ কারণেই তার সকল বিধি ও নির্দেশ নিরেট ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে সামষ্টিকতা ও সংঘবদ্ধতার লক্ষ্যেই পরিচালিত। শরীয়ত যদিও ব্যক্তির সংশোধন ও পরিশীলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করে, কিন্তু এটা শুধু ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে পবিত্র করে দিয়ে ক্ষ্যান্ত থাকার জন্য সে করে না, বরং তাকে পবিত্র করার পর তাকে একটি উৎকৃষ্টতম সমাজের সদস্য ও কর্মী হিসেবে গড়ে তোলাও তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এ জন্যই শরীয়ত ব্যক্তি গড়ার যতগুলো কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে, তার প্রায় সবগুলোই এমন যে, তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবেও পরিশুদ্ধ করে, আবার সেই সাথে তাদেরকে পরস্পরে সংযুক্ত করে একটা উন্নতমানের দলও গঠন করে।

উদাহরণ স্বরূপ রোযাকেই ধরুন। এটা যদিও শুধুমাত্র ব্যক্তির পরিশুদ্ধিরই পন্থা বিশেষ। কিন্তু শরীয়ত একই সময়ে ত্রিশ দিনের রোযা সকল মুসলমানের ওপর ফরয করেছে, যাতে তারা সেই পবিত্র ও পরিশুদ্ধ অবস্থাতেই সেই সামষ্টিক ইবাদাতের মাধ্যমে সৎ ও পরহেজগার লোকদের একটি দলে রূপান্তরিত হয়। যাকাতের ব্যাপারটা দেখুন। এর তো ভিত্তিই সামষ্টিকতা ও সংঘবদ্ধতার ওপর। যাকাত ব্যক্তির পরিশুদ্ধির পন্থাই অবলম্বন করেছে এ রকম যে, সে অন্যান্য ব্যক্তির সাহায্য করুক। হজ্জ সম্পর্কে ভাবুন। এতে সামষ্টিকতার দিকটা এত প্রবল ও পরিদৃশ্যমান যে, তাকে আর উজ্জ্বল করে দেখানোর দরকারই নেই। এ সবের পর নামাযের প্রতি লক্ষ্য করুন। এটা এ সবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যক্তিবর্গকে সততা ও ন্যায়পরায়নতার প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা। রোযা বছরে ত্রিশ বার এবং যাকাত ও হজ্জ বছরে একবার যে ভূমিকা পালন করে, নামায প্রতিদিন পাঁচবার সেই কাজই সম্পন্ন করে। এ ইবাদাতের ও শরীয়ত ব্যক্তি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সৎ নাগরিক তৈরী এবং সৎ লোকদের দল গঠনের লক্ষ্য সামনে রেখেছে। সে প্রতিদিন পাঁচবার জামায়াত বদ্ধভাবে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়। কম বেশী যে ক'জন মুসলমান কোথাও জমায়েত হতে পারে, সকলে মিলে ফরয

কাজটি সম্পন্ন করুক এটাই এর উদ্দেশ্য। অতপর সে সপ্তাহে একটা দিন এই উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করে যেন যত বেশী সংখ্যক মুসলমান সমবেত হতে পারে হোক এবং সম্মিলিতভাবে ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে আল্লাহর নাম শুনুক ও তার ইবাদাত করুক। এই সাপ্তাহিক সমাবেশের পর সে প্রতি বছর রোযার মাস শেষে এবং হযরত ইবরাহীমের আদর্শের স্মৃতি উৎসবের মত গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষে তাদেরকে বৃহত্তর সমাবেশে মিলিত হওয়ার আহ্বান জানায়। উদ্দেশ্য এই যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে যে প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এবং জুময়ার নামায দ্বারা যে প্রাসাদের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কার্য সাধিত হয়েছে, তার পূর্ণতা সাধিত হোক।

জুময়া ফরয হওয়ার নিগূঢ় তত্ত্ব

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে পরিস্ফুট হয়েছে যে, সকল ফরয ইবাদাতে শরীয়তের দৃষ্টি সামষ্টিকতার দিকেই কেন্দ্রীভূত। পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতিটি ইবাদাত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও সমাজবিমুখতার প্রবণতা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা এবং সংঘবদ্ধতা ও সামষ্টিকতা যতটা সম্ভব বাড়ানোর চেষ্টায় নিয়োজিত। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে জামায়াতকে ফরয করে দেয়ার সুযোগ ছিল না। কেননা প্রতিদিন প্রতিটি মানুষের ওপর জামায়াতে নামায পড়া বাধ্যতামূলক করে দিলে মারাত্মক অসুবিধা ও সংকটের সৃষ্টি হতো। এ জন্য শুধুমাত্র জামায়াতের জোর তাগিদ দিয়েই ক্ষ্যান্ত থাকা হয়েছে। কেউ যদি কোন ওয়াক্তের নামায জামায়াতে পড়তে সমর্থ না হয় তবে সে একাকীই পড়ে নিতে পারবে—এ অনুমতি দেয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে এই যে শৈথিল্য দেখানো হয়েছে, তার প্রতিকারার্থে সপ্তাহে একবার এমন এক নামায ফরয করা হয়েছে, যা জামায়াত ছাড়া আদায়ই হয় না। এটাই জুময়ার নামায। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে যে সুবিধা দিয়ে খানিকটা ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা ও বিচ্ছিন্নতার অবকাশ সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই ক্ষতিপূরণের

নিমিত্তই যেহেতু এ ফরযটি আরোপিত, সেহেতু শরীয়ত কামনা করে যে, এ ফরয সম্পাদনে মুসলমানদের বৃহত্তর সমাবেশ ঘটুক এবং যতদূর সম্ভব বিভেদ ও বিশৃংখলার অবসান ঘটানো হোক।

জুময়ার ফরযের গুরুত্ব

এখন সহজেই বুঝা যায় যে, জুময়ার ফরয হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কেন এত জোর দেয়া হয়েছে এবং কি জন্যই না তা কায়েম করার ওপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - (الجمعة-٩)

"হে ঈমানদারগণ! যখন জুময়ার দিন নামাযের জন্য ডাক দেয়া হয়, তৎক্ষণাত আল্লাহর স্মরণের দিকে ছুটে যাও এবং বেচা-কেনা বন্ধ কর। তোমরা যদি জান তবে এটা তোমাদের জন্য ভালো।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ (مسلم-احمد)

"আমার ইচ্ছা হয় যে, নিজের জায়গায় কাউকে নামায পড়ানোর জন্য নিয়োগ করি, অতপর যারা জুময়ার নামাযে আসে না তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেই।"

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لَا يُمْحَى وَلَا يُبَدَّلُ - (رواه الشافعي)

"যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জুময়া ত্যাগ করে, তাকে এমন এক খাতায় মুনাফিক হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়, যার লেখা মোছাও যায় না, বদলানোও যায় না" (শাফেয়ী)

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ .....
... فَمَنِ اسْتَغْنٰى بِلَهْوٍ اَوْ تِجَارَةٍ اِسْتَغْنَى اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ
غَنِيٌّ حَمِيْدٌ - (دارقطني)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্য জুময়ার দিন জুময়ার নামায পড়া অবশ্য কর্তব্য...... যে ব্যক্তি কোন বিনোদন বা কারবারের খাতিরে এর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করবে, আল্লাহও তার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ সর্ব দোষমুক্ত এবং তিনি কারোর মুখাপেক্ষী নন" (দারকুতনী)।

لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى
قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ (مسلم)

"জুময়ার নামায তরক করা থেকে মানুষের ক্ষান্ত থাকা উচিত। নচেত আল্লাহ তাদের মনের ওপর সিল মেরে দেবেন। অতপর তারা শৈথিল্য ও উদাসীনতায় নিমজ্জিত হবে" (মুসলিম)।

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَأْتِهَا ثُمَّ سَمِعَ
النِّدَاءَ وَلَمْ يَأْتِهَا ثَلَاثًا طَبَعَ عَلٰى قَلْبِهِ فَجَعَلَ قَلْبَ
مُنَافِقٍ - (طبراني)

"যে ব্যক্তি জুময়ার আযান শুনলো, কিন্তু নামাযে এল না পরবর্তী জুময়ায়ও আযান শুনলো, তখনো নামাযে এল না, এভাবে পর পর তিন জুময়ায় করতে থাকলো, তার হৃদয়ে সিল মেরে দেয়া হয় এবং তার মনকে একজন মুনাফিকের মন বানিয়ে দেয়া হয়" (তাবরানী)।

ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখুন তো। জুময়ার জন্য ছুটে যাওয়া এবং কায়কারবার ত্যাগ করার এত তাগিদ কেন? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত দয়ালু ও স্নেহবৎসল মানুষের মনে জুময়া তরককারীদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়ার ইচ্ছা জাগলো

কেন? জুময়ার মধ্যে এমন কি আছে যে, জুময়া ত্যাগ ও মুনাফিকীকে সমর্থক বলা হলো এবং তার জন্য এমন কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হলো? এর একমাত্র কারণ এই যে, মূলতঃ জুময়া কায়েমের ওপরই মুসলিম উম্মাহর সামষ্টিক সত্তার টিকে থাকা নির্ভরশীল। এর দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সফল হয়। ইসলামের একটা মহৎ উদ্দেশ্য হলো কল্যাণমূলক নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠা এবং সততাপূর্ণ সমাজ জীবন গঠন। পার্থিব জীবনে এটাই তার সবচেয়ে কাংখিত বস্তু। এ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার অর্থ হলো ইসলামের উদ্দেশ্যই বিফলে যাওয়া এবং এ কাজের ক্ষতি হওয়ার অর্থ হলো ইসলামের প্রাসাদেরই ক্ষতি হওয়া। এই মহৎ উদ্দেশ্যটির সফলতার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো জুময়ার নামায।

দুটো নীতিগত কথা

এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হলো তা থেকে দু'টো বিষয় জানা যায়।

প্রথমত, জুময়ার নামায সাধারণ নামাযের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ফরয। ইসলামের মৌল উদ্দেশ্যসমূহ সফল করার ব্যাপারে জুময়ার প্রতিষ্ঠা সর্বোচ্চ গুরুত্বের দাবী রাখে। খুঁটিনাটি ও ইজতিহাদী মাসয়ালাসমূহের মধ্যে যেগুলো জুময়ার বিপক্ষে, সেগুলো উপেক্ষা করাই ভালো এবং যেগুলো জুময়া কায়েম করার পক্ষে সেগুলোকে গ্রহণ করাই অধিকতর সঙ্গত।

দ্বিতীয়ত, জুময়া কায়েম করার দ্বারা শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো মানুষের সামাজিক ও নাগরিক জীবনকে সংহত ও সংগঠিত করা। শরীয়ত এর দ্বারা মুমিনদের বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততা দূর করে তাদেরকে সংঘবদ্ধতার দিকে আনতে চায়। সুতরাং জুময়া কায়েম করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জামায়াতগুলো বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন না হয় বরং সমাবেশ যথা সম্ভব বড় হয়।

জুময়া কায়েমের সর্বসম্মত কার্যকর বিধিসমূহ

এবার আরো সামনে অগ্রসর হোন। কুরআনে জুময়ার ফরয হওয়া ও তার গুরুত্ব এত জোরের সাথে বর্ণিত হয়েছে যে, তার

জন্য সমস্ত কায়কারবার ছেড়ে ছুটে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু নামায কখন পড়তে হবে, কোথায় পড়তে হবে, কার পড়তে হবে আর কার পড়তে হবে না, কিন্তু পরিস্থিতি ও পরিবেশে পড়া যাবে এবং কোন্ পরিস্থিতি ও পরিবেশে পড়া যাবে না, এ সব প্রশ্নে কিছুই বলা হয়নি। এ সব ব্যাপার রসূল (সাঃ) এর নির্দেশের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। মুমিনদেরকে শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত থাকা হয়েছে যে, "জুময়ার দিন যখন নামাযের জন্য আহ্বান জানানো হবে, অমনি আল্লাহর স্মরণের দিকে ছুটে যাও এবং কায়কারবার ত্যাগ কর।"

উল্লিখিত প্রশ্নগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত পথনির্দেশ আমরা রসূল (সাঃ) এর উক্তি ও আজীবন চালিয়ে যাওয়া কর্মকান্ড থেকে পাই। যে সব সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা লাভ করেছেন, তাদের কথা ও কাজ থেকে এ ব্যাপারে আরো তথ্য অবগত হওয়া যায়। এ সব মাধ্যম দ্বারা আমরা অকাট্যভাবে যে বিধিগুলো জানতে পারি তা এইঃ

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম জুময়ার নামায সব সময় জোহরের সময়ে পড়েছেন। কাজেই জোহরের ওয়াক্তই জুময়ার ওয়াক্ত।

২. তিনি ও তাঁর সাহাবাগণ কখনো খুতবা ছাড়া জুময়ার নামায পড়েননি। সুতরাং জুময়ার নামাযের সাথে খুতবা বাধ্যতামূলক।

৩. জুময়ার নামায গোলাম, নারী, শিশু, প্রবাসী ও রোগীর ওপর ফরয নয়। শুধুমাত্র বয়োপ্রাপ্ত স্বাধীন ও সুস্থ পুরুষের ওপরই জুময়া ফরয।

৪. রসূল (সাঃ)-এর আমলে ও সাহাবা আমলে কখনো জনহীন প্রান্তরে, জঙ্গলে, সাময়িক আবাসস্থলে ও শিবিরে কখনো জুময়ার নামায পড়া হয়নি। কাজেই শুধুমাত্র স্থায়ী জনঅধ্যুসিত এলাকাতেই জুময়া কায়েম করা যাবে।

৫. জুময়া কখনো ব্যক্তিগত বাস গৃহে পড়া হয়নি। সকল মুসলমানের অবাধ প্রবেশাধিকার রয়েছে এমন জায়গাতেই পড়া হতো। সুতরাং জুময়ার জন্য সর্ব সাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার জরুরী।

মতভেদ ও তার কারণ

উপরোক্ত বিধিসমূহ সর্ববাদীসমত। এ ছাড়া অন্যান্য যে সব খুটিনাটি বিধি রয়েছে, তার কোনটাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়। এ কারণেই সে সব ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে, যেমন কতজন লোক হলে জুময়ার জামায়াত শুদ্ধ হবে? জুময়া প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কার ওপর বর্তায়? খুতবা দুটো হবে, না একটা? ইত্যাদি। এ ধরনেরই একটা প্রশ্ন এই যে, জুময়ার জন্য কি ধরনের জনবসতি প্রয়োজন? সেই জনবসতি থেকে কত দূরের অধিবাসীদের ওপর জুময়া ফরয?

ইমাম শাফেয়ীর মতে যে সব জনপদের অধিবাসী শীত গ্রীষ্মকালে অন্য জায়গায় চলে যায়, সেখানে জুময়া নাজায়েয। স্থায়ী জনঅধ্যুসিত জনপদে ৪০ জন বা ততোধিক বয়োপ্রাপ্ত স্বাধীন সুস্থ পুরুষ থাকলে সেখানে জুময়া হতে পারে। এর সমর্থনে তিনি হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) এই উক্তি থেকে প্রমাণ দর্শান যে, মদীনার পর প্রথম যে জুময়া পড়া হয় তা ছিল বাহরাইনের জুয়াসী নামক গ্রামে। তাছাড়া এই রেওয়ায়েত থেকেও তিনি যুক্তি দেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) বাহরাইনবাসীর প্রশ্নের জবাবে লিখেছিলেন যে, যেখানেই থাক জুময়া আদায় কর। কিন্তু প্রথম রেওয়ায়েতটিতে 'গ্রাম' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, যার কোন নির্দিষ্ট আকার-আয়তন নেই। তা থেকে আর যাই হোক, ৪০ জন হতেই হবে এমন কথা বুঝা যায় না। এখন ইমাম সাহেব কিসের ভিত্তিতে ৪০ জনের শর্ত আরোপ করেন তা আমরা জানি না। আর দ্বিতীয় রেওয়ায়েত যতটা ইমাম শাফেয়ীর মতের পক্ষে যায়, ঠিক ততটাই তার বিপক্ষেও যায়। কেননা এর দ্বারা তো জংগল এবং মরুভূমিতেও জুময়া পড়া জায়েয মনে হয়। অথচ এটা তিনি নাজায়েয বলে স্বীকার করেন।

ইমাম আহমদের মত ইমাম শাফেয়ীর মতই এবং তার যুক্তি প্রমাণও একই।

ইমাম মালিকের মতে স্থায়ী জনঅধ্যুষিত যে কোন গ্রামে জুময়ার নামায জায়েয, চাই তার অধিবাসী সংখ্যা ৪০ জনের কমই হোক না কেন।

ইমাম আবূ হানিফা ও তাঁর শিষ্যগণ বলেন যে, জুময়া শুধু শহরে হতে পারে, গ্রামে নয়।

জুময়ার জন্য শহরের শর্ত ও তার প্রমাণ

হানাফী মতে জুময়ার জন্য শহরের শর্তারোপের প্রমাণ এই যে, হযরত আলী (রা) বলেছেঃ

لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا اضحى الا في مصر جامع

"জনাকীর্ণ শহর ছাড়া কোথাও জুময়া, তাকবিরে তাশরীক, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা পড়া চলবে না।" ১

তাঁরা এর যুক্তি হিসেবে এ কথাও বলেন যে, সাহাবীগণ যখন বিভিন্ন দেশ জয় করেন, তখন গ্রামাঞ্চলে কোথাও মিম্বার তৈরী করেননি। এ থেকেই তাঁরা বুঝেছেন যে, জুময়ার জন্য শহর হওযা যে শর্ত, সে ব্যাপারে সাহাবীগণ একমত ছিলেন।

কিন্তু শহরের সংজ্ঞা নিয়ে হানাফী ইমামগণের মধ্যে প্রচুর মতানৈক্য রয়েছে। এমনকি স্বয়ং ইমাম আবূ হানিফার দু'রকমের মতামত বর্ণিত রয়েছে। হানাফীগণের বিভিন্ন সংজ্ঞা লক্ষ্য করুন।

১. যেখানে এমন শাসক ও বিচারক থাকবে, যারা আইন চালু করতে এবং শরীয়তের দন্ডবিধি প্রয়োগ করতে সক্ষম, সেটাই জুময়া কায়েমের যোগ্য শহর।

---

১. এ উক্তিটি ইবনে আবি শায়বা ও আব্দুর রাজ্জাক নিজ নিজ হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। উভয়ে, এটি হযরত আলী (রাঃ) নিজস্ব বক্তব্য হিসেবেই উদ্ধৃত করেছেন। রসূল (সাঃ)-এর কোন নির্দেশ এরূপ ছিল, এমন কথা বলা হয়নি।

২. যেখানকার সবচেয়ে বড় মসজিদে শহরের সকল লোক হাজির হলে স্থান সংকুলান হয় না, সেটাই জুময়ার উপযুক্ত শহর।

৩. যেখানে বাজার, সড়ক ও মহল্লা থাকবে, জুলুমের প্রতিকার করতে পারে এমন শাসক এবং ইসলামের প্রয়োজনীয় নির্দেশ জিজ্ঞাসা করলে জানাতে পারে এমন আলিম আছে, সেটাকেই শহর বলা হয়।

৪. মুসলিম শাসক যে জায়গাকে শহর বলে আখ্যায়িত করেন ও জুময়া কায়েম করার নির্দেশ দেন সেটাই শহর।

৫. যেখানে প্রত্যেক পেশাদার মানুষ নিজ পেশা দ্বারা জীবিকা উপার্জন করতে পারে, সেটাই শহর।

৬. যার অধিবাসীর সংখ্যা দশ হাজার, সেটাই শহর নামে অভিহিত হতে পারে।

৭. যার জনসংখ্যা তিন হাজারের কম নয়, সেটাই শহর।

এ ধরনের আরো বহু সংজ্ঞা ফিকাহবিদগণ বর্ণনা করেছেন।

এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, প্রথমত "শহর"-এর শর্ত হওয়াটা সর্বসম্মত (ইজমা) নয়, বরং হাদীসবেত্তা ও ফিকাহবিদদের একটি বিরাট গোষ্ঠী এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। দ্বিতীয়ত, এর শর্ত হওয়া যদি প্রমাণিত হয়ও, তথাপি সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না যে, শহর কাকে বলে। এমতাবস্থায় প্রশ্ন জাগে যে, এ ধরনের একটা বিতর্কিত ও অস্পষ্ট শর্ত অপূর্ণ থাকায় জুময়ার নামাযের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ ও জোর তাগিদের ফরযকে মুসলিম জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশের ওপর থেকে রহিত করা কি সঙ্গত? আমি মনে করি, একদিকে খোদাভীতি অপরদিকে ফিকাহ শাস্ত্রীয় বিচক্ষণতার দাবী এই যে, ফরয রহিতকরণের ফতওয়া দেয়ার আগে আমাদের সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা ও তত্ত্বানুসন্ধান করে জানবার চেষ্টা করতে হবে যে, মুজতাহিদ ইমামগণের মতবিরোধের কারণ কি, তাঁরা জুময়ার ব্যাপারে শরীয়তের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় কি বুঝেছেন, আর সে উদ্দেশ্য ও

অভিপ্রায় সফল করার জন্য তারা যে বাস্তব পন্থা অবলম্বন করেছেন তার নিগূঢ়তম রহস্য কি? হয়তো এভাবে আমরা এমন একটা ভারসাম্যপূর্ণ মত ও পথের সন্ধান পেয়ে যাবো, যার কল্যাণে আমাদের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ জুময়ার বরকত লাভে ধন্য হতে পারবে।

মতবিরোধের আসল কারণ

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, জুময়া প্রতিষ্ঠার মূলে দুটো জিনিস মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী।

একটি হলো, ফরয হিসেবে জুময়ার বাধ্যবাধকতা। এটা এমন ফরয যে, সাধারণ নামাযের চেয়েও এর ওপর অনেক বেশী জোর দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক সুস্থ, সবল, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন পুরুষের জন্য এ নামায বাধ্যতামূলক।

দ্বিতীয়টি হলো, সংঘবদ্ধতা ও সামাজিকতা। বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা দূর করা এবং মুসলমানদের মধ্যে বেশী করে একাত্মতা ও সমাজবদ্ধতা সৃষ্টি করাই এর লক্ষ্য।

মুজতাহিদ ইমামগণের সকলেই এই দুটো বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন এবং উভয়টির স্বার্থ যাতে রক্ষিত হয় তার জন্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমস্যা এই যে, কোন কোন অবস্থায় এই দুটো দিককে একত্রিত করা সম্ভব হয় না। ফরয হওয়ার ওপর বেশী জোর দিতে গেলে, সংঘবদ্ধতার দিকটা ছুটে যায়। কেননা ফরয হওয়ার কড়াকড়ি স্বতই দাবী করে যে, দু'চারজন মানুষও যদি কোথাও সমবেত হয় সেখানে জুময়া আদায় করা উচিত। আর যদি সামষ্টিকতা ও সংঘবদ্ধতার ওপর বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়, তাহলে ফরয হওয়ার দিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। কেননা এর স্বাভাবিক দাবী এই যে, প্রচুর সংখ্যক লোক যেখানে নেই, সেখানে এর বাধ্যবাধকতা রহিত করা উচিত। মুজতাহিদ ইমামগণ এই সমস্যার সুরাহা করার জন্য উভয় দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ চল্লিশ জনের সমাবেশকে জুময়ার জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন। চল্লিশ জন মানুষ যে গ্রামেই পাওয়া যাবে, সেখানেই জুময়া প্রতিষ্ঠার জন্য তারা নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে তাঁরা এই মর্মেও ফতওয়া দিয়েছেন যে, ঐ গাম থেকে যত দূর পর্যন্ত আযানের শব্দ শোনা যাবে, সেখানকার সকল বয়স্ক ও স্বাধীন পুরুষের জুময়ার নামাযে হাজির হওয়া ফরয।

ইমাম মালিক জুময়ার জাময়াতের জন্য কমপক্ষে ১২জন মুসল্লীর উপস্থিতিকে যথেষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন। কাজেই তাঁর মতানুসারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জনপদেও জুময়া চালু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর জুময়ার নামাযের স্থান থেকে ছয় মাইল পর্যন্ত এলাকার লোকদের জুময়ায় হাজির হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ইমাম আবূ হানিফা (রঃ) উপলব্ধি করলেন যে, এভাবে গ্রামে গ্রামে জুময়ার নামাযের অনুমতি দিলে বিভেদ ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে এবং জুময়ার সমাবেশ দ্বারা শরীয়তের যে অভিপ্রায় তা পূর্ণ হবে না। তিনি এও দেখলেন যে, ইরাক ও সিরিয়া প্রভৃতি দেশে, যেখানে সাহাবা আমলের স্মৃতিচিহ্ন তখনো অমলিন ছিল, গ্রামাঞ্চলে কোথাও মিম্বার বা জুময়া মসজিদের খোঁজ পাওয়া যায় না। সেই সাথে হযরত আলীর (রাঃ) এ উক্তিটাও তার কাছে পৌঁছেছিল যাতে তিনি শুধুমাত্র শহরেই জুময়া কায়েম করা যাবে—এ কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। তিনি এ কথাও শুনেছিলেন যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন আহওয়াযে জুময়া চালু করলেন, তখন ইমাম হাসান বাসরী বলেছিলেনঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْحَجَّاجَ يَتْرُكُ الْجُمُعَةَ فِي الْأَمْصَارِ وَيُقِيْمُهَا فِيْ حَلَاقِيْمِ الْبِلَادِ

"হাজ্জাজের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাৎ, হতভাগা শহরগুলোকে বাদ দিয়ে দেশের আনাচে-কানাচে জুময়া চালু করে বেড়াচ্ছে।" এ সব বিষয় লক্ষ্য করে তিনি ফতওয়া দিলেন যে, প্রত্যেক অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে জুময়ার ব্যবস্থা করা হোক এবং যাদের ওপর জুময়া ফরয, তারা যেন সন্নিহিত

তিন মাইল এলাকা থেকে কেন্দ্রীয় স্থানে সমবেত হয়ে জুমুয়া পড়ে।

হানাফী মতের প্রকৃত তাৎপর্য ও পটভূমি

এবার আমাদের তৎকালীন পরিস্থিতির ওপরও একবার নজর বুলাতে হবে। তখন ছিল ইসলামী শাসনের যুগ। জায়গায় জায়গায় পরগনা ও উপ-শহরে কাজী ও শান্তিরক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত ছিল। তারা বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা ও জুলুম-অনাচারের প্রতিরোধ করতো। বিপুল জনতার সমাগম হলে যেহেতু গোলযোগের আশংকাও থাকে, তাই সমাবেশের জন্য এমন জায়গা নির্ধারণ করাই সঙ্গত ছিল, যেখানে শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান। তাছাড়া শীর্ষস্থানীয় হানাফী ইমামদের যুগে ইরাক, আরব উপদ্বীপ ও পারস্য প্রভৃতি দেশের জনবসতি অত্যন্ত বেশী ও ঘন ছিল।

জনসংখ্যার আধিক্য হেতু গ্রাম ও উপ-শহর একাকার হয়ে গিয়েছিল। সভ্যতারও বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। শিল্প, কারিগরি ও বাণিজ্যের বিকাশ ও বিস্তৃতির ফলে উপ-শহরগুলিও শহরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই "শহরের" নানা রকমের সংজ্ঞা উপরে দেখতে পেলেন। অন্যথায় আসলে কাজী, কোতোয়াল, বাজার, সড়ক কিংবা দশ হাজার ও তিন হাজার অধিবাসীর সাথে জুমুয়ার নামায ফরয হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃত শর্ত হলো "শহর" আর এর সংজ্ঞা নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেক মুজতাহিদ, ফিকাহবিদ নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে শহরের যা যা বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, তাই উল্লেখ করেছেন।

এই সব বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে যদি দেখা হয়, কিসের ভিত্তিতে শহরকে জুমুয়ার শর্ত গণ্য করা হয়েছে, তা হলে বুঝা যাবে যে, "কেন্দ্রীয় স্থান"-ই হলো শহরকে জুমুয়ার শর্ত হিসেবে নির্ধারণের ভিত্তি। কোন অঞ্চলে যে স্থানটি কেন্দ্রীয় স্থানের মর্যাদা রাখে অথবা জুমুয়ার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়, সেটাই জুমুয়ার উপযোগী শহর। আর সেই কেন্দ্রীয় জায়গাটি ছাড়া

আশপাশের জায়গাগুলোতে জুময়া চালু করা নাজায়েয হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, ঐ সব জায়গার অধিবাসীদের ওপর জুময়ার নামায পড়াই ফরয নয়। বরং তার অর্থ এই যে, তাদেরকে জুময়ার নামায পড়ার জন্য ঐ কেন্দ্রীয় স্থানটায় আসতে হবে। যদি তারা শরীয়ত সম্মত ওজর ব্যতিরেকে না আসে, তা হলে তারা গুনাহগার হবে।

এ ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিশারদদের বিভিন্ন বক্তব্য পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, জুময়ার জন্য শহরের শর্ত আরোপ করা এবং গ্রামে জুময়া কায়েম করাকে নাজায়েয বলে ঘোষণা করার মূলে তাদের উদ্দেশ্য আমরা যা বুঝেছি অবিকল তাই ছিল।

আল্লামা ইবনে হুমাম লিখেছেনঃ

ولو مصّر الإمام موضعًا وأمرهم بإقامة الجمعة فيه جاز

"মুসলিম শাসক যদি কোন স্থানকে শহর ঘোষণা করে এবং সেখানে জুময়া কায়েম করার নির্দেশ দেয়, তাহলে জুময়া পড়া জায়েয হবে" (ফাতহুল কাদীর, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০৯)

এখানে শাসককে "শহর ঘোষণা করার" ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কেননা প্রকৃত অর্থে আমীর বা শাসক ছাড়া ইসলামী জীবনযাপন অসম্ভব। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যেখানে দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানদের সামাজিক জীবনে মুসলিম শাসক বা আমীর নেই, সেখানে যদি ইমাম মালিক (রহ)-এর ঘোষিত মূলনীতি অনুসারে মুসলমানদের সমাজ বা সংগঠন পারস্পরিক মতৈক্যের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত অধিক মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত এবং বড় মসজিদ বিশিষ্ট কোন বড় গ্রাম বা ক্ষুদ্র শহরকে জুময়া পড়ার যোগ্য "শহর" বলে ঘোষণা করে, তবে সেটা কি নাযায়েজ হবে?

আল্লামা ইবনে হুমাম আরো বলেনঃ

ومن كان في توابع المصر فحكمه حكم أهل المصر في وجوب
الجمعة عليه بأن يأتي المصر فيصليها فيه واختلفوا فيه

فعن أبي يوسف أنها تجب في ثلاثة فراسخ وقال بعضهم قدره ميل وقيل قدر ميلين وقيل ستة أميال وعن مالك ستة وقيل إن أمكنه أن يحضر الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة وإلا فلا قال في البدائع وهذا أحسن - (فتح القدير - ج١ - ص٤١١)

"শহরের সন্নিহিত এলাকার অধিবাসীর ওপরও শহরবাসীর মতই জুময়া ফরয। তাকে সেখানে গিয়ে নামায পড়তে হবে। সন্নিহিত এলাকার সীমা কত দূর তা নিয়ে ফিকাহবিদগণের মতভেদ রয়েছে। আবু ইউসুফের মতে তিন ক্রোশের সীমার মধ্যে জুময়া বাধ্যতামূলক। কেউ এক মাইল, কেউ দু' মাইল এবং কেউ ছয় মাইলের সীমা নির্ধারণ করেছেন। ইমাম মালিকের মতেও ছয় মাইল। আর একটি মত এই যে, যদি কেউ জুময়ার নামাযে যোগদান করার পর কোন অসুবিধা বা কষ্ট ছাড়াই রাত হওয়ার আগে বাড়ীতে পৌঁছতে পারে, তবে তার ওপর জুময়া পড়া বাধ্যতামূলক। নচেত নয়। বাদায়ে গ্রন্থের লেখক এই মতটাই পছন্দ করেছেন" (ফাতহুল কাদীর, প্রথম খন্ড, পৃঃ৪১১)

শেষোক্ত মতটির পক্ষে কোন কোন হাদীস থেকেও সমর্থন পাওয়া যায়। তিরমিজীতে আবু হোরাইরার (রাঃ) সূত্রে নিম্নের হাদীসটি বর্ণিত হয়েছেঃ

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله -

"রসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাত পর্যন্ত নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতে পারে, তার ওপর জুময়া ফরয।"

বুখারীতে আছেঃ

عن عائشة زوج النبي قالت كان الناس ينتابون الجمعة

من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا۔

"হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, লোকেরা নিজ নিজ বাসস্থান থেকে এবং আওয়ালী থেকে জুময়ার নামাযের জন্য আসতো এবং তাদের শরীরে ধুলা ও ঘামের পরত জমা হয়ে যেত। একবার রসূল (সাঃ) যখন আমার কাছে ছিলেন, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রসূল (সাঃ)-এর কাছে এলো। তিনি বললেন, আজকের দিন তোমরা যদি গোছল করে নিতে তবে ভাল হতো।"

প্রথম হাদীস তো সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় হাদীসে বলা হয়েছে যে, লোকেরা জুময়ার নামায পড়ার জন্য আওয়ালী থেকে আসতো। মদীনার সন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামগুলোকে আওয়ালী বলা হতো। আল্লামা ইবনে হাযার লিখেছেন যে, এ সব গ্রাম মদীনা থেকে চার মাইল এবং আরো বেশী দূরে অবস্থিত ছিল। আর যারা আওয়ালী থেকে উটে চড়ে কিংবা পদব্রজে আসতো, তাদের সেই সব পথ দিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে যেতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যেত। এটা যে সময়কার কথা, তখন বাস, ট্রাক, রেল, সাইকেল ও মোটর সাইকেল ইত্যাদি চলতো না। এমনকি পাকা সড়ক পর্যন্ত ছিল না। সেই যামানায় যখন লোকদেরকে ছয় মাইল দূর থেকে আসতে বলা হয়েছে, তখন আজকাল যখন যাতায়াতের ব্যবস্থা অনেক সহজ হয়ে গেছে, তখন মানুষের পক্ষে ২০ মাইল দূর থেকেও জুময়া পড়তে আসা কঠিন নয়। তথাপি অবস্থার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে মাইলের হিসেবে দূরত্ব নির্ধারণ করা ঠিক নয়, বরং শরীয়তে যে মাপকাঠি দেয়া হয়েছে সেটা মেনে চলাই ভাল। অর্থাৎ জুময়ার পর মাগরিব পর্যন্ত বাড়ীতে পৌছানো সম্ভব হলে কেন্দ্রীয় জায়গায় গিয়ে জুময়া পড়া উচিত, নচেত নিজ গ্রামে বসে জোহরের নামায পড়া চলবে।

প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা দরকার যে, ফিকাহশাস্ত্রকারগণ শহরের যে সব বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছেন, তা অগ্রাহ্য করার মত নয়। কোন গ্রামাঞ্চলের মুসলমানগণ যখন নিজেদের এলাকার কোন কেন্দ্রীয় জায়গাকে জুময়া পড়ার উপযোগী শহর বলে আখ্যায়িত করতে চাইবে, তখন তাদেরকে জায়গা নির্ধারণে নিম্ন লিখিত গুণ বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবেঃ

১. সেখানে মুসলমানদের জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হবে।

২. যথাসম্ভব বেশী লোক সংকুলান হয় এমন বড় আকারের মসজিদ থাকবে।

৩. এমন কোন আলিম সেখানে থাকা চাই যিনি শরীয়তের মাসয়ালা শিক্ষা দিতে পারেন এবং ওয়াজ-নসিহত করার ভাল যোগ্যতা রাখেন।

৪. সেখানে এমন কোন প্রশাসনিক কর্মকর্তা থাকবেন যিনি শান্তি রক্ষার দায়িত্বশীল।

৫. আশপাশের গ্রামের মানুষ নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সেখান থেকে কিনতে পারে।

এ বৈশিষ্ট্যগুলো জুময়ার নামায কায়েম করার শর্ত নয়। তবে জুময়ার জায়গা নির্বাচনে এগুলোকে লক্ষ্য রাখা সঙ্গত ও সমিচিন।

ইতিপূর্বে গ্রামে জুময়ার নামায পড়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি হানাফী মতের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি , সে সম্পর্কে দু'জন সুধী আমাকে কিছু প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। তাদের প্রশ্ন হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

১। "গ্রামে জুময়া সম্পর্কে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, মূল বিধিতে তো যথেষ্ট প্রশস্ততা রয়েছে। হানাফী ইমামগণ ছাড়াও অন্যান্য ইমামদের মতামতও তাই। গ্রামবাসীর ওপর যে জুময়া ফরয নয়, এটা তাদের সুস্পষ্ট অভিমত। এ ব্যাপারে যদি আপনার কোন বিশেষ গবেষণা প্রসূত মতামত থেকে থাকে, তবে সুযোগ মত জানাবেন।"

২। "জুময়া , জুময়ার খুৎবা এবং গ্রামে জুময়া ফরয সম্পর্কে আপনি যে ফতওয়া দিয়েছেন, তা আমার বুঝে আসেনি। বরং আমার মতে আপনার এ ফতোয়া চার মযহাবের কোন মযহাবের সাথে সঙ্গতিশীল নয়। কেননা সকল মযহাবেই জুময়ার জন্য কিছু না কিছু শর্ত রয়েছে। আজকাল যারা কোন মযহাবই মানে না, তাদের মতামত অবশ্য আপনার মতামতের মতই।"

এ প্রসঙ্গে কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে একটা কথা আমি স্পষ্টভাবে বলে দেয়া প্রয়োজন মনে করি। আমি এমন হটকারী লোক নই যে, শরীয়ত সম্মত প্রমাণাদির তোয়াক্কা না করে শরীয়তের কোন ব্যাপারে কেবল নিজের খেয়াল-খুশী অনুসারে একটা মত আকড়ে ধরবো এবং যারা শরীয়তের ব্যাপারে পারদর্শী,তাদের যুক্তি-প্রমাণের জবাব গেয়ার্তুমী দ্বারা দেবো। বরঞ্চ আমি নিজেকে নিছক একজন শিক্ষার্থী মনে করি। বিভিন্ন মাসয়ালা সম্পর্কে সাধ্যমত অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তা কোন কাট-ছাট ছাড়াই ব্যক্ত করি। অকাট্য প্রমান দ্বারা

আমার মত ভুল প্রমাণিত হলে আমি সেই মত প্রত্যাহার করতেও সব সময় প্রস্তুত থাকি। গ্রামে জুমআর নামাযের প্রসঙ্গ তোলার দ্বারা নতুন কোন হাঙ্গামা বাধানো আমার অভিপ্রায় নয়। আসলে সমকালীন পরিস্থিতি দেখে আমি অনুভব করছি যে, বর্তমানে এ বিষয়টি নিয়ে পুংখানুপুংখ অনুসন্ধান চালিয়ে এ সম্পর্কে শরীয়তের প্রকৃত বিধান কি তা অবগত হওয়া খুবই জরুরী। এ জন্য আমি এ ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি মাত্র। যে মহান ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহ শরীয়তের সূক্ষ্ম জ্ঞান দান করেছেন, তারাও বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করুন এবং তাদের গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা আমাকে ও সাধারণ মুসলমানদেরকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দান করুন এটাই আমার কাম্য। তবে যেহেতু প্রসঙ্গটা উত্থাপনের উদ্যোক্তা আমি নিজেই, তাই অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে আমি যা জানতে পেরেছি, সেটা সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা আমার কর্তব্য।

পল্লী অঞ্চলে জুময়ার নমাযের ব্যাপারে ইতিপূবে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা সরাসরি হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও শরীয়তের বিধিসম্মত কেয়াসের ভিত্তিতেই করা হয়েছে। এ জন্য সম্ভবত কেউ কেউ ধারণা করে বসেছেন যে, আমি হানাফী মতের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেই স্বাধীনভাবে ইজতিহাদ তথা চিন্তা-গবেষণা করে (প্রচলিত ভাষায় লামযহাবী হয়ে) মত ব্যক্ত করছি। কাজেই এখন আমি শুধুমাত্র হানাফী মযহাব মতে নিজের যুক্তি পেশ করতে চাই।

আমাদের দৃষ্টিতে চারটি বিষয় সুক্ষ্ম বিচার-বিবেচনার দাবী রাখে এবং এ চারটি প্রশ্নের সমাধানের ওপরই এ বিতর্কের নিষ্পত্তি নির্ভরশীলঃ

১. জুময়া কি ধরনের ফরয?

২. জুময়ার শর্তাবলী কি কি এবং তা কি প্রকারের?

৩. এই সব শর্তের কোন সংশোধন বা রদবদল কি হয়েছে এবং আরো কোন রদবদলের কি অবকাশ আছে?

৪. এই ফরযকে বাস্তবায়িত করার জন্য এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা কি জায়েব আছে, যা হানাফী ফিকাহ- বিদদের ফতওয়া থেকে ভিন্ন হলেও তাদের মূলনীতির পরিপন্থী নয়? আমি চারটি বিষয় নিয়েই ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করবো।

জুময়া কি ধরনের ফরয

সকল মুসলিম আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, জুময়া ফরযে আইন অর্থাৎ প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের ওপর ব্যক্তিগতভাবে ফরয। হানাফী আলিমগণও এ ব্যাপারে পুরোপুরি একমত। আল্লামা সারাখসী স্বীয় গ্রন্থ 'আল মাবসুতে' লিখেছেন যে, "জুময়া কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে ফরয এর ফরয হওয়ার ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত।"

আল্লামা ইবনে হুমাম 'ফাতহুল কাদীর' গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"জুময়া এমন এক ফরয, যা কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে অকাট্যভাবে নির্ধারিত এবং যার প্রত্যাখ্যানকারীর কাফির হওয়া সম্পর্কে সমগ্র উম্মাহ একমত" (প্রথম খন্ড, পৃঃ ৪০৭)।

অতপর ফরয হওয়ার প্রমাণাদি খুবই বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করার পর তিনি বলেনঃ

"জুময়া ফরয হওয়ার ব্যাপারে আমি অত্যন্ত দীর্ঘ আলোচনা করেছি। কারণ শুনেছি কিছু কিছু অজ্ঞ লোক নাকি বলে থাকে যে, হানাফীগন জুময়াকে ফরয মনে করে না। তাদের এ ভুল ধারনাটার সৃষ্টি হয়েছে কুদুরীর এই উক্তি থেকে যে, "যে ব্যক্তি জুময়ার দিন বিনা ওজরে ঘরে বসে জোহরের নামায পড়ে তার নামায শুদ্ধ হবে বটে। তবে এ রূপ করা মাকরূহ।" এ সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আপাতত এটুকু বলে রাখছি যে, এই উক্তিতে মাকরূহ শব্দের অর্থ প্রকৃতপক্ষে হারাম। আর জোহরের নামায শুদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য কি তা আমরা পরে ব্যাখ্যা করবো। যাই হোক, আমাদের হানাফী ফকীহগণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, জুময়া

জোহরের চেয়েও কঠোরভাবে ফরয এবং জুমুয়াকে যে অস্বীকার করে সে কাফির।" (পৃঃ ৪০৮)।

আল্লামা বাবর্তী 'হেদায়া 'গ্রন্থের টীকা "এনায়াতে" লিখেছেনঃ "জুমুয়ার নামায অনুষ্ঠানের খাতিরে আমাদেরকে জোহরের নামায বাদ দেয়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জোহরের নমায যে ফরয সে তো জানা কথা। একটা ফরযকে কেবল তদোধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরযের জন্যই বাদ দেয়া যায়" (প্রথম খন্ড, পৃঃ৪০৮।

এই সব উক্তি থেকে জানা গেল যে, জুমুয়ার নামায আন্দাজ অনুমান ও ইজতিহাদী চিন্তা গবেষণা দ্বারা উদ্ভাবিত ওয়াযিব কাজ নয়। বরং সুস্পষ্ট ও অকাট্য ওহীর নির্দেশাবলীর বলেই এটা ফরয হয়েছে। এটা এমন কঠোর ফরয যে, এর ফরয হওয়া কে অস্বীকার করার দরুন মানুষ কুফরীর দ্বার প্রান্তে পৌছে যায়। এ ধরনের ফরযের দায়- দায়িত্ব থেকে মুসলমানদের কোন শ্রেণীকে অব্যাহতি দেয়ার ব্যাপারে যে সর্বোচ্চ পরিমাণ সতর্কতা ও খোদাভীতির প্রয়োজন, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রথমত, কুরআন ও সুন্নাহর কোন অকাট্য ঘোষণা বলে যে কাজ ফরয় হয়, তা রহিত করতেও কুরআন ও সুন্নাহর অনুরূপ অকাট্য উক্তি প্রয়োজন। কোন মানুষের উক্তি এটাকে রহিত করার মত জোরদার দলীল হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, যদি কোন ইমাম বা ফিকাহবিশারদের কোন উক্তিতে একে রহিত করার স্বপক্ষে কোন ঈশারা ইংগিত পাওয়া যায়, তবে অত্যধিক সতর্কতার সাথে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে যে, বক্তার প্রকৃত বক্তব্য কি? এমনও তো হতে পারে যে, যে সব কারণ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তিনি এ মত অবলম্বন করেছিলেন, তা মূলত ঠিকই ছিল, কিন্তু আমরা সেই কারণ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে শুধুমাত্র তার উক্তির শাব্দিক অনুসরণ করে ভুল করছি।

তাছাড়া একটা ফরয কাজকে কোন বিশেষ পরিস্থিতি ও পরিবেশে ফরয নয় সাব্যস্ত করার ব্যাপারে যতখানি সতর্কতা

অবলম্বন করা প্রয়োজন। তার চেয়ে বহুগুণ বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা চাই ঐ ফরয কাজটিকে নিষিদ্ধ, হারাম ও গুনাহর কাজ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে। কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য ঘোষণা বলে একটি কাজকে ফরয মনে করা এবং তাকে হারাম ও পাপের কাজ মনে করার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। এত বড় ব্যবধান অতিক্রম করতে অত্যন্ত শক্তিমান বাহনের প্রয়োজন। দুর্বল বাহনে আরোহণ করে এ পথে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক।

জুময়ার শর্তাবলী

এবার দেখতে হবে যে, জুময়ার যে শর্তাবলীর অনুপস্থিতিতে ফরয রহিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে তা কি কি এবং কোন কোন ধরনের।

হানাফী মযহাব মতে, জুময়ার শর্তাবলী দুই ধরনের। প্রথমত, যে শর্তাবলী নামাযীর মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত, যে শর্তাবলী পরিস্থিতি ও পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট।

প্রথম ধরনের শর্তাবলী এই যে, নামাযী স্থায়ী বসবাসকারী হবে, প্রবাসী নয়, স্বাধীন হওয়া চাই গোলাম নয়, বয়োপ্রাপ্ত পুরুষ হওয়া চাই, শিশু ও নরী নয়, সুস্থ হওয়া চাই রোগী, প্রতিবন্ধী বা পংগু নয়, (আল মাবসূত, ২য় খন্ড পৃঃ ২২) হানাফী আলিমগনের মতে নিম্নোক্ত হাদীসটি এ সব শর্তের উৎসঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ
الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ اِلَّا مُسَافِرٌ وَمَمْلُوْكٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَاَةٌ
وَمَرِيْضٌ۔

"রসূল (সাঃ) বলেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, তার ওপর জুময়া ফরয। অবশ্য প্রবাসী, গোলাম, শিশু ও বালক, নারী ও রুগ্ন ব্যক্তি এর আওতা বহির্ভূত।"

প্রবাসী, গোলাম,নারী,শিশু ও রুগ্নদের ক্ষেত্রে এই যে নমনীয়তা দেখানো হয়েছে, এর অর্থ শুধু এতটুকুই যে, তারা যদি

জুমায়ায় উপস্থিত না হয়,তবে কোন আপত্তি নেই। এর এরূপ অর্থ কেউ গ্রহণ করেনি যে, তাদের জন্য জুময়ার নামায নিষিদ্ধ। এমন কথাও কেউ বলেনি যে,তারা যদি জুময়ায় হাজির হয় তা হলে জোহর ত্যাগ করার দায়ে দোষী ও পাপী সাব্যস্ত হবে। স্বয়ং রসূল (সাঃ) এর আমলে মহিলারা জুময়ার নামাযে হাজির হতো। গোলামও অংশ গ্রহণ করতো। হাত ধরে পৌছে দেয়ার লোক পাওয়া গেলে অন্ধরাও ঘরে বসে থাকতো না। তাদের কাউকে রসূল (সাঃ). এ কথা বলেননি যে, তোমাদের ওপর জুময়ার ফরয রহিত হয়েছে। জুময়ার বদলে তোমাদের জোহর পড়া উচিত। নচেত জোহর ত্যাগ করার জন্য গুনাহগার হতে হবে।

আল্লামা সারাখসী বলেনঃ

"এ সব হলো বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্ত, শুদ্ধ হওয়ার শর্ত নয়। প্রবাসী ,গোলাম,মহিলা ও রোগী যদি জুময়ায় যোগদান করে ,তবে সেটা জায়েয হবে। হযরত হাসান (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মহিলারা রসূল (সাঃ) এর সাথে জুময়া পড়তো এবং তাদেরকে বলা হতো যে, সুগন্ধী লাগিয়ে এসো না। তাদের ওপর ফরয রহিত হওয়ার কারণ এটা নয় যে, নামাযের মধ্যে তাদের জন্য কোন বাধা আছে। বরং শুধু তাদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তারা যদি এ কষ্ট বরদাশত করে নিতে রাজী হয় তবে নামায আদায় করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে ও অন্যদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।" (আল মাবসুত,২য় খন্ড পৃঃ ২৩)।

দ্বিতীয় প্রকারের শর্তাবলীকে আদায়ের শর্ত বা শুদ্ধ হওয়ার শর্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ এগুলো না হলে জুময়াই শুদ্ধ বা জায়েয হবে না। এ ধরনের শর্ত ছয়টি। যথাঃ শহর ,সময়, খুতবা, জামায়াত,শাসক,অবাধ প্রবেশাধিকার। এগুলোর মধ্য থেকে প্রথম শর্ত অর্থাৎ শহর এখানে আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা করার আগে জানা দরকার যে, এই শর্তগুলোর মান কি রকম?

এগুলোর মধ্যে কয়েকটা শর্ত এমন রয়েছে,যা অকাট্য উক্তি ও সর্বজনবিদিত বাস্তব কর্মকান্ড দ্বারা প্রমাণিত। যেমন সময়,জুময়ার সময় যে জোহরেরই সময় তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। অনুরূপভাবে খুতবাও যে জুময়া শুদ্ধ হওয়ার শর্ত, তা সর্ববাদীসম্মত। কেননা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো খুতবা ছাড়া জুমযার নামায পড়েননি। তাছাড়া কুরআনেও এর স্বপক্ষে ইংগিত বিদ্যমান। জামায়াত যে জুময়ার শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত, তা তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত। মতভেদ যেটুকু হয়েছে, জামায়াতের আকার ও পরিমাণ নিয়েই হয়েছে। অবাধ প্রবেশাধিকারও রসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কিরাম ও ইমামগণের অব্যাহত কার্য্যধারা থেকে প্রমাণিত। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ শরীয়ত সম্মত জনস্বার্থ এবং জনকল্যাণও এর দাবী জানায়।

কেবল মাত্র শহর ও শাসক সংক্রান্ত শর্ত দুটো এমন, যার কোন উৎস কুরআন ও সুন্নাহর কোন সুস্পষ্ট উক্তিতে পাওয়া যায়না। প্রধানত ইমামদের চিন্তা-গবেষণা ও ইজতিহাদ মূলক বিচার-বিবেচনা থেকেই এ দুটির উদ্ভব । এ জন্য এ দুটোকে জুময়ার বিশুদ্ধতার শর্ত গণ্য করাতে মতভেদ দেখা দিয়েছে।

নিম্নের হাদীসটি থেকে শাসক সংক্রান্ত শর্তের আভাস পাওয়া যায়ঃ

..... فَمَنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا وَاسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا وَلَهُ إِمَامٌ جَائِرٌ

أَوْ عَادِلٌ فَلَا جَمَعَ اللّٰهُ شَمْلَهُ أَلَا فَلَا صَلَاةَ لَهُ أَلَا فَلَا صَوْمَ لَهُ-

إِلَّا أَنْ يَتُوبَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ-

"যে ব্যক্তি জুময়াকে একটা নগন্য জিনিস মনে করে এবং এর দাবীকে গুরুত্বহীন ভেবে ত্যাগ করে এবং সে কোন জালিম বা ন্যায়বিচারক শাসকের শাসনাধীন থাকে। তবে আল্লাহ যেন কখনো তাকে বিশৃংখলা থেকে উদ্ধার না করেন, জেনে রেখো, তার নামাযও হবে না, রোযাও হবে না, যতক্ষণ সে তওবা না করে। তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন।

ইবনে আবি শায়বা কর্তৃক ইমাম হাসান বসরীর নিম্নের উক্তি থেকেও এ শর্তের সমর্থন পাওয়া যায়ঃ

أَرْبَعٌ إِلَى السُّلْطَانِ مِنْهَا إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ- "চারটা জিনিস শাসকের সাথে সংশ্লিষ্ট, তন্মধ্যে জুময়া এবং দুই ঈদও রয়েছে।"

কিন্তু উপরোক্ত হাদীস এবং ইমাম হাসান বসরীর এ উক্তি এ দুটোর কোনটাই এই মর্মে প্রত্যক্ষ ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য দেয়না যে, শাসক ছাড়া জুময়া চালু করা জায়েজই হবে না। হাদীস থেকে তো শুধু এটুকুই প্রতীয়মান হয় যে, যেখানে ইসলামী সামাজিক অবকাঠামো বহাল আছে, সেখানে জুময়া ত্যাগ করা আরো মারাত্মক গুনাহর কাজ। ব্যাপারটা ঠিক এ ধরনের, যেমন কেউ বললো যে, যে ব্যক্তি মসজিদে চুরি করে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। এর অর্থ এই নয় যে, বক্তা চুরিকে কেবল মসজিদে সংঘটিত হলেই হারাম মনে করে। বরং সে মসজিদে চুরি করাকে আরো জঘন্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করছে। ঠিক অনুরূপভাবে রসূল (সাঃ) মুসলিম শাসকের বর্তমানে বা অন্য কথায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বহাল থাকা অবস্থায় জুময়া ত্যাগ করাকে আরো ধিক্কারজনক ও নিন্দনীয় ব্যাপার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ জন্যই যে সব হাদীসে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে জুময়াকে ফরয বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে শাসকের উল্লেখ দেখা যায় না। আর অন্যান্য হাদীসে জুময়া তরককারীকে যে ভাবে ধিক্কার দেয়া হয়েছে, এ হাদীসে তার চেয়েও বেশী ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছে। অনুরূপবাবে ইবনে আবি শায়রা হাসান বসরীর যে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে এ কথা বুঝা যায় না যে, জুময়ার জন্য শাসকের উপস্থিতি একটা জরুরী পূর্বশর্ত। ঐ উক্তিতে শুধু এ কথাই বলা হয়েছে যে, জুময়া ও ঈদসহ চারটা জিনিসের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব শাসকের ওপর ন্যস্ত। এ কথা থেকে কি ভাবে বুঝা যায় যে, শাসক না থাকলে এ কাজটাই বন্ধ থাকবে। কেউ যদি বলে যে, মেয়ের বিয়ে দেয়া পিতার দায়িত্ব তা হলে তার এ অর্থ হয় না যে, বাপ না থাকলে মেয়ে চিরকাল ঘরে বসে থাকবে।

এখন আসা যাক শহরের শর্ত প্রসঙ্গে । এ শর্তের উৎস হলো নিম্নের হাদীসঃ

لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيْقَ إِلَّا فِيْ مِصْرٍ جَامِعٍ

"জুমুয়া ও ঈদের নামাযকে কেন্দ্রীয় শহরে ছাড়া পড়া যাবে না।" [১] হযরত আলী (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত উক্তিও এ শর্তের ভিত্তি হিসেবে গণ্যঃ

لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيْقَ وَلَا فِطْرَ وَلَا اَضْحٰى اِلَّا فِيْ مِصْرٍ جَامِعٍ۔

"জুমুয়া, তকবীরে তাশরিক, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা কেন্দ্রীয় শহর ছাড়া কোথাও পড়া চলবে না।"

কিন্তু ''কেন্দ্রীয় শহর'' এর কোন সংজ্ঞা কুরআনের কোন আয়াত বা হাদীস থেকে সংগৃহীত হয়নি। আমি যথাসাধ্য অনুসন্ধান চালিয়েছি। কিন্তু শহরের সীমা বা সংজ্ঞাকি .তা আমি এ যাবত রসূল(সাঃ) বা সাহাবিদের কোন উক্তি থেকে খুঁজে পাইনি। হানাফী ফকীহগণের কিতাবে শহরের যে সব সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, তার সূত্র বা উৎস হিসেবে কোন হাদীস বা কোন সাহাবির উক্তির বরাত দেয়া হয়নি।

শহর ও শাসক সংক্রান্ত শর্ত দুটোর এই হচ্ছে অবস্থা। এ জন্যেই এ দুটোকে জুমুয়ার শুদ্ধ হওয়া বা জায়েব হওয়ার শর্ত বলে গণ্য করা চলে কিনা,তা নিয়ে মতভেদের অবকাশ রয়েছে এবং মতভেদ হয়েছেও। স্বয়ং হানাফী আলিমগণ সময় সময় এ সব শর্তের রদবদল ঘটিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, শরীয়তের মৌল বিধিসমূহের আলোকে পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুসারে এ সব শর্তের আরো পরিবর্তন ও সংশোধনের অবকাশ হানাফী মযহাবে রয়েছে।

---

১. উল্লেখ্য যে, এ হাদীস হযরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম আহমদের মতে এ হাদীসের সূত্র দুর্বল। (নাইলুল আওতার তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১৯৮)।

পরিবর্তনযোগ্য শর্তাবলী

প্রথমে শাসকের শর্তটাই ধরুন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তো শুরুতেই এটাকে জুময়ার শর্ত হিসেবে মানতে অস্বীকার করেছিলেন। হানাফী ফকীহগণও পরবর্তীকালে এ শর্ত বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন। ইসলামী বিধান সম্পর্কে কিছুমাত্র দায়িত্ববোধ সম্পন্ন রাজা বা শাসক যতদিন শাসন ক্ষমতায় আসীন ছিল ,ততদিন তো হানাফী আলিমগণ নির্দ্বিধায় এ ফতওয়া দিয়েছেন যে,"শাসকের সিদ্ধান্তের ওপর জুময়া কায়েম করা নির্ভরশীল। শাসকের অবর্তমানে জুময়া পড়া জায়েয নয়। কিন্তু যখন ইসলামের প্রতি উদাসীন ও অবহেলাপ্রবণ শাসক ও রাজাদের যুগ এলো, তখন ফকীহগণ অনুভব করলেন যে, শাসকের শর্ত আরোপের ফলে ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজ পার্থিব শাসকদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এমনকি তারা যদি না চায় তবে ফরযটা বাদ পড়ে যাওয়ারই উপক্রম হয়। এ জন্যে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে,শাসকরা যদি শৈথিল্য দেখায়,তা হলে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে জুময়া কায়েম করা হোক। এর পর এমন যুগও এলো যখন মুসলিম দেশগুলো অমুসলিমদের দখলে চলে যেতে লাগলো এবং বিরাট বিরাট মুসলিম জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল মুসলিম শাসন থেকে একেবারেই বঞ্চিত হয়ে গেল। তখন ফকীহগণ নিম্নরূপ ফতওয়া দিতে বাধ্য হলেনঃ

وَأَمَّا فِي بِلَادٍ عَلَيْهَا وُلَاةٌ كُفَّارٌ فَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ
وَالْأَعْيَادِ وَيَصِيرُ الْقَاضِي قَاضِيًا بِتَرَاضِي الْمُسْلِمِينَ وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ
طَلَبُ وَالٍ مُسْلِمٍ. (شامى)

"যে সব দেশে কাফির শাসকদের শাসন চালু হয়েছে, সেখানে মুসলমানদের পক্ষে আপন সম্মিলিত উদ্যোগে জুময়া ও ঈদের নামায কায়েম করা জায়েয হবে এবং সেখানে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে বিচারক নিয়োজিত হবে, সে বৈধ বিচারক হিসেবে গণ্য হবে। এক

জন মুসলিম প্রশাসক নিয়োগের দাবী জানানো তাদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। "(ফতওয়ায়ে শামী)।

এভাবে যে শর্ত এক সময় জুমায়ার বৈধতায় শর্ত ছিল, তা এখন জুময়া বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্ত হিসেবেও বহাল রইল না। আরো সুক্ষ্মতম তদন্তে জানা গেল যে, মুসলিম শাসকের বিদ্যমানতা আদৌ জুময়ার কোন শর্ত নয়।

নবী ও মুজতাহিদের মধ্যে যে কি পার্থক্য, তা এখানেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নবীর প্রজ্ঞা সরাসরি আল্লাহর জ্ঞান থেকে উৎসারিত। তাই তিনি যে বিধি নির্দেশ জারি করেন তা সর্বকালের ও সর্বাবস্থার উপযোগী প্রমানিত হয়। কিন্তু মুজতাহিদ যত বিচক্ষণ ও পারদর্শী হোক না কেন, স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে পারে না। সকল যুগ এবং সকল পরীস্থিতি ও পরিবেশের ওপর তার দৃষ্টি ব্যাপ্ত হতে পারেনা বলেই তার ইজতিহাদ প্রসূত সিদ্ধান্ত সকল যুগ ও পরিবেশের উপযোগী ও অনুকূল হতে সক্ষম হয় না।

আল্লাহ যাদেরকে ইসলামের সুক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান এবং নিপুণ দক্ষতা ও পারদর্শিতার নেয়ামতে ভূষিত করেছিলেন, তারা হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর পরেও এ নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করতেন। তাই তারা পরিস্থিতি ও পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের ফিকাহ বিষয়ক খুঁটিনাটি বিধিতে যথোপযুক্ত সংশোধন করে নিতেন। তাদের সেই সব পরিবর্তন ও সংশোধন ইজতিহাদ প্রসূত হলেও তা তাদের অনুসৃত মাযহাবেরই একটা অংশে পরিণত হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, পতন যুগের লোকেরা ইমামের উক্তিকে আল্লাহ ও রসূলের (সাঃ) উক্তির মত অপরিবর্তনীয় ও অকাট্য মনে করা শুরু করেছে এবং তারা মুজতাহিদের কোন উক্তির ভিত্তিতে প্রণীত ফতওয়ার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোন পরিবর্তন সাধন করাকে গুনাহর কাজ বলে ধরে নিয়েছে, চাই তাতে আল্লাহ ও রসূলের (সাঃ) কোন সুস্পষ্ট নির্দেশও যদি লংঘিত হয়। এ ধরনেরই কিছু সংখ্যক স্থবির মস্তিষ্কের ফিকাহবিদ ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ফতওয়া দিতে আরম্ভ করে যে, এখন এখানে জুময়ার নামায পড়া যায়েয নেই। কেননা ইসলামী শাসনের

অবসান ঘটার কারণে জুময়া প্রতিষ্ঠার একটা শর্ত উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তখন ভারতে এমন আলিমরাও বর্তমান ছিলেন, যাদেরকে আল্লাহ সত্যের জ্ঞান দিয়েছিলেন। তারা কঠোরভাবে এ মতের বিরোধিতা করেন। এমনকি মওলানা আব্দুল হাই ফিরিঙ্গী মহল্লী অধিকতর তীব্র ভাষা ব্যবহার করে এত দূর বলেনঃ

أَنَّهُ لَاشَكَّ فِي وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَصِحَّةِ أَدَائِهَا فِي بِلَادِ الْهِنْدِ
الَّتِي غَلَبَتْ عَلَيْهِ النَّصَارٰى وَجَعَلُوا عَلَيْهَا وُلَاةً كُفَّارًا
وَذَالِكَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَرَاضِيْهِمْ وَمَنْ أَفْتٰى بِسُقُوطِ
الْجُمُعَةِ بِفَقْدِ شَرْطِ السُّلْطَانِ فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ-

"ভারতের যে সব অঞ্চলের ওপর খৃস্টানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারা অমুসলিম প্রশাসক নিয়োগ করেছে, সেখানে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্মতি ও মতৈক্যক্রমে জুময়া প্রতিষ্ঠা করা নিসন্দেহে বৈধ এবং অবশ্য করণীয়। যে ব্যক্তি জুময়া রহিত হয়ে গেছে বলে ফতওয়া দেয়, সে নিজেও পথভ্রষ্ট হয়, অন্যকেও বিপথগামী করে।"

বস্তুত এ শুভ বুদ্ধির কল্যাণেই আজ ভারতের হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা, আলিম ও সাধারণ মানুষ সকলেই জুময়ার নামায আদায় করছে।[১] অথচ 'হিদায়া' গ্রন্থে এখনো এ উক্তি পড়া ও পড়ানো হয় যে,

لَا يَجُوْزُ إِقَامَتُهَا إِلَّا بِالسُّلْطَانِ أَوْ لِمَنْ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ

"শাসক অথবা তার আদিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া জুময়া কায়েম করা জায়েয নেই।" বস্তুত পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক মুজতাহিদদের উদ্ভাবিত বিধিতে আংশিক রদবদল ও সংশোধন করা যদি

---

১. এ কথা অনস্বীকার্য যে, সে সময় যদি এই ভ্রান্ত মতটি চালু হয়ে যাওয়ার সুযোগ পেত, তা হলে এ দেশে যে কখনো জুময়ার নামায হতো সে কথা নিছক কিংবদন্তির আকারেই বিদ্যমান থাকতো এবং আমরা কেবল মুরুব্বীদের মুখেই তা শুনতাম।

মাযহাব অমান্য করার শামিল হয় তবে মাযহাব লংঘনের এ কাজে ভারতের হানাফী আলিমগণ অনেক আগেই লিপ্ত হয়েছেন।

শহরের শর্ত

শাসক সংক্রান্ত শর্তের মত শহর সংক্রান্ত শর্তও ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক অগ্রাহ্য করেছেন। অরণ্যে, শিবিরে ও অস্থায়ী বাসস্থানে জুময়া কায়েম করা যে জায়েব নয়, সেটা তো সর্ববাদী সম্মত ব্যাপার। তাছাড়া জুময়ার জন্য এক ধরনের সভ্য জনপদ হওয়া যে জরুরী, তা নিয়েও মতভেদ নেই। তবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, জুময়া কায়েম করতে হলে কত বড় জনবসতি প্রয়োজন। ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, যে জায়গায় কম পক্ষে ৪০ জন মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করে (অর্থাৎ তারা শীত-গ্রীষ্ম বা অন্য কোন পরিবেশগত পরিবর্তনে স্থান ত্যাগ করতে অভ্যস্ত না হয়) সেটা জুময়া কায়েম করার উপযোগী। ইমাম মালিকের মতে ৪০ জনের চেয়ে কম লোকের বসতিতেও জুময়া হতে পারে। কিন্তু হানাফীদের মত এই যে, জুময়া কায়েম করার জন্য কেন্দ্রীয় বা জনাকীর্ণ শহর প্রয়োজন।

সন্দেহ নেই যে, "মিসরে জামে" (জনাকীর্ণ শহর বা কেন্দ্রীয় শহর) শব্দটা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে, এর কোন সংজ্ঞা ঐ হাদীসেও দেয়া হয়নি, অন্য কোন রেওয়ায়েতেও নয়। এ জন্য এ ক্ষেত্রে 'ইজতিহাদ' তথা স্বাধীন চিন্তা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগের অবকাশ রয়েছে। ইজতিহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে। এমনকি একই ইমাম বিভিন্ন সময়ে এর বিবিধ সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) থেকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছেঃ

১. যেখানে শাসক ও বিচারক ইসলামী আইন বাস্তবায়িত করে এবং শরীয়ত নির্ধারিত দন্ডবিধি চালু ও প্রয়োগ করে। অবিকল

এ ধরনেরই একটা উক্তি ইমাম আবু হানিফা থেকেও বর্ণিত আছে। কারখী প্রমুখ ফকীহবৃন্দ এই মতই অবলম্বন করেছেন।

২. যেখানকার অধিবাসীরা (অর্থাৎ যাদের ওপর জুময়া ফরয) সকলে যদি সেখানকার বৃহত্তম মসজিদে সমবেত হয়, তবে স্থান সংকুলান হয় না এবং আর একটা মসজিদ বানানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইবনে শুজা এ মতটি পছন্দ করেছেন। আবূ আব্দুল্লা সালজীও এ মতের সমর্থক।

৩. যেখানকার জনসংখ্যা দশ হাজারের কম নয়।

এ তিনটি সংজ্ঞা যে পরস্পর থেকে ভিন্ন তা বলাই নিষ্প্রয়োজন এবং একই ইমাম বিভিন্ন সময়ে এগুলোকে গ্রহণ করেছেন। আবার পরবর্তী ফিকাহবিদগণের কেউ কেউ নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী এর কোনটা গ্রহণ এবং কোনটা বর্জন করেছেন। অথচ তারা পুরোপুরি স্বাধীন মুজতাহিদ ছিলেন না।

ইমাম আবূ হানিফার একটা মততো উপরে বর্ণিত হলো। তার দ্বিতীয় মত এই যে–

"যেখানে একাধিক সড়ক, বাজার ও মহল্লা আছে, অত্যাচারের প্রতিকার করার কাজে নিয়োজিত শাসক আছে, এবং শরীয়তের ব্যাপারে প্রশ্নের জবাব দিতে পারে এমন আলিম আছে, সেটাই জুময়ার যোগ্য কেন্দ্রীয় শহর" (ফাতহুল কাদীর ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০৯, ৪১১)।

এভাবে ইমাম আযম আবূ হানিফা (রহঃ) দুবার এবং ইমাম আবু ইউসুফ তিনবার শহরের সংজ্ঞা সংশোধন করেছেন।

এর পর বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা দিতে থাকেন এবং সংজ্ঞা দেয়ার ধারা চলতে থাকে।

যেমন আল্লামা সারাখসী লিখেছেনঃ

"আমাদের কোন কোন মাশায়েখ (নাম উল্লেখ না করে) বলেছেন যে, যেখানে সকল পেশার লোক নিজ নিজ কাজ দ্বারা

জীবিকা উপার্জন করতে পারে এবং এ জন্য সেখান থেকে বাইরে যাওয়ার দরকার হয় না (আল মাবসূত, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৪)।

'বারবজান্দী 'কানজুল ইবাদ' গ্রন্থ থেকে আর একটা সংজ্ঞা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, কোন ফিকাহ্‌বিদের মতে "যে জনপদে প্রতিদিন একজন শিশু জন্মে ও একজন মারা যায় সেটাই জুময়ার যোগ্য শহর।"

'কানজুল ইবাদে' একজন অজানা ফিকাহ্‌বিদের বরাত দিয়ে আর একটি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে যে, "যে জনপদের আদম শুমারী করা অত্যন্ত কষ্ট সাপেক্ষ, সেটাই শহর।" এ ধরনের আরো বহু সংজ্ঞা দেয়ার পালা প্রায় প্রত্যেক যুগেই অব্যাহত ছিল। এমনকি আমাদের অতি নিকট যুগেও বিভিন্ন আলিম বিভিন্ন রকমের সংজ্ঞা দিয়েছেন। এ ধরনের সংজ্ঞার সংখ্যা ডজন ছাড়িয়ে যাবে। সুতরাং শহরের সংজ্ঞার ব্যাপারে খোদ হানাফী ফকীহ্‌গণের মধ্যেও যে মতভেদ রয়েছে, তা সুস্পষ্ট। এক কথায় বলা যায় যে, 'শহর' কোন সুনির্দিষ্ট জিনিসের নাম নয়। এখন যদি তার কোন নতুন সংজ্ঞা দেয়া হয়, তাহলে হানাফী মাযহাবচ্যুত হয়ে না-মযহাবী হয়ে যাওয়ার আশংকা নেই। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, হানাফী মূলনীতির আলোকেই যদি শহরের এমন কোন সংজ্ঞা নতুন করে নির্ধারণ করা হয়, যাতে জুময়ার ফরয রহিত করার চাইতে তা আদায় করার পথই সুগম হয়, তবে তা পরহেজগার লোকদের কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা।

শেষ প্রশ্ন

এবার আমি সর্বশেষ প্রশ্নের প্রতি মনোনিবেশ করছি। এ প্রশ্নের ওপরই পুরো সমস্যাটার নিষ্পত্তি নির্ভর করছে। প্রশ্নকর্তার নিজের ভাষায় প্রশ্নটির পুনরুল্লেখ করছিঃ

"জুময়ার ফরয আদায় করার জন্য এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা কি জায়েয, যা হানাফী ফকীহ্‌গণের ফতওয়ার সাথে সামঞ্জস্যশীল না হলেও তাদের মূলনীতির পরিপন্থী নয়?"

আমার উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এরূপ করা জায়েয। শাসক সংক্রান্ত শর্ত সম্পূর্ণ বিলোপ করে এবং শহরের সংজ্ঞায় ক্রমাগত রদবদল ঘটিয়েও যদি কেউ হানাফী মাযহাব থেকে বহিষ্কৃত না হয়, তা হলে এ মাযহাবের মূল নীতির সাথে সংগতি রক্ষা করে জুমুয়ার ফরয আদায় করার যোগ্য কোন ব্যবস্থা উদ্ভাবনের অবকাশ এ মাযহাবের ভেতরে থাকবে না এমন কোন কারণ নেই। সুতরাং এখন আমার ওপর শুধু এটুকু প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তায় যে, যে ব্যবস্থার আমি প্রস্তাব করছি তা হানাফী মাযহাবের মূলনীতির অনুসারী।

শরীয়তের জুময়া সংক্রান্ত বিধিসমূহ নিয়ে আমি যতদূর চিন্তা গবেষণা চালিয়েছি তাতে শরীয়তের অভিপ্রায় আমার কাছে এটাই মনে হয় যে, জুময়ার নামাযকে বিক্ষিপ্তভাবে ছোট ছোট জনপদে আলাদা আলাদা আদায় করা শরিয়তের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক নয়। এজন্য শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে যে, জুময়াকে 'কেন্দ্রীয় শহরে' আদায় করা হোক। 'কেন্দ্রীয় শহর' শব্দটাই ইংগিত দিচ্ছে যে, এর দ্বারা এমন জনপদকে বুঝায়, যা ছোট ছোট জামায়াতকে একত্রিত করে বা সকল জামায়াতের সমন্বয়ে এক বিশাল জামায়াত গঠন করে। অর্থাৎ যেখানে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের লোকেরা সমবেত হয়ে জুময়া আদায় করে। এ ব্যাপারে দোকান, বাজার, জনসংখ্যা এবং এ ধরনের অন্যান্য ব্যাপারের সাথে শহরের কেন্দ্রিকতার কোন সম্পর্ক নেই। জুময়া কায়েম করার সাথেও শহরের এই সব অংশ–যথা বাজার, দোকানপাট ইত্যাদির কোন যোগাযোগ নেই। জুময়ার নামায এমন কোন জিনিস নয় যে, তা শুদ্ধ হওয়ার জন্য বাজার কিংবা স্বল্পসংখ্যক দোকানপাটের প্রয়োজন। তার জন্য কেবল এমন একটি জনপদ প্রয়োজন, যা কেন্দ্রীয় মর্যাদা সম্পন্ন, যাতে আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলমানরা সেখানে জমায়েত হতে পারে। যদি তেমন কোন বড় শহর থেকে থাকে, নাগরিক সুবিধাদির প্রাচুর্যের কারণে আপনা থেকেই এলাকার প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়ে আছে, তাহলে খুবই ভাল কথা। নচেত শাসন কর্তৃপক্ষ যে জনপদকে উপযুক্ত মনে করে, 'কেন্দ্রীয় শহর' ঘোষণা করে জনগণকে

সেখানে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিতে পারে। আল্লামা ইবনে হুমাম ফাতহুল কাদীরে লিখেছেনঃ

وَلَوْ مَصَّرَ الْإِمَامُ مَوْضِعًا وَأَمَرَهُمْ بِالْإِقَامَةِ فِيهِ جَازَ وَلَوْ مَنَعَ أَهْلَ مِصْرٍ أَنْ يَجْمَعُوا لَمْ يَجْمَعُوا -

"যদি শাসক কোন স্থানকে শহর বলে ঘোষণা করে এবং জনগণকে সেখানে জুমুয়া কায়েম করার নির্দেশ দেয় তবে সেখানে জুমুয়ার নামায জায়েয। আর যদি কোন জায়গার অধিবাসীদেরকে নিষেধ করে তবে তাদের জুমুয়া কায়েম করা উচিত নয়" (প্রথম খন্ড, পৃঃ ৪০৯)।

কিন্তু যদি শাসক না থাকে, তা হলে যেমন জনগণের পারস্পরিক সম্মতিতে জুমুয়া কায়েম করা যায়, যেমন তাদের পারস্পরিক সম্মতিতে বিচারক নিয়োগ করা যায়, ঠিক তেমনিভাবে তাদের পারস্পরিক সম্মতি শাসকের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কোন জনপদকে কেন্দ্রীয় শহর বলে আখ্যায়িত করতে পারে। আমি বুঝিনা, এতে কুরআন ও হাদীসের কোন উক্তি বাধা দেয় এবং এ কাজ কোন্ মূলনীতির বিরুদ্ধে যায়।

কেন্দ্রীয় শহরের শর্ত আরোপ করা দ্বারা শরীয়তের অভিপ্রায় শুধু এই ছিল যে, গ্রামের লোকেরা জুমুয়ার ফরয বিচ্ছিন্নভাবে আদায় না করে একটা কেন্দ্রীয় জায়গায় সমবেত হয়ে আদায় করুক। কিন্তু কিভাবে যে এ শর্তের অর্থ একেবারেই উল্টে দেয়া হলো তা কেউ জানে না। গ্রামের মানুষকে জুমুয়ার সমাবেশে যোগ দেয়ার পরিবর্তে তাদেরকে জুমুয়ার ফরয থেকেই অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। সম্ভবত এর কারণ এই যে, "শহর" শব্দটার অর্থ আলিমরা প্রচলিত নগর বা শহরই মনে করেছেন এবং হাদীসটির মর্ম এরূপ বুঝেছেন যে, জুমুয়া শুধু শহর নগরেই পড়া চলে। আর যেহেতু শহর অনেক দূরে অবস্থিত হয়ে থাকে এবং দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে সেখানে যেতে হলে মানুষ মুসাফিরের সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হয়ে যায়, যার ওপর জুমুয়া সুস্পষ্ট হাদীস অনুসারেই ফরয নয়, তাই ব্যাপারটা এত দূর এসে গড়িয়েছে যে, শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকা ছাড়া প্রত্যন্ত

গ্রামাঞ্চলের লোকদের ওপর জুমায়াই ফরয নয়। অথচ কুরআন, বিশুদ্ধ হাদীস, রসূল (সাঃ)–এর বাস্তব দৃষ্টান্ত এবং মুসলিম জাতির সর্ববাদী সম্মত রায় অনুসারে যে কাজ মুসলমানদের জন্য ফরয, তাকে গ্রামের কোটি কোটি মুসলমানের ওপর রহিত করা–তাও একটা দুর্বল, বিতর্কিত ও অস্পষ্ট হাদীসের ভিত্তিতে–কোন মতেই সতর্ক সিদ্ধান্ত নয়। হাদীসে তো জুমআ কায়েম করার জন্য কেবল 'মিসরে জামের' (যার অনুবাদ 'জনাকীর্ণ শহর' কেন্দ্রীয় জনপদ ইত্যাদি হতে পারে) শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আদম শুমারীর একটা বিশেষ পরিমাণ, কিংবা দোকানসমূহের এক নির্দিষ্ট সংখ্যা ইত্যাদির কোন উল্লেখ তাতে করা হয়নি। সুতরাং এসব জিনিস মূলত জুমআ কায়েম করার শর্ত নয়। আলিমগণ 'মিসরে জামে' শব্দ দ্বারা যে মর্ম গ্রহণ করেছেন, তার ভিত্তিতেই এগুলো শর্তের রূপ পরিগ্রহ করেছে। অন্য কথায় বলা যায়, স্বয়ং কুরআন বা হাদীস গ্রামের মুসলমানদেরকে জুমআর ফরয থেকে অব্যাহতি দেয়নি, অব্যাহতি দিয়েছে হাদীসের গৃহীত অর্থ। সংশ্লিষ্ট হাদীসের এই অর্থ ছাড়া আর কোন অর্থ গ্রহণের যদি অবকাশ না থাকতো অথবা তার শব্দ সুস্পষ্ট অর্থবোধক হতো, তা হলে অবশ্যই তার ভিত্তিতে ফরযকে রহিত করা সঙ্গত হতো। কিন্তু তার ভিন্ন অর্থের অবকাশ যখন রয়েছে, তখন আমার মতে সতর্কতা ও খোদাভীতির দাবী এই যে, যে অর্থ গ্রহণ করলে ফরয রহিত করার অজুহাত খুঁজে পাওয়া যায়, সে অর্থের চাইতে যে অর্থ গ্রহণ করলে ফরয কায়েম করার পথ উন্মুক্ত হয়, সেই অর্থই অগ্রগণ্য হওয়া উচিত।

শহরের যে সংজ্ঞা আমি দিয়েছি, তা গ্রহণ করলে শুধু গ্রামের মুসলমানদের জন্য নয়, যাযাবর মুসলমানদের জন্যও খাঁটি শরীয়ত সম্মত পন্থায় জুমআ আদায় করা সম্ভব পর হয়। এর কার্যকর পন্থা এই যে, গ্রামাঞ্চলকে ছোট ছোট উপ–অঞ্চলে বিভক্ত করতে হবে, যার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের দূরত্ব ৪/৫ মাইল থেকে নিয়ে ৮/৯ মাইল পর্যন্ত হবে। এই সব উপ অঞ্চলের মধ্য থেকে একটা কেন্দ্রীয় জায়গাকে মুসলিম অধিবাসীদের সম্মতিক্রমে

'মিসরে জামে' তথা, 'কেন্দ্রীয় জনপদ' হিসেবে ঘোষণা করা হবে। অতঃপর আশপাশের গ্রামগুলোকে উক্ত কেন্দ্রীয় জনপদের আওতাধীন বা সন্নিহিত অঞ্চল রূপে আখ্যায়িত করে তথাকার মুসলিম জনগণকে ঐ কেন্দ্রীয় জায়গায় এসে জুময়ার নামায পড়তে নির্দেশ দেয়া হবে। এ ব্যবস্থা শুধু যে সহীহ হাদীসের মর্ম অনুসারেই সঠিক হবে তা নয়, বরং হানাফী ফকীহগণের বিভিন্ন মতামতের আলোকেও যথার্থ হবে। ফকীহগণ 'শহর'-এর সন্নিহিত বা আওতাধীন অঞ্চলের আয়তন ও দূরত্ব সম্পর্কে নানা মত ব্যক্ত করেছেন। কেউ এর সীমা নির্ধারণ করেছে ৯ মাইল, কেউ বলেছেন ২ মাইল, কারো মতে ৪ মাইল, আবার কারো কারো মতে নামায পড়ে সন্ধ্যার আগে ঘরে ফিরে যাওয়া যায় এরূপ দূরবর্তী অঞ্চলই 'শহরের' আওতাধীন।" 'বাদায়ে' গ্রন্থের লেখক এই শেষোক্ত সংজ্ঞাই পছন্দ করেছেন। হাদীস থেকেও এর পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যেঃ-

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّعَمْ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ

"রসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাত হওয়ার আগে নিজের বাড়ীতে পৌঁছে যেতে পারে, তার ওপর জুময়া ফরয।"[১]

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي

"লোকেরা নিজ নিজ বাসস্থান থেকে এবং আওয়ালী (মদিনার পার্শ্ববর্তী গ্রাম) থেকে জুময়া পড়তে আসতো।"

অন্য এক হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

---

১. সনদের দিক দিয়ে হাদীসটি দুর্বল হলেও একই মর্মে হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আনাস, হযরত ইবনে ওমর এবং হযরত মুয়াবিয়া থেকে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নাফে, হাসান, ইকরামা, ইবরাহীম নাখয়ী, আতা, আওযায়ী ও আবূ সাওর প্রমুখ হাদীসবেত্তা ও ফেকাহবিদগণ এটি গ্রহণ করেছেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا هَلْ عَسٰى اَحَدُكُمْ اَنْ يَتَّخِذَ الصبة مِنَ الْغَنَمِ عَلٰى رَأْسِ مِيْلٍ اَوْ مِيْلَيْنِ فَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَاءُ فَيَرْتَفِعُ ثُمَّ تَجِيْئُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَجِيْئُ وَلَا يَشْهَدُهَا (ثَلَاثًا) حَتّٰى يُطْبَعَ عَلٰى قَلْبِهِ -

"রসূল (সাঃ) বলেছেন, শোন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন আছে যে, মেষের পাল নিয়ে ঘাষের খোঁজে এক মাইল, দু' মাইল চলে যেতে পারে। কিন্তু জুময়ার নামাযের জন্য এখানে আসে না (এ কথাটা তিনি তিনবার বলেন)। এ ধরনের লোকের মনে সিল মেরে দেয়া হবে।"

এ সব হাদীস এবং ফকীহদের উক্তি থেকে জানা যায় যে, জুময়া আদায়ের উপযোগী 'শহরের' আওতাধীন অঞ্চলের সীমা ছয়-সাত মাইল বা তার কাছাকাছি, যেখানকার অধিবাসীরা নামায পড়ার পর সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ীতে পৌঁছে যেতে পারে। এই সীমার মধ্যে অবস্থানকারী স্থায়ী গ্রামবাসী কিংবা যাযাবর-সকল মুসলমানের জন্য কেন্দ্রীয় জনপদে উপস্থিত হয়ে জুময়ার নামায আদায় করা ফরয। ইবনে হুমাম ফাতহুল কাদীরে এ সম্পর্কে বলেনঃ

وَمَنْ كَانَ مِنْ مَكَانٍ مِنْ تَوَابِعِ الْمِصْرِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ اَهْلِ الْمِصْرِ فِىْ وُجُوْبِ الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ بِاَنْ يَاْتِىَ الْمِصْرَ فَلْيُصَلِّيَهَا فِيْهِ (ج ١ ص ٤١١)

"যে ব্যক্তি শহরের পার্শ্ববর্তী কোন জায়গায় অবস্থান করে, তার ওপর শহরবাসীর মতই জুময়া ফরয। তাকে শহরে গিয়ে নামায পড়ে আসতে হবে" (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪১১)

সার কথা

এবার আমি নিজের বক্তব্যকে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি। এ থেকে আপনি এক নজরে বুঝতে পারবেন যে, গ্রামে জুময়া চালু

করার জন্য আমি যে ব্যবস্থার সুপারিশ করছি তা হানাফী মযহাবের সাথে কতখানি সংগতিশীল বা অসঙ্গতিশীল।

১. হানাফী মাযহাবে আলাদা আলাদা গ্রামে জুময়া কায়েম করা যায়েজ নয়। আমিও তা সমর্থন করি।

২. হানাফী মতে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় শহরে জুময়া কায়েম করা উচিত। এ ব্যাপারেও আমি তাদের অনুসারী।

৩. হানাফী মযহাবে কেবলমাত্র দু'ধরনের জনপদকে জুময়া আদায়ের যোগ্য কেন্দ্রীয় শহর বলে স্বীকার করা হয়। প্রথমত, যে জনপদ নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ও নাগরিক সুবিধার প্রাচুর্যের কারণে স্বতসিদ্ধভাবে কেন্দ্রীয় ও জনাকীর্ণ জনপদে পরিণত হয়, যেমন শহর, নগর, ও উপশহর, দ্বিতীয়ত, যে জনপদকে শাসক কর্তৃক জুময়া পড়ার যোগ্য শহর বলে ঘোষণা করা হয়।

এই শেষোক্ত সংজ্ঞাটিতে আমি শুধু এতটুকু সংশোধনী যুক্ত করেছি যে, যেখানে মুসলিম শাসক নেই সেখানে সাধারণ মুসলিম অধিবাসীদের মতৈক্যকে শাসকের স্থলাভিষিক্ত মেনে নেয়া হোক এবং তারা কোন অঞ্চলের কোন স্থানকে কেন্দ্রীয় শহর রূপে নির্বাচন করলে তার স্বীকৃতি দেয়া হোক। যেহেতু জুময়া কায়েম করার ব্যাপারে হানাফী মাযহাব মুসলমানদের পারস্পরিক সম্মতি তথা তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তকে শাসকের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মেনে নিয়েছে। সেহেতু শহর নির্ধারণের ব্যাপারে তাদের মতামতকে হানাফী মূলনীতির পরিপন্থী মনে করার কোন কারণ নেই।

৪. হানাফী মাযহাব গ্রামবাসীর ওপর জুময়া ফরয না হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে কেবল এ জন্যে যে, মুসলিম শাসকরা জুময়া কায়েম করার ব্যবস্থা গ্রহণে শৈথিল্য দেখিয়েছে। ফলে জুময়া শুধুমাত্র বড় বড় শহর ও উপ-শহরে সীমিত হয়ে গেছে। আর যেহেতু এ সব শহর অনেক দূরে অবস্থিত হয়ে থাকে, তাই বাধ্য হয়ে হানাফী আলিমগণকে ফতওয়া দিতে হয়েছে যে, গ্রামবাসীর ওপর জুময়া ফরয নয়। নচেত নিছক গ্রামবাসী হওয়া যে জুময়া রহিত হওয়ার কোন কারণ নয়, সেটা সর্বস্বীকৃত ব্যাপার। এ জন্য

শহরের ৭/৮ মাইলের মধ্যে অবস্থিত গ্রামের অধিবাসীদের ওপর হানাফী ইমামগণ শহরের অধিবাসীদের মতই জুময়া ফরয বলে স্বীকার করেন। আমার বক্তব্য এই যে, কারণে এভাবে বাধ্য হয়ে জুময়া রহিত করার পক্ষে ফতওয়া দেয়া হয়েছে, সে কারণটি দূর করা আমাদের কর্তব্য। কারণ দূর করতে পারলে আপনা আপনি ফতওয়াটাই রহিত হয়ে যাবে এবং মুসলমানদের জন্য একটি ফরয আদায়ের পথ সুগম হবে। কিন্তু কিছু সংখ্যক আলেমের বক্তব্য ঠিক এর বিপরীত। তাঁরা বলেন যে, যে কারণটি বহাল রাখতে হবে, যাতে করে সেই পুরানো ফতওয়া যা। প্রাচীনত্বের কারণে পবিত্র ও মহিমান্বিত হয়ে গেছে-বহাল থাকুক। এতে যদি ফরযের কল্যাণ ও রহমত থেকে কোটি কোটি মুসলমান বঞ্চিত থেকে যায়, তবে তাতে তাদের কিছু আসে যায় না।

ইসলামের স্বার্থে ফতওয়া পরিবর্তনের আবশ্যকতা

উক্ত সংক্ষিপ্ত সার পড়ার পর সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, জুময়া কায়েম করার যে ব্যবস্থার আমি সুপারিশ করেছি, হানাফী মাযহাবে তার পুরোপুরি অবকাশ বিদ্যমান এবং তাকে অবৈধ সাব্যস্ত করার সত্যিকার কোন ভিত্তি নেই। এবার আমি অল্প কথায় এও বলে দিতে চাই যে, এ ধরনের একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবনের কি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সে প্রয়োজনীয়তা কতখানি গুরুত্ববহ।

ভারতে যত দিন মুসলমানদের শাসন চালু ছিল, তা শরীয়তের বিচারে যত অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণই হোক না কেন, তার কল্যাণে ইসলামের সামাজিক অবকাঠামো কোন না কোন পর্যায়ে অবশ্যই বহাল ছিল। অন্তত এতটুকুতো ছিলই যে, মুসলিম শাসকদের দ্বারা ইসলামী আইন জারি হতো এবং সর্বস্তরের মুসলিম জনগণ-ছোট-বড় শহরে, পাড়া গাঁয়ে নির্বিশেষে সকলেই নিজেদের জীবন যাপনের সমস্যাবলীতে শাসকদের শরণাপন্ন হতো। মুসলিম জাতির প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে একটা ইসলামী যোগসূত্রে গ্রোথিত করে রাখার এটা একটা শক্তিশালী মাধ্যম ছিল। কিন্তু সেই অসম্পূর্ণ ইসলামী

শাসনও যখন বিলুপ্ত হয়ে গেল, তখন মুসলিম জনতাকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত ও সংঘবদ্ধ করে রাখার আর কোন উপায় অবশিষ্ট রইল না। এখন সব কিছু খতম হয়ে যাওয়ার পর আমাদের সামষ্টিক সত্তা তথা জাতীয় অস্তিত্বের একটি মাত্র সর্বশেষ অবলম্বন বাকী রয়েছে। আমাদের আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত, সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত শরীয়তের আইন-বিধি থেকে যে যোগসূত্রের সৃষ্টি হয়, সেটাই সেই সর্বশেষ অবলম্বন। এ যোগসূত্রটি যত সবল হবে, আমাদের জাতিসত্তা ততই সবল হবে। আর এটি যত দুর্বল হবে ততই দুর্বল হবে আমাদের সামষ্টিক অস্তিত্ব। আর এর মৃত্যু ঘটলে আমাদের মৃত্যু অবধারিত। অসংখ্য বিপরীতমুখী উপকরণ সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও আমাদের নগর-জনপদ গুলোতে এ যোগসূত্রগুলো এখনো অপেক্ষাকৃত শক্তিমান। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়ে যে ছোট ছোট মুসলিম জনপদগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, সেগুলোকে ইসলামী বন্ধনে আবদ্ধকারী যোগসূত্র এখন এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে একটা ঈশারাইেত তা ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মেষ শাবকদের মত তারা এখন যে কোন প্রতারক বাঘের সহজ শিকারে পরিণত হওয়ার যোগ্য। বিশেষত যেখানে তারা সংখ্যালঘু সেখানে তো তাদের জান, মাল ও সম্ভ্রম পর্যন্ত নিরাপদ নয়। এ পরিস্থিতিকে শুধরানোর ব্যবস্থা যদি ত্বরিত গতিতে গ্রহণ না করা হয়, তাহলে আপনি দেখবেন যে, গ্রামের মুসলিম জনসংখ্যা দলে দলে ইসলাম থেকে কেটে পড়তে আরম্ভ করবে, আর তাদের বিপথগামী হওয়ার অর্থ হলো আমাদের গোটা জাতির অনিবার্য ধ্বংস ও বিলুপ্তি। কেননা আমাদের আট কোটি মুসলিম জনতার অন্তত সাড়ে ছয় কোটি গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী।

এখন যদি কেবল অন্যান্য জাতির অনুকরণ করাই আমাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে, তা হলে পল্লী উন্নয়নের বহু রকমের কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে এবং করাও হচ্ছে। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের কর্মসূচী দ্বারা আর যাই হোক, ইসলামী সামাজিক বন্ধন ও ইসলামী জাতীয় একাত্মতা সংহত করা সম্ভব নয়। ইসলামী সামাজিক সংহতি তো কেবল ধর্মীয় বন্ধনকে দৃঢ়তর করা দ্বারাই

অর্জিত হতে পারে। আর ধর্মীয় বন্ধনকে দৃঢ় ও মজবুত করার যতগুলো উপায় রয়েছে, গ্রামে জুময়ার ব্যবস্থা কায়েম না করা পর্যন্ত তার কোনটাই সফল হতে পারে না। ইসলামী সংগঠন ও সংস্কারের পথের প্রথম পদক্ষেপ হলো বিক্ষিপ্ত ব্যক্তি ও বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে ধর্মীয় কর্মকান্ডের মাধ্যমে পারস্পরিক সংযোগ ও কেন্দ্রমুখিতা সৃষ্টি করা। আর এই সংযোগ ও কেন্দ্রমুখিতা সৃষ্টির যে সর্বোত্তম কার্যকর পন্থা আল্লাহ আমাদের জন্য মনোনীত করেছেন, তা হলো জুময়ার প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা।

(তরজমানুল কুরআন, সফর ও রবিউল আউয়াল, ১৩৫৭ হিঃ, এপ্রিল–মে, ১৯৩৮)